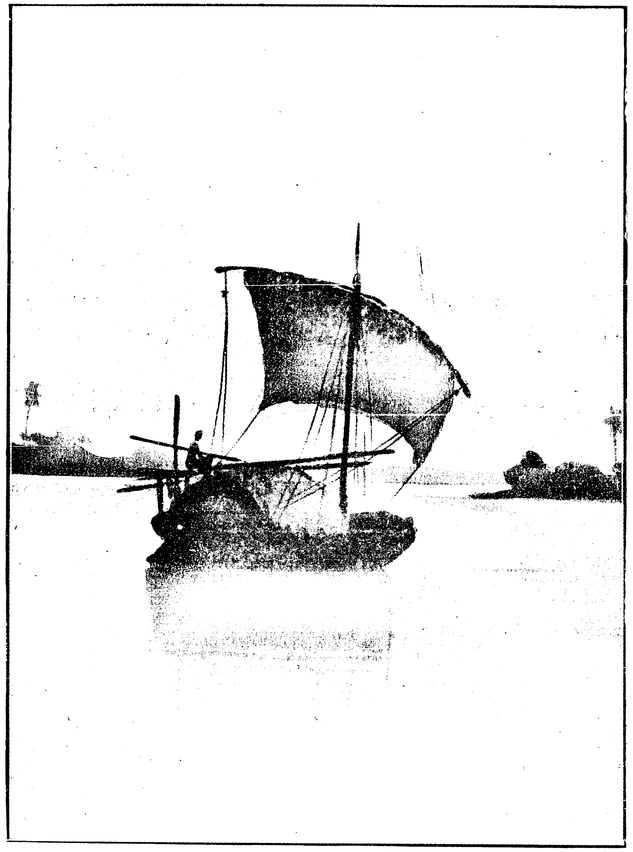

বারাকপুরের গঙ্গা

(শিল্পী—শ্রীমান্ অজয়কুমার দাস
(রামধনুর গ্রাহক)

৭ম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪১ { ৪র্থ সংখ্যা

বিশ্বরূপ

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

জানি তুমি এক সাথেতে ভয় অভয়,
দয়াল বল্‌তে আজকে তবু কষ্ট হয়।
এমন করে ভুলিয়ে দিলে পৃথ্বীকে !
মুহূর্ত্তেকে করলে এমন কীর্ত্তি কে ?
পড়্‌ল চাপা নর ও নারী লক্ষ হে,
কান্না চাপায় কাঁপায় পাষাণবক্ষ হে !
এ দুখ চেপে কেমন করে রাখ্‌ব হে,
দয়াল বলে কেমন করে ডাক্‌ব হে !

রুদ্ধ শ্রবণ অশ্রুধারার কল্লোলে,
রুদ্র রূপই দেখছি প্রলয় হিল্লোলে ;
বুদ্ধ কি আজ রুদ্র রূপই ধরলে হে ?
বুদ্ধভূমি হত্যাগৃহ করলে হে ?
যদুবংশ ধ্বংস করা হস্তকে
দেখছি শুধু শঙ্কানত মস্তকে।
এ দুখ চেপে কেমন করে রাখ্‌ব হে,
দয়াল বলে কেমন করে ডাক্‌ব হে !

এই যে ভাঙন, বুঝি নে এর অর্থ কি,
সৃষ্টি তোমার করবে তুমিই ব্যর্থ কি ?
অরুন্তুদ এই যাতনা—লোকক্ষয়
দয়াল তুমি দেয় কি তাহার পরিচয় ?
এ নয় মাখন কিংবা দধিভাণ্ড হে,
তোমার রচা বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড হে !
সত্য শিব সুন্দর হে চিৎস্বরূপ,
দেখতে নারি তোমার ভয়াল বিশ্বরূপ।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

১০

দেবী গাঙ্গুলীর রসগোল্লার কথা মনে হতেই কাঞ্চনের জিভে জল এল। বাবা কিন্তু দেবীকে বড় ঠাট্টা করেন। সেবার কালীপূজার সময়ে বলেছিলেন, 'দেখ

দেবী, মাঝে মাঝে একটু রকমফের কোরো। তোমার যা গোল্লা, ও গোলা-বিশেষ—দুর্ভিক্ষে আর রাষ্ট্রবিপ্লবে কাজে লাগ্‌তে পারে কিন্তু ভদ্রলোকের পাতে—!' ব'লে কথাটা শেষ না করেই বাবা যা হেসেছিলেন! এ কথায় হাসবার কি আছে কাঞ্চন ত খুঁজে পায় না। বাবার যেমন!

"জগদ্ধাত্রী ভোজনাশ্রম"

চল্‌তে চল্‌তে আচম্‌কা ওই কথাগুলো দেখে কাঞ্চন থম্‌কে দাঁড়াল। মন দিয়ে সাইন্‌-বোর্ড্‌টা পড়তে লাগ্‌ল—"এই যে আসুন! এখানে উৎকৃষ্ট ভাত, ডাল, তরকারী, মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল ইত্যাদি দিবারাত্র পাওয়া যায়।"

বাঃ, এই ত সে খুঁজছিল! কাঞ্চন আর ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ না করে সটান্ ভেতরে ঢুকে গেল। 'কত? তোমাদের এখানে খেতে ক' পয়সা?'

'তিন আনা। কই, পয়সা দেখি?'

'দেব, আগে খাই।'

'ও সব হবেক্ নাই বাপু—' ব'লে আশ্রমের মালিক বিড় বিড় করে বক্‌তে সুরু কর্‌ল; তার মোদ্দা কথাটা এই যে, ছেলে-ছোক্‌রাদের এই ভাবে খাইয়ে অনেকবার সে ঠকেছে, আগে হাতে পয়সা নিয়ে তবে—, ধারে সে খাওয়ায় না।

কাঞ্চন তাকে সিকিটা দিয়ে একটা আনি ফেরৎ নিল। লোকটার বক্তৃতায় সে মনে মনে ভারী বিরক্ত হয়েছিল। আগে ত খেয়ে নিক্, তার পরে দেখাবে লোকটাকে। ঘরের মধ্যে পছন্দমত ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে সে বসে পড়্‌ল। বস্‌তে না বস্‌তেই একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।—"ওহে ছোক্‌রা, ওখানে বস্‌লে যে? ওটা যে আমার জায়গা!"

কাঞ্চন ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকাল মাত্র, কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি কর্‌ল না।

'এ যে নড়েও না, রাও কাড়ে না! ও কিত্তিবাস—কিত্তিবাস!'

আশ্রমের মালিক কৃত্তিবাস উপস্থিত হয়ে সমস্যাটা আগে বুঝে নিল, তার পরে কাঞ্চনকে বল্ল—'তুমি একটু সরে বস বাপু, ইনি আমাদের বাঁধা খদ্দের—'

'বাঁধা খদ্দের ত অন্য কোথাও বেঁধে রাখ গে। আমি নড়ছি নে।'

ততক্ষণে কাঞ্চনের সম্মুখে ভাতের থালা এসে পৌঁছেছে। কৃত্তিবাস চটে বল্লে—'তুমি থালাটা নিয়ে ওই ধারে বস না কেন?'

'পয়সার বেলা নগদ, আর বস্‌বার বেলা ধারে? তা হবে না।' এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে কাঞ্চন আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে থালার প্রতি মনোনিবেশ কর্‌ল। অগত্যা ভদ্রলোক কাঞ্চনের দিকে কট্‌মট্ করে চাইতে চাইতে নিজেই অন্য জায়গায় গিয়ে বস্‌লেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কাঞ্চন বেরিয়ে পড়্‌ল। বারোটা পয়সা নিয়েছে বটে তবে নেহাৎ মন্দ খাওয়ায় নি। যাক্ গে বেটা, কাঞ্চন ওকে মনে মনে মার্জ্জনা ক'রে দিল।

'ভোজনাশ্রমের' পাশেই একটা ওষুধের দোকান—বড় বড় হরফে ইংরেজিতে লেখা Chemist and Druggist। দোকানের টেবিলে কাঞ্চন দেখ্‌ল, সকালবেলার সেই কাগজখানার মত একখানা কাগজ। আজ্‌কের খবরটা তো তার পড়া হয় নি। একবার পড়ে দেখ্‌লে হ'ত।

সে আস্তে আস্তে দোকানে ঢুক্‌ল। টেবিলের ধারে সাহেবী পোষাক পরা অল্পবয়সী একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি খবর-কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকালেন। কাঞ্চন জিজ্ঞেস কর্‌ল—'আপনি কি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, কি চাই?'

'ওই কাগজখানা একবারটি পড়্‌ব?'

'পড়তে পার।'

'কাগজখানা পড়তে গেলে ওষুধ কিন্‌তে হবে না ত? আমি আগেই বলে দিচ্ছি মশাই, আমার কাছে পয়সা-টয়সা নেই, ওষুধ কিন্‌তে আমি পার্‌ব না।'

ডাক্তার বিস্মিত ভাবে বল্লেন—'না না, ওষুধ কিন্‌তে হবে কেন? কিছু না কিনেই তুমি পড়তে পার।'

ডাক্তার এতক্ষণ একটু অবাক্ হয়ে কাঞ্চনকে লক্ষ্য করছিলেন, কাগজখানা তার পড়া শেষ হলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন্ স্কুলে পড় তুমি? কোন্ ক্লাসে?'

কাঞ্চন গর্ব্বের সহিত বল্ল—'আমি পড়ি টড়ি না।'

'এত বড় ছেলে, স্কুলে পড় না! কি রকম?'

'পড়তুম। স্বরাজের জন্য ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছি।'

'বটে? মুখ্যু হয়ে থাক্‌লে স্বরাজ হবে?'

কাঞ্চন প্রশ্নের ধাক্কায় প্রথমটা কাবু হয়ে পড়্‌ল, কি জবাব দেবে ভেবে পেল না, কিন্তু একটু পরেই দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল—'নিশ্চয়! মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—বলেছেন—স্বরাজ মে ওয়েট্ বাট্—বাট্—কথাটা আমার এখন মনে আস্‌ছে না। তার মানেটা এই যে, পড়াশুনার জন্য অপেক্ষা করা চল্‌বে কিন্তু স্বরাজের জন্য আর অপেক্ষা করা চল্‌বে না। বুঝেছেন?'

ডাক্তার হেসে বল্লেন—'মহাত্মা গান্ধী কোথাও এ কথা বলেন নি। ওই ত তোমার সম্মুখে কাগজ পড়ে আছে, কোথায় বলেছেন দেখাও দেখি? মহাত্মা গান্ধী নিজে কি মুখ্যু? সি, আর, দাশ কি মুখ্যু? ওঁদের মত অত বড় বিদ্বান্ দেশে খুব কমই আছে, তা জান?' কাঞ্চন এবার নিরস্ত্র হয়ে পড়্‌ল।

ডাক্তার বলে চল্লেন—'মূর্খতার দ্বারা যদি স্বরাজ হ'ত তা হলে দেশের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে ঊনত্রিশ কোটিই তো আকাট্, কোন্ দিন স্বরাজ হয়ে যেত তবে! মুখ্যু হয়ে থাক্‌লে ভাত আসে না,—স্বরাজ আসে?'

কাঞ্চন কি বল্‌তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে ডাক্তার বল্লেন—'তোমার কোন কথা আমি শুন্‌তে চাই না। খবরের কাগজ পড়ে পড়ে তোমার মাথা বিগ্‌ড়েছে। যাও, এখুনি ইস্কুলে আবার ভর্ত্তি হও গে, ভর্ত্তি হয়ে তবে অন্য কথা। যাও—এক্ষুণি যাও—যাঃও।'

ভদ্রলোক যেন কাঞ্চনকে তাড়া করলেন। চম্‌কে উঠে কাঞ্চন চেয়ার ছেড়ে এক লাফে একেবারে ফুটপাথে।

কিন্তু ফুটপাথে পড়েই তার মনে হল—ছিঃ! পালানোটা কাপুরুষের লক্ষণ। কাঞ্চনের কোষ্ঠিতে কাপুরুষতা লেখে না। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বল্ল—'পড়্‌ব না আমি। আপনি কি করবেন? আমি ভয় করি নাকি আপনাকে?'

ডাক্তার হো হো করে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর হাসিতে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ

হয়ে কাঞ্চন সে স্থান পরিত্যাগ কর্‌ল। পরিত্যাগ কর্‌ল বটে, কিন্তু ভয় পেয়ে নয়, বীরের মত।

কিন্তু বড় ভাবনায় পড়ে গেল কাঞ্চন। মহাত্মা গান্ধী নাই বলুন, না হয় অন্য কেউই বলেছে, তা বলেই তো কথাটা মিথ্যে হতে পারে না। কিন্তু এ ভদ্রলোক যা বল্লেন সে কথাগুলোও তো ফেল্‌না নয়! তবে? উল্‌টো-পাল্‌টা দু' রকম কথার দুইই কি সত্যি হতে পারে কখনো? কোন্‌টা সত্যি তা হলে?

সহসা ফিরিওয়ালার চীৎকারে কাঞ্চনের সমস্ত চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

'সাবা—ন্ তরল আল্‌তা চাই,
মাথার কাঁটা কিলিপ্ চাই
হেজ্‌লিন্ চাই পমেটম্ চাই—'

কাঞ্চন তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'দেখি কি আছে তোমার?' লোকটা তার বোঁচ্‌কা খুলে কাঞ্চনকে দেখাতে লাগ্‌ল।

'কি চাই আপনার? সব আছে, সাবান, তরল আলতা, কিলিপ, মাথার কাঁটা, সেফ্‌টিপিন্, মাথার চিরুনী, হেজ্‌লিন, হিমানী, পাউডার—'

'হ্যাঁ, এ সমস্তই চাই—আমার মার জন্য।'

'তা, কোন্ বাড়ী বলুন, আমি যাচ্ছি।'

কাঞ্চন গম্ভীর ভাবে বল্ল—'আমাদের বাড়ী? সে আমাদের দেশে।'

লোকটা হতাশ হয়ে বল্ল—'এখানে বাড়ী নয়? কিন্‌বেন না যদি তবে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?'

কাঞ্চন আশ্বাস দিয়ে বল্ল—'কিন্‌ব বই কি! মার জন্য কিন্‌তে হবে—আমাকেই কিন্‌তে হবে, বাবা ত এ সব কিনে দেন্ না কখনো! বাবা বলেন—এ সব বিলাসিতা। আমি চাই আমার মা একটু বিলাসিতা করুক। বিলাসিতা করলে মাকে ভাল দেখায়।'

লোকটা কাঞ্চনের কথা শুনে হাস্‌ল। বল্ল, 'তুমি ত ছেলেমানুষ! তুমি কি করে কিন্‌বে?'

'কেন? রোজ্‌গার করে? আমি ত চাক্‌রি করতেই কলকাতায় এসেছি।

তা তুমি তো এই রাস্তা দিয়েই রোজ যাও এই সময়ে—কেমন? প্রথম মাসের মাইনে পেলেই এ সব আমি কিন্‌ব। কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেব। ডাকে এত জিনিস যাবে না?'

'খুব যাবে। ডাকে কি না যায়! মাশুল বেশী লাগ্‌বে কেবল।'

'তা লাগুক্। মাশুলের জন্য আমি কেয়ার করি না। হঠাৎ এ সব পেলে মা কি রকম আশ্চর্য্য হয়ে যাবে আমি তাই ভাব্‌ছি। সে ভারী মজা হবে।'

লোকটা আবার হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে চলে গেল। কাঞ্চন সেই ভারী মজার দৃশ্যটা একবার মানস-চক্ষে নিরীক্ষণ করে নিল। পিয়ন বেটা মস্ত এক পার্শ্বেল নিয়ে হাজির হয়েছে তাদের বাড়ীতে। কিসের পার্শ্বেল? কার নামে?

বাবা ছুটে বেরিয়েছেন। উঁহুঁ—বাবার নামে নয়, মার নামে। মার নামে এত বড় পার্শ্বেল? বাবার মুখ তখন চুণ। তাদের বাড়ী এত বড় পার্শ্বেল কখনো আসে নি। আর যদিবা অবশেষে একদিন এল, তাও এল কিনা মার নামে! মনে মনে ভারী হিংসে হয়েছে বাবার। যেমন হিংসে, তেম্‌নি হয়েছে কৌতূহল!

বাবা পিয়নকে তাড়া দিচ্ছেন, 'দাও না আমাকে! আমারি ত বৌ—তারি নামে এসেছে, আমাকে দিতে দোষ কি?' পিয়ন বল্‌ছে—'উঁহুঁ, হুকুম নেই। রেজেষ্টরী কিনা, মার সই চাই।'

মা তো অবাক্! যা কখনো আসে না, আসার কল্পনাও তাঁর স্বপ্নে নেই, তাই কিনা এল তাঁর নামে! কি আছে না জানি ওর মধ্যে! কেই বা পাঠিয়েছে কে জানে!

সই দিয়ে পার্শ্বেল নিয়ে খুলে দেখেন—ওমা, এ যে সাবান, তরল আল্‌তা, মাথার কাঁটা, কিলিপ্, সেফ্‌টিপিন, হেজ্‌লিন, পাউডার, পমেটম—আরো কত কি! কেবল বিলাসিতা আর বিলাসিতা!

কে পাঠালে? মা যখন ভাব্‌বেন—কে পাঠালে! আঃ, তখন কি মজাই না হবে!

নাঃ, একটা চাক্‌রির যোগাড় করতে হল তাকে। তা না হ'লে কিছু হচ্ছে না।

ও বাবা, এ আবার কি! এত জল হঠাৎ কোত্থেকে! এ যে দেখি—পাইপে করে রাস্তায় জল দিচ্ছে,—ভারী চমৎকার ত! কিন্তু আর একটু হলেই সে ভিজে গিয়েছিল! যদি ঘুরিয়ে না নিত তা হ'লেই নেয়ে উঠ্‌তে হত আর কি! একটা লোক রাস্তার মুখে পাইপ এঁটে দিচ্ছে, আর একজন কত কায়দায় জল ছড়িয়ে যাচ্ছে। কাঞ্চন জল দেওয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল।

কাঞ্চনের হঠাৎ মনে হল—এ ত বেশ কাজ! এ কাজ করলে হয় না? এ ত কাজ নয়, কাজ-কাজ খেলা।

যদি এ কাজ পায় সে খুব ক'ষে রাস্তায় জল দেয়—দিনরাতই জল দেয়—সহরের সব রাস্তায়। পাইপে করে জল ছিটানোয় নিশ্চয়ই খুব আরাম।

যে লোকটা জল দিচ্ছিল কাঞ্চন তাকে জিজ্ঞেস কর্‌ল—'তোমার তো বেশ কাজ হে! তুমি কি দিনরাতই রাস্তায় জল দাও?'

'দু'বার দিতে হয়, খুব ভোরে আর বিকালে।'

'বাঃ, বেশ ত! তা ক' টাকা পাও এ জন্যে?'

'বেশী না বাবু, মোটে আঠারো টাকা।'

কাঞ্চন অবাক্ হয়ে বল্লে—'আ-ঠা-রো টা-কা! সে যে অনেক!'

'অনেক কি বাবু! ওই ক'টা টাকায় আমাদের কি চলে? আমাদের পোষায় না ওতে।'

'তা, এ কাজ কোথায় পাওয়া যায়?'

'মুন্সীপালীতে।'

'সে কোথায়? আমাকে কাল নিয়ে যাবে?'

'খুব, কাল এইখানে দাঁড়িয়ে থেক এমন সময়ে, আমরা জল দিতে আস্‌ব, সেইখানে নিয়ে যাব।'

'নিয়ে গেলে হবে না, আমাকেও এই কাজ একটা দিতে হবে। আমিও জল দেব রাস্তায়।'

'কাজ দেবার মালিক কি আমরা, বাবু? কাজ দেন বড় সাহেব।'

'বেশ, তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেয়ো, কেমন?'

'আচ্ছা'।

লোক দু'টো জল দিতে দিতে চল্‌ল, কাঞ্চন আর তাদের সঙ্গে গেল না। সে পরিশ্রান্ত হয়ে রাস্তার একধারে বসে তার আসন্ন এই চমৎকার চাকরীর কথাটা ভাব্‌তে লাগ্‌ল। আঃ, রাস্তায় জল দিতে কী ফূর্ত্তি! এই বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ! আঠারো টাকাও কম টাকা নয়, ওতে বোধ হয় ওই লোকটার বোঁচ্‌কার সমস্ত জিনিস কেনা যায়!

সেখান থেকে সামান্য দূরে বড় রাস্তার মোড়ে একটা পোড়ো জমিতে অনেকগুলি লোক জমেছিল,—জনতার বৃত্তাকার ক্রমশঃই বড় হয়ে উঠ্‌ছিল। কাঞ্চনের দৃষ্টি ও পা সেই দিকে আকৃষ্ট হ'ল। অতি কৌশলে এবং কষ্টে সে সেই সঙ্ঘবদ্ধ লোকগুলোর ভেতর দিয়ে গলে গিয়ে একটা ভাল জায়গা দখল করে বস্‌ল।

বৃত্তাকারের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে মড়ার মাথার খুলি, হাড়-গোড়, এবং আরো হরেক রকম জিনিস। একজন আলখাল্লা পরা লোক আগড়ম-বাগড়ম মন্ত্র আউড়ে ভেল্‌কি দেখাচ্ছিল। কাঞ্চন ভাল হয়ে জমে বস্‌ল।

যে সে ভেল্‌কি নয়—ভানুমতীর ভোজবাজী! আলখাল্লা পরা লোকটা বক্তৃতা দিচ্ছিল যে পেশাদার ম্যাজিক-ওয়ালাদের সাধ্য নেই যে তার মত খেলা দেখায়। এমন খেলা পৃথিবীতে কেবল একজন জানে এবং সেই একজন হচ্ছে সে নিজে। তার কথায় কাঞ্চনের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল।

একটা ছোট ছেলেকে বেঁধে-ছেঁদে একটা বড় চুপ্‌ড়ির মধ্যে পুরে ডালাটা বন্ধ করা হ'ল, তার পরে চুপ্‌ড়িটাকে দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধা হ'ল। ভেল্‌কি-ওয়ালা প্রশ্ন কর্‌ল—'ভেতরে আছিস্ তো?' ছেলেটা ভেতর থেকে সাড়া দিল। তার পরে ভেল্‌কিওয়ালা একটা প্রকাণ্ড ছোরা নিয়ে নির্দ্দয় ভাবে ডালাটার ভেতরে খোঁচাতে লাগ্‌ল। কাঞ্চনের সমস্ত আত্মা আঁৎকে উঠ্‌ল—ছেলেটা মারা যাবে যে! তার পরে চুপ্‌ড়ি খুলে দেখা গেল ছেলেটা তার মধ্যে নেই, সে জনতার ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল কাঞ্চনের পাশ দিয়ে!

কাঞ্চন ত অবাক্! এ রকম দৃশ্য সে জীবনে দেখে নি। তখন ভূমিকম্প সুরু হ'লেও সে টের পেত কি না সন্দেহ।

লোকটা একটা আমের আঁঠি পুঁত্‌ল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটা দাঁড়াল একটা আমের চারা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাতে ফল ধর্‌ল—একেবারে একটা আস্ত পাকা আম! ভেল্‌কিওয়ালা আমটা কেটে জনতাকে পরিবেশন করতে গেল, কিন্তু ভেল্‌কির আম খেতে কারু সাহস হ'ল না। কাঞ্চন এক টুক্‌রো খেয়ে দেখ্‌ল—সত্যি একেবারে আসল আম! অবাক্ কাণ্ড! (ক্রমশঃ)

এক পেয়ালা চা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

কবি দ্বিজু রায় বলিয়াছেন—

"বিভব, সম্পদ্, ধন নাহি চাই, যশ-মান চাহি না,
শুধু বিধি, যেন প্রাতে উঠে পাই ভাল এক পেয়ালা চা।"

শুধু দ্বিজু রায় নন, তোমাদের অনেকেরই বোধ হয় মনের কথা এই। বাস্তবিক সকাল বেলা উঠিয়া এক পেয়ালা গরম গরম চা না পাইলে দিনটাই যেন কেমন বিশ্রী হইয়া যায়—মনটা তো উদাস হয়ই, নয় কি? বল না, লজ্জা কি? আমি জানি দু'-চার জন 'নিরামিষ' স্বভাবের পাঠক বাদে তোমাদের সকলেই আমার কথায় সায় দিবে।

চা যারা খায় কেউ কেউ কিন্তু তাদের নেশাখোর বলে। নেশা দু' রকম আছে। এক—যা খাইলে লোকের স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থতা নষ্ট হয়—যেমন মদ, গাঁজা, সিদ্ধি ইত্যাদি। আর এক রকমে ও সব কিছু হয় না, শুধু জিনিষটি খাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ থাকে। ইহাকেও অনেকে নেশা বলে। চা এই জাতের নেশা। (আমাদের একটি চা-খোর বন্ধু কিন্তু বলেন—তা হইলে বাঙ্গালী মাত্রেই নেশাখোর, কেননা বাঙ্গালীর মস্ত বড় নেশা ভাত—একটা দিন ভাত

না হইলে—ওরে বাবা, ভাবিতেও মন খারাপ হইয়া যায়!) শেষেরটিকে নেশা বল আর নাই বল, জিনিষটা উপকারী হইলে দোষের নয় কিন্তু অপকারী হইলে দোষের সন্দেহ নাই।

চায়ের মধ্যে দু'টি বিশেষ জিনিষ আছে, তাদেরই জন্য চায়ের এত সুনাম এবং বদ্‌নাম। এক নম্বর জিনিষটির নাম কেফিন্। এটি কিন্তু বেশ ভাল জিনিষ—আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে কিন্তু অন্যান্য উত্তেজক জিনিষের মত পরে কোন অবসাদ আনে না। ইহাই এর প্রধান গুণ। চা খাইলে শরীরে, মনে যে বেশ একটা তাজা তাজা ভাব আসে তার কারণ এই কেফিন্। দ্বিতীয় জিনিষটির নাম ট্যানিক্ য়্যাসিড্। এটি কিন্তু মোটেই উপকারী নয়, জিনিষটি ভারী কষায়। কষায় জিনিষ মুখে গেলে মুখের লালা শুকাইয়া দেয়, আবার পেটের ভিতর গিয়াও সেখানকার রস টানিয়া ধরে—ফলে হজমের গণ্ডগোল হয়। চায়ের যত বদ্‌নাম সে এই জিনিষটির জন্য। তবে একটা সুখের কথা, কেফিন্ যেমন চায়ের পাতায় গরম জল ঢালা মাত্র বাহির হইতে সুরু করে ট্যানিক্ য়্যাসিড্ তা করে না। চা জলে ভিজাইবার পর ৪।৫ মিনিট গেলে তবে ট্যানিক্ য়্যাসিড্ বাহির হয় এবং সম্পূর্ণ রূপে বাহির হইতে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা সময় লাগে। কাজেই অল্পক্ষণ ভিজাইয়া 'লাইট্' চা তৈরী করিলে ট্যানিক্ য়্যাসিডের ভয় বিশেষ থাকে না। বেশীক্ষণ ভিজাইয়া 'কড়া' চা খাওয়াটাই খারাপ।

একটি মেয়ে-কুলি চা-বাগান হইতে চা-পাতা সংগ্রহ করিতেছে।

বলা বাহুল্য চা জিনিষটা যখন শুক্‌না পাতা তখন গাছ হইতেই তা জন্মায়।

চা গাছ আমাদের ভারতবর্ষেরই গাছ, কিন্তু চা খাইতে শেখে বোধ হয় প্রথম চীনারা। হাজার হাজার বছর আগেও চীনদেশে চা খাইবার রেওয়াজ ছিল। সে দেশে চায়ের চলন সম্বন্ধে একটা ভারী মজার (যদিও গাঁজাখুরি) গল্প আছে। একবার এক ভারতবর্ষীয় পরিব্রাজক চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান। এক দিন অনেকখানি পথ হাঁটিয়া তিনি ভয়ানক অবসন্ন হইয়া পড়েন। কিছুতেই ক্লান্তি দূর না হওয়ায় শেষ কালটায় তিনি যান রাগিয়া, এবং বোধ করি হাতের কাছে কিছু না পাইয়া নিজের ভ্রূগুলিই টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িতে থাকেন। ব্যস্, আর কি! সেই-ভ্রূ যেমনি মাটীতে পড়া অমনি তা হইতে গজাইতে লাগিল গাছ, সেই গাছের পাতা আস্বাদন করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় তাঁর অবসাদ দূর করিলেন। এই গাছই নাকি চা গাছ।

চীন হইতে জাপান এবং ক্রমে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ইয়োরোপের লোকেরাও চা খাইতে শেখে। তার পর আস্তে আস্তে ইয়োরোপে চায়ের চলন হয়। প্রথম প্রথম বিলাতে চায়ের ভয়ানক দাম ছিল। এমন কি, এক পাউণ্ড্ চায়ের দাম একশ'-দেড়শ' টাকাও হইত। কাজেই জিনিষটা বড়লোকদের ঘরেই চলিত বেশী, এবং একটু বিলাসের সামগ্রী ভাবেই। তার পর ক্রমে বাণিজ্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের দাম কমিতে থাকে, ফলে সেখানকার সাধারণ লোকেও চা খাইতে সুরু করে—এবং বেশ একটু বেশী মাত্রায়ই। চা আমাদের দেশের জিনিষ হইলেও এই সাহেবদের কাছেই আবার আমাদের নতুন করিয়া চা খাওয়ার 'হাতেখড়ি' হয়।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, জাপান—এই সব দেশেই আসল চা জন্মায়। আমেরিকানরা খুব বেশী চা খায় বলিয়া নিজেদের দেশে চায়ের চাষ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে—চা তৈরীও করিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশের মত সস্তায় পারে নাই।

আমাদের দেশে আসাম, দার্জ্জিলীং এবং জলপাইগুড়ীর ডুয়ার্স্ অঞ্চল চায়ের চাষের পক্ষে বড় চমৎকার জায়গা। ভাল চায়ের জন্য দরকার স্যাঁৎসেঁতে জায়গা, প্রচুর বৃষ্টি, আর বিশেষ এক রকম হাল্কা মাটী। এ সবই এখানে আছে, কাজেই এখানে ভাল চা হইবে না তো কোথায় হইবে? তোমাদের মধ্যে যারা দার্জ্জিলীং

গিয়াছ তারা শিলিগুড়ীর কাছাকাছি হইতেই অসংখ্য চা-বাগান নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ। ঐ সব অঞ্চলে চায়ের ব্যবসা একটা মস্ত ব্যবসা।

চা অবশ্য যে অবস্থায় তোমরা কিনিয়া আন সেই অবস্থায়ই গাছে ফলে না তা বোধ হয় জান। চাকে বাজারে ছাড়িবার আগে তার উপর অনেক মেহানৎ করিতে হয়। এবার তার কথা কিছু বলা যাক্।

প্রথমে তো চাষের জন্য জমি তৈরী করা হয়, ওদিকে নার্সারীতে চায়ের চারাও তৈরী হইতে থাকে। এক-একটা চারা ইঞ্চি ছয়েক করিয়া লম্বা হইলে সেগুলি আনিয়া বাগানে ফাঁক ফাঁক করিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়। তার পর প্রয়োজন মত সার পাইয়া সে গাছ বাড়িতে থাকে, "যত্ন-আত্তি" তো চলেই।

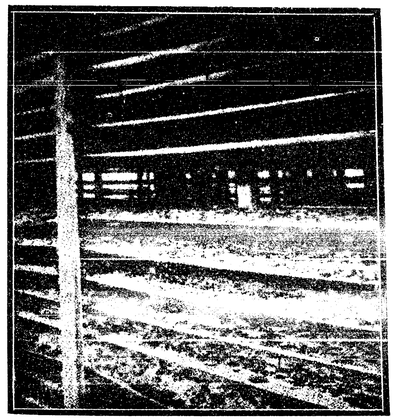

চায়ের কারখানার একটি দৃশ্য—চা-পাতাগুলিকে থাকে থাকে সাজাইয়া শুকান হইতেছে।

বছর দেড়েক কি দুয়েক পরে গাছগুলিকে মাঝে মাঝে এমন ভাবে ছাঁটিয়া দেওয়া হয় যাতে পাতার কুঁড়িগুলি ঠিক মত বাড়িতে পারে। গাছের বয়স বছর চারেক হইলে পাতা সংগ্রহ করা হয়। চা-বাগানের কুলীর কথা তোমরা সবাই শুনিয়াছ, তারাই পাতা সংগ্রহ করে। একেবারে কুঁড়ির কাছাকাছি কচি পাতাগুলিই তোলা হয়—নীচের দিক্কার বড় বড় পাতায় ভাল চা হয় না। পাতা যত কুঁড়ির কাছের হইবে চা তত উঁচুদরের হইবে।

পাতা তোলা হইলে ছোট-বড় পাতাগুলি বাছিয়া আলাদা আলাদা ভাগ করা হয়, তার পর সেগুলিকে পাঠান হয় কারখানায়। কারখানায় নিয়া পাতাগুলিকে প্রথমে বড় বড় 'ট্রে'র মত পাত্রে ছড়াইয়া দেওয়া হয়—বেশ করিয়া ছড়াইয়া সেই ট্রেগুলি শুকাইবার ঘরে লইয়া

শেল্‌ফের মত থাকে থাকে সাজান হয়। তার পর সেই পাতার উপর বাতাস ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বর্ষার সময়ে কিংবা ঠাণ্ডার সময়ে সে বাতাসকে একটু গরম করিয়া লইতে হয়। শুকাইবার উদ্দেশ্য—পাতাগুলিকে নরম, কম-জোরি করা—যাহাতে টিপিলে বসিয়া যায়;—শুকান' মানে যেন একেবারে মচ্‌মচে করা মনে করিও না।

প্রায় ১৮।২০ ঘণ্টা পরে পাতাগুলি ঠিকমত শুকাইলে সেগুলিকে লইয়া রোলার-যন্ত্রে চাপ দেওয়া হয়। এই চাপের ফলে পাতার ভিতরকার রস বাহির হইয়া আসে এবং ঘষাঘষিতে গরম হইয়া তার মধ্যে নানা রকম রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়। এর পরে পাতাগুলিকে জালের ভিতর দিয়া ছাঁকা হয়। পাতার ছোট টুক্‌রাগুলি জালের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে, যেগুলি বাহির হয় না সেগুলিকে আবার রোলারে চাপ দেওয়া হয়। এমনি ভাবে বার কয়েক চাপ দেওয়া আর ছাঁকা চলে।

এর পরের ব্যাপারকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'ফারমেণ্টেশন্', চল্‌তি কথায় বলে 'গাঁজিয়া ওঠা'। চা-পাতাগুলাকে একটা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে লইয়া গিয়া ভিজা চট দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়, চট অবশ্য পাতার গায়ে লাগে না; ঘরের উত্তাপ দরকার মত বাড়াইবার-কমাইবার বন্দোবস্ত থাকে। ফারমেণ্টেশন্ ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, পাঁউরুটী তৈরী করিবার সময়ে, মদ তৈরী করিবার সময়ে যে ব্যাপার ঘটে এটাও ঠিক তাই। পাতার রসে যে বীজাণু থাকে তারই সাহায্যে তার মধ্যে এক রকম রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়। পাতার ভিতরে অক্সিজেন্ গ্যাস্ ঢোকে আর কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড্ নামে এক রকম গ্যাস্ বাহির হইয়া যায়। এরই ফলে চায়ে একটা মিষ্টি গন্ধ আসে, আর আসে তার তামাটে-কালো রং।

ঠিক মত ফারমেণ্টেশন্ হইয়া গেলে চাগুলিকে গরম বাতাসের মধ্যে শুকান হয়। এই শুকাইবার যন্ত্র দেখিতে অনেকটা আলমারীর মত। প্রথমে উপরের তাকে চা রাখিয়া তার মধ্যে গরম বাতাস (এই ধর ১২০ ডিগ্রী) ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কয়েক মিনিট পরে সেই পাতাগুলিকে পরের তাকে নামাইয়া বাতাসের উত্তাপ আর একটু বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এমনি ভাবে একটু একটু করিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে খানিক পরেই চা ঠিক মত শুকাইয়া যায়। তার পর আর

কি? খড়-কুটা বাছিয়া চাগুলিকে লইয়া বড় বড় সীসায় মোড়া বাক্সে বন্দী করিলেই হইল।

কিন্তু আর একটা কাজ তখনও বাকী থাকে। এ কাজটি ঠিক কারখানার নয়, এর জন্য এক দল বিশেষজ্ঞ লোকের দরকার হয়। বাগানের সব চা তো এক রকম নয়, সব কিছুর মধ্যেই অল্পবিস্তর দোষগুণ আছে। এঁরা করেন কি, নানা রকম চা পরীক্ষা করিয়া, চা খিয়া ঠিক করেন কোন্‌টা কি দরের চা এবং কোন্ কোন্ চায়ের সঙ্গে কোন্ কোন্ চা কতটা মিশাইলে এক-একটা বিশেষ ধরণের চা পাওয়া যাইবে। অবশ্য বহু বছরের পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলেই এঁরা এ বিদ্যা লাভ করেন। চা পরীক্ষা করা হয় কেমন করিয়া বলিতেছি। অনেকগুলি ছোট ছোট চীনামাটীর পাত্রে নানা জাতের চা খানিকটা করিয়া (এক আউন্সের দশ ভাগ) রাখিয়া তার মধ্যে পাঁচ আউন্স্ ফুটন্ত জল ঢালিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। পাঁচ মিনিট ভিজিলে পরে সেই ক্বাথ নিয়া তার রং, উজ্জ্বলতা এবং অন্যান্য গুণ পরীক্ষা করা হয়। আর মুখে চুমুক দিয়া যে হয়ই তা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। তার পর পরীক্ষার ফল অনুযায়ী বিভিন্ন চায়ের দর ঠিক হয় এবং সেগুলি কি ভাবে মিশাইতে হইবে তাহাও ঠিক করা হয়।

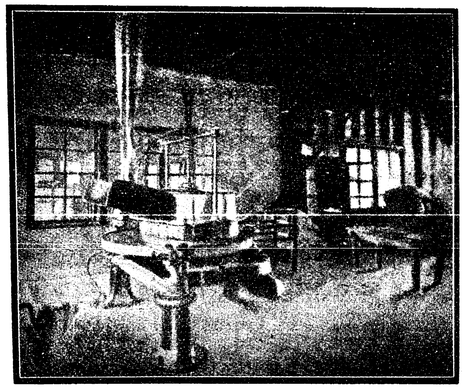

চায়ের কারখানার আর একটি দৃশ্য—রোলার দিয়া চায়ে চাপ দেওয়া হইতেছে।

পরীক্ষা করিয়া ঠিক করার পর বড় বড় পাত্রের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চা-পাতা ঢালিয়া দিয়া ভাল করিয়া মিশান' হয়। বেশীর ভাগ জায়গায়ই এই

মিশান' কাজটা কলে করা হয়। তার পর সেই চা ছোট-বড় প্যাকেটে ঢুকিয়া বাজারে রওনা হয়।

তার পর? তার পর বাজার হইতে বাড়ীতে চায়ের প্যাকেট্ আসিলে সে চা কি ভাবে তোমাদের পেয়ালায় গিয়া হাজির হয় তা তো তোমরা জানই।

নিবারণচন্দ্রের ডাক্তারী

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি)

নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মস্ত বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার।

ম—স্ত বড় ডাক্তার—অবশ্য তার কোনও ডিগ্রী নেই,—ডিগ্রী নেই তার কারণ কোনও পরীক্ষাতেই কখনও পাশ করে নি তো! তা ব'লে ফেল্‌ও তো করে নি—পাশ করে নি তার এক মাত্র কারণ কখনও কোন ডাক্তারী স্কুলে পড়েই নি যে মোটে।—তবে?

সত্যিই খুব বড় ডাক্তার—তার প্রধান কারণ ওর বাবা যে বড় ডাক্তার ছিলেন!—শুধু তাই? ওর বাবার অতগুলো ডাক্তারী বই আলমারীতে সাজান রয়েছে, ওর মধ্যে থেকে তিন-চারখানা বই ও যে ডিক্‌সনারী দেখে দেখে পড়ে শেষ করে ফেলেছে মাত্র এই তিন-চার বৎসরের মধ্যে!

কাজেই মস্ত বড় ডাক্তার সে। অবশ্য ওর বাবা মারা গেছেন আজ প্রায় দশ বৎসর—আর এই দশ বৎসরের মধ্যে একটাও 'ডাক' আসে নি তার। কাজেই রোজগারও হয় নি এক পয়সা। বাপের যা টাকা ছিল তাতেই কোনও রকমে চল্‌ছে এত দিন—কিন্তু আর চলে না।

নিবারণ ডাক্তারের স্ত্রী রেগে বলে—"ডাক্তারীতে কিছু হ'বে না—অন্য উপায় দেখ, নইলে না খেয়ে মরতে হবে।"

নিবারণ ডাক্তারও রেগে ওঠে, বলে—"হবে না! হবে না কি? আমি কি

একটা হিজি-বিজি ডাক্তার নাকি—ঐ কোনও রকমে কষ্টে-সৃষ্টে এম্, বি পাশ করা নব্‌নে মুখুজ্যেটার মত? বুঝেছ, পড়লে ওরকম আমি একটা কেন একশ'টা পাশ কর্ত্তে পার্ত্তাম—বুঝলে? তা নয়, ডিগ্রী দেখিয়ে নয়,—সত্যিকারের জ্ঞানের জোরে, প্রতিভার জোরে বড় হব, এ দেখে নিও। একদিন দেখ্‌বে, নিশ্চয় দেখ্‌বে, কোনও বড় সাহেব বা রাজা-মহারাজার বাড়ী থেকে 'কল্' আস্‌বে—একটা 'কেস্' করে হাজার কয়েক টাকা—তার পর নাম কি রকম ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিভা বুঝতে লোকের একটু দেরী লাগে কিন্তু যেদিন বুঝবে সেদিন আর—হ্যা হ্যা, তখন দেখ—" বল্‌তে বল্‌তে বাইরে চলে যায়।

তার স্ত্রী পিছনে চীৎকার করতে থাকে—"ওগো ডাক্তার সাহেব, লোকে তোমার প্রতিভা বুঝবার আগে যে আমাদের না খেতে পেয়ে পটল তুল্‌তে হ'বে, এদিকে হাঁড়ি যে খালি!"

নিবারণ চক্রবর্ত্তী বাইরে বসে নিজের মনেই গজর-গজর করে—"বাইরে যে "নেম্-প্লেট্" টাঙ্গান রয়েছে—লেখা রয়েছে "ডাক্তার নিবারণ চক্রবর্ত্তী, শিশু-চিকিৎসক"—কারও কি চোখে পড়ে না? বাংলা দেশের শিশুগুলো সব হঠাৎ অমর হয়ে গেল নাকি? কলেরা, নিউমোনিয়া, হাম—নিদানে শুধু জ্বর—তাও হয় না?

এমনি করে দিন চলে—মানে দিন আর চলে না।

সেদিনও নিবারণ ডাক্তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাইরের ঘরে চলে এসেছে। তার পরনে আছে তার ছোট মেয়ের আটহাতি একখানি শাড়ী—খালি গা, মোটা ভুঁড়িটার উপর পৈতা ঝুল্‌ছে। ভয়ানক রেগেছে, রাগ সামলাবার জন্য তামাক সাজ্‌তে বসে গেছে—কলকেতে দু'-এক টান দিলে যদি সব রাগ-দুঃখ ভোলা যায়।

পিছন ফিরে বসে তামাক সাজ্‌ছে—হাতে তখন তামাক আর টিকের কালি লেগে, কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে চোখে জল এসে গেছে—এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে এক মেম সাহেব—বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে—হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। ঘরে ঢুকে সে নিবারণ ডাক্তারকে ঐ অবস্থায় দেখ্‌তে পেলে। সে বল্লে, "এই, ডক্টর সা'ব কি ঘর হায়?"

নিবারণ ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে পিছন ফিরতেই মেম সাহেবকে দেখ্‌তে পেল।

মেম দেখে সে ভয়ে, বিস্ময়ে, আনন্দে কি রকম যেন একটা হয়ে গেল—তার চোখের মণি দুটো বোঁ বোঁ করে দু'বার ঘুরেই থেমে গেল, নীচেকার থুৎনিটা গেল ঝুলে, আর দোক্তায় কালো দাঁতগুলির প্রায় সব ক'টীই বার হয়ে এল।

তার এই অবস্থা দেখে মেম গেল চটে; হেঁকে বল্লে, "ইউ ড্যাম্, উল্লুক, ডক্টর চাকরবরটীকো বোলাও জল্‌দি।"

নিবারণ ডাক্তার মেমের গাল খেয়ে অনেকটা যেন সংজ্ঞা ফিরে পেল। বল্লে, "আই য়্যাম্ ডক্টর চকর্‌বর্টি, ম্যাডাম্,—প্লীজ্ টেক্ ইয়োর সীট্, ম্যাডাম্—হোয়াট্ ডু ইউ ওয়াণ্ট্ ম্যাডাম্?"

ম্যাডামের তখন হয়ে এসেছে—ডাক্তারের চেহারা দেখে। প্রথমটা সে বিশ্বাসই করে নি, কিন্তু শেষে যখন দেখ্‌ল যে ঐ লোকটাই চেয়ারে গিয়ে বস্‌ল তখন সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হ'ল যে ঐ ডক্টর চাকর্‌বর্টি।

মেম সাহেব যখন দেখ্‌লে যে স্বয়ং ডাক্তারকেই সে ড্যাম্, উল্লুক বলে গাল দিয়েছে তখন মহা লজ্জিত হয়ে পড়্‌ল—বল্‌লে, "সো সরি, আই ডিড্ নট্ মীন্ ইউ—আপকো হাম কুছ্ নেই বোলা—ভুল কর্‌কে আপকো হাম—"

নিবারণ চক্রবর্ত্তী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে দাঁত বা'র ক'রে হেসে বল্লে—"নো, নো মাড্যাম, আই ডোন্ট্ মাইন্ড্ ম্যাডাম্—হাম্ কুছ্ মনে নেই কিয়া—আপকা কেয়া দরকার—ম্যাডাম্?"

এবার মেম সাহেব হঠাৎ এক কাণ্ড করে বস্‌লে। সে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌ল—তার পর পাগলের মত ডাক্তারের হাত দু'টো চেপে ধরে বল্লে—"ডক্টর, মাই লিলি ইজ্ ডাইইং—কালসে উস্‌কা পানিকা মাফিক—" ডাক্তার লাফিয়ে উঠ্‌ল—"'লিলি' আপকা কোন্ হায়?"

মেমের কান্নার চোটে আর কথা বার হ'তে চায় না। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে—"শী ইজ মাই—ও, হোয়াট্ নট্? হামারা সব কুছ্ হায়, হামারা আউর কোই নেই হায়—লেড়কা নেহি, লেড়কী নেহি—খালি লিলি; উস্‌কো হাম একদম্ ছোটাসে—ওহো-হো! উ মর যানেসে হামভি মর যাওএগে—"

ডাক্তারের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেছে, বুকটা দ্রুততালে ওঠা-নামা

করছে, তার নিঃশ্বাসের জোরে টেবিলের কাগজগুলো পর্য্যন্ত উড়্‌ছে। উঃ, এত বড় একটা কেস্—য়্যাঁ! কলেরা, নিশ্চয় কলেরা। তাও আবার মেমের একমাত্র পালিতা কন্যার! কেল্লা মার দিয়া, যদি বাঁচে।

"কামিং ম্যাডাম্; ওয়েট্ এক মিনিট ম্যাডাম্—আভি আতা হায়—" নিবারণ আনন্দের বেগ কোন রকমে চেপে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। বাড়ীর ভিতর গিয়েই আনন্দে ফেটে আটখানা, দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে রান্না-ঘরে। গিন্নী তখন পাশের বাড়ী থেকে দু'টো চাল চেয়ে নিয়ে এসে সবে রান্নার যোগাড় করছে—নিবারণ আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌ল, "গিন্নী, ও গিন্নী, শোন, শীঘ্রি এদিকে এস—মস্ত বড় কেস্—বুঝ্‌লে? যা বলেছিলাম তাই; প্রতিভা—বুঝেছ? জ্ঞানের জোর—চাষা-টাষা নয়—এমন কি বাঙ্গালীও নয়—একেবারে ইংরেজ; তাও সাহেব নয়—মেম, মেম সাহেব—বুঝ্‌লে? নিজে এসেছে—পাগলের মত ছুটে এসেছে—মোটার বার করবারও তর সয় নি—হেঁটেই চলে এসেছে—অগাধ অর্থ—কেউ নেই সংসারে—একটী মাত্র পালিতা কন্যা—সেই তার সব—ইহকাল, পরকাল—বুঝেছ? সেই মেয়ের কলেরা—এসিয়াটিক্ কলেরা—উঃ একটী ডোজ্ ওষুধ—ব্যস্, একেবারে কিওর—আরাম; তার পর বুঝেছ—ঝন্ ঝন্ ঝন্—এই য়্যা—ত টাকা। ও ছাই মোটা চালের ভাত আজ নেহি খায়েগা—পোলাও, কোপ্তা কাবাব, সন্দেশ, রসগোল্লা, রাবড়ি। আমার যে নাচ্‌তে ইচ্ছে করছে—দেখ্‌লে, প্রতিভা—বাঙ্গালী ওয়ার্থ্‌লেস্—যাকে বলে কোনও কাজের নয়—প্রতিভা বোঝে না—খালি ডিগ্রী দেখে; সাহেব, সাহেব—ওরাই বোঝে প্রতিভা—" নিবারণের ভাব-গতিক দেখে গিন্নী ত অবাক্—ভাবলে শেষে লোকটা 'কল্' না পেয়ে পেয়ে পাগল হয়ে গেল নাকি? সে চট্ করে একবার বাইরের ঘরে উঁকি মেরে দেখ্‌লে, সত্যিই বাইরের ঘরে একটা বুড়ী মেম মাথা নীচু করে বসে আছে ভাঙ্গা চৌকীটার উপর। ভাবলে, তা হ'লে একেবারে মিথ্যা নয়।

নিবারণ ততক্ষণ মহা হল্লা লাগিয়ে দিয়েছে—"বার কর, বার কর, বাবার সেই কোট প্যাণ্টটা বার কর, সাহেব-বাড়ী 'কল্'—ধুতি-পাঞ্জাবী চল্‌বে না—বুঝেছ? এ নব্‌নে মুখুজ্যের ডাক্তারী নয়—"

অনেক খোঁজাখুঁজির পর নিবারণ ডাক্তারের বাবার বহু দিনের পুরানো একটা কোট আর একটা প্যাণ্ট বার হ'ল। কোটটা যদি বা কোনও রকমে গায়ে হ'ল, প্যাণ্ট টা আর হয় না—নিবারণ ডাক্তারের ভুঁড়ি তে আঁটে না যে! যাই হোক—ঐ এক রকম করে বেল্ট বেঁধে নিলেই হবে—কোটের তলায় থাকবে। কিন্তু বেল্ট? বেল্ট ত নেই!

একটা কাপড়ের পাড় নিয়ে এল

"দড়ি, দড়ি নিয়ে আয় খেঁদি"। খেঁদি ছুটে গিয়ে একটা কাপড়ের পাড় নিয়ে এল। এক দিকে খেঁদি টানে, আর এক দিকে খেঁদির মা;—পাড় গেল ছিঁড়ে। নিবারণ রেগেই অস্থির। "ছিঁড়লে ত, এখন তাড়াতাড়ির সময়—একটা শক্ত দড়ি নিয়ে এস—ওঃ, এতক্ষণ হয়ত 'লিলি'—আহা এক মাত্র পালিতা কন্যা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, সুন্দর ছোট্ট পুতুলের মত মেয়েটী, এতক্ষণ কি কষ্টই না পাচ্ছে! একটী ফোঁটা, একটী ডোজ্—কই এনেছ দড়ি?" নিবারণের স্ত্রী ততক্ষণে ছাগলের গলা থেকে একটা নারকেলের দড়ি খুলে নিয়ে এসেছে, তাই দিয়েই বাঁধা হ'ল কোনও রকমে। তার পর সে ছেঁড়া ক্যান্‌ভাসের জুতোটা পায়ে দিয়ে নিল। মোজা? মোজা নেই ত! যাক গে—

খেঁদি সামনে ছিল, নিবারণ তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোর কি জিনিষ চাই বল্?"

খেঁদি ত অবাক্। তার বাবা ঠাট্টা করছে নাকি? এক পয়সার মুড়ি খাবার জন্য যাকে তিন বার আগে লাথি খেতে হয়—সেই খেঁদিকে কিনা বাবা নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করছে—কি চাই বল্!

খেঁদি ভয়ে ভয়ে বল্‌ল—"ল্যা—বেঞ্চুস্—"

নিবারণ হো হো করে হেসে উঠ্‌ল—"দূর বেটী! এখন কি আর তোর সে বাবা আছে রে? টাকার কুমীর—বুঝলি? বল্, বল্, খুব দামী জিনিষ চা।"

খেঁদি বল্লে—"শাড়ী—"

"দূর। আচ্ছা তোকে—তোকে এক সেট্ রূপোর খেলনা কিনে দেব।"

এবার গিন্নীর পালা—"কি চাই গিন্নী বল?"—"শাড়ী? কি যে বল! বড় ছোট নজর তোমারও! আচ্ছা, তোমাকে দশ ভরির অনন্ত এক জোড়া আর একটা হার—" বল্‌তে বল্‌তে নিবারণ ডাক্তার ছুটে বার হয়ে গেল।

সারা রাস্তা আর কেউ কথা বল্লে না—নিবারণ ডাক্তারও না, মেম সাহেবও না। অবশেষে মেম সাহেব এসে একটা গলির ভিতর ঢুকে একটা একতলা বাড়ীর সামনে থাম্‌ল। গলি দেখে আর বাড়ী দেখে নিবারণ ডাক্তার ত হতাশ হয়ে গেল—যাই হোক হয়ত বুড়ী কৃপণ।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বুড়ী ডাক্‌ল—"লিলি, লিলি, মাই লিলি, কাম্ হিয়ার!" একটা রুগ্ন কুকুর লেজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে হাজির হ'ল।

ডাক্তারের চোখ কপালে উঠেছে, সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সম্মুখে ঘুর্‌ছে; তবু কোনও রকমে বল্‌লে—"ম্যাডাম্, হোয়্যার ইজ্ ইয়োর 'লিলি?'—লিলি কি ধার?"

মেম সাহেবের চোখ দিয়ে তখন অজস্র ধারে জল গড়াচ্ছে। কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়ে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বল্ল—"দিস্ ইজ্ মাই লিলি—হামারা লিলি—ও হো হো—মাই পুয়োর লিলি—"

ডাক্তার বল্‌লে—"ই ত কুত্তা!"

"কুত্তা তো কেয়া হায়! ই হামারা সব কুছ্ হায় এ দুনিয়ামে—"

ডাক্তার এবার যেন বোমা ফাটার মত ফেটে গেল—চীৎকার করে উঠ্‌ল—"কেয়া, হাম্ ভেটিরিনারী সারজেন্—পশু-চিকিৎসক হায়?"

মেম সাহেব বল্লে—"পশু-চিকিট্‌সক নেহি হায়? আপকা 'নেম্-প্লেট্'—যিস্‌কা উপার নাম লিখা হায়—উস্‌কা উপর লিখা নেহি হায়—ডক্টর নিভারণ চকরবরটী—পশু-চিকিট্‌সক? হাম থোড়া বাংলা পড়্‌নে সক্‌তা—লিখা হায় নেহি?"

নিবারণ ডাক্তারের রাগে মাথার চুল ছিঁড়্‌তে ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌ল, সে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ী চলে এল। নেম্-প্লেট্‌টার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—সত্যিই শিশু-চিকিৎসক দূর থেকে পশু-চিকিৎসকের মতই দেখাচ্ছে। দশ বৎসর আগেকার লেখা—জলে ভিজে ভিজে শিশুর—'ই' কার (ি) উঠে গিয়ে হয়েছে 'শশু' আর দূর থেকে প্রথম 'শ' টাকে 'প' দেখাও আশ্চর্য্য নয়—কারণ তারও উপর দিয়ে দশ বৎসরের রোদ-বৃষ্টি বয়ে গেছে। তার উপর বুড়ীর চোখ—তার উপর আবার বিলাতী বুড়ী—শশু হয়েছে পশু। নিবারণ টান মেরে নেম্-প্লেট্‌টা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল—শিশু-চিকিৎসক নিবারণ চক্রবর্ত্তী আজ পশু-চিকিৎসক নিবারণ চক্রবর্ত্তী হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌ল।

তার পর? তার পর নিবারণ চক্রবর্ত্তীকে আর কেউ কখনও ডাক্তারী কর্‌তে দেখে নি। এখন নাকি সে পাগল হয়ে গেছে—একটা কালীর টিন্ আর একটা তূলি হাতে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়; যেই দেখে কারো নেম্-প্লেটে কোনও অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে গেছে অমনি তক্ষণি সেটা সে তূলি টেনে আবার স্পষ্ট করে দেয়।

সূর্য্যের মেয়ে পৃথিবী

(শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্-এস্-সি)

বৈশাখ মাসে দিনের বেলা সমস্ত দেশটা যখন রৌদ্রের আগুনে পুড়িয়া যাইতে থাকে তখন সূর্য্যের দিকে চাহিয়া তোমাদের নিশ্চয়ই মনে হয় "ঐ

'পোড়া' সূর্য্যটা যদি না থাকিত!" কিন্তু ঐ 'পোড়া' সূর্য্যটাই যে আমাদের এত সাধের পৃথিবীকে এমন সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে, আলো আর উত্তাপ দিয়া আমাদের সকলকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সে কথা তোমরা ভাল রকমই জান। কিন্তু কেন যে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের এতটা টান তা' বোধ হয় তোমাদের অনেকের জানা নাই। সেই কথাটা আজ তোমাদের কাছে ফাঁস করিয়া দিই শোন। আমাদের এই পৃথিবী হইল সূর্য্যের মেয়ে, আর আমরা সব তার নাতি-নাতনীর দল; এইজন্যই সূর্য্য আমাদের এত ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।

তোমরা হয়ত অবাক্ হইয়া ভাবিতেছ—এ আবার কোন দেশী কথা! চিরকাল ত জানি যে আমরা সবাই "সূয্যি মামার' ভাগ্‌নে-ভাগ্‌নী, আজ আবার নূতন করিয়া সম্বন্ধ হইল নাকি? কিন্তু সম্বন্ধটা আসলে নূতন মোটেই নয়, বৈজ্ঞানিক-মহলে অনেক দিন হইল কথাটার আবিষ্কার হইয়াছে, তোমরাই কেবল টের পাও নাই। কথাটা এখন বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এবং তার দিকে বেশ ভাল যুক্তিও আছে। যদি তোমরা শুনিতে চাও তাহা হইলে সে সব কথার ছোট্ট একটু বিবরণ আমি তোমাদের দিতে পারি।

বৈজ্ঞানিকদের মনে অনেক দিন হইল একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল—পৃথিবী কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়া তাঁরা দেখিলেন যে পৃথিবী যখন অন্য গ্রহগুলিরই মত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন পৃথিবীও নিশ্চয় ওদেরই দলের একজন। ঐ গ্রহগুলি কোথা হইতে আসিল, ওরা এমন করিয়া সূর্য্যের চারিদিকেই বা ঘুরিতেছে কেন এই সব প্রশ্নের কৈফিয়ৎ যোগাড় করিতে পারিলে পৃথিবীর জন্মেরও একটা ঠিকানা পাওয়া যাইবে।

এই ঠিক করিয়া পণ্ডিতেরা উঠিয়া-পড়িয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। এ সম্বন্ধে ভাবিয়া-চিন্তিয়া গবেষণা করিয়া অনেকেই অনেক রকম মত উপস্থিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে লাপ্‌লাস্ বলিয়া এক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের মত ছাড়া আর কাহারও মত বৈজ্ঞানিক-মহলে টিকিল না। লাপ্‌লাস্ বলিলেন—সূর্য্যটা অনেক দিন আগে ছিল একটা প্রকাণ্ড নীহারিকা, (নীহারিকা কা'কে বলে তা' তোমরা গত মাসের রামধনুতেই পড়িয়াছ) আর তখন সেটা এখনকার গাড়ীর

চাকার মত পাক খাইতেছিল। ঐ রকম করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নীহারিকাটা অল্পে অল্পে ঠাণ্ডা হইয়া কোঁকড়াইয়া ছোট হইয়া আসিল, এবং তার বেড়টির বাহিরের দিক্ হইতে তাল তাল গ্যাস আংটির মত হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। সেই আংটি-গুলিই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া তালগোল পাকাইয়া এক একটি গ্রহের সৃষ্টি হইতে লাগিল। আমাদের পৃথিবী তাদেরই একটি।

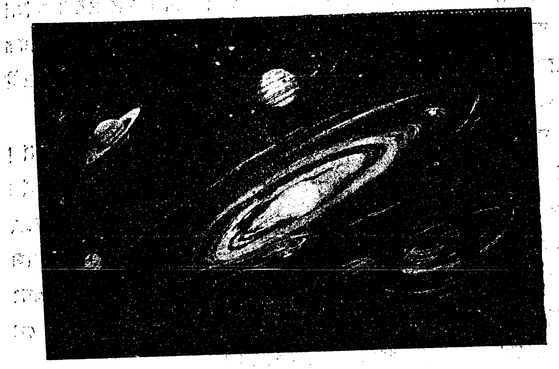

লাপ্‌লাসের মত-অনুযায়ী সূর্য্য হইতে বিভিন্ন গ্রহের জন্ম

লাপ্‌লাসের এই মতে অনেকেই সায় দিলেন না। আবার অনেকে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে লাপ্‌লাসের এই ব্যাখ্যায় একটু একটু ভুল বাহির হইতে লাগিল, লাপ্‌লাসের মত চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন আবার নূতন উদ্যমে গবেষণা সুরু হইয়া গেল। কিছু দিন পরে দুই আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক—প্রফেসর চেম্বারলিন্ আর প্রফেসর মোল্টন্ আর এক নূতন মত লইয়া উপস্থিত হইলেন। এঁদের কথা বুঝিতে গেলে আগে বিজ্ঞানের দু'টি মোটা কথা বুঝিয়া লওয়া দরকার।

প্রথম কথাটি এই ঃ—তোমরা রোজ রাত্রে আকাশের কোলে ঐ যে সুন্দর ফুট্‌ফুটে ছোট ছোট তারাগুলিকে দেখিতে পাও ওরা কিন্তু আসলে মোটেই অমন গোবেচারা এবং ফুট্‌ফুটে নয়। ওদের এক একটি যেন এক একটি বিরাট্ দৈত্য। ওরা সব সূর্য্যেরই জাত-ভাই, সূর্য্যেরই মত গরম গ্যাসে তৈরী, কিন্তু ওদের এক একটা সূর্য্যের চেয়ে ঢের ঢের বড়। শুধু তাই নয়, ঐ ভয়ঙ্কর দৈত্যের

মত তারাগুলি আবার আকাশের গায়ে দুরন্ত বেগে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এত জোরে যে তার কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। অথচ মজার কথা এই যে এই ভয়ঙ্কর ছুটাছুটির মধ্যেও ঐ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মত তারাগুলির একটার সঙ্গে আর একটার ধাক্কা প্রায়ই লাগে না। যদিই বা লাগে তা সে কোটি কোটি বছরের মধ্যে ক্বচিৎ দু'-একবার।

এই ত গেল প্রথম কথা, তার পর দ্বিতীয়টি শোন। তোমরা সকলেই জান যে সমুদ্রের জলে প্রত্যহ দু'বার করিয়া জোয়ার আসে—চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে। (এই শক্তিটা কি তা' নূতন করিয়া বলিতে হইবে না বোধ হয়। এটি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের আবিষ্কার; এই শক্তির বলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি জিনিষ তার চারি পাশের জিনিষগুলিকে আপনার দিকে টানিতেছে।) চাঁদের দিকে তখন পৃথিবীর যে সব সমুদ্র থাকে সেগুলির জল একটু ফুলিয়া ওঠে, তাকেই বলে জোয়ার। আবার সেই সব সমুদ্রের ঠিক উল্টা দিকে পৃথিবীর উপর যে সব সমুদ্র আছে সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার আসিয়া উপস্থিত হয়। এও সেই চাঁদেরই টানে, তবে এবার ঠিক জলের উপর নয়। সেই উল্টা দিকের সমুদ্রের চেয়ে পৃথিবীর শরীরটা চাঁদের বেশী কাছাকাছি পড়ে ত, তাই চাঁদ যেন পৃথিবীর শরীরটাকে হঠাৎ একটু তার দিকে টানিয়া লয়, পিছনের সমুদ্রের জলটা যেন পিছনেই পড়িয়া থাকে অর্থাৎ সেদিকেও যেন সমুদ্রের জল মাটি হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চায়, আর মনে হয় যেন জলটা ফুলিয়া উঠিয়াছে।

এইবার তোমাদের চেম্বারলিন্ আর মোল্টনের মতে পৃথিবীর জন্মের কথা বলি। এঁরা দু'জন দু'টি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর তাঁদের মত খাড়া করিলেন। তাঁরা বলিলেন যে লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমাদের এখনকার সূর্য্যের চেয়ে ঢের বড় বিরাট্ একটা তারা হঠাৎ সূর্য্যের কাছাকাছি আসিয়া তার একেবারে গা ঘেঁষিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। তারাটা যখন দূর হইতে সূর্য্যের দিকে আসিতেছিল তখন যেমন করিয়া চাঁদের টানে পৃথিবীর সমুদ্রের জল ফুলিয়া ওঠে তেমনি করিয়া সেই বিরাট্ তারাটার টানে সূর্য্যের উপরের খানিকটা গ্যাস সেই তারাটার দিকে এবং তার ঠিক উল্টা দিকে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তার পর যখন তারাটা সূর্য্যের

একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়া তার পাশ কাটাইয়া দূরে চলিয়া গেল, তখন এম্‌নি সেই তারাটার টান যে, সেই ফুলিয়া-ওঠা গ্যাসের ঢেউ দু'টি সূর্য্যের গায়ের দুই দিক্ হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তার পর সেই গ্যাসের তাল দু'টির ঠাণ্ডা হইবার পালা। ঠাণ্ডা হইতে হইতে ক্রমশঃ তাদের মধ্যে ছোট ছোট সব তরল বিন্দু দেখা দিল (গরম জলের বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে যেমন সেই বাষ্প বিন্দু বিন্দু তরল জল হইয়া দেখা দেয়) এবং সেই তরল বিন্দুগুলি আবার ঠাণ্ডা হইয়া হইয়া জমাট বাঁধিয়া নীরেট হইয়া গেল। চেম্বারলিন্ আর মোল্টন্ সেই শক্ত বিন্দুগুলির নাম দিলেন গ্রহাণু, এবং বলিলেন যে এই সমস্ত সময় ধরিয়াই কিন্তু গ্রহাণুগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল, ছুটাছুটি করিতে করিতে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে ধাক্কাধাক্কিও হইতেছিল। সেই ধাক্কাতে গ্রহাণুগুলি একটির সঙ্গে একটি, তার সঙ্গে আর একটি—এম্‌নি করিয়া পরস্পরে যুড়িয়া যাইতে যাইতে একটু একটু করিয়া বড় হইয়া ক্রমে পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৈজ্ঞানিক-মহলে আবার হৈ হৈ পড়িয়া গেল। ইংলণ্ডের এক মস্ত পণ্ডিত প্রফেসর জীন্‌স্ অঙ্ক কষিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন পৃথিবীর জন্মের ঠিক কথাটি কি করিয়া পাওয়া যায় (পৃথিবীর চলাফেরা সবই একেবারে অঙ্ক ধরিয়া নিয়মিত কিনা তাই)। তিনি ত বলিয়া বসিলেন এত দিনে খাঁটি কথাটি ধরা পড়িয়াছে, চেম্বারলিন্-মোল্টনের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোন রকমেই সূর্য্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্পর্কের কৈকিয়ৎ দেওয়া যায় না। তিনি এই মতের সঙ্গে আরও একটু নূতন কথা যুড়িয়া দিয়া বলিলেন যে সূর্য্যের গা' হইতে শুধু একটি গ্যাসের তালই বাহির হইবে—তারাটার সামনের দিকে, আর বাহির হইবার সময় তার চেহারাটা হইবে একটা বাঁকান বর্ম্মা চুরুটের মত। তারাটি সূর্য্যের পাশ কাটাইয়া আবার দূরে চলিয়া গেলে গ্যাসের সেই বাঁকান চুরুটটি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া কয়েকটি গোলগাল গ্যাসের পিণ্ডের সৃষ্টি করিল। সূর্য্য এই পিণ্ডগুলিকে নিজের ভিতর টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তার কাছাকাছির কয়েকটিকে আত্মসাৎ করিয়াও লইল, কিন্তু যে কয়টি সেই তারাটির টানে একটু দূরে চলিয়া

গিয়াছিল তাদের আর সূর্য্য বিশেষ কায়দা করিতে পারিল না। তবে একেবারে ছাড়িয়াও দিল না, তারাটার হ্যাঁচকা টানে পড়িয়া আর সূর্য্যের টানাটানিতে তা'রা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। তার পরে তা'রাই ঠাণ্ডা হইয়া আমাদের পৃথিবী এবং গ্রহগুলির সৃষ্টি করিল।

পৃথিবীর ঠিক জন্মের পর কিন্তু তা'কে আমাদের এখনকার পৃথিবী বলিয়া চিনিবার উপায়ই ছিল না। কেমন করিয়া যে সে সত্যি সত্যি পৃথিবী অর্থাৎ এখনকার এই পৃথিবীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তার খুব ভাল এবং নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন জীন্‌সেরই পরে আর এক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক; তাঁর নাম জেফ্রিস্। তার কথা আজ বলিতে গেলে অনেকখানিই বলিতে হইবে,—আর একদিন বলিব, কেমন?

কিন্তু এই জেফ্রিস্ সাহেব যে শুধু পৃথিবীর জন্মের পর হইতে তা'র ছেলে-বেলার কথাই বলিয়াছেন তাই নয়; একেবারে অন্য রকম উপায়ে তিনি দেখাইয়াছেন যে চেম্বারলিন্, মোল্টন্ এবং জীন্‌স্ সাহেবদের মতে কোনও ভুল নাই। আমাদের পৃথিবী ঠিক অম্‌নি করিয়া সূর্য্যের গ্যাস হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে।

তা হইলে আমি মিথ্যা কথা বলি নাই, দেখিতেছ। চেম্বারলিন্ হইতে জেফ্রিস্ পর্য্যন্ত আধুনিক মতের বৈজ্ঞানিকেরা—আর শুধু তাঁরাই নন্—সেই পুরানো যুগের লাপ্‌লাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতের দল—এঁরা সবাই একবাক্যে বলিতেছেন যে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে ঐ সূর্য্য হইতে। এখন তোমরাই বল যে পৃথিবী কি সূর্য্যের মেয়ে নয়? আমরা কি সূর্য্যের কাছে তার নাতি-নাত্‌নী বলিয়া আদর চাহিতে পারি না?

হার-জিত

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার হইতে সুরু হইয়া পৃথিবীতে প্রত্যহ যে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘটনা—কত বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে কে তার হিসাব রাখে?

ব্যাপারটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সিনেমায় রবিন্সন ক্রুসো ফিল্ম দেখিয়া আসিয়া অহিভূষণ এবং তার বন্ধু অবিনাশ দু'জনার মধ্যে তর্ক আরম্ভ হইয়াছিল। উভয়েই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক; তার উপর অবিনাশ আবার বিপুল ধনশালী, অহিভূষণ ধনী না হইলেও সম্প্রতি পাটের ব্যবসায়ে বেশ কিছু কিছু রোজগার করিতেছে।

তর্কটা ছিল এই রকমের—অহিভূষণ বলিতেছিল, রবিন্সন্ ক্রুসোর মত একটা জনমানব-শূন্য জায়গায় কোন লোককে যদি আবদ্ধ রাখা যায় এবং সে যদি তার ইচ্ছামত সমস্ত রকম কাজ করিবার সুযোগ পায়, ইচ্ছানুযায়ী সব রকমের মানসিক এবং শারীরিক খোরাক পায়, তবে তার পক্ষে সারা জীবন নিঃসঙ্গ অবস্থায় সেই নির্জ্জন স্থানে কাটাইয়া দেওয়া কিছুই কষ্টকর ব্যাপার নয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস রবিন্সন ক্রুসো সেরূপ সুযোগ পায় নাই বলিয়াই তার মন কেবল দ্বীপ হইতে পালাই-পালাই করিতেছিল—পাইলে অক্লেশেই সে সেই নির্জ্জন দ্বীপে সারা জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিত।

অবিনাশ কহিতেছিল অহিভূষণের ধারণা একেবারেই ভুল, কেননা ভগবান্ মানুষকে এমন ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন যে অপর মানুষের মুখ না দেখিতে পাইলে, সদাসর্ব্বদা লোকের সঙ্গ না পাইলে, সে কিছুতেই পৃথিবীতে টিকিতে পারে না, জীবন তার মরুভূমি হইয়া যায়। মানুষ যে কথা বলার ক্ষমতা পাইয়াছে সে কি ঘরের কোণে একা একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য, না কি পরস্পরের সহিত মেলামেশা করিয়া সমাজবদ্ধ ভাবে কাল কাটাইবার জন্য? মানুষের কথা বলার ক্ষমতা হইতেই বোঝা যায় তার সম্বন্ধে ভগবানের আসল অভিপ্রায়টা কি। তার এই শেষ যুক্তি সমাপ্ত করিয়া অবিনাশ বলিল, "দেখ বাপু, মুখে অমন লম্বা চওড়া বক্তৃতা অনেকেই করতে পারে, কাজের বেলাতেই বোঝা যায় কার কত মুরদ। আমি জোর করে বলতে পারি তুমি যদি রবিন্সন্ ক্রুসো হতে তা হলে অমন জেলখানার বন্দীর মত সারা জীবন তো দূরের কথা, দশটী বচ্ছরও কাটাতে পারতে না—না!" উত্তেজিত অবিনাশ টেবিলের উপর জোরে জোরে দুইটি চাপড় মারিয়া তার কথা শেষ করিল।

অহিভূষণও কম উত্তেজিত হয় নাই, সেও উত্তর দিল, "দেখ অবিনাশ, জোরে জোরে টেবিল চাপ্‌ড়ালেই যদি তর্কে জেতা যেত তবে আর ভাবনা ছিল না। আমি কি পারি না পারি, তোমার চাইতে বোধ করি সেটা আমারই বেশী জানা আছে। তুমি বাজী রাখতে রাজী আছ? তোমার প্রস্তাবেই আমি রাজী; দশ বছর নয়, এক যুগ অর্থাৎ বার বছর তুমি আমায় লোকালয়ের সম্পূর্ণ বাইরে, নির্জ্জন কারাগারের মত একটা বাড়ীতে আট্‌কে রাখ্‌বে। মানুষের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক আমি তাদের মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌ব না। শুধু আমার যখন যা চাই আমায় তুমি তাই জুগিয়ে দেবে। অবশ্য সাধারণ মানুষের যা যা দরকারে লাগতে পারে তাই আমি

চাইব—যেমন বই, খাবার, কোন একটা কাজ করবার উপযোগী সাধারণ যন্ত্রপাতি—অন্যায় কোন কিছু আমি চাইব না। কেমন, রাজী?"

অবিনাশ টেবিলের উপর আর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া কহিল, "এক লাখ টাকা বাজী।"

কেমন, রাজী?

পাঁচ মিনিট আগে দু'জনার একজনও যা কখনো কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই, মুহূর্ত্তের কথা কাটাকাটিতে তাহাই হইয়া গেল—সে ঘরে আরও বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিল, সকলের সম্মুখে চুক্তির পত্রে দুইজনে সই করিয়া দিল। কথাটা শুনিতে এমনই অবিশ্বাস্য যে বোধ করি এক মাত্র গল্প-উপন্যাসেই এর জুড়ি মেলে। কিন্তু সত্য ঘটনা অনেক সময় গল্পকেও ছাড়াইয়া যায়। ইংরাজেরা বোধ হয় সেইজন্যই বলেন facts are stranger than fictions.

কলিকাতা হইতে কিছু দূরে অবিনাশের বাবা একটা বাগান-বাড়ী কিনিয়াছিলেন, সহরের জন-কোলাহলে মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হইলে মাঝে মাঝে সপরিবারে সেখানে গিয়া তিনি বাস করিতেন। কোম্পানীর প্রথম আমোলে সেটা নাকি ছিল কোন্ জমিদারের কয়েদখানা। কয়েদী রাখার উপযুক্ত স্থানই বটে সন্দেহ নাই; জেলখানার মত উঁচু প্রাচীরে সমস্ত বাড়ীখানা ঘেরা, ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা জমি ও মাত্র গুটি কয়েক ঘর। সামনের দিক্‌টা এমনি ভাবে তৈরী যে বাহির হইতে তালা-চাবি আঁটিয়া দিলে মশামাছির পর্য্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করার ক্ষমতা থাকে না। আশপাশে লোকের বসতিও অত্যন্ত কম, যারা আছে তারাও প্রায় সকলেই অবিনাশদের আশ্রিত প্রজা। মোটের উপর দরজা-কপাট বন্ধ করিয়া দিলে উঁচু পাঁচীল-ঘেরা

TIGHT BINDING

সে বাড়ীটার সঙ্গে জনপ্রাণি-শূন্য নির্জ্জন দ্বীপের কোনই পার্থক্য থাকে না। ঠিক হইল বাজীর সর্ত্ত অনুসারে অহিভূষণকে এক যুগ এখানেই কাটাইতে হইবে। দিনের বেলা পাঁচীলের মধ্যে খোলা জায়গায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতে বা ইচ্ছানুযায়ী কাজকর্ম্ম করিতে পারে কিন্তু রাত্রে তাকে থাকিতে হইবে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। পোষ্ট-অফিসে দেয়ালের গায়ে খোপ কাটিয়া লোকে যেমন চিঠিপত্র ফেলে ঠিক সেই রকমই একটা ব্যবস্থা অহিভূষণকে করিয়া দেওয়া হইবে—তার যখন যা দরকার কাগজে লিখিয়া ওই ভাবে সে অবিনাশের লোককে জানাইতে পারে; তাদের কারো সঙ্গে কথা বলা বা তাদের মুখ দেখা অহিভূষণের বারণ, সেরূপ কোন চেষ্টা হইলেই বাজীর সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। ঠিক ওই রকমই একটা উপায়ে অহিভূষণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র অবিনাশ তাকে পৌঁছাইয়া দিবে। বাগান-বাড়ীটির ঠিক সাম্‌নেই অবিনাশের গোমস্তার বাস; তিনি এবং সেখানকার দরওয়ান নানা কাজের মধ্যেও অষ্টপ্রহর কারাগারের প্রতি কড়া নজর রাখিবেন।

অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবস্থানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম অহিভূষণ ভাবিল বাগবাগিচার কাজ করিয়া সে সময় কাটাইবে। ফল ও ফুলের বাগিচা সম্বন্ধে ভাল ভাল বিলাতী বই আনাইয়া হু হু করিয়া সে পড়িয়া ফেলিল। তার পর সকাল-বিকাল নিয়মিত পরিশ্রমের ফলে যে বাগানটির সৃষ্টি হইল তা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! অবিনাশকে সে লিখিয়া জানাইল বাগানের কাজে আশাতিরিক্ত সাফল্য পাওয়া গেছে। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি ফল ও ফুলের নমুনা পাঠাইতেও সে ভুলিল না।

কিন্তু পাঁচ-ছ' মাসের বেশী এ কাজে অহিভূষণের উৎসাহ টিকিয়া রহিল না। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল নিজের কাজে নিজের তৃপ্তিই যথেষ্ট নয়, আরও পাঁচজনকে তৃপ্তি না দিতে পারিলে সে কাজের যেন কোন সার্থকতাই থাকে না। মানুষের তৃপ্ত মুখ সে দেখিতে চায়। আঃ, মানুষের মুখ, ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মুখ! কত দিন সে দেখে না!

সে বছরের বাকী কয়টা মাস অহিভূষণের কাটিতে লাগিল বড়ই অশান্তিতে। কত রকমের কাজে সে আপনাকে ভুলাইয়া রাখার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সর্ব্বক্ষণই তার সকল রকমের কাজকে, সকল রকমের চিন্তাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে শুধু একটী মাত্র চিন্তা—ওই যে কয়েক ইঞ্চি পুরু ইটের দেয়াল, ওর ওপারে কী অপূর্ব্ব রাজ্য মানুষের সমাজ—সুখে-দুঃখে গড়া মানুষের সমাজ। থাক্ সেখানে দুঃখ, অহিভূষণ সেখানেই পড়িয়া থাকিতে চায়, এখানকার রাজত্বেও তার অরুচি। ভুল বলিয়াছেন তাঁরা যাঁরা নির্জ্জনতার জয়গান গাহিয়াছেন। তাঁরা যে কেবল পরের মুখেই ঝাল খাইয়াছেন অহিভূষণের অবস্থায় পড়িলে নিশ্চয়ই তা স্বীকার করিতেন। কত বার সে ভাবিয়াছে

ইটের এ ব্যবধানটুকু সে তো এক মুহূর্ত্তেই ঘুচাইয়া ফেলিতে পারে। শুধু অবিনাশকে একখানা চিঠি লেখা মাত্র, পর মুহূর্ত্তে সে খুসী হইয়াই রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত করিয়া দিবে। কেবল তার বাজীতে হার হইবে এইমাত্র। কতবার সে লোভ তার হইয়াছে। কি করিয়া সে যে তা সামলাইয়াছে নিজেই জানে না।

অহিভূষণ জানিত দুনিয়ায় একটী মাত্র কাজ আছে যার দৌলতে মানুষ পৃথিবী তো দূরের কথা, আপনাকেও ভুলিয়া যায়—পড়াশুনা। দ্বিতীয় বছর হইতে সে এ কাজেই মনোনিবেশ করিল। মানুষের সঙ্গে মুখের আলাপ না ঘটুক, মানুষের মধ্যে সেরা যারা, বইয়ের ভিতর দিয়া তাদের সহিত আলাপ সে তো করিতে পারিবে।

অবিনাশের নিকট বই সরবরাহের জন্য চিঠি আসিল। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে টাকা জমা দিয়া অবিনাশ বই পাঠাইতে সুরু করিল অহিভূষণের কয়েদখানায়—রাশি রাশি বই। সমস্তই প্রায় গল্পের, দেশী, বিলাতী, ফরাসী, রাশিয়ান্। কিছুকাল পরে অহিভূষণ লিখিয়া জানাইল—গল্পের মানুষের কথা আর তার ভাল লাগিতেছে না, সে এখন জানিতে চায় আসল মানুষের কথা। কাজেই অতঃপর তাকে আর গল্পের বই না পাঠাইয়া যেন জীবনী পাঠান হয়, মহাপুরুষদের জীবনী, ভাবুকদের জীবনী, কর্ম্মীদের জীবনী।

এই ভাবে বছর দুই কাটিয়া গেল, অহিভূষণের নিকট হইতে এক দিন আবার সংবাদ আসিল, লোকের জীবনী আর নয়, এখন সে জানিতে চায় জাতির জীবনী। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি হইতে এবার চালান যাইতে লাগিল ঝুড়ি ঝুড়ি দেশ-বিদেশের ইতিহাস।

পঞ্চম বৎসরের পর অহিভূষণ সুরু করিল দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা, পড়ার নেশা এখন তার চরমে উঠিয়াছে। হাল্কা গল্পের বইগুলিই পড়িয়া ফেরৎ পাঠাইতে আগে তার সপ্তাহখানেক লাগিয়া যাইত, এখন সেই সময়ের মধ্যেই সে জটিল দর্শনের বইগুলি নিঃশেষ করিয়া ফেরৎ পাঠায়—যা আয়ত্ত করিতে সাধারণ লোকের মাসের পর মাস কাটিয়া যাইবার কথা। অবিনাশের কেমন সন্দেহ হইল লোকটা বাস্তবিকই বইগুলি পড়ে তো? অনেক দিন আগেই সে রাজমিস্ত্রি লাগাইয়া উঁচু পাঁচীলের মাথার কাছাকাছি একটা ছোট ফুটা তৈরী করাইয়া নিয়াছিল। মইএ চড়িয়া সে ফুটায় চোখ রাখিলে অহিভূষণের কয়েদখানার সমস্তটাই চোখে পড়িত অথচ ভিতর হইতে অহিভূষণের পক্ষে বাহিরের লোককে লক্ষ্য করার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এক দিন বিকালে অবিনাশ সেই রন্ধ্রপথে দেখিতে পাইল বারান্দার দেয়ালে বালিশ লাগাইয়া এবং সেই বালিশে ঠেসান দিয়া অহিভূষণ পুস্তক-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে—সকাল হইতে এতটা বেলা পর্য্যন্ত তাকে যে তিন বার তিন রকমের খাবার দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সে অবস্থায় সেখানেই পড়িয়া, অহিভূষণের তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই।

দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচ বছর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে অবিনাশের অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গত কয়েক বছর হইতেই তার ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছিল, বর্ত্তমানে দুর্দ্দশা চরমে আসিয়া পড়িয়াছে। দেনার দায়ে কয়েকখানা সম্পত্তি ইতিমধ্যেই তাকে বিক্রী করিতে হইয়াছে। বছর দশেক আগে যে অবিনাশ এক লক্ষ টাকাকে নিতান্ত হেলাফেলার বস্তু মনে করিত আজ তার এমন অবস্থা যে দু' বছর পরে অহিভূষণ কয়েদখানা হইতে বাহির হইয়া সে টাকা দাবী করিলে তাকে স্ত্রী-পুত্র নিয়া নির্ঘাৎ পথে দাঁড়াইতে হইবে। লক্ষ টাকার লোভে যে লোক দশ বছর এই অদ্ভুত জীবন যাপন করিতে পারিয়াছে বাকী দু'টি বছর তার পক্ষে আর কী? অবিনাশ আর পূর্ব্বের মানুষ নাই, শরীর ও মন দুই-ই তার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মাত্র দু'টি বছর, তার পর ধনীর দুলাল অবিনাশ ভিখারীর বেশে রাজপথে দাঁড়াইবে, আর সেই পথ দিয়াই লক্ষপতি অহিভূষণের মোটর গর্ব্বিত সিংহনাদ করিতে করিতে ছুটিতে থাকিবে।

অহিভূষণেরও কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেছে। কয়েদের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই কি না জানি না, তার লেখাপড়ায় বিলক্ষণ ভাঁটা পড়িয়াছে। যে গ্রন্থকীট অহিভূষণ গভীর দর্শনের বইগুলি সপ্তাহে সপ্তাহে পড়িয়া ফেরৎ পাঠাইত গত দেড় বছর হইতে সে একখানিও নতুন বই চায় নাই। দেড় বছর আগে সে একখানি তুলসীদাসের রামায়ণ আনাইয়াছিল, তার পর এত দিন যাবৎ সে কেবল সেইখানাই পড়িতেছে। অথচ এমন নয় যে হিন্দি ভাষা তাকে নতুন শিখিতে হইতেছে; ছেলেবেলা তার কাটিয়াছে কাশীতে, উৎকৃষ্ট হিন্দিই তার জানা আছে।

অহিভূষণের মুক্তির ঠিক আগের দিন। সকালে উঠিয়াই অবিনাশের স্ত্রী অবিনাশের মুখের দিকে তাকাইয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এক রাত্রের মধ্যে অবিনাশের মাথার প্রায় সমস্ত চুল সাদা হইয়া গেছে!

বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত বহু সাধ্য-সাধনা করিয়াও যখন অবিনাশকে কেউ জলস্পর্শ করাইতে পারিল না হঠাৎ সেই সময় কয়েদখানার গোমস্তার নিকট হইতে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ আসিল—অহিভূষণের উন্মাদ রোগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে! কিছু দিন হইতেই সে লক্ষ্য করিতেছিল অহিভূষণ আপন মনেই উচ্চস্বরে কথা বলে, বিড় বিড় করিয়া সারা উঠান ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনো কখনো তুলসীদাস হইতে আবৃত্তি করে, কখনো বা আবার হু হু করিয়া কাঁদিতে থাকে। আজ সে ধারণা তার বদ্ধমূল হইয়াছে।

অবিনাশ তড়াক্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অহিভূষণ পাগল হইয়া গেছে?

চুক্তির লক্ষ টাকা তবে সে চেষ্টা করিলেই বাঁচাইতে পারে! তাকে স্ত্রী-পুত্র নিয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে না!

আশার আলোক অবিনাশের চোখের সম্মুখে ধাঁধিয়া উঠিল। এমন পিশাচও মানুষ হয়! যাকে এক দিন বন্ধু বলিয়া সে গ্রহণ করিয়াছিল, স্বার্থের অনুরোধে আজ তার সর্ব্বনাশ করিতেও সে পিছ-পা নয়।

রাত্রি তখন একটা, সমস্ত জগৎ ঘুমে অচেতন। ধী-রে, অতি সন্তর্পণে অবিনাশ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। তার পর এক পাঞ্জাবীর ট্যাক্সি ধরিয়া গাড়ী চালাইতে হুকুম দিল—কয়েদখানার দিকে।

রাত্রি গোটা দুইয়ের সময় কড়া নাড়ার আওয়াজ পাইয়া গোমস্তা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সম্মুখে 'বাবু'কে দেখিয়াই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অবিনাশ তৎক্ষণাৎ ঠোঁটে তর্জ্জনী চাপিয়া গোমস্তাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল, তার পর গলা খাটো করিয়া কহিল, "আপনি লিখেছেন অহিভূষণ পাগল হয়ে গেছে—এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। এই অবস্থাতে এখুনি আমরা তাকে কয়েদখানার বাইরে এনে ছেড়ে দেব। কাল বেলা বারোটায় তার মুক্ত হবার কথা, বাজী রাখ্‌বার সময়ে যাঁরা যাঁরা কাগজে সই করেছিলেন তাঁরা আমাকে নিয়ে সে সময়ে কয়েদখানার ফটকে এসে হাজির হবেন। তাঁদের কাছে প্রমাণ হয়ে যাবে অহিভূষণ পাগল অবস্থাতে জেলখানা থেকে আপনিই ভেগে পড়েছে। আমার লাখ টাকা বাঁচাবার কেবল এই এক মাত্র উপায় আছে—নতুবা আমায় পথে দাঁড়াতে হবে"।

গোমস্তা চালাক লোক, মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাপারটি আঁচিয়া নিয়া কহিল, "চমৎকার মৎলব। পাঁচীলের গায়ে গোটা কতক লোহা পুঁতে রাখ্‌লেই সবাই ভাব্‌বে ওই পথেই পাগল সট্‌কেছে। আর তা ছাড়া গাঁ আমাদের, সাক্ষী-সাবুদ জোটাতেও কষ্ট হবে না।"

দরওয়ানকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে তখন কয়েদখানার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু কোথায় অহিভূষণ? তার ঘর খোলা, সে ঘরে তো জনপ্রাণী নাই! সে কি তবে রাত দুপুরে উঠানময় টহল দিয়া বেড়াইতেছে? আলো জ্বালাইতেই অবিনাশ দেখিল টেবিলের উপর গেলাস চাপা দেওয়া একখানা চিঠি। চিঠিখানা হাতে নিয়া তাড়াতাড়ি রুদ্ধশ্বাসে সে পড়িয়া ফেলিল। তাতে লেখা ছিল,

"ভাই অবিনাশ,

বারো বছর লোকালয়ের বাইরে রেখে তুমি আমাকে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েছ। তার ফলে আজ আমি এমন জিনিষ পেয়েছি যার কাছে তুচ্ছ এক লাখ টাকা কিছুই নয়। এমন এক দিন ছিল যখন লাখ টাকা পেলে আমি হাতে স্বর্গ পেয়েছি মনে করতাম,

কিন্তু আজ আমার চোখে তা পথের ধুলো ছাড়া আর কিছুই নয়। জগতের কাছে এ কথাই আজ আমি প্রমাণ করতে চাই। কাল বেলা বারোটার সময় আমার কয়েদের মেয়াদ পূর্ণ হবে; ঠিক তার বারো ঘণ্টা আগে অর্থাৎ আজ রাত বারোটার সময় আমি এই চিঠি লিখে এই ঘরের স্কাই-লাইটের ফুটো দিয়ে ভেগে পড়্‌ছি। বাজীর কাগজে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁদের এই চিঠিখানা দেখিও।"

ইতি—অহিভূষণ।

অবিনাশ চিঠিখানা দুইবার পড়িয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক রি য়া গো ম স্তা র দিকে তাকাইয়া রহিল। তার চোখের কোণে ও কি? জল না কি! গোমস্তা তখন চিঠিখানা 'বাবু'র হাত হইতে তু লি য়া নিয়া নিজেই চোখ বুলাইয়া নিল, তার পর তুড়ি মারিয়া কহিল, "আর কি, কেল্লা ফতে! রেখে দিন বাবু চিঠিটা যত্ন করে—দ লী লে র সিন্দুকে তুলে রাখবেন।"

চিঠিখানা…রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল।

তার পানে চাহিয়া একটু ম্লান হাসির সহিত অবিনাশ কহিল, "কোন দরকার নেই, চক্কোত্তি মশাই, অহিভূষণ এখন অনেক উঁচু স্তরের জীব, তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী-প্রমাণের দরকার নেই……চলুন বাইরে যাই, রাত প্রায় কাবার হয়ে এল।" *

* একটি রাশিয়ান্ গল্পের ভাবাবলম্বনে।

একে আর—

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

জুট্-অফিসের বড়-বাবু হঠাৎ সেদিন হেঁকে
বল্‌ল,—"ওহে ষষ্ঠীচরণ, আসে নি আজ কে কে?
নাম ঠিকানা ওদের লিখে আমার আপিস-ঘরে—
ভুল কোরো না, পাঠিয়ে দিয়ো একটুখানি পরে।
আর যাহারা আজ্‌কে হাজির তা'দেরো নামগুলি—
ওই কাগজের আর এক পিঠে ঠিক্‌সে দিও তুলি'।"
সবাই শুনে চম্‌কে ভাবে ব্যাপারটা কি তবে—
আজ্‌কে যাদের কামাই তা'দের জবাবটা কি হবে?
কিন্তু যা'রা হাজির তা'দের নাম পাঠান কেন?
যতই ভাবে গুলোয় মাথা গোলকধাঁধা যেন!
চট্‌ল নাকি বড় সাহেব? বিগ্‌ড়ালো কি মাথা?
কিংবা হঠাৎ উধাও হ'ল হিসাব রাখার খাতা?
কিংবা ক্যাসের টাকা কি কেউ লুঠ ক'রেছে রাতে?
কিংবা অফিস ঘায়েল হ'ল পাটের ব্যবসাতে?
আসল ব্যাপার নাইক' জানা—সারাটি দিন তারা
আবোল তাবোল ভাবনা ভেবে আতঙ্কেতে সারা;
ছুটির আগে বড়-বাবু হঠাৎ এলেন ঘরে,
বাবুরা সব চম্‌কে ওঠে, প্রাণে কাঁপন ধরে।
মনে মনে সবাই তখন ডাকছে ভগবানে,
কে জানে কি দারুণ কথা শুন্‌তে হবে কানে;
টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁতের পাঁতি মেলে—
হাঁক্‌ল বড়-বাবু, "ওহে, শুন্‌তে কি কেউ পেলে?

গিন্নী দেবেন পুষির বিয়ে, বেজায় ঘটা ভাই—
নিমন্ত্রণের এই যে চিঠি—সবার যাওয়া চাই।”

সংখ্যার রহস্য

(শ্রীবিজয়কুমার বড়াল)

এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, তাঁরা বলেন যে আমাদের অনেকের জীবনের উপর গ্রহ, রত্নের মত সংখ্যারও (Number) যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এর মধ্যে এখনও এত রহস্য আছে যে তার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করতে বড় বড় মস্তিষ্ক 'হিম্‌সিম্' খেয়ে যাচ্ছে। গ্রীক্ পণ্ডিত পীথাগোরাসের একখানি সম্পূর্ণ তান্ত্রিক দর্শনই এই সংখ্যার ভিত্তির উপর স্থাপিত।

এখানে ১৩, ১৪ এবং শুক্রবারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে দিলুম, তোমরা পড়ে দেখো এ-সবের মধ্যে কিছু মজা আছে কি-না ; চেষ্টা করলে অনেকেই এমন ২।১টি সংগ্রহ করতে পারবে।

১০ম চার্লসের পুত্র বেরীর ডিউক, জনৈকা বিদেশী রাজকুমারীর স্বামী, ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী (লুই ফিলিপের পতনের মাস) লুভেল কর্ত্তৃক নিহত হন। তিনি তাঁর ১০ম বর্ষীয় পৌত্রের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। ১৮৩০-এর বিদ্রোহ তিন দিন ধ'রে চলেছিল। ১০ম চার্ল্‌স্ ৭৪ বছর বয়সে রাজ্য হারিয়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

লুই ফিলিপের পুত্র অর্লিনের ডিউক, জনৈকা বিদেশী রাজকুমারীর স্বামী, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী (লুই ফিলিপের পতনের মাস) ভীষণভাবে নিহত হন। তিনি তাঁর ১০ম বর্ষীয় পৌত্রের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। ১৮৪৮-এর বিদ্রোহ তিন দিন ধ'রে চলেছিল। লুই ফিলিপ্ ৭৪ বছর বয়সে রাজ্য হারিয়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

—এই দু'টির মধ্যে যে সামঞ্জস্য দেখ্‌ছ তা কি অদ্ভুত নয় ?

ক্রিষ্টোফার কলম্বস্ শুক্রবারকে খুব ভক্তি করতেন। ৩রা আগষ্ট, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের শুক্রবারে তিনি স্পেনের পালোস্ বন্দর ত্যাগ ক'রে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। একটি শুক্রবারে সমুদ্রের উপর কয়েকটি পাখীকে উড়্‌তে দেখে তিনি প্রথম মাটীর আভাস পান। ৭০ দিন জাহাজ চালিয়ে প্রথম যে-দিন আমেরিকার লুকাইয়াস দ্বীপে তিনি পদার্পণ করলেন সে-দিন এক শুক্রবার—১২ই অক্টোবর, ১৪৯২। তাঁর বিজয়ী-বেশে বার্সিলোনাতে প্রবেশের দিনও এক শুক্রবার। পোর্টো সান্টো তে ক্রুশ স্থাপন করেছিলেন ৩০শে নভেম্বর, শুক্রবারে। আর একটি শুক্রবারে —৪ঠা জানুয়ারী—তিনি স্পেনের উদ্দেশে রওয়ানা হ'য়ে পালোস বন্দরে পুনঃপ্রবেশ করেছিলেন এক শুক্রবারে।

ক্রিষ্টোফার কলম্বস্—এঁর জীবনে শুক্রবারের খুব প্রভাব দেখা যায়।

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্ম শুক্রবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৩২। লক্ষ্য ক'রো—১৩×২=২৬ ; ১+৭+৩+২=১৩।

ভিক্তর হুগো ১৩ সংখ্যাটিকে দুগ্রহ ব'লে মনে করতেন ; এ বিষয়ে তাঁর নোট্-বইয়ে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বর্দোয়ায় ন্যাশ্যানাল্ এসেম্বলীতে যাবার সময়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন যে তিনি সবান্ধবে ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্যারী ত্যাগ করেন, তাঁর রেল-কামরায় সবশুদ্ধ ১৩ জন যাত্রী ছিল, বর্দোয়াতে তাঁর বাড়ীর নম্বর ছিল ১৩ রিয় সাঁ মর্। ১৩ই মার্চ্চ রাত্রে তিনি আদৌ ঘুমুতে পারেন নি,

গিন্নী দেবেন পুষির বিয়ে, বেজায় ঘটা ভাই—
নিমন্ত্রণের এই যে চিঠি—সবার যাওয়া চাই।”

সংখ্যার রহস্য

(শ্রীবিজয়কুমার বড়াল)

এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, তাঁরা বলেন যে আমাদের অনেকের জীবনের উপর গ্রহ, রত্নের মত সংখ্যারও (Number) যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এর মধ্যে এখনও এত রহস্য আছে যে তার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করতে বড় বড় মস্তিষ্ক 'হিম্‌সিম্' খেয়ে যাচ্ছে। গ্রীক্ পণ্ডিত পীথাগোরাসের একখানি সম্পূর্ণ তান্ত্রিক দর্শনই এই সংখ্যার ভিত্তির উপর স্থাপিত।

এখানে ১৩, ১৪ এবং শুক্রবারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে দিলুম, তোমরা পড়ে দেখো এ-সবের মধ্যে কিছু মজা আছে কি-না; চেষ্টা করলে অনেকেই এমন ২।১টি সংগ্রহ করতে পারবে।

১০ম চার্লসের পুত্র বেরীর ডিউক, জনৈকা বিদেশী রাজকুমারীর স্বামী, ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী (লুই ফিলিপের পতনের মাস) লুভেল কর্ত্তৃক নিহত হন। তিনি তাঁর ১০ম বর্ষীয় পৌত্রের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। ১৮৩০-এর বিদ্রোহ তিন দিন ধ'রে চলেছিল। ১০ম চার্ল্‌স্ ৭৪ বছর বয়সে রাজ্য হারিয়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

লুই ফিলিপের পুত্র অর্লিনের ডিউক, জনৈকা বিদেশী রাজকুমারীর স্বামী, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী (লুই ফিলিপের পতনের মাস) ভীষণভাবে নিহত হন। তিনি তাঁর ১০ম বর্ষীয় পৌত্রের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। ১৮৪৮-এর বিদ্রোহ তিন দিন ধ'রে চলেছিল। লুই ফিলিপ্ ৭৪ বছর বয়সে রাজ্য হারিয়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

—এই দু'টির মধ্যে যে সামঞ্জস্য দেখ্‌ছ তা কি অদ্ভুত নয়?

ক্রিষ্টোফার কলম্বস্ শুক্রবারকে খুব ভক্তি করতেন। ৩রা আগষ্ট, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের শুক্রবারে তিনি স্পেনের পালোস্ বন্দর ত্যাগ ক'রে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। একটি শুক্রবারে সমুদ্রের উপর কয়েকটি পাখীকে উড়্‌তে দেখে তিনি প্রথম মাটীর আভাস পান। ৭০ দিন জাহাজ চালিয়ে প্রথম যে-দিন আমেরিকার লুকাইয়াস দ্বীপে তিনি পদার্পণ করলেন সে-দিন এক শুক্রবার—১২ই অক্টোবর, ১৪৯২। তাঁর বিজয়ী-বেশে বার্সিলোনাতে প্রবেশের দিনও এক শুক্রবার। পোর্টো সান্টো তে ক্রুশ স্থাপন করেছিলেন ৩০শে নভেম্বর, শুক্রবারে। আর একটি শুক্রবারে —৪ঠা জানুয়ারী—তিনি স্পেনের উদ্দেশে রওয়ানা হ'য়ে পালোস বন্দরে পুনঃপ্রবেশ করেছিলেন এক শুক্রবারে।

ক্রিষ্টোফার কলম্বস্—এঁর জীবনে শুক্রবারের খুব প্রভাব দেখা যায়।

জর্জ্জ্ ওয়াশিংটনের জন্ম শুক্রবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৩২। লক্ষ্য ক'রো— ১৩×২=২৬; ১+৭+৩+২=১৩।

ভিক্তর হুগো ১৩ সংখ্যাটিকে দুর্গ্রহ ব'লে মনে করতেন; এ বিষয়ে তাঁর নোট্-বইয়ে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বর্দোয়ায় ন্যাশ্যানাল্ এসেম্বলীতে যাবার সময়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন যে তিনি সবান্ধবে ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্যারী ত্যাগ করেন, তাঁর রেল-কামরায় সবশুদ্ধ ১৩ জন যাত্রী ছিল, বর্দোয়াতে তাঁর বাড়ীর নম্বর ছিল ১৩ রিয় সাঁ মর্। ১৩ই মার্চ্চ রাত্রে তিনি আদৌ ঘুমুতে পারেন নি,

পীথাগোরাসের স্বপ্ন, সংখ্যার চিন্তা তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছিল, আর কয়েক ঘণ্টা পরে সে বাড়ী ত্যাগ করবার সম্ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। এর কারণ—

সেই সন্ধ্যায় যখন পুত্রবধূ ও পৌত্রদ্বয়কে নিয়ে তিনি লাঁতা রেস্তোরাঁয় তাঁর পুত্র চার্লসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন হঠাৎ হোটেলের কর্ত্তা এসে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল, "মশাই, দৃঢ় হোন, মঁসিয়ে চার্ল্‌স্—" সে চুপ ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"কি?" বৃদ্ধ বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"তিনি মারা গেছেন।" সে-দিন ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৭১।

বিখ্যাত সাহিত্যিক হেনরি বেরাণ্ড্ ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২২-এ Goncourt প্রাইজ্ লাভ করেন। সে সময়ে তিনি ১৩ খানি বই লিখেছিলেন, তাঁর বাড়ীর নম্বর ছিল ৬৭ (৬+৭=১৩)।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কোন মাসের ১৩ই তারিখের এক শুক্রবারে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দানুন্‌ৎসিওর একটি চোখ প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিলেন তার নম্বর ছিল ১৩, গাড়োয়ান ভাড়া চেয়েছিল ১৩ 'লিয়ার'। বাড়ী ফিরে তিনি ১৩ খানি পত্র পেয়েছিলেন, সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে ১৩ জন অভ্যাগত ছিল। আবার ১৯২২-এর আগষ্ট মাসের ১৩ই তারিখে তাঁর এক মারাত্মক রকমের পতন ঘটে। এই সব দেখেই মনে হয় তিনি ১৩-কে কখনও ব্যবহার করেন না, কারণ জনৈক বন্ধুকে তাঁর নিজের একখানি বই উপহার দিতে গিয়ে তিনি তার পাতায় লিখেছিলেন: Arcachon, the 2nd January, 1912+1, আর খাতার পাতায় সংখ্যা দেবার সময়ে তিনি লেখেন '12a'।

জগৎবিখ্যাত নাট্যরথী ভাগ্‌নের (Richard Wagner)-এর পুরো নাম ১৩টি অক্ষর-সমষ্টি, জন্ম ১৮১৩, মৃত্যু ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর নাটক 'তান্‌হয়জের্' (Tannhauser) প্যারীতে প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১৩ই মার্চ্চ্, ১৮৬১, আবার ১৩ই মে, ১৮৯৫-এ।

১৪ সংখ্যার মধ্যেও অনেক আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে

১৪শ লুই-এর জীবনেই এর প্রাদুর্ভাব বেশী। বোঝাই যাচ্ছে তিনি লুই নামধারী রাজাদের মধ্যে ১৪শ ব্যক্তি, ১৪ বছর বয়সে ১৪ই মে তারিখে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩শ লুইএর ১৬৪৩ (১+৬+৪+৩=১৪) খৃষ্টাব্দে মৃত্যু তিনি দর্শন করেছিলেন; Turenne কর্ত্তৃক ১৬৫২ (১+৬+৫+২=১৪) খৃষ্টাব্দে ব্লাঁদাঁতে তাঁর জীবন রক্ষা হয়; ১৬৬১ (১+৬+৬+১=১৪) খৃষ্টাব্দে তিনি স্বহস্তে শাসন-ভার গ্রহণ করেন, ইংলণ্ডের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে ১৬৭০ (১+৬+৭+০=১৪) খৃষ্টাব্দে ডোভার সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন এবং ১৭১৫ (১+৭+১+৫=১৪) খৃষ্টাব্দে ৭৭ (৭+৭=১৪) বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ফ্রান্সের ৪র্থ হেনরীর উপরেও এর প্রভাব দেখি। তাঁর পূরো নাম—Henri de Bourbon বা Henri de Navarre—১৪টি অক্ষরের সমষ্টি, জন্ম ১৪ই ডিসেম্বর, ১৫৫৩ (১+৫+৫+৩=১৪) অর্থাৎ খৃষ্টের ১৪ শতাব্দী, ১৪ দশক (decade) পরে; মৃত্যুর তারিখ ১৪ই মে। সুতরাং তাঁর রাজত্বের কাল ৩ গুণ ১৪ বছর, পরমায়ু ছিল ৪ গুণ ১৪ বছর এবং ১৪ সপ্তাহ ও ৩ গুণ ১৪ দিন। এ ছাড়া Jean Chatel যখন তাঁকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে গিয়ে তাঁকে আহত ক'রে ফেল্‌ল তার ঠিক ১৪ ঘণ্টা আগে রাণী Saint Denis-এ প্রবেশ করেছিলেন,—এঁরও জন্মের তারিখ ১৪ই মে। আজ এই পর্য্যন্ত।

সনাতনের সয়তানী

(শ্রীনিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ)

চোর কয় রকম?

চার রকম।

যথা—

সিঁধেল চোর, ছ্যাঁচড়া চোর, জুয়াচোর—আর? আর এক রকমের চোর আছে যাদের কথা ফাল্গুন মাসের "রামধনু"তে পড়েছ—"বৈজ্ঞানিক চোর"।

বৈজ্ঞানিক চোর যত বড়ই হোন, জুয়াচোরও বড় কম যান না। তার একটা গল্প বলি শোন। তবে একটা কথা, গল্পটী পড়ে জুয়াচুরীর বাহবা না দিয়ে তাদের ধারাল বুদ্ধিটীকেই বাহাদুরী দিও।

প্রায় কোম্পানী-আমলের কথা; মাণিকপুরের বাবুদের দু'জন লাঠিয়াল ছিল। এক জনের নাম সনাতন, অপরের নাম রতন—দু'ভাই তারা। তখনকার দিনে সে অঞ্চলে তাদের মত লাঠিতে দখল আর কারুর ছিল না। আগে তারা ডাকাতিই কর্‌ত, একবার ধরা পড়ে কোম্পানীর বিচারে তাদের আর একটু হ'লেই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মাণিকপুরের বাবুরা তাদের লাঠির বহর জানতেন, তাই অনেক কায়দায় তাদের সে-যাত্রা বাঁচিয়ে নিজেদের লাঠিয়াল ক'রে রেখে-ছিলেন। বাবুদের দয়াতেই প্রাণে বেঁচে তারা একেবারে বাবুদের গোলাম হ'য়ে গিয়েছিল। সেই থেকে ডাকাতিও ছেড়েছিল, তবে যুৎ-সই দাঁও পেলে পরের মাথায় হাত বুলিয়ে দু'-চার পয়সা রোজগার করতেও ছাড়্‌ত না। হাজার হোক্ স্বভাব তো!

নতুনগঞ্জের জমীদার চৌধুরীদের তখন খুব বোল্‌বোলাও কাণ্ড। এমন সময়ে হঠাৎ জমীদার মারা গেলেন। দান-সাগর শ্রাদ্ধ হবে, মহা সমারোহ ব্যাপার; ব্রাহ্মণবিদায়, কাঙ্গালীভোজন করান হবে বলে দেওয়ানজী চারিদিকে ঢেঁট্‌রা দেওয়ালেন।

দেওয়ানজী ছিলেন খুব পাকা,—যাকে বলে ঘুঘু; পাছে অব্রাহ্মণেরা এসে চালাকী ক'রে দান নিয়ে যেতে না পারে সে-উপায়ও তিনি মনে মনে ভেঁজে রেখেছিলেন।

শ্রাদ্ধ শেষ হয়ে গেল। এইবার দান; দেওয়ানজী দেখলেন আন্দাজ পাঁচ-সাত হাজার ব্রাহ্মণ বিদায় নেবার জন্য হাজির হয়েছেন। তিনি হাতযোড় ক'রে সভার মধ্যে নিবেদন করলেন যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ভট্‌চায্‌ মশায়ের কানে কানে গায়ত্রী বলে দান নিতে হবে।

ব্রাহ্মণরা দানের বহর দেখে একেবারে বুঁদ হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের আর

কিছুই খেয়াল ছিল না। তাঁরা একে একে পুরুতঠাকুরের কানে গায়ত্রী ব'লে আশার অতিরিক্ত বিদায় নিয়ে যে যার দিকে রওনা দিতে লাগ্‌লেন।

এখন এদিকে হ'য়েছে কি, সনাতন, রতন দু'জনেই লাটের খাজনা দিয়ে ফির্‌ছিল সহর থেকে; পথে এমন দাঁও পেয়ে তারা তোফা পৈতে গলায় ঝুলিয়ে ব্রাহ্মণদের দলে দানের আশায় ভিড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল কোনই হাঙ্গামা এতে পোহাতে হবে না;—ওদিকে শ্রাদ্ধের দান—সে বড় একটা ফেল্‌না জিনিষ নয়।

দেওয়ানের কথায় মাথায় যেন তাদের বজ্রাঘাত হ'ল।

রতন সনাতনকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কি বলতে বল্লে"?

সনাতন উত্তর দিল—"গায়ত্রী"

"সেটা আবার কি? তুই জানিস্?"

"কচু। আমি জান্‌ব কোত্থেকে রে! বামুন ছাড়া তা কেউ জানে না—পৈতের সময় তেনাদের গুরুরা কানে কানে কয়ে দেয়। তেনারা ছাড়া কেউ শোনেও নি তা।"

"তবে কি হবে?" রতন ভয়ে ঘামতে আরম্ভ কর্‌ল। "তার চেয়ে চল্, এই ফাঁকে খসে পড়ি"—বলে সে উঠে দাঁড়াল। "সে আর এখন হয় না, সব দর্‌জা বন্ধ। তুই চুপ্ কর্, দেখ্ কি রকম ক'রে কাজের বন্দোবস্ত করি"—বলে সনাতন হাত ধরে রতনকে বসিয়ে দিল।

বিদায় নেওয়া চল্‌তে লাগ্‌ল। শেষে সনাতনের পাশের ব্রাহ্মণও দান নিয়ে ফির্‌ল। এইবার! এবার সনাতনের পালা। রতন কাঁপ্‌তে সুরু কর্‌ল।

সনাতন গিয়ে দাঁড়াতেই ভট্‌চায্‌ মশায় গায়ত্রী বল্‌তে বল্‌লেন। চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে সনাতন বল্লে—"কি? কি বল্‌ব? গায়ত্রী!! বামুন হ'য়ে গায়ত্রী বিক্রী ক'রে দান নেব? এত বড় কথা! নেহি মাংতা দান, এমন দানের মুখে মারি ই-য়ে....."

ব্যস্! আর যায় কোথা? সভায় একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গেল। "নেহি লেঙ্গা"—বলে রতনও বাঘের মতন চারিদিকে লাফাতে লাগ্‌ল। আবার

যাঁরা সত্যিকার ব্রাহ্মণ তাঁরাও সনাতনের কথা শুনে নেওয়া-দান ফিরিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। সত্যিই ত! অব্রাহ্মণের বাড়ীতে শেষে গায়ত্রী বেচবে! হ'লই বা জমীদার!

"রক্ষা করুন ঠাকুর মশায়"—বলে দেওয়ানজী ছুটে এসে সনাতনের পা চেপে ধর্‌লেন।

রতনের রাগ আর কিছুতেই থামতে চায় না। ফটাং ক'রে পৈতে ছিঁড়ে দেওয়ানজীর মাথায় জড়িয়ে দিল। অমঙ্গলের ভয়ে দেওয়ানজী ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন।

যাক্, বহু কষ্টে গোলমাল থেমে গেল। কোন ব্রাহ্মণকেই আর শেষ পর্য্যন্ত গায়ত্রী বল্‌তে হ'ল না; দেওয়ানজী বহু টাকা ও জিনিষপত্র দিয়ে সনাতন-রতনকে 'বিদায়' কর্‌লেন।

পঞ্চভূত

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্)

মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশকে পঞ্চভূত বলে। শাস্ত্রে আছে যে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু এবং সকল প্রাণীর দেহ এই পঞ্চভূতে গঠিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা যে এখানে শাস্ত্রে ভুল আছে। কারণ আজকাল "কেমিষ্ট্রী" পড়িয়া জানা গিয়াছে যে জল, বাতাস এগুলি মৌলিক উপাদান (element) নহে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়ুর সংযোগে জল হইয়াছে; নাইট্রোজেন মিশিয়া বাতাস হইয়াছে।

কিন্তু শাস্ত্রে কিছু ভুল নাই। কারণ শাস্ত্র কোথাও বলেন নাই যে মাটি, জল, বাতাস এগুলি মৌলিক উপাদান (element)। শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর প্রথমে আকাশ সৃষ্টি করিলেন, আকাশ হইতে বাতাস, বাতাস হইতে আগুন, আগুন হইতে জল এবং জল হইতে মাটি সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং

মৌলিক উপাদান যদি কিছু থাকে তাহা হইলে আকাশ। প্রকৃত পক্ষে আকাশকেও মৌলিক উপাদান বলা যায় না, কারণ সৃষ্টির সময় ঈশ্বর হইতে আকাশের উৎপত্তি হয় এবং প্রলয়ের সময় ঈশ্বরের মধ্যেই আকাশ বিলীন হয়। যাহা হউক ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে জল ও বাতাসকে শাস্ত্রে মৌলিক উপাদান বলা হয় নাই।

বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প মিশাইয়া তাহার মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ করিলে আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং বাষ্প দুইটি একত্র হইয়া জলে পরিণত হয়। শাস্ত্রে পঞ্চভূতের মধ্যে যে বায়ুর উল্লেখ আছে, বায়বীয় পদার্থ মাত্রই (all gaseous things) তাহার অন্তর্গত। সুতরাং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উভয়ই বায়ুর অন্তর্গত। এখন দেখা যাইতেছে যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যে ভাবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হইতে জল প্রস্তুত করেন তাহার সহিত—"বায়ু হইতে আগুন, আগুন হইতে জল হয়"—এই শাস্ত্র-বাক্যের কোনও বিরোধ নাই।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা যায় যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে করিতেন যে অনেকগুলি মৌলিক উপাদান আছে, কিন্তু আজকাল তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন যে যে সকল পদার্থকে মৌলিক উপাদান মনে করা যাইত তাহারা সকলেই একমাত্র চরম মৌলিক উপাদান হইতে নির্ম্মিত। কিন্তু উপনিষদে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে একমাত্র আকাশ হইতে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের ঋষিদের সত্য দৃষ্টি আলোচনা করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

সম্প্রতি লণ্ডনের ব্রিটীশ মিউজিয়ম্ লাইব্রেরীর জন্য এক লক্ষ পাউণ্ড্ দিয়া রুষ-গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে একখানি হাতের লেখা বাইবেল্ কেনা হইয়াছে। এই বাইবেল্‌খানা খুব পুরানো—গ্রীক্ ভাষায় লেখা। ইটালির ভ্যাটিকান্ লাইব্রেরীতেও এমনি ধারা একখানি খুব পুরানো বাইবেল্ আছে।

TIGHT BINDING

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বসন্ত আজ বিদায় নিতে চায়

(শ্রীবেলারাণী সরকার)

বসন্ত আজ বিদায় নিতে চায়।
কাল-বোশেখীর কালো পাখা
দূর আকাশে দিচ্ছে দেখা,
তারই ভয়ে দখিন হাওয়া
থম্‌কে থেমে যায়;
বসন্ত আজ বিদায় নিতে চায়।
ফুলের কলি পাতার কোলে
বেদনাতে পড়্‌ল ঢলে,
পাতার তলায় কোকিল কাঁদে
আকুল বেদনায়;
বসন্ত আজ বিদায় নিতে চায়।
ভোমরা কেবল থেকে থেকে
গুণগুণিয়ে বলছে ডেকে,
'মধু খাওয়া এবার তবে
শেষ করে দি আয়।'
বসন্ত আজ বিদায় নিতে চায়।

ব্যাকুল হয়ে পাপিয়া রাণী
হারিয়ে ফেলে সুরের বাণী,
আকাশ যেন রাঙিয়ে ওঠে
ব্যথার লালিমায়।
বসন্ত আজ বিদায় নিতে চায়

গ্রীষ্মকাল

[গ-এর গড়াগড়ি]

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (গ্রাহক)

গ্রীষ্মে গোলাপ, গোলাপজাম, গন্ধরাজ গজায়। গ্রীষ্মে গগন গাঢ়, গঙ্গা গম্ভীর। গ্রীষ্মের গরমে গজ, গণ্ডার, গোখুরা গর্জ্জায়। গ্রামে গৃহস্থগণ গ্রীষ্মের গুমটে গুমরে। গ্রীষ্মসন্ধ্যায় গোপালকগণ গৃহ গমনোদ্দেশ্যে গান গাহে। গ্রীষ্মে গিরিপ্রদেশে গমনে গৌরব। গাঙ্‌-চিল গ্রীষ্মে গাছে গাছে গৃহ গড়ে।

শূন্যের ইতিহাস

(শ্রীঅধীরচন্দ্র রায়)

ছেলে—পণ্ডিত মশায়ের কাণ্ড শুনেছ বাবা?

বাবা—না ত, কি?

ছেলে—সেদিন আমার কাছ থেকে ছুরি আর পেন্সিল্ চেয়ে নিলেন, তার পর সেই ছুরি দিয়ে সেই পেন্সিল্ কাটলেন, আর সেই পেন্সিল্ দিয়ে আমারই খাতায় শূন্য বসিয়ে দিলেন।

চিঠি-পত্র

শ্রীপ্রণবনাথ ভাদুড়ী জানিয়েছেন যে তাঁর ঠিকানা বোধ হয় রামধনুতে বার হয় নি। তাঁর ঠিকানা—২৭, ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন, সাঁত্রাগাছি (হাওড়া)।

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"হিন্দী ভাষা শেখা যায় এমন কোন বাংলা বই আছে কি?" (আছে। শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত 'সরল হিন্দীশিক্ষা' এই ধরণের একখানি বই। ৩৪ নং গোবিন্দ ঘোষাল লেন, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম ১।০—রাঃ সঃ)

বড়ই দুঃখের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি যে এত ক'রেও "ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে" অপরের চুরি করা লেখা প্রকাশ আমরা বন্ধ করতে পারছি না। ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার এই ধরণের হীন ব্যাপার ঘটেছে। সম্প্রতি আমরা কয়েকজন গ্রাহক-গ্রাহিকার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি যে ফাল্গুনের রামধনুতে প্রকাশিত "ফাগুনের দোল" কবিতাটি শ্রীমঞ্জীখন সেন-গুপ্তের লেখা নয়, ওটি শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর লেখা, এবং বছর আষ্টেক আগে 'খোকাখুকু'তে বেরিয়েছিল। সম্পাদকের পক্ষে সমস্ত পত্রিকার সমস্ত লেখা মনে করে রাখা সম্ভব নয়। লেখক-

দের—বিশেষতঃ দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল "ভাবী সাহিত্যিকদের" এটুকু বিশ্বাস আমাদের করতে হয়। কিন্তু কেউ কেউ দেখছি আমাদের এ বিশ্বাসের উপযুক্ত নন।

যাই হোক্, একটা সুখের কথা শ্রীষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত স্বীকার করেছেন যে তিনি এ জন্য অনুতপ্ত, এবং তাঁর অল্প বয়স বিবেচনা করে পাঠক-পাঠিকা এবং বিশেষ করে শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। ভবিষ্যতে তিনি আর এমন কাজ করবেন না। সম্পূর্ণ চুরি না হ'লেও অপরের লেখা একটু অদল-বদল ক'রে অনেকে পাঠান। সেটাও চুরির মতই দূষণীয়। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আর কখনও 'বৈঠকে'র কোন লেখার জন্য এর কোন রকম অভিযোগই আমাদের শুনতে হবে না।—রাঃ সঃ

সন্দেশ

পাশের ছবিতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখ—প্রকাণ্ড একটা চাকার মধ্যে একটা কুকুরকে দাঁড় করাইয়া দিয়া চাকাটা ঘুরান হইতেছে! উদ্দেশ্য অবশ্য মজা দেখা নয়, কুকুরটিকে দৌড় শেখান'র জন্যই এমনটা করা হইতেছে। চাকা যত ঘুরিবে কুকুরটিকেও, দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে, ততই চার পা ছুঁড়িতে হইবে; না হইলে যে পপাত! আর কুকুরের পা ছোঁড়ার অভ্যাস মানেই তো দৌড়ের অভ্যাস। ছবির কুকুরটি এই ভাবে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল দৌড়াইতে শিখিয়াছে।

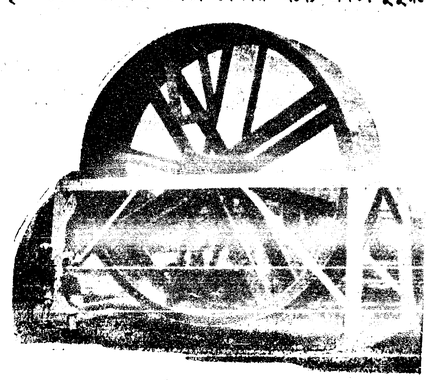

কুকুরকে দৌড় শিখাইবার অদ্ভুত কল

* * *

টারিম মরুভূমির দক্ষিণ দিকে প্রায় দু' হাজার বছর আগে কতকগুলি বড় বড় সহর ছিল—এদের সবগুলিই ছিল বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। যে সব নদী এই সব সহরকে সরস করিয়া রাখিত কালক্রমে সেগুলি শুকাইয়া যাওয়ায় আস্তে আস্তে এখানকার লোকের বাস কমিতে থাকে। মরুভূমির বালিও উড়িয়া আসিয়া সহরগুলিকে ঢাকিতে সুরু করে। এমনি ভাবে শত শত

বছর পরে সেগুলি এখন একেবারে মরুভূমির মধ্যে ডুবিয়া আছে। কিছু দিন হইল এই সহরগুলি খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে।

* * * *

আর একখানা ছবি দেখ। একটা ঢালু গোল চাকতির উপর একজন লোক অবলীলাক্রমে সাইকেলে চাপিয়া ঘুরিতেছে। চাকতিটা যে শুধু ঢালু তাই নয়, নীচেকার যন্ত্র-পাতির সাহায্যে সেটাকে মিনিটে মিনিটে এ পাশ ও পাশ কাৎ করিয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু লোকটির ভ্রূক্ষেপ নাই। অথচ সে ভাল রকমেই জানে যে একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই—এবং এক্ষেত্রে পড়াটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। লোকটির নাম ক্যাটালিনি—বাড়ী বার্লিনে।

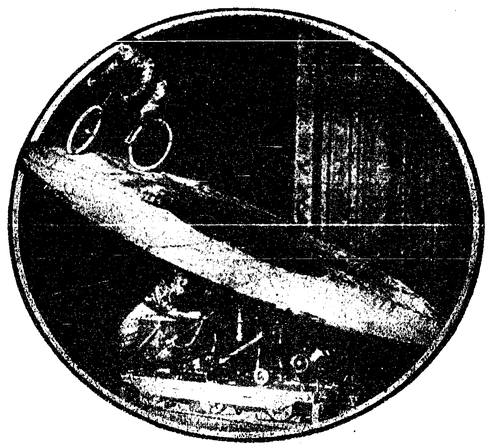

ক্যাটালিনির কেরামতি

* * *

ফ্রান্সের কোন কোন জায়গায় আইন আছে সেখানকার প্রত্যেক লোককে সাঁতার শিখিতেই হইবে—এবং ১৩ বছর বয়সের আগেই। ১৩ বছরের বেশী বয়সের কোন লোক সাঁতার না জানিলে তাকে শাস্তি পাইতে হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্ববঙ্গের মত নদীবহুল জায়গায় এ ধরণের আইনের খুবই দরকার আছে।

* * * *

আমাদের আশ-পাশে অলক্ষিতে কত যে জীবাণু ছড়াইয়া আছে তার ধারণা করাও কঠিন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এক পাউণ্ড মাটীর মধ্যে গড়ে চার হাজার কোটি জীবাণু পাওয়া যায়।

* * * *

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। কিন্তু এমন অনেক জিনিষও আছে যা অত্যন্ত সাধারণ বলিয়া তার কথা আমাদের মনেই আসে না। পাশের ছবিখানা দেখ। কী চমৎকার কারুকার্য্য! অথচ কী সূক্ষ্ম? জিনিষটা কি বল ত? সামান্য একটা মাকড়ষার জাল, তার উপর শিশির আর রোদ পড়িয়াছে।

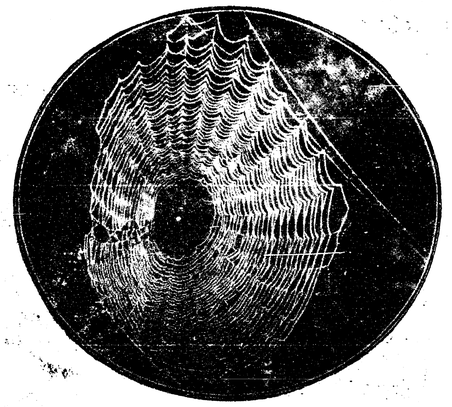

মাকড়ষার জালে শিশির আর রোদের খেলা

* * *

শামুকের ব্যবসা প্যারিসের একটা বড় ব্যবসা। শামুকের মাংসের জন্যই অবশ্য তার এত কদর। শীতকালে শামুকের মাংস নাকি সেখানকার অনেকেরই বেশ একটা লোভনীয় খাদ্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রতি বছর প্যারিসে গড়ে আট কোটি শামুক এই ভাবে খাওয়া হয়।

পুস্তক-পরিচয়

নীতিগল্পগুচ্ছ—শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল-হাউস্, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দাম ছয় আনা।

এই বইখানিতে ছেলেমেয়েদের গল্পচ্ছলে নানা নীতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পড়িলে তারা গল্প পড়ার আনন্দ তো পাইবেই অধিকন্তু তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনেও বইখানা যথেষ্ট সাহায্য করিবে। তবে ২।১টি গল্প ঠিক ছোট ছেলেরা হয়ত বুঝিবে না। খুব অল্প দিনে বইখানির ১ম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়া দেখিয়া ছেলে-মহলে ইহার আদর বুঝা যায়। ছাপা কাগজ ভাল এবং অনেক রঙ্গিন ও একবর্ণ ছবি আছে। সেই হিসাবে দাম খুবই কম বলিতে হইবে।

বাণী রত্নমালা—শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল প্রণীত। প্রকাশক—মডার্ণ বুক-এজেন্সি। মূল্য ॥০। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নানা ভাষা হইতে সংগৃহীত নীতিবাক্যের কবিতা-সঞ্চয়।

কান্তকবি রজনীকান্তের 'অমৃত' এর অনুরূপ লেখা। এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য এবং প্রাইজের বই হিসাবে আদৃত হইবে। শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমপাড়ানি—শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত। বুকষ্টল্। দাম দশ আনা।

এর অধিকাংশ লেখাই 'রামধনু' ও 'মৌচাকে' বেরিয়েছিল। তখন পড়ে খুসী হয়েছিলাম, এখন আরও খুসী হ'য়েছি সেগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত দেখে। শিশুরা এ বই প'ড়ে আমোদ তো পাবেই, বয়স্করা প'ড়েও উপভোগ করবে আমার বিশ্বাস, কারণ প্রত্যেকের ভেতর আছে ঘুমন্ত শিশু-মন যা অনাবিল নির্দ্দোষ আমোদ চায়, যা স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করতে চায় নিজের চারদিকে।

বইয়ের ছাপা-বাঁধাই খুবই ভাল হ'য়েছে। ভেতরের ছবিগুলি তত ভাল না হ'লেও প্রচ্ছদপটটী এত ভাল হ'য়েছে যে ভেতরের সব দোষ পুষিয়ে নিয়েছে। সমস্ত দিক্ দিয়েই বইটা কেনবার মত। শ্রীভৃগু গুহ-ঠাকুরতা

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

গোদা, খোঁড়া, কুঁজো, কাণা, নুলা, ফোগলা, টেরা, টেকো।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

সুধীরচন্দ্র দাস (ভবানীপুর); গিরিধারী, গোবিন্দ, গদা, ইন্দু, অনু, প্রদ্যুম্ন, শুভঙ্কর, বাদল (নহিপুর, মুর্শিদাবাদ); জিতেন্দ্রনাথ দাস (জলপাইগুড়ি); তপেশ, বিজয়া, রমা, জুনু, রেণু, জেসমিন, রেবা, ঝরণা, প্রণতি, আইলিন (কলিকাতা), সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ); সুধু, নীলু, অজু, নন্দ, কল্যাণী, রামকৃষ্ণ (অঙ্গুল); পরেশ বাবু, মণ্টু, ননীবালা, ভোলা, ভানু, কাশী, বলাই, বাবা, মা, অধীররঞ্জন দে (বর্দ্ধমান); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, বীণাপাণি, লীলা, বড়দা, বৌদি, ছোড়দি, চিনদি, যূঁই, রথী, কানু প্রভৃতি (জামালপুর); পানু, ভানু, অনাথ দা, বাবা, মা, চান দা, শশী, মহিম (সেরপুর টাউন); গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য (রামপুরহাট); ন্যাড়া, গজা, চিতু, নাদু, বুকু, পাগলা, কার্ত্তিক, কেয়া, কোকো, কুটি (আন্থুলিয়া—নদীয়া); দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডস্থ কর্পোরেশন্ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ (কলিকাতা); বেনিয়াটোলা লেনস্থ কর্পোরেশন স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (কলিকাতা); সুনীল ব্যানার্জ্জি, জ্ঞান, রবি, অনিল, আলোক, অশোক, রমাদি, সরোজ দা, বিমল, শুকদেব (ভবানীপুর); নবদ্বীপ, গোবর্দ্ধন, সুনীতি, বাদল, অমূল্য, ফণী, হরেকৃষ্ণ, ভূধর, নাড়ু, বিশু প্রভৃতি (পুরুলিয়া); অমিতাভ, স্নেহমুকুল, বুল্‌বুল্ (কুতুবপুর); ফুল, বিনু, বুলু, সনু, নিমু, বুড়ু, অমু, অণ্ট, চুড়ু, নন্দ প্রভৃতি (আন্দুলমৌড়ী); সোম, খোকা, প্রতি, অসি, রেবী (ভবানীপুর); সুকুমার পালিত, সুহাস, সুশান্ত লতিকা, মল্লিকা,

যূথিকা, মণিকা, রেণুকা, (পাটনা); মাণিক, নারায়ণ, হাসু, গংগং (পুরুলিয়া—নডিহা); মিয়াভাই, ছেরন, হেরন, ভেরন, মাখন, কেরামউদ্দীন আহ্‌মদ (রাণীনগর); সোনু, মনু, মোহন, খুসি (বসিরহাট); সুললিত, অমিয়া, অমর, প্রতিভা (মুড়াগাছা); তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় (মধুপুর); বড়কা, ছোটকা, বুলু (লেক্ রোড)।

যাঁহাদের একটি ভুল হইয়াছে—

ডলি, তুলতুল, সেজদি, মেজদি, দিদি, দাদামণি (ভবানীপুর); অজয়কুমার দাস, মাষ্টার মশাই, ছোট ভাই, বাবা, বড়দা, সেজকা, ছোটদা, মিণ্টু, রাঙ্গাদি প্রভৃতি (বালিগঞ্জ); পাঁচুগোপাল, বলাইকুমার, রামপ্রসাদ সিং (বেহালা); জ্যোৎস্না ঘোষ (৯৮১); ছবিরন্নেছা বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দা (মাথাভাঙ্গা); সরোজ, অতুল, মণি, মাণিক, নির্ম্মল, কানাই, রাণী, মৃণালিনী, দাদা (ভাট্টা—পূর্ণিয়া); লতিকা, পমী, লাখা, সবু (রাজসাহী); দীনানন্দ, বিশ্বানন্দ, হীরালাল, শশাঙ্কশেখর বসু (বড়িশা—বেহালা); বাণী, কিকি, খোকা, চেপু, খুকি, বাবা, মা, ঠাকুমা, বিনয়, ভোলাকাকা (চাইবাসা); সুরমা, প্রতিমা, বেলা, সতী, তমাল, বেবী (পাতিহাল); ব্যোমকেশ রাহা (নন্দনকানন—চট্টগ্রাম); অজিত দাশগুপ্ত; মিণ্টু, ফড়িং দ্বিজু, চড়িং (কালিগ্রাম—মালদহ); কামাখ্যাচরণ গুপ্তভায়া (ময়নাগুড়ি); সন্তোষকুমার বসু ও অরুণা (রাণাঘাট); শেফালিকা রায় চৌধুরী (কলিকাতা)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

সুমুখনাথ মিত্র, জ্যোতিঃ, হরি, ভানু, বেণু, লক্ষ্মী, রাণী, গৌরী (দিনাজপুর); জানু, মনু, সুধা, ভুলু, বুদ্ধ, বৈদ্য, সুনীল, পিসেমশাই, পিসীমাগণ, মাষ্টার মশাই (গাইবান্ধা); শ্যামাকান্ত লাইব্রেরীর সেক্রেটারী ও সভ্যবৃন্দ (বজ্রযোগিনী—ঢাকা); প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ); দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর); আজিজ ও সন্তোষ (নলহাটী); শৈলেশচন্দ্র, অনিলচন্দ্র ও নিখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; নিরুপমা, প্রভাবতী ও বিভাবতী দেবী (জলপাইগুড়ি) মোছাম্মাৎ রমিছা খাতুন (শুনকা—হুগলী)।

নূতন প্রশ্ন

(আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

[কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির নাম দিয়া ফাঁক পূরাইতে হইবে।]

বেদে আছে নাম নারী ঋষি রো——র,
নাহি সী——ল বহু গুণের তাঁহার।
——না না পেতে তিনি শুইতেন ঘরে;
তথা——নি যে বিয়ে হ'ল বহু পরে।
এক দিন মালা ——র টোপর
পরিয়ে এলেন —— সম বর।

মা

[বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী র‍্যাফেলের আঁকা]

৭ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ { ৫ম সংখ্যা

নীড়ের মায়া

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

ভুলায় মোরে আমারি এই ভাঙ্গন-ধরা বাড়ী,
তক্‌তকে ওই অজয়-জল, তরুলতার সারি।
সামনে কাশের বন,
দোলায় আমার মন।
আকাঙ্ক্ষা মোর মিট্‌ছে না যে, ছাড়্‌তে তাদের নারি।

আধা চাঁদের আলোকে পাই অমৃতেরি ছিটা ;
গোটা চেয়ে মধুর এ যে ভাঙ্গা ক্ষীরের পিঠা।

ভাঙ্গা চাকেই শুধু
উপ্‌ছে পড়ে মধু,
ভাঙ্গা ভিটাই আমার কাছে লাগ্‌ছে অধিক মিঠা।

অজয়-জলের অমৃতে হায়, হয় না কিছুই হারা,
ঝর্‌ছে সুধা প্রাণের কাণে পাচ্ছি তাহার সাড়া।
যায় নি কিছুই দূরে
আসছে সবই ঘুরে,
লক্ষ্মী আসেন, দিচ্ছে নদী আল্‌তা-দুধের ধারা।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

১১

তার পরে তাসের ম্যাজিক,—আরো কত কি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক রাত হয়ে গেল। এই বার লোকটা সবার কাছে একটা করে পয়সা চাইতে লাগ্‌ল। অনেকে দিল, অনেকে দিল না। লোকটা কাঞ্চনের কাছে কিছু চাইল না, চাইলে বোধ হয় সে আনিটা দিয়ে দিত।

খেলা ভেঙে গেলে সবাই চলে গেল। ভেল্‌কিওয়ালা তার জিনিসপত্র গুছোতে লাগ্‌ল—তার ছেলে তাকে সাহায্য করছিল। কাঞ্চন তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল—'আমাকে নেবে তোমার দলে? আমি ম্যাজিক শিখ্‌ব।'

ভেল্‌কিওয়ালা বল্লে—'বেশ শেখাব তোমাকে। আমার সঙ্গে যাবে?'

কাঞ্চন উৎসাহিত হয়ে বল্লে—'এখুনি।'

লোকটা বল্লে—'তোমাকে এই পোষাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আমাকে পুলিস পাক্‌ড়াবে। তোমার জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি-পিরাণ পরতে হবে—পারবে ত?'

'খুব। দাও না একটা লুঙ্গি, আমি এখুনি পরছি।'

'এখন নয়। এখানে লোকজন তোমাকে পরতে দেখ্‌বে। কাল সকালে আমার আস্তানায় যেয়ো। এই রাস্তা ধরে সোজা গেলে সিঁদুরিয়াপট্টি,—সেখানে ইউসুফ্‌ ভেল্‌কিওলার নাম করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে। কাল সকালে যেয়ো।'

লোকটা চলে গেল। কাঞ্চন তাকে জানাল কাল ভোরে সে নিশ্চয় যাবে।

সামনের দোকানের ঘড়িতে কাঞ্চন দেখ্‌ল এগারোটা। ওঃ, অনেক রাত হয়ে গেছে। এ পর্য্যন্ত সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিল। উদরের মধ্যে একটা তীব্র ক্ষুধার প্রেরণা এতক্ষণ পরে সে অনুভব কর্‌ল। অবিলম্বেই কিছু খাওয়া তার দরকার।

একটা মিঠাইওয়ালার দোকানে গিয়ে সে বল্ল—'ও গুলো কি তোমার? লুচি ত? দাও না চার পয়সার।'

'পুরী নেহি—উ কচৌরি।'

'দাও কচৌরিই দাও। চার পয়সার।'

মিঠাইওয়ালা তাকে একটা ঠোঙ্গায় ক'রে দু'খানা কচুরি আর একটুখানি আলুর তরকারী দিল। তার পর আনিটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—'তুম্‌ হিন্দু।'

'হাঁ।'

ঠোঙ্গাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আনিটা ফেরৎ দিয়ে বল্ল—'ই আনি নেহি চলে গা। সিসা হ্যায়।'

'বা রে!' কাঞ্চনের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।

'ঠক্‌লানেকা জায়গা নেহি মিলা?' বলে মিঠাইওয়ালা তাকে অনেক গালমন্দ দিল। একমুহূর্ত্তে চারি ধারে অনেক লোক জমে গেল। একে দারুণ ক্ষুধা, তার ওপরে এত লোকের সামনে অপমান—কাঞ্চনের চোখ ফেটে জল আস্‌বার মত হ'ল। সে আর সেখানে দাঁড়ালো না।

খাওয়া না হয় নাই হ'ল, শোয়া তো দরকার। কিন্তু কোথায় শোবে?

এত রাত্রে কার বাড়ী আশ্রয় পাবে? তা ছাড়া খাওয়াই হোক্ আর স্থানই হোক্—কিছু ভিক্ষা করতে তার ভারী লজ্জা করে। 'আমাকে কিছু খেতে দেবে? শোবার জায়গা দেবে?' এ কথা মুখ ফুটে বল্‌তে তার মাথা কাটা যায়। সে ভাব্‌লে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেই আজ রাতটা কাটাবে।

কিন্তু ঘোরেই বা আর কতক্ষণ? আজ সকাল থেকে সমস্ত দিনই তো ঘুরছে। তা ছাড়া, ঘুমে তার সমস্ত শরীর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছিল।

কাঞ্চন দেখ্‌ল, দু' ধারের ফুটপাথে বিস্তর লোক শুয়ে আছে। যত দূর সে হাঁট্‌ল দেখ্‌ল কেবল লোক আর লোক। এদের বোধ হয় ঘর বাড়ী নেই—এরা বোধ হয় পথে শুয়েই জীবনটা কাটায়। সেও কেন না ফুটপাথে শোবে?

কাঞ্চন একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কাল রাত্রে বিয়েবাড়ীতে কি আরামেই না কেটেছে। আর আজ এই ফুটপাথে!

'এ কে এখানে?'

এক জন ভদ্রলোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কাঞ্চনকে সেখানে শয়ান দেখে বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করলেন।

কাঞ্চন ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল—'আমি।' তার কথোপকথনের বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

'তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এখানে শুয়ে? এস, আমার সঙ্গে এস।'

অগত্যা কাঞ্চন উঠ্‌ল। বল্ল, 'কোথায় শোব? আমার শোবার জায়গা নেই।'

'রাস্তায় যত ছোট লোকে শোয়, তাদের সঙ্গে—ছিঃ! তুমি এস আমার সঙ্গে।'

কাঞ্চন ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। যাক্, তা হলে সত্যিই ভগবান্ আছেন! একটু আগেই ভগবানের ওপর তার যা অভিমান হচ্ছিল। এই ত তিনি আজ রাত্রের মত খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন!

আর কত দূর হাঁট্‌তে হবে? ভদ্রলোকের বাড়ী কত দূর আর? কাঞ্চনের

পা চলে না, তবু গরম ভাত আর উষ্ণ বিছানার লোভে কোন রকমে সে হাঁট্‌ছিল। ভদ্রলোক যা তাড়াতাড়ি চলেন! কাঞ্চনকে তাঁর সঙ্গে প্রায় দৌড়োতে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা পার্কের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক থাম্‌লেন। বল্লেন, 'পার্কের গেট্ যে বন্ধ দেখ্‌ছি। যাক্ গে, তুমি টপ্‌কে যাও।'

'টপ্‌কে! কেন?' কাঞ্চন অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রলোক আবার বল্লেন—'ভেতরে যাবে কি করে? গেট্ যে বন্ধ। টপ্‌কে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওঠ, আমি ধরছি তোমাকে।'

রেলিংএর ওপর দিয়ে কাঞ্চনকে পার্কের ভেতরে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন—'ওই যে সব বেঞ্চি দেখ্‌ছ? ওই বেঞ্চে গিয়ে শুয়ে থাকো। কোন ভয় নেই, কেউ কিচ্ছু বল্‌বে না।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। কাঞ্চন অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার পর পার্কের ভেতরের পুকুরে গিয়ে এক পেট জল খেল। খেয়ে বেঞ্চিতে এসে শুয়ে পড়্‌ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—

কালকের ভোজটা কেমন!

মিনি মেয়েটা বেশ—কিন্তু তার ছোড়দা—

সি, আর দাশ—সিল্কের চাঁদর—পকেট-কাটা—

মাম্‌লেট্—হাওড়া ষ্টেশন—টিঞ্চার আয়োডিন—

তার পর সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

১২

—'ওহে ওঠো ওঠো, এটা ঘুমোবার জায়গা নয়! আরে, এর ঘুম যে ছাই ভাঙে না, কোথাকার আপদ্!'

কাঞ্চন তখন প্রকাণ্ড ভোজে বসে গেছে। লুচি, পোলাও পায়েস, সন্দেশ—নানাবিধ খাদ্য! পরিবেষণ করছে আবার মিনি! কিন্তু খাবারও যেমন ফুরোয় না, তার খাওয়াও তেমনি শেষ হয় না!

কিন্তু প্রচণ্ড তাড়নায় তাকে চোখ খুল্‌তে হ'ল।

'বাবা! কি ঘুম তোমার! কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়!'

কাঞ্চন দেখ্‌ল সকাল হয়ে গেছে, রোদ উঠেছে এবং তার অব্যবহিত সামনে একজন বৃদ্ধ লোক অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে দাঁড়িয়ে বক্‌ছেন। চোখ রগ্‌ড়ে উঠে সে বেঞ্চির এক ধারে বস্‌ল।

ভদ্রলোক বকে চল্লেন—'সকালে কি পড়ে পড়ে ঘুমোয়? ভোরে ধীর হাওয়া বয়, গায়ে লাগালে জোর বাড়ে। আজকালকার ছেলেরা যেন কী! আমার পঁয়ষট্টি বছর বয়স, সেই প্রত্যূষে উঠে বেরিয়েছি, আর এই সব জোয়ান্ ছোক্‌রা কোথায় মাঠে ছুটোছুটি করবে, না—'

কাঞ্চন তাঁর বকুনি থেকে পরিত্রাণ পেতে সেখান থেকে উঠে পুকুরে মুখ ধুতে গেল।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ঘাটের পঁইঠা থেকে এক দৌড়ে কাঞ্চন একেবারে ফুটপাথে। কাল যাদের সঙ্গে কাঞ্চন প্যারেড্ করেছিল সেই দলটাই,—কিন্তু এবার তাদের আগে ও পিছনে অনেক কনেষ্টবল।

'বাঃ, আজ্‌কে যে দেখ্‌ছি পুলিসরাও ওদের সঙ্গে মার্চ্চ্ করছে। ওরাও গান্ধীর দলে ভিড়ে গেল নাকি?'

'নাহে, না, ওদের ধরে নিয়ে চলেছে থানায়।'

কাঞ্চনের প্রশ্নের জবাব যে দিল সেও ছেলেমানুষ, তার চেয়ে দু'-চার বছরের যদি বড় হয়। কাঞ্চন তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'থানায় নিয়ে চলেছে, তুমি কি করে জান্‌লে?'

'আমি জিজ্ঞাসা করলুম যে। ওর মধ্যে আমার বন্ধু আছে, ওই যে মাঝখানে, গায়ে লাল খদ্দর, ও। আজ খুব ভোরে কংগ্রেস-আপিসে খানাতল্লাসী হয়ে গেছে, ওদের সবাইকে প্রেপ্তার করেছে।'

ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে কি করবে?'

'জেলে দেবে।'

'জেলে? তা হলে তো ভারী বিপদ্! আমি শুনেছি জেল ভারী খারাপ জায়গা, ভারী ভয়ের।'

'কেন, আমি তো জেলে ছিলুম, কাল সন্ধ্যায় ছাড়া পেয়েছি।'

কাঞ্চন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল,—এ ছেলেটা বলে কি? তারা দু'জনে পার্কের মধ্যে এসে নরম ঘাসে এক জায়গায় বস্‌ল। ছেলেটা তার কারাবাসের কাহিনী বলে চল্‌ল, কাঞ্চন হাঁ করে শুন্‌তে লাগ্‌ল। সেই জেলে আগে সব চোর ডাকাত খুনে বদমায়েস থাক্‌ত, তাদের খালি করে মফঃস্বলের জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে, এখন কেবল কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার—তারাই থাকে। গল্প চলে, কাঞ্চন আর বিস্ময় চেপে রাখ্‌তে পারে না, সে বলে উঠ্‌ল—'বল কি? একটা গোটা নিমগাছ সবাই মিলে দাঁতন করে ফেল্‌ল?'

'ফেল্‌বে না? আমরা চার হাজার লোক আছি যে, তার মধ্যে ছেলে ছোক্‌রাই বেশী। সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সবাই নিমগাছে উঠে বসি,—আমাদের দাঁতন করতে হবে তো?'

'তা বলে একটা গোটা নিমগাছ?'

'চার হাজার লোক দাঁতন করলে একটা নিমগাছ আর ক'দিন টেঁকে?'

'ভারী আশ্চর্য্যি তো!'

কাঞ্চন মনে মনে ভাবে, কিন্তু ভাব প্রকাশের ঠিক কথাটি খুঁজে পায় না। অনেকক্ষণ পরে কথাটা পেয়ে অন্য গল্পের মাঝখানেই বলে উঠে—'কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা, সব সমেত?'

গল্পে বাধা পড়ায় এবার ছেলেটা একটু বিরক্ত হয়। বলে—'বড় বড় শাখা-প্রশাখা কি আর, ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা। শুঁড়িটাও বাদ।'

ছেলেটা বলে চলে—'সমস্ত দিন আমরা হৈ চৈ করে স্ফূর্ত্তি করে ঘুরে বেড়াই—অবশ্যি জেলের মধ্যে। বাইরে তো যেতে দেয় না। আর রাত্রে কেবল ঘরে পুরে রাখে। আমরা থাকি এক ধারে, দাশ-মশাই থাকেন আরেক ধারে।'

সি আর দাশ! তিনিও জেলে? কাঞ্চনের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ছেলেটা চলে গেলে কাঞ্চন নরম ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ তার কথাগুলো ভাব্‌তে থাকে।

কিন্তু চিন্তা করা কাঞ্চনের পোষায় না, বিশেষতঃ পেটের মধ্যে ক্ষিদে নিয়ে। কাল রাত্রে যে খাওয়া হয়নি এত বড় কথাটা এমন গল্পের মধ্যিখানে এতক্ষণ

কাঞ্চনের মনে পড়ে নি, কিন্তু সেই কথাটাই এখন তার উদরের মধ্যে একমাত্র কথা হয়ে উঠ্‌ল। আচ্ছা, জেলখানায় খেতে দেয় ত? খেতে দেয় নিশ্চয়, নইলে লোকগুলো কেবল নিমগাছের ছোট খাট শাখা-প্রশাখা চিবিয়েই কিছু আর বাঁচে না।

কিন্তু জেল তো পরের কথা, কি খেয়ে আপাততঃ বাঁচে কাঞ্চন?

কি করে কাঞ্চন—কোথায় যায়? কাল সকালে যে চমৎকার ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার কথা কাঞ্চনের মনে পড়্‌ল। ভদ্রলোক বলেছিলেন—এই আমার কার্ড্‌ রাখো, এতে আমার নাম ঠিকানা আছে। কখনো অসুবিধায় পড়লে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

কাঞ্চন ভেবে দেখ্‌ল, আজকের এই অবস্থাটাকে অসুবিধাই বিবেচনা করতে হবে। খালি পেটে থাকার চেয়ে মারাত্মক অসুবিধা আর কি হতে পারে? এ রকম অসুবিধায় কাঞ্চন এর আগে আর কখনো পড়ে নি। বাড়ীতে এতক্ষণ তার তিন বার খাওয়া হয়ে যেত।

কিন্তু সেই কার্ড্‌খানা? পকেটেই তো ছিল,—কিন্তু কই? যাঃ, হারিয়ে গেছে! তা হ'লে আর যাবে কি করে? উৎসাহে কাঞ্চন উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার মুহ্যমান হয়ে বসে পড়্‌ল।

পেটের মধ্যে যেন সূচ ফুট্‌ছে।

মিনিদের বাড়ী যাবে? সেখানে হয়ত আজ বৌভাত, আজও খুব খাওয়া-দাওয়া। সেখানে গেলেই তো হয়। সেই বেশ। তাদের বাড়ী চিনে যাওয়া বোধ হয় খুব শক্ত হবে না।

মিনিদের বাড়ীর দোর-গোড়ায় সেই এঁটোপাতার জঞ্জাল। ভিখিরীরা তার থেকে লুচি, তরকারী, সন্দেশের টুক্‌রো বেছে জড় করছে। সেই স্তূপীকৃত ভুক্তাবশেষ কাঞ্চন মানসচক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

আর যদি সেখানে আজ বৌভাত না থাকে? নাই থাক্‌ল কোন ভোজ, সে মিনিকে ডাক্‌বে। ডেকে বল্‌বে তাকে। মিনি তার ছোড়দার মত কি ভোম্বলের মত নয়, সে নিশ্চয় তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াবে। মিনি তার চওড়া

বুকের প্রশংসা করে। মিনিকে সে পাঞ্জা কষ্‌তে শিখিয়ে দেবে, ছেলেদের জব্দ করার আরো কুত্‌ রকম প্যাঁচ আছে, সব শিখিয়ে দেবে। হ্যাঁ।

মিনির কাছে গিয়ে যদি তাকে শেখানোর এই প্রস্তাব করে সে নিশ্চয়ই ভারী খুসী হবে। তাকে নিশ্চয়ই বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাবে, তাদের মার কাছে। তাদের মা না জানি কি রকম! তার মার মত কি? খেতে সে চাইবে না, কিন্তু না চাইলেও মিনি জোর ক'রে তাকে খাওয়াবে। নিশ্চয়।

হ্যাঁ—তাই ত! ঠিক হয়েছে তবে! আজ সকালেই তো সে স্বপ্ন দেখেছে মিনি তাকে খাওয়াচ্ছে। মা বলেন, ভোরের স্বপ্ন ভারী সত্যি হয়।

কাঞ্চন উঠে দাঁড়াল। স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে তিলমাত্র বিলম্ব তার সইছিল না। সে পার্ক্‌ থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। (ক্রমশঃ)

বড় লোকের খেয়াল

(আবুল ফজল)

দানুৎসিও (D'Annunzio)—

ইউরোপের মানচিত্র খুল্‌লেই আল্পস্‌ পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে ক্ষুদ্র একটী সরু দেশ কুমীরের মত ভূমধ্য-সাগরের দিকে নেমে এসেছে দেখ্‌তে পাবে। ওই দেশের নাম হচ্ছে ইটালী। ইটালীর মস্ত বড় লোক হচ্ছেন মুসোলিনি। মুসোলিনি রাজা না হ'লেও রাজার মত ক্ষমতাশালী—মুসোলিনির হুকুমে রাজ্য চলে, তাঁর কথা ওদেশের রাজাকেও মান্‌তে হয়। এই মুসোলিনির মস্ত বড় বন্ধু হচ্ছেন দানুৎসিও। দানুৎসিও ইটালী দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক; তিনি কবিতা লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, আরও কত কি! তিনি যে শুধু খুব বড় লেখক তাই নয়, বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি বিপুল পরাক্রমে অনেক যুদ্ধও করেছেন। দানুৎসিও এখন বুড়ো হয়েছেন—খুব বুড়ো—কিন্তু তিনি মানুষের মাঝে মানুষের সঙ্গে বাস করতে ভালবাসেন না।

এখন গত ক' বছর ধরে তিনি এক নির্জ্জন ঘরে একাকী বাস করেন। মুসোলিনি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁকে এক বড় বাড়ী দিয়েছেন। এখন সে বাড়ীর চার দিকে বন্দুক কাঁধে সৈন্যেরা দিনরাত পাহারা দেয়; কা'কেও তারা দানুৎসিওর সঙ্গে দেখা করতে, এমন কি তাঁর ঘরে ঢুক্‌তে পর্য্যন্ত দেয় না। দানুৎসিও এই আত্ম-নির্ব্বাসন অবলম্বন ক'রে নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন—তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না, কারও চিঠির উত্তর দেন না, প্রতি দিন ডাক আসার পর অ-পঠিত চিঠিগুলি জড় ক'রে জ্বালিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন, তাঁর 'ভিলা'র বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জান্‌বার প্রয়োজন তাঁর নেই এবং কারও মিনতি, রাগ বা বিদ্রূপকে তিনি থোড়াই কেয়ার করেন।

* * *

বার্ণার্ড্ শ'—

বিলেতের বড় লিখিয়ে বার্ণার্ড্ শ'র নাম শুনেছ? এ আর এক অদ্ভুত বুড়ো! কেউ কেউ এঁকে বিশ্বনিন্দুক বলেন,—চুল-দাড়ি পেকে একেবারে তূলোর মত সাদা হয়ে গেছে, তবুও বুড়োর সে কী বিদ্রূপ-বাণ! ভদ্রলোকের অদ্ভুত ক্ষমতা—এমন সুন্দর ভাবে গাল দেন যে যাকে গাল দেন সেও তা শুনে না হেসে থাকতে পারে না। গাল খেয়েও কেউ ওঁর ওপর এতটুকু রাগ করে না। রাগ করবে কি? ওঁর লেখা পড়ার জন্য, ওঁর কথা শুন্‌বার জন্য পৃথিবীশুদ্ধ লোক পাগল,—কবে কোন্ বইএর দোকানে হয়ত এক লাইন কি দু' লাইন কার্ড্ লিখেছেন, তা পড়বার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ছুটোছুটী লাগিয়ে দেয়!

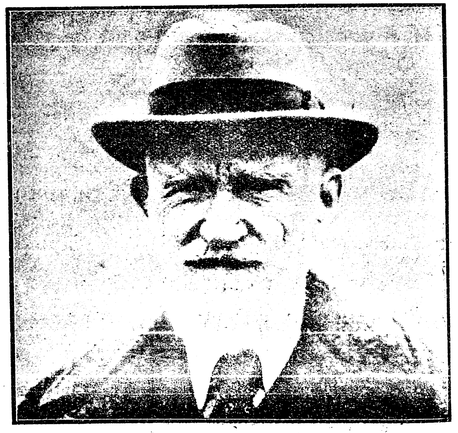

বার্ণার্ড্ শ'

শ' যখন স্কুলে পড়তেন তখন তিনি নাকি মোটেও ভাল ছাত্র ছিলেন না। তিনি নিজে নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত অলস ও অপদার্থ ছিলেন। সত্যি, ভেবে কি আশ্চর্য্য হ'তে হয় না? সে দিনের সেই অলস ছাত্র আজ পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লেখক! লণ্ডনের ওপর তিনি হাড়ে চটা—লণ্ডনের লোকদের তিনি মোটেও দেখ্‌তে পারেন না। যৌবনে তাঁর একবার খেয়াল চাপ্‌ল,—বক্তৃতা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে তিনি লণ্ডনের লোকগুলিকে একটু 'ভদ্র' ক'রে তুল্‌বেন। যেই খেয়াল হওয়া অম্‌নি সংবাদ-পত্রে লম্বা লম্বা উপদেশ ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন আর রাস্তায়, পার্কে, মোড়ে যেখানে সুবিধা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে লাগ্‌লেন। রাস্তায় এম্‌নি ভাবে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া বে-আইনী—কারণ রাস্তার ওপর লোক জমে গেলে মানুষের ও গাড়ী-ঘোড়ার চলাফেরার খুব অসুবিধা হয়। পুলিশ কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসে তাঁর হাসিঠাট্টা ও রসিকতায় গ্রেপ্তার করবে কি, মুগ্ধ হয়ে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই অদ্ভুত লোকটী বিলেতের লোক হয়েও প্রতিজ্ঞা করেছেন দাড়ি-গোঁফে ক্ষুর ব্যবহার করবেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই প্রতিজ্ঞা তিনি পালনও করেছেন। ধূমপান তিনি কোন দিন করেন না—মদ ইত্যাদি অন্যান্য মাদক দ্রব্যও কোনদিন স্পর্শ করেন নি এবং আজীবন নিরামিষভোজী। লেখেন তিনি বাসে ও ট্রেনে চল্‌তে চল্‌তে—তাও আবার শর্ট্ হ্যাণ্ডে!

মেজ-দা'র কাণ্ড

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

আমার মেজ-দা' বড় ভালো মানুষ। ওকালতি করেন, কিন্তু মনটি একেবারে সরল। মুখে হাসি লেগেই রয়েছে। পসার জমে নি; কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয় খুবই সুখে আছেন।

বর্দ্ধমানে তিনি থাকেন। কিসের জন্য কলেজ দু'দিনের ছুটি—তাঁর কাছে বেড়াতে গিয়েছি। বাইরের ঘরে তাঁর চাকর তক্তপোষের উপর গ্যাঁট হয়ে ব'সে হুঁকো টানছিলো, আমাকে দেখে খাতির ক'রে উঠে দাঁড়ালো। হুঁকো-শুদ্ধ হাতটা পিছনে লুকিয়ে বললে, 'আসুন।'

লোকটার বে-আদবিতে সমস্ত শরীর জ্বলে গেলো। ভিতরে গিয়ে এ-কথা সে-কথার পর বললুম, 'মেজ-দা', রামকান্তকে তুমি একেবারে মাথায় তুলেছো দেখছি।'

মেজ-দা' শশব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'কেন, কেন, ও করেছে কি ?'

তোমার বাইরের ঘরের তক্তপোষে ব'সে হুঁকো টানছিলো।'

মেজ-দা' হেসে ফেললেন।—'ও, এই ! আমি ভাবলুম, কী না জানি করেছে ! ব্যাটার তো আবার কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

'কাণ্ডজ্ঞান যে নেই সেটা তো চোখেই দেখলুম। তুমি যদি বলো, আমি ওকে একদিনে ঠিক ক'রে দিতে পারি।'

'না, না, তোকে কিছু করতে হবে না। আর ও এমন দোষই বা কি করেছে ? এত খাটতে হয়, একটু তামাক খাবে না ?'

'কিন্তু তোমার ঐ তক্তপোষে—'

'ওঃ, ভারী তো ! রাজ্যের যত নোংরা মক্কেল এসে তো বসে ওখানে—তাদের তুলনায় রামকান্ত তো ফিটফাট বাবু।'

সে-কথা ঠিক। মক্কেলের তুলনায় শুধু নয়, অনেক সময় মেজ-দা'র পাশে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলেও ওকেই মনে হবে বাবু। ওর গেঞ্জি আর কাপড় দিব্যি পরিষ্কার, মাথায় প্রকাণ্ড টেড়ি। বেরোবার জন্য চক্‌চকে বার্নিশ করা জুতোও আছে এক জোড়া—ভিতরে ঢোকবার আগে বাইরের ঘরের তক্তপোষের নীচে ছেড়ে আসে।

আমি বললুম, 'তুমি ওকে এত জামা-কাপড়ই বা দান করতে যাও কেন ?'

'পাগল ! দান কোত্থেকে করবো ?'

'না, ঐ ফিনফিনে ধুতি ও নিজের পয়সায় কেনে ?'

'তা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কী আর হবে ? আর এত দিন একটা লোক আছে বাড়ীতে—না হয় মাঝে মাঝে দিলুমই।'

এর পর আমি চুপ ক'রে রইলুম। আমি জানতুম মেজ-দা'র বেশীর ভাগ কাপড় একটু পুরোনো হ'লেই রামকান্তর কাছে যেতো। রামকান্ত যে তাঁদের জন্য বাসন মাজে আর জল তোলে এতে মেজ-দা' মনে মনে তার কাছে অপরাধী হ'য়ে আছেন যেন ; নানা ভাবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন।

বৌদি বললেন, 'এ-সব কথা আর বলো কেন ঠাকুর-পো ! বছরের মধ্যে একটা ছেঁড়া কাপড় চোখে দেখা যায় না—অথচ ছেলেপুলের ঘরে ছেঁড়া কাপড়ের কত যে দরকার—'

মেজ-দা' বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'হয়েছে, হয়েছে—তুমি থামো তো।'

বৌদি বললেন, 'বলবোই বা কী ! তবু রামকান্ত এক রকম গা-সহা হ'য়ে গেছে—কিন্তু এই যে সেদিন কানাই এসে স্যুটকেস্-শুদ্ধ চুরি ক'রে নিয়ে গেলো তারই বা কী খেয়াল আছে ?'

আমি চমকে উঠলুম।—'কানাই ! ও আবার এসেছিলো নাকি ?'

মেজ-দা' মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললেন, 'আহা, বড় কষ্টে পড়েছে ছেলেটা। জামা-কাপড়ের দরকার ছিলো—না হয় নিয়েই গেছে। দরকার ছিলো ব'লেই তো নিয়েছে। দেখো না—ইচ্ছে করলে আরো কত-কিছু তো নিতে পারতো—তা তো আর নেয় নি।'

আমি বৌদির দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কি হয়েছিলো বলো তো ?'

বিশেষ কিছু নয়। মাস খানেক আগে কানাই এসে কয়েক দিন ছিলো—সে চলে যাবার পর একটি স্যুটকেস্ বাড়ীতে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে ছিলো দাদার গোটা দুই সিল্কের পাঞ্জাবি, এক জোড়া তাঁতের ধুতি, আর উড়ুনি—আর ছেলেপুলেদের অনেক খুচরো পোষাক। সব চেয়ে মজা এই, ছেলেপুলেদের জামাগুলো সারা বাড়ীতে ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো।

মেজ-দা' বললেন, 'দেখলে ! ওর যদি চুরি করবারই মৎলব থাকতো তা হ'লে ওগুলোও নিয়ে যেতে পারতো তো ?'

রাগে সমস্ত শরীরে যেন আলপিন ফুটতে লাগলো, কিন্তু একটুও অবাক্ হলুম না। এ-রকম কিছু না হ'লেই বরং অবাক্ হতুম। কানাইকে কে না চেনে! ও আমাদের দূর সম্পর্কের কি রকম ভাগ্নে হয়। জন্ম-বয়াটে। কুড়ি বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছু করে নি, কোনোদিন কিছু করবে এমন লক্ষণও নেই। নিকট ও দূর যত রকমের যত আত্মীয় আছে প্রত্যেকের বাড়ী ঘুরে ঘুরে ওর জীবন কাটে। অন্ততঃ আগে কাটতো। এখন এমন হয়েছে যে বেশীর ভাগ বাড়ীর দরজাই ওর পক্ষে বন্ধ। নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে বেছে বেছে ওর পছন্দমত জিনিস তুলে নিয়ে আসে। আর যাদের বাড়ী তারা অবশ্য সেটা পছন্দ করে না। ও কোনো ঘরে ঢুকলেই চার দিকে সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে—যতগুলো সম্ভব চোখ ওকে পাহারা দেয়। সব জায়গাতেই আমি এই রকম দেখেছি—এক আমার মেজ-দা'র বাড়ীতেই দেখলুম অন্য রকম।

গম্ভীর মুখে বললুম, 'না, মেজ-দা, এটা তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। নিজের জিনিস তুমি ফেলবে, ছড়াবে, যা খুসী করবে—কিন্তু চুরির প্রশ্রয় কি ব'লে দাও?'

'আহা, তোরাও যেমন! একে কি আর চুরি বলে? মুখ ফুটে চেয়ে নিতে লজ্জা করলো—এই না? তা নিয়েছে তো নিয়েছে, এখন চেঁচামেচি করলে লাভ হবে কিছু? আর ও-সব সৌখীন জামা-কাপড় আমি পরতুম নাকি কখনো? ও ছেলেমানুষ, তবু যা হোক্ ওর সখ মিটলো।'

এমন লোকের সঙ্গে কে কথা কইবে! সংক্ষেপে বললুম, 'যা-ই হোক্, কানাইকে আর কখনো ঢুকতে দিয়ো না বাড়ীতে।'

'পাগল! ও আর আসতেই গেছে। হাজার হোক্, মনে তো একটা—'

আমি বললুম, 'হ্যাঁঃ, খুব তুমি কানাইকে বুঝেছো। ওর মনে যদি লজ্জাই থাকতো তা হ'লে তো ও মানুষই হ'তো। দেখবে কালই হয়-তো এসে উপস্থিত হবে।'

যা বলেছিলুম। পরের দিনই শ্রীমান্ কানাইয়ের সশরীরে আবির্ভাব। আর সে শরীরে শোভা পাচ্ছে মেজ-দা'র শান্তিপুরে ধুতি, মেজ-দা'র সিল্কের পাঞ্জাবি। হাতে মেজ-দা'র সেই স্যুটকেস্—দেখেই বোঝা যায় সদ্য রঙ্ করিয়ে নিয়েছে।

আমাকে দেখেই কানাই এক গাল হেসে ফেললো।—'কী হে, কী খবর? কেমন আছো?' বলতে বলতে আমার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি।

ইচ্ছে হ'লো, দু' কান ধ'রে টানতে-টানতে ওকে বাইরে নিয়ে যাই, তার পর মনের কথাটা খুলে বলি। কিন্তু এমন সময় মেজ-দা' এসে পড়লেন।—'আরে এসো, এসো। সেবার অমন না বলে-কয়ে কোথায় চলে গেলে? আছো তো ভালো?'

কানাই মেজ-দা'র পায়ের কাছে ঢিপ্ ক'রে একটা প্রণাম ক'রে বললে, 'আজ্ঞে ভালোই আছি। ইছাপুরের বন্দুকের কারখানায় একটা চাকরি করছি আজকাল। আপনাদের দেখতে এলুম।'

মেজ-দা' বললেন, 'বাঃ, বেশ। যা হোক্ একটা সুরাহা হ'লো এতদিনে।'

কানাই সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে আপনাদের আশীর্ব্বাদ। এই চাকরির খবর পেয়েই তো সেবার অমন তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে হ'লো।'

অক্লেশে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গিয়ে কানাই বললে, 'এই যে মামীমা, আমি এসেছি। লুচি ভাজুন। আপনার হাতের লুচি খাবার জন্য মনটা ছটফট্ করছে।' বলে সে রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় উব-হাঁটু হ'য়ে বসে পড়লো। বলতে লাগলো, 'উনুনে ওটা কী? মুড়িঘন্ট? বাঃ, গরম লুচির সঙ্গে বেশ জমবে। ওরে পটলি, মাণিক, ভোলা—এদিকে আয়, লুচি খাবি নাকি?'

পটলি, মাণিক আর ভোলা ছুটে এসে তিনদিক্ থেকে বৌদিকে জড়িয়ে ধরলো।—'মা, লুচি খাবো। লুচি খাবো মা।'

অগত্যা বৌদি কী আর করেন? ব'সে-ব'সে লুচি ভাজতে লাগলেন আর কানাইকে খাওয়াতে লাগলেন।

নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে—কানাই তা-ও ছাড়িয়ে যায়। ওর আস্পর্দ্ধায় স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। মেজ-দা'কে চুপি চুপি বললুম, 'দেখো, এ সহ্য করা যায় না। তুমি বলো, আমি ওকে এমন শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি যে—'

মেজ-দা' তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, ও-সব কিছু করবার দরকার নেই। বেচারার কেউ নেই—মাঝে মাঝে এই আমাদের কাছেই তো আসে। মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? আর এখন ওর চাকরি হয়েছে—এখন তো আর ও কিছু নেবে না।'

চোখ কপালে তুলে বললুম, 'কী যে বলো! সত্যি-সত্যি ওর চাকরি হয়েছে নাকি?'

মেজ-দা' যেন একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন।—'ও খামকা একটা মিথ্যে কথা বলতে যাবে কেন?'

কানাইয়ের চাইতে মেজ-দা'র উপরেই রাগ হ'লো বেশী। এমন মানুষ নিয়ে কী করা যায়! কিছু না ব'লে সেখান থেকে চ'লে এলুম।

দুপুর বেলা সবাই আমরা খেতে বসেছি, বৌদি পরিবেষণ করছেন। দু' ঘণ্টা আগে কানাই লুচি আর মুড়িঘণ্ট দিয়ে প্রচুর জলযোগ করেছে, তবু আহারে তার উৎসাহের কিছুমাত্র অভাব দেখা গেলো না। এক-একটা জিনিস মুখে দেয় আর চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাঃ, খাসা হয়েছে, খাসা হয়েছে। সত্যি মামীমা, কী চমৎকার আপনি রাঁধেন। দেখি ঐ ডালনাটা আর একটু। আর ওজিনিসটা কি—ডিমের বড়া বুঝি? না, থাক্, আর দিতে হবে না।' তার মুখের দু' রকম ব্যবহারই অনর্গল চলছে।

একটু ফাঁক পেয়ে আমি বললুম, 'কানাই, গেলবার তুমি চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ীতে এক কাণ্ড।'

মেজ-দা' হঠাৎ খক্‌খক্ ক'রে কেসে উঠলেন।

আমি বলতে লাগলুম, 'মেজ-দা'র একটা স্যুটকেস্ চুরি গেলো—তাতে ভালো ভালো সব জামা-কাপড় ছিলো।'

কানাই বললে, 'সত্যি? কী সাংঘাতিক! কে করলে চুরি?'

'সে তার নাম-ঠিকানা লিখে রেখে যায় নি তো।'

'আমি থাকলে ঠিক চোর ধ'রে দিতুম, দেখতে।'

'সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তুমি থাকলেই চোর ধরা পড়তো।'

কানাই আমার দিকে একবার তাকালো, তার পর হঠাৎ হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে উঠলো। আমি বাঁ হাত দিয়ে ওর পাঞ্জাবির তলাটা একটু ধ'রে বললুম, 'মেজ-দা,' দেখো তো, তোমার জামাগুলো অনেকটা এই রকমের ছিলো না?'

মেজ-দা' বললেন, 'থাক্, থাক্, ও গেছে তো গেছেই। তুমি ভালো ক'রে খাও, কানাই, লজ্জা কোরো না।'

কানাই এক ঢোঁক জল খেয়ে বললে, 'চাকরি পেয়েই ভাবলুম কিছু জামা-কাপড় করাই, ও-রকম ভ্যাগাবণ্ড্ সেজে থাকতে কত আর ভালো লাগে?'

মেজ-দা' বললেন, 'বেশ করেছো, কানাই, বেশ করেছো। এখন নিজের রোজগার, এখন ইচ্ছে-মত একটু খরচ করবে বই কি।'

তখন আর কিছু বলা হ'লো না, কিন্তু খেয়ে উঠে কানাই বললে, 'এই চারটের গাড়ীতেই আমি যাচ্ছি।'

মেজ-দা' বললেন, 'সে কি! এই তো এলে!'

'না, আজ রাত্তিরে কলকাতায় আমার বড্ড দরকার।' কানাই লম্বা একটা ঢেঁকুর তুলে ফরমায়েস করলে, 'এই পটলি, আরো দু'টো পান নিয়ে আয় তো।—আর হ্যাঁ, মেজ-মামা, একটা কথা। আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছি।'

'জিনিস? কী জিনিস?'

কানাই সলজ্জ হেসে বললে, 'এই প্রথম চাকরি পেলুম—এই স্যুটকেস্‌টা কিনে আনলুম আপনার জন্য।'

মেজ-দা' অপ্রতিভভাবে বললে, 'না, না, সে কি হয়?'

কানাই জোর ক'রে বললে, 'না, না, এ জিনিসটা আপনাকে নিতেই হবে। আমি কিছুতেই ছাড়বো না।'

'কিন্তু ওর ভিতরে তো তোমার জিনিসপত্র—'

'ওঃ! ভারী তো জিনিসপত্র। নেবো'খন খবরের কাগজে মুড়ে।' বলতে বলতে কানাই স্যুটকেস্‌টা খালি ক'রে বার ক'রে আনলো। 'রইলো এটা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। এখন তুমি একটু জিরিয়ে নাও তো গিয়ে।'

পাশের ঘরে গিয়ে বৌদি বললেন, 'দেখলে কাণ্ডটা?'

আমি বললুম, 'যাক্, তবু কিছু ফেরৎ পেলে।'

মেজ-দা' মুচকি হেসে বললেন,—'আর তুই তো মার-ধর করতে চেয়েছিলি। লোককে বিশ্বাস করতে হয়। সবার মধ্যেই ভালো আছে। আমি ঠিক বলতে পারি, ওর মনে এখন অনুশোচনা এসেছে।'

দুপুরবেলা ঘুমের আয়োজন করছিলাম, কিন্তু কানাই বাড়ীতে আছে জেনে

মনে শান্তিও পাচ্ছিলাম না। দু'টো বাজতেই উঠে একবার পা টিপে-টিপে বাইরের ঘরে গেলুম—দেখি, কানাই কি করছে। কিন্তু সেখানে ওকে দেখতে পেলুম না। সারা বাড়ী খুঁজে এসে আবার বাইরের ঘরে এলুম। হঠাৎ চোখে পড়লো, টেবিলের উপর এক টুক্‌রো ভাঁজ-করা কাগজ সযত্নে চাপা দেয়া। উপরে লেখা—'শ্রীযুক্ত মেজ-মামা শ্রীচরণেষু।' খুলে পড়লুম—

শ্রীচরণেষু,

দু'টোর গাড়ীতেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আপনারা সব ঘুমিয়ে আছেন, ডাকাডাকি ক'রে আর বিরক্ত করলুম না। আপনার টেবিলের দেরাজে দশটা টাকা ছিলো, আমি নিয়ে গেলুম। এখন আমার বড্ড টাকার দরকার। সামনের মাসের মাইনে পেয়েই পাঠিয়ে দেবো। আশা করি আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার সহস্র প্রণাম জানবেন। ইতি কানাই।'

চিঠিটা নিয়ে মেজ-দা'কে দিলুম। তিনি চোখ রগড়ে বললেন, 'কী ওটা?'

আমি বললুম, 'কানাইয়ের অনুশোচনা।'

চিঠিটা প'ড়ে মেজ-দা' বললেন, 'টেবিলের দেরাজে টাকা ছিলো নাকি?'

বৌদি বললেন, 'দেখো কাণ্ড! এদিকে কাল আমি মুন্সেফ বাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে আনলুম।'

আমি বললুম, 'কানাই ব্যবসা বোঝে। স্যুটকেস্‌টার দাম নিয়ে গেলো।'

মেজ-দা' বললেন, 'কী যা তা বলিস্! টাকার দরকার কার না হয়? মাইনে পেয়ে ঠিক পাঠিয়ে দেবে।'

বৌদি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হায়রে, ছেলেমানুষও এর চেয়ে বেশী বোঝে।'

সত্যি, মেজ-দা'কে কিছু বলা বৃথা। চলে আসবার আগে বৌদিকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে বললুম, 'দেখো বৌদি, তোমায় একটু শক্ত না হ'লে তো চলে না। যে রকম ব্যাপার দেখছি, কানাইয়ের দেখা আবার যে না পাবে এমন ভরসা করি নে। কিন্তু সেবারই যেন শেষ হয়। বুঝলে?'

বৌদি বললেন, 'আমি কী করতে পারি? তোমার দাদা যদি ওকে সিল্কের জামা আর দশ টাকার নোট উপহার দিতে থাকেন, ও তো পেয়ে বসবেই।'

'না, যেমন ক'রে পারো তোমাকে এটা করতেই হবে। একেবারে বাড়ীতেই ঢুকতে দেবে না—একটা কেলেঙ্কারিও যদি হয় তো হোক্। নয় তো একদিন হয়তো গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে তোমাদের সমস্ত সংসার তুলে নিয়ে যাবে। আর আমার সঙ্গে যদি ওর আবার কখনো দেখা হয়—আমার তো মনে রইলোই।'

ব'লে তো এলুম অনেক কথা, কিন্তু মনে বিশেষ ভরসা পেলুম না। আমারই দোষ হয়েছে—কানাইকে হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছি। কলকাতায় ফিরে এসে অনেক দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে একটা রাগ গজ্‌গজ্ করতে লাগলো। এদিক্-ওদিক্ তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে চলি—যদি দৈবাৎ কখনও ভিড়ের মধ্যে কানাইকে দেখতে পাই। কলকাতাতেই ও থাকে, তবে কোথায় থাকে কেউ জানে না।

যা-ই হোক্, কানাইয়ের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম এমন সময় হঠাৎ একদিন মেজ-দা'র এক চিঠি। লিখেছেন—'একটা দরকারে তোমাকে লিখছি, তুমি চিঠি পেয়েই তা করবে। কানাই মাঝখানে এসেছিলো, ওর হাতে আমি আমার সোনার ঘড়িটি কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। ঘড়িটার মেরামৎ দরকার—কথা ছিলো ও কলকাতায় পৌঁছেই সেটি তোমার বৌদির দাদার কাছে দিয়ে আসবে। আমি ইচ্ছে করেই ওর সঙ্গে দিয়েছিলুম—ইচ্ছে ক'রেই ওকে বিশ্বাস করেছিলুম—ও সত্যি-সত্যি ভালো কি মন্দ তাই দেখবার জন্যে। আমার ধারণা ছিলো, একজনকে বিশ্বাস করলেই তার ভিতরকার ভালো আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আট-দশ দিন হ'য়ে গেলো—ঘড়ির কোনো খোঁজ পেলুম না। তার পর বৈকুণ্ঠ বাবুকে চিঠি লিখে জেনেছি তিনি ঘড়িটা পান্‌ই নি। কানাই শেষ পর্য্যন্ত এ রকম করবে ভাবতে পারি নি। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে সেই জামা-কাপড়গুলো ও চুরিই করেছিলো; আর সেই দশ টাকা নিয়ে ফেরৎ দেবার উদ্দেশ্যই ওর ছিলো না। যা-ই হোক্, এখন তুমি যদি ওকে খুঁজে বার করতে পারো—এই ভরসা। রাগারাগি কোরো না, ওকে মিষ্টি ক'রে ঘড়িটা ফিরিয়ে দিতে বোলো; ওর দরকার থাকলে আমি না হয় ওকে কিছু টাকা দিতে পারি। কি করতে পারলে শীগ্‌গিরই জানিও।'

কলকাতার জনারণ্যে কানাইকে যদি বা খুঁজে বার করতে পারি, ঘড়ি খুঁজে পাবো না এটা নিশ্চিত জানতুম। আর মেজ-দা'কে চিঠির উত্তরে কী লিখবো তা অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করতে পারলুম না।

'শ্যাওলা' থেকে মানুষ!

(শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

"গাঁজা, নিতান্ত গাঁজাখুরি কথা—আপনাদের বিজ্ঞানটাই গাঁজাখুরি"। এক নিঃশ্বাসে যিনি সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের এত বড় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে ফেল্‌লেন তিনি আর কেউ নন—আমাদেরই একজন সাহিত্যিক বন্ধু। এ বন্ধুটীর বিজ্ঞানের উপর খুব ঝোঁক—কিন্তু ছেলেবেলা বিজ্ঞানের ধার দিয়েও না যাওয়ার কষ্টটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আজ তিনি ডারউইনের বানরের পূর্ব্বপুরুষ থেকে মানুষ হওয়ার কথা পড়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন—"এও কি সম্ভব?" আমি তাঁকে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলুম, "খুবই সম্ভব—শ্যাওলা থেকেও মানুষের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।" তাতেই বন্ধুবরের এই উত্তর।

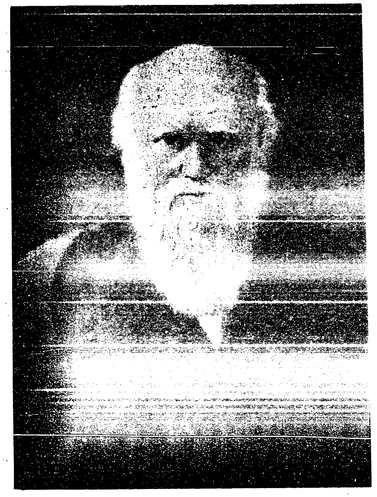

ডারউইন

বাস্তবিকই কিন্তু আমি নেহাৎ বাজে কথা বলি নি। বিজ্ঞান আজকাল এই বলতে চায়—এমন কি আরও বেশী

কিছু বলতে চায়—যা তোমরা আজ কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। সেই 'বেশী কিছু'টা তোমাদের আর একদিন বল্‌ব।

আমাদের বহু বহু পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদের মত এ রকম ঘর-বাড়ী তৈরী ক'রে সহরে থাকত না—জান নিশ্চয়। প্রথমে তারা ছিল 'অসভ্য'—চাষবাস কিছুই জান্‌ত না—কাঁচা মাংস খেত—গুহায় থাক্‌ত। কিন্তু মানুষের সঙ্গে অন্য জীবের তফাৎ এই যে তাদের বুদ্ধি আছে, তারা ক্রমাগতঃ নিজেদের উন্নতির চেষ্টা করে। এই উন্নতি করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ভাবতে শিখ্‌ল।

এই আদিম 'সভ্য' মানুষদের মধ্যে দু'ধরণের লোক দেখা গেল। এক দল বেঁচে থাক্‌তেন শিকার ক'রে—অন্য দল চাষবাস ক'রে। চাষবাস-করা দল থাকতেন বড় বড় নদীর ধারে—যেমন চীনের হোয়াংহো, ভারতবর্ষের গঙ্গা-সিন্ধু, মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস্-টাইগ্রিস্ (ব্যাবিলন), মিশরের নীল নদ ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখতেন কি রকম ক'রে বন্যা এসে সমস্ত জীব-জন্তু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আবার নতুন জীবজন্তু হয়। তাই এঁরা কল্পনা করতেন যেন এ পৃথিবীতে কেবল জীবের সৃষ্টি আর ধ্বংস চলে। সেইজন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মহাপ্রলয়ের কল্পনা করতেন। অন্য দল কিন্তু দেখতেন মানুষ আর অন্যান্য জীবের সঙ্গে কত মিল! তাঁরা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারতেন না যে এই সব জীব যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যে এত মিল কেন?

লেখাপড়া চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দু' দল পণ্ডিতের সৃষ্টি হ'ল। এক দল বললেন—প্রত্যেক জীবের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টির প্রথমে আজকাল আমরা যত রকমের জীব দেখি সবই কিছু কিছু ছিল। অন্য দল বল্‌লেন—ও রকম হ'তেই পারে না, জীব সৃষ্টি হয়েছিল একবার। অসভ্য মানুষ যেমন একটু একটু ক'রে সভ্য হয় ঠিক সেই রকম ভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে এই প্রথম সৃষ্ট জীব একটু একটু ক'রে উন্নত হ'তে হ'তে আজ একদিকে মানুষ এবং অন্য দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছে পরিণত হয়েছে।

এক শ' বছর আগেও কিন্তু এই দ্বিতীয় দলের কথাকে লোকে গাঁজাখুরি

ব'লে উড়িয়ে দিয়েছে—আর আজ বোধ হয় সমস্ত পৃথিবী খুঁজলেও তুমি প্রথম দলের একটী লোক পাবে কি না সন্দেহ।

এই দ্বিতীয় দলকে আমরা বলতে পারি 'ক্রমবিবর্ত্তনবাদী' বা Evolutionist—কেননা এঁরা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। আজকাল যে সব মত আমরা দেখতে পাই তার কোনটারই বয়স ১৫০ বছরের বেশী নয়।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত লা মার্ক তাঁর 'ব্যবহার ও অব্যবহারের মত' (Theory of use and disuse) প্রকাশ করেন। এ মতটা কিন্তু ভারী মজার। ইনি বলেন কোন জীব যদি ক্রমাগতঃ পুরুষানুক্রমে একটা বিশেষ ক্ষমতার চর্চ্চা করতে থাকে তবে সে ক্ষমতাটা তার বেড়ে যাবে—কিন্তু আবার চর্চ্চার অভাবে ক্ষমতাটা যাবে কমে। যেমন ধর, এক পাল ঘোড়াকে এমন একটা দেশে ছেড়ে দেওয়া হ'ল যেখানে মাটীতে ঘাস নেই, আর গাছের পাতাগুলিও খুব উঁচুতে। ঘোড়াগুলি বহু কষ্ট ক'রে ঘাড় উঁচু ক'রে গাছের পাতা খাবে—এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ঘাড়টা একটুখানি—হোক্ তা অতি সামান্য—লম্বা হয়ে যাবে। এই সব ঘোড়ার যে বাচ্চা হবে তাদের গলাটা একটু লম্বা হবে। এখানে কিন্তু তোমরা লক্ষ্য করবে যে লা মার্ক মেনে নিলেন যে বাপ নিজের চেষ্টায় কোন গুণ পেলে ছেলেও সেই গুণ পায়—বিনা চেষ্টায়। এর পর এই বাচ্চা ঘোড়াগুলি চেষ্টা ক'রে নিজেদের গলাকে আর একটু বাড়াল। এই রকম ক'রে বহু পুরুষ পরে ঘোড়া থেকে সৃষ্টি হল জিরাফ।

এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ডারউইন সাহেব তাঁর বিখ্যাত মত প্রকাশ করলেন। তাঁর প্রমাণগুলি এত সুন্দর হ'ল যে এর বিরুদ্ধে আর কোনও যুক্তি কারও রইল না।

তোমাদের মধ্যে যদি কারও বাগানের সখ থাকে তবে নিশ্চয় দেখেছ যে এক-একটা ফুল গাছ (যেমন গাঁদা) থেকে কত চারা হয়। এতগুলি চারা কখনও এক সঙ্গে বাঁচতে পারে না। তাই মালী কতকগুলিকে বেছে বেছে ফেলে দেয়। এখন, মালী হয়ত বিশেষ এক রকমের গাছ পছন্দ করে এবং সে অন্য রকম চারাগুলি ফেলে দেয়। তা' হলে—যদি বাপের নিজের পাওয়া গুণ ছেলে পায়—

ক্রমে ক্রমে বহু বছর পরে আমরা নতুন এক ধরণের গাছ পাব যাতে ঐ বিশেষ গুণটা এত বেশী পরিমাণে থাকবে যে তুমি হয়ত বলতেই পারবে না যে সেই প্রথম গাছ আর এই গাছ একই জাতের। ঠিক এই রকম বাছাই যদি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা রকম ভাবে বদলাতে বদলাতে চলতে থাকে তবে শেষে কি তুমি—হুঁকোর খোল আর নলচে দুইই বদ্‌লে ফেললে যে রকম হুঁকোই বদ্‌লে যায়—ঠিক সেই ভাবে সম্পূর্ণ নতুন জীব পাবে না?

আর একটা কথা বাকী রইল। তা' হলে এক জাতের জীব থেকে আর এক জাতের জীব পেতে হ'লে কি সব সময়েই একজন মালী চাই? তাই যদি হয় তবে এই অদ্ভুত মালীটী কে? ডারউইন উত্তর দিলেন, 'এই মালীটী আর কেউ নয়—স্বয়ং প্রকৃতি দেবী'।

ধর, একটা দেশে কতকগুলো খরগোস আছে—কারও লোম বেশী, কারও কম। সে দেশে হঠাৎ ভয়ানক শীত পড়ে গেল। কয়েক শ' বছর পরে দেখতে পাবে যে সে দেশে প্রত্যেক খরগোসের গায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোম! এখন তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে কেন এ রকম হবে। প্রকৃতি দেবী যে গরম জামাওয়ালা জীবগুলোকেই একটু প্রশ্রয় দেবেন।

ডারউইনের মত শুনে পাদ্রীরা গেলেন ক্ষেপে। ধার্ম্মিক লোকের বাড়ীতে ডারউইনের নাম করলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে হ'ত। ডারউইনকে এরা বল্‌ত "সয়তানী বুদ্ধির সন্তান" ("The offspring of the sin-diseased brain")। প্রথম দিকে ডারউইন তাঁর বানরের পূর্ব্বপুরুষ থেকে মানুষ হওয়ার কথা প্রচার করতে সাহসই পান নি। লেজের ব্যবহার না করলে লেজ যে খসে যাবে এ তো তোমরা লা মার্কের মত থেকেই বুঝতে পারছ। ঠিক এমনি ক'রেই ক্রমে ক্রমে বানরের পূর্ব্বপুরুষ থেকে মানুষ হয়েছিল। সুখের বিষয় মরার আগেই ডারউইন দেখে গেছেন যে লোকে পাগলের মত তাঁর মত অনুসরণ করছে।

এর পরও হয়ত তোমরা বলবে—'কিন্তু তাই বলে শ্যাওলা থেকে মানুষ!' কিন্তু এ ত' হতেই পারে।

প্রথম জীবনের সৃষ্টি হয় জলের মধ্যে। প্রথম সৃষ্ট প্রাণীর কোন একটা

চেহারাই ছিল না—তার নমুনা দেখ ঐ য়্যামিবা—একটা চট্‌চটে আঠাল পিণ্ডি (অতি ক্ষুদ্র, খালি চোখে দেখা অসম্ভব)। এই আঠাল পদার্থটীই হচ্ছে জীবনের মূল—প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (ল্যাটীন শব্দ—অর্থ "প্রথমে যার সৃষ্টি হয়েছিল")। এর বিশেষ কোন চেহারা নেই, মি নি টে মি নি টে চেহারা ব দ্‌লা য়। জল থেকেই এ নিজের খাবার যোগাড় করে—বড় হয়—ঘুরে বেড়ায়—এবং ফেটে দু'খানা হয়ে যায়। এমনি ক'রেই এর বংশ বৃদ্ধি হয়। এ জিনিষটা দেখতে শ্যাও-লার মত হ'লেও এ কিন্তু বৈজ্ঞানিক 'শ্যাওলা' নয়।

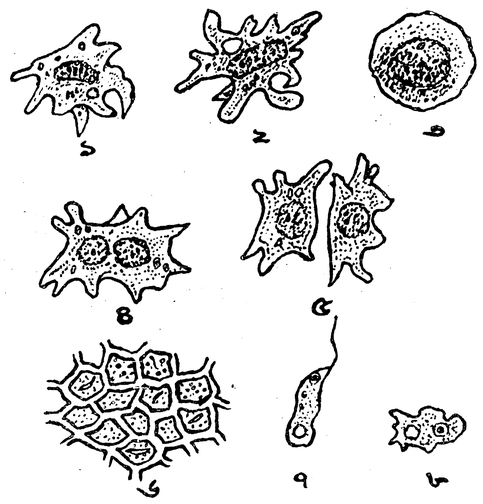

(১—৩) প্রথম সৃষ্ট জীব য়্যামিবা। মিনিটে মিনিটে য়্যামিবার কি রকম চেহারার বদল হয় দেখ। য়্যামিবাকে স্পর্শ করাতে তার ৩নং চেহারা হয়েছে।
(৪—৫) একটা য়্যামিবা ফেটে দু'টো হ'য়ে গেল।
(৬) য়্যামিবার মতই কতকগুলি একত্রে থাকলে প্রথমে দেখতে এ রকম হবে। ক্রমে ক্রমে আরও বড় জীব হবে।
(৭—৮) 'জানোয়ার গাছ'। দেখতে ঠিক য়্যামিবারই মত কিন্তু তবুও এ গাছ। তা'হ'লে গাছ আর জানোয়ার এক জায়গা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল মনে হয় না কি?

এর পরে প্রকৃতি দেবী দেখলেন যে অনেক-গুলি এ রকম জীব একত্র ক'রে (মৌমাছির চাকে যেমন অনেক কুঠুরী থাকে সেই রকম ক'রে—মনে কর, এক-একটী কু ঠু রী এক একটী জীব) রাখাই সুবিধা। তার পর তিনি আপন পছন্দমত এদের এক-একটা চেহারা দিতে লাগলেন—তা'তেই সৃষ্টি হ'ল জলের যত পোকা-মাকড়—শামুক-ঝিনুক। এদের কাউকে দেওয়া হ'ল ডাঙ্গায় পাঠিয়ে। সেখানে ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হ'তে হ'তে ক্রমে মানুষের সৃষ্টি

হ'ল—সে আর এক প্রকাণ্ড গল্প। ঠিক এমনি ক'রে আর এক দিক্ দিয়ে সৃষ্টি হ'ল নানা রকম গাছের।

ডারউইন সাহেবের এ মত কিন্তু আজকাল অনেক বদলে গেছে। সে সব কথা তোমাদের আর এক দিন বল্‌ব। কিন্তু মনে রেখ 'ক্রমবিবর্ত্তন' যে হয়েছে সে সম্বন্ধে কারও আর কোনও সন্দেহ নেই—সন্দেহ শুধু কেমন ক'রে সেটা হ'ল তাতেই।

ঘুম-কাতুরে

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ, বি-টি)

খবর কি তুই রাখিস্ কিছুই তার?
এই জগতে জন্মেছিলো একটি মহান্ লোক—
যে-জন ঘুমের কর্‌লে আবিষ্কার;
ঘুচিয়ে দিলে সবার বুকের সকল দুঃখ-শোক।
আছি বেঁচে তার দয়াতেই আজ,
নইলে হতো অবস্থা যে বড়ই সাংঘাতিক;
জেগে জেগেই কর্‌তে হতো কাজ,
প্রাণটা যেতো হাঁপিয়ে শেষে ছুটে দিগ্‌বিদিক্।

ঘোর পাপী সেই শঠের সেরা ভবে—
'ভোরে-ওঠা' কথাটি যার প্রথম রচনা;
নরক মাঝেও ঠাঁই কি তাহার হবে?
ম'রেও ব্যাটা করবে আপন পাপের শোচনা।
'ভোরে ওঠার' কাব্য লেখেন কবি—
'পাখীর ডাকে জাগো শিশু, দেখো সূর্য্যোদয়।'

ঐখানেতেই ভুল করিলেন সবি,
ভূগোলে তো বলে না কই সূর্য্য উদয় হয়।
পৃথিবীটাই ঘুরছে আপন ঝোঁকে,
তাই তো আরও চোখের পাতায় ঘুমের নেশা পায়,—
যেমনতর তন্দ্রা লাগে চোখে
চলন্ত ঐ রেল-গাড়ীটার দোলন-বিছানায়।
ভোরের বেলা যখন মৃদু হাওয়া
ঝির্‌ঝিরিয়ে জান্‌লা দিয়ে বহে ঘরের মাঝে,
সোনালি সেই রোদের আভাস-পাওয়া
দেয়ালখানি মুচ্‌কি' হাসে যেন জাগার লাজে,—

সেই তো আসল ঘুমের শুভক্ষণ!
ভোর বেলাতেই যত সুখের স্বপ্ন আসে ধেয়ে;
আটটা যখন বাজেরে ঢন্ ঢন্
মাঘের শীতে তখন আরাম লেপের তলা ছেয়ে।
ঝাপ্‌সা ভোরে যে জন জেগে থাকে
হয় সে ডাকাত, কিংবা সিঁধেল, নয়তো নেশাখোর;
সাবধানে ভাই তফাৎ রেখো তাকে,
সকল কবাট বন্ধ ক'রে এনো ঘুমের ঘোর।
পাঁচটি প্রহর লাগাও ক'ষে ঘুম।
ঘুম, ঘুম, ঘুম! কী অপরূপ সৃষ্টি বিধাতার!
গভীর রাতে পৃথিবী নিঃঝুম,
ঘুম-পাড়ানি পরীরা সব বেড়ায় চারিধার।
তন্দ্রা লাগে চাঁদের আঁখিমাঝে,
তারারা সব ঘুমিয়ে পড়ে দেখে ভোরের আলো,
জেগে থাকা তখন কি আর সাজে?

তাই তো ভোরের আমেজে মোর ঘুমটি জমে ভালো।
ঘুম, ঘুম, ঘুম! উধাও স্মৃতির দল!
চিন্তাবিহীন কর্ম্মহারা কেবল ফাঁকা সুখ!
সপ্ত রঙে পাঠাও রসাতল,
কেবল কালোর অন্ধকারে ভরাট্ করো বুক। *

জন্মদিনের উপহার

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

'এক বৃন্তে দু'টি ফুল' বলিয়া একটা কথা লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায় কিন্তু চোখে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের সুশোভন আর সুমিতাকে দেখিলে কিন্তু এ আফ্‌শোষটা করিতে হইত না। ভাইবোনের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এমন একটা কিছু নতুন জিনিষ নয় তা আমি স্বীকার করি, তবু এ দু'টি ভাইবোনের মধ্যে কী যে একটা বিশেষত্ব ছিল যার জন্য এদের সাধারণের চাইতে একটু তফাৎ বলিয়া মনে হইত। ঝগড়া-ঝাঁটি সব ছেলেপেলের মধ্যেই হয়—সুশোভন-সুমিতার মধ্যেও হইত। সুশোভন যখন-তখন সুমিতার চুল টানিয়া, বেণী খুলিয়া তাকে রাগাইত—কাঁদাইত আবার সুমিতাও সুশোভনের পেন্সিল ভাঙ্গিয়া, ঘুড়ি-লাটাই লুকাইয়া শোধ তুলিতে ছাড়িত না। এই ত' সেদিনকার একটা ব্যাপার—রোজ স্কুলে যাইবার আগে সুশোভন ও সুমিতা পাশাপাশি বসিয়া খায়, সেদিন কি একটা কারণে সুশোভন সুমিতাকে না ডাকিয়াই তাড়াতাড়ি খাইয়া উঠিয়া গেল। ব্যস্, বিকাল বেলা স্কুল হইতে ফিরিয়া সুশোভন আর তার চটি যোড়া খুঁজিয়া পাইল না। "এই সুমি পোড়ারমুখী, আমার জুতো কোথায় ফেল্‌লি?" পোড়ারমুখী কিন্তু কোন উত্তর দিবার নাম করে না।

* একটি ইংরাজি কবিতার ছায়াবলম্বনে রচিত।

অগত্যা সুশোভনকে আলমারির পিছনে, বাক্সের আড়ালে, টেবিলের নীচে, দরজার কোণে এবং পরে খাটের তলায় ঢুকিয়া চটি খুঁজিতে হইল এবং তার ফল স্বরূপ মাথায় প্রচণ্ড গুঁতা খাইয়া যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইল।

মাথায় প্রচণ্ড গুঁতা খাইয়া…

সুমিতা এতক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছিল, কিন্তু সুশোভনের যন্ত্রণা-কাতর মুখ দেখিয়া তার সে মজা আর টিকিল না; সুশোভনের হাত ধরিয়া লজ্জায়, অনুশোচনায় সে একেবারে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন না দু'জনের মধ্যে আসল আঘাতটা সত্যিসত্যিই কে পাইয়াছে—সুমিতা না সুশোভন? তাই বলিতেছিলাম এ দু'টি ভাইবোনের ভালবাসায় কেমন যেন একটা বিশেষত্ব আছে।

কয়েক বছর পরের কথা। মানুষের দিন কখন কেমন কাটে কেউ কিছু বলিতে পারে না। ছোট্ট সুখের সংসার, কিন্তু তার মধ্যে হঠাৎ একটা ঝড় বহিয়া গেল। পাড়ায় হঠাৎ কলেরা দেখা দিল—আর কয়েক দিনের ব্যবধানে সুশোভনদের বাবা-মা দু'জনেই ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। ছোট্ট সুশোভন—তখনও সে আই-এ পাশ করে নাই—তার ঘাড়ের উপর পড়িল সমস্ত সংসারের চাপ। সুমিতা সেবার সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে।

তেমন বড়লোক না হইলেও সুশোভনদের ছেলেবেলা বেশ আদরেই কাটিয়াছিল, অভাবের কষ্ট কোন দিন পোহাইতে হয় নাই; কিন্তু এখন দেখা গেল তাদের বাবা কিছুই রাখিয়া যান নাই—তারা একেবারে গরীব হইয়া পড়িয়াছে। সুশোভন পড়াশুনা ছাড়িয়া একটা ছোটখাট চাকরি যোগাড় করিবে ঠিক করিয়াছিল কিন্তু সুমিতা কিছুতেই তা করিতে দিল না। শেষ পর্য্যন্ত সুশোভন সকালে বিকালে একটা ছেলে পড়াইবার কাজ লইল, তা ছাড়া স্কলারশিপের সামান্য কয়েকটা টাকা ছিল।

চাকর-ঠাকুর তুলিয়া দিয়া সুমিতা কোমর বাঁধিয়া ঘরের কাজে লাগিয়া গেল। সুশোভন অবশ্য ইহাতে আপত্তি তুলিয়াছিল কিন্তু সুমিতা প্রবীণা গিন্নীর মত মুখ করিয়া দাদাকে এমন এক ধমক লাগাইয়া দিল যে বেচারা আর দ্বিতীয় বার কথাটা তুলিতে পারিল না। সুমিতার চেহারা বড় সুন্দর—বিশেষ করিয়া তার চুলগুলি—যেমন অদ্ভুত রকম লম্বা, তেমনি ঘন—দেখিলে এক গোছা কুচকুচে কালো রেশম বলিয়া ভুল হয়। সাধারণতঃ অমন চুল বাঙ্গালীর ঘরে বড় একটা দেখা যায় না। সুমিতা যখন সেই চুলে কষিয়া ঝুঁটি বাঁধিয়া রান্নাঘরের ধোঁয়ার মধ্যে ঢুকিত আর ঘণ্টা কয়েক পরে সেই ঝুঁটি ঝুল-কালিতে পরিপাটী করিয়া ঢাকিয়া বাহির হইত তখন সুশোভনের হাসির চাইতে দুঃখই হইত বেশী। কিন্তু কিছু করিবার ছিল না। এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

বছরের মধ্যে সুশোভনদের একটা স্মরণীয় দিন ছিল তাদের জন্মদিন। আশ্চর্য্য, দুই ভাইবোন্ দু' বছরের ছোট-বড় হইলেও জন্মিয়াছিল ঠিক এক তারিখে। বাড়ীতে একটা জন্মদিন থাকিলেই বেশ একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যায়, এক সঙ্গে যোড়া জন্মদিন পড়িলে তো কথাই নাই। এবারও দেখিতে দেখিতে সেই দিনটি আসিয়া পড়িল।

প্রতি বছর জন্মদিন আসিবার কয়েক দিন আগে হইতেই সুশোভন এবং সুমিতা দু'জনেরই রাত্রে ঘুম বন্ধ হইয়া যাইত। জন্মদিনে অপরকে এমন কি একটা জিনিষ উপহার দেওয়া যায় যা দেখিয়া যে উপহার পাইতেছে তার তো বটেই, বাড়ীর অন্যান্য লোক এবং নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবদেরও রীতিমত তাক্ লাগিয়া

যাইতে পারে সারা রাত্রি শুইয়া শুইয়া তারা মনে মনে তারই খসড়া করিত, কাজেই ঘুম হইবে কেমন করিয়া? সুশোভনদের বাবা-মাও এ বিষয়ে ছিলেন মুক্তহস্ত। ছেলে-মেয়ের এই বিশেষ দিনটিকে তাদের ঠিক মনের মত করিবার জন্য কোন রকম অর্থের কার্পণ্য তাঁরা করিতেন না। সুশোভন-সুমিতা খরচের জন্য যা চাহিত তাই পাইত।

সুশোভন আপত্তি তুলিয়াছিল…

সেই কত দিনের চাহিয়া-থাকা দিনটি এবারও আসিতেছে। সুশোভন-সুমিতার চোখে ঘুম বন্ধ হইল, কিন্তু এবার আর সেই আনন্দে নয়—দুশ্চিন্তায়। বছরের এই দিনটিকে তারা কিছুতেই ফাঁকি দিয়া সরাইয়া দিতে পারে না, অথচ সাংসারিক অবস্থা তাদের এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে একটি পয়সা বাজে খরচ করিবার উপায় নাই। কঠিন সংসার, দণ্ড তার কঠিনতর। হৃদয়ের কোমল বৃত্তির কোন আদর তো তার কাছে নাই!

জন্মদিনের ঠিক আগের দিন। সুশোভন টেবিলের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—ছোট বোনটির সেই সুন্দর মুখখানি আর সেই মুখ ঘিরিয়া চমৎকার চুলগুলি তার চোখের সামনে ভাসিতেছিল। বেচারা সুমি, অমন সুন্দর চুলগুলিকে আজকাল সে বাঁধিবারও সময় পায় না—রাতদিন রান্নাঘরের ঝুল-কালিতে ভরিয়া রাখে। অথচ বছর খানেক আগে এই চুলের উপর তার কী দরদটাই

না ছিল! সুশোভন ঠাট্টা করিয়া তার এক গাছা ধরিয়া টান দিলে একেবারে ফোঁস্ করিয়া উঠিত। আহা, সেই চুলে পরিবার জন্য যদি একটা কিছু দিতে পারে সুমি তা হইলে একেবারে আনন্দে দিশাহারা হইয়া যাইবে। কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ তো আছে—খোঁপায় পরিবার কত রকম দামী দামী ফুল—সেকেলে মেয়েদের মত নয়, আধুনিক মেয়েদের পরিবার মত ফ্যাশন-দুরস্তও তো অনেক আছে। পাশের বাড়ীর সীতাদি'কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া দিতে পারেন কোন্‌টা একালকার মেয়েরা পছন্দ করিবে। কিন্তু নাঃ, তা দেওয়া চলিবে না, টাকা কোথায়? সুশোভন অন্য কোন একটা সস্তা অথচ সখের জিনিষের কথা ভাবিতে লাগিল।

সুমিতার অবস্থা আরও মর্ম্মান্তিক। তার হাতে নিজের বলিতে কিছুই নাই, দাদার কাছেও তাই। আর যদিই বা থাকিত তা হইলেও দাদাকে উপহার দিবার জন্য দাদার নিকট হইতেই টাকা চাওয়া—সে কেমন করিয়া হয়! রান্না করিতে করিতে সুমিতার বড় বড় চোখ দু'টি জলে ভরিয়া আসিল।

সুশোভনের বাবা অনেক দিন আগে তাকে একটা পুরানো সোনার ট্যাঁক-ঘড়ি দিয়াছিলেন। ঘড়িটি ছিল সুশোভনের বড় প্রিয়। 'চেনে'র অভাবে একটা কালো 'কার' বাঁধিয়া সে সেটাকে বুক-পকেটে রাখিত। সুমিতার বড় সাধ হইল যদি একটা সোনার চেন্ সে সুশোভনকে দিতে পারিত! সুতার কার বাঁধিয়া ঝুলাইলে কি আর সোনার ঘড়ি মানায়? মানাক্ আর নাই মানাক্, সুমিতার কিছু করিবার উপায় নাই—সাধ্য নাই। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ডালের হাঁড়িতে কাঠি দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা চুলগুলি বাঁধা হয় নাই—অনেক দিন যাবতই হয় না—সেগুলি সামনে ঝুলিয়া পড়িয়া তার বিরক্তি দিল আরও বাড়াইয়া। হঠাৎ তার মাথায় এক ফন্দী জুটিল। সে পাশের বাড়ীর ছোট্টুকে ডাকিয়া পাঠাইল।

পর দিনই জন্মদিন। এবার আর বাহিরের লোক কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; তা না হউক্, সুশোভন-সুমিতা দু'জনেই তাদের উৎসবকে সজীব করিয়া রাখিবে। সারা দিন বসিয়া সুমিতা নানা রকম খাবার তৈরী করিয়াছে—বড় ব্যস্ত; একবারটিও সুশোভনকে দেখা দেয় নাই।

বিকালের দিকে অল্প কিছু ফুল আনিয়া হাসিমুখে সুশোভন চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিল। তার পর দু'জনের মত খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিল সুমিতা। তার মুখটিও বেশ হাসি হাসি, কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন? সুমিতা সুশোভনকে প্রণাম করিল, তার পর কোথা হইতে এক ছড়া সোনার চেন্ বাহির করিয়া বলিল, "কই, দেখি দাদা, তোমার ঘড়িটা?" সুশোভন অবাক্ হইয়া তার দিকে তাকাইল, "ও কি? তোর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন? কেটে গেছে? আজ জন্ম দিনে এ কি কাণ্ড! দেখি দেখি?" সুমিতার প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করিয়া সুশোভন তার মাথার ব্যাণ্ডেজ্ খুলিয়া ফেলিল। কোথায়, মাথা তো কাটে নাই! কিন্তু কাটিয়াছে তার চাইতে বড় জিনিষ। সুমিতার অত সাধের, অত সুন্দর, অত বিশাল চুলের রাশি একেবারে ছাঁটা!

খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিল সুমিতা।

এইখানে দিন দুই আগের একটি ঘটনা বলা দরকার।

গোপাল দা' সুমিতাদের সম্পর্কে কি রকম দাদা হন। সখের থিয়েটার করিয়া তাঁর বেশ নাম হইয়াছিল। সুমিতা পাশের বাড়ীর ছোট্টুকে দিয়া তাঁকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল।

গোপাল দা' আসিয়া হাঁক দিলেন, "কিরে সুমি, কোন্ প্রয়োজনে ডেকেছিস্

গোপাল দাদারে?" গোপাল দা' থিয়েটারী ঢঙ্গে কথা বলিতে ভালবাসেন। সুমিতা বলিল, "প্রয়োজন আছে, তোমাদের ভয়ানক বদ্নাম শুনলাম; তোমরা নাকি পাটের চুল পরে থিয়েটার কর?" "হেন কথা কে কহিল তোরে? সমুচিত দণ্ড দিব সেই পাপাশয়ে।" "দণ্ড পরে দিও গোপাল দা', কিন্তু তোমরা না ব'লে বেড়াও নাট্যশাস্ত্র বাজে লোকের হাতে পড়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তোমরা তাকে উদ্ধার করবে—যেমন বিলেতের এক দল শিক্ষিত লোকেরা করছেন। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে ও সব হয় না গোপাল দা, খরচ করতে হয়। ওদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ ঐখানে—ওরা আর যাই করুক, পাটের চুল দিয়ে 'উইগ্' তৈরী করে না নিশ্চয়ই।" তার পর সে তার মনের কথাটি খুলিয়া বলিল। লম্বা চুল রাখাটা আজকালকার দিনে নেহাৎই সেকেলে, এখন বব্-করা চুলের যুগ। তাই তারা কয়েক বন্ধু মিলিয়া একটা সমিতি করিয়াছে, সমিতির সভ্যরা সবাই চুল কাটিয়া বব্ করিবে। গোপাল দা' ইচ্ছা করিলে তার চুলগুলি লইয়া তাঁদের নাট্যশাস্ত্রের উন্নতি করিতে পারেন। তবে গোপালদা'দের পয়সা-ওয়ালা দলকে সে অমনি চুল ছাড়িয়া দিবে না—ঠিক বিলাতী হারেই দাম আদায় করিবে—কেননা তাদের 'বব্ চুল' সমিতি চালাইতে হইলে টাকার দরকার, সে টাকা এই ভাবে ওঠানই যুক্তিসঙ্গত। গোপাল দা' প্রথমটা অনেক আম্তা আম্তা করিলেন, মনে মনে একালকার 'মেমী' মেয়েদের মুণ্ডপাত করিলেন, কিন্তু শেষটা অমন চমৎকার চুলের লোভ সামলাইতে পারিলেন না। সুমিতা নিজের হাতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া সব চুল কাটিয়া দিল। পরের দিন গোপাল দা' ক্লাব হইতে এক মুঠা টাকা আনিয়া সুমিতার হাতে দিলেন। তার পরের ব্যাপার তো সহজই। টাকা পাইয়া সুমিতার পক্ষে ঘড়ির চেন্ সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার হয় নাই।

খানিকক্ষণ অভিভূতের মত থাকিয়া সুশোভন চীৎকার করিয়া উঠিল, "পোড়ারমুখী, এ কি করেছিস্! কেন এমন করলি? তোর এত সাধের চুল—অমন চুল কি আর জীবনে হবে?" সুশোভনের প্রবল জেরায় সুমিতা গোপাল-দা'-ঘটিত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। তার পর ধরা-গলায় বলিল, "লক্ষ্মীটি দাদা, রাগ ক'র না। তোমার জন্মদিনে একটা কিছু না দিতে পারলে আমার মৃত্যুযন্ত্রণা

হ'ত। চুল আমার আবার গজাবে। কিন্তু তুমি ঘড়িটা বার কর, চেন্‌টা বেঁধে একবার পর—দেখি কেমন দেখায়।"

সুশোভন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বুক-পকেটে হাত দিল, তার পর কি একটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। সুমিতা সবিস্ময়ে দেখিল সেটি ঘড়ি নয়, একটি আধুনিক রুচিসঙ্গত খোঁপায় পরিবার দামী ফুল। সুমিতা প্রশ্ন করিবার আগেই সুশোভন জবাব দিল, "ঘড়ি পাব কোথায়? ঘড়ি আর নেই, সে ঘড়ি বেচে তার টাকায় আমি তোর খোঁপায় পরবার জন্য এই ফুল কিনে এনেছিলাম।" *

এডল্‌ফ্‌ হিট্‌লার

(অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার, এম্‌-এ, এফ্‌-আর-ইকন্‌-এস্‌)

গত মহাযুদ্ধের খবর তোমরা সকলেই রাখ—জগতের ইতিহাসে এ প্রলয়-কাণ্ডের আর তুলনা নাই। যুদ্ধে বহু দেশ ছারখার, কোটি কোটি লোকের প্রাণনাশ—এ সব তো হইলই, যুদ্ধ থামিবার পরেও কি শান্তি আছে? চারিদিকে বিদ্রোহ, অরাজকতা, মারামারি লুটপাট আরম্ভ হইল। অজস্র টাকা যুদ্ধে নষ্ট হইয়াছিল, কাজেই অর্থকষ্ট যে কি বস্তু তাও লোকে হাড়ে হাড়ে টের পাইতে লাগিল। অনেক দেশের গভর্ণমেণ্ট্‌ই দেনা করিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, দেনার দায়ে চক্ষে সরিষাফুল দেখিয়া তাঁরা কাজকর্ম্ম বন্ধ করিলেন; কাজের অভাবে সাধারণের আয় গেল কমিয়া—এক কথায় দুঃখের পাত্রটি পূর্ণ হইল। গভর্ণমেণ্টের উপর লোকের আস্থা কমিয়া গেল।

এত দিন পর্য্যন্ত সভ্য মানুষের ধারণা ছিল গণতন্ত্র বা 'ডেমোক্রেসী'র চাইতে ভাল গভর্ণমেণ্ট্‌ বুঝি আর হয় না; দেশের সমস্ত লোক তাদের মধ্য হইতে গুটিকয়েক কর্ম্মকুশল বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিকে বাছিয়া দিবে এবং তাঁরা নির্দ্দিষ্ট-কালের

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

জন্য রাজ্য চালাইবেন—এর চাইতে আর কি সুব্যবস্থা হইতে পারে? অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া ইয়োরোপের লোক চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে এবার ভাবিতে সুরু করিল "সত্যিই কি তাই? বোধ করি অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইতেছে"।

বাস্তবিকই দেশে যখন দারুণ সঙ্কট-কাল উপস্থিত হয় তখন যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতির মত একজন শক্তিমান্‌ পুরুষের হাতে রাজ্যের সমস্ত রকম ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। সমান ক্ষমতাওয়ালা জনা পাঁচেক সেনাপতি যদি যুদ্ধের সময় প্রত্যেকেই নিজের নিজের মর্জ্জি-মত কাজ করার বায়না ধরে তাহা হইলে যুদ্ধে পরাজয় যেমন অনিবার্য্য তেম্‌নি সঙ্কটের সময় পাঁচ কর্ত্তা মিলিয়া হৈচৈ বাগ্‌-বিতণ্ডা করিলে শুধু কথা কাটা-কাটিই হয়, দেশ যে তিমিরে সে তিমিরেই পড়িয়া থাকে। প্রকৃত শক্তিমান্‌ পুরুষের (Dictator) হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলে তিনি হয়ত তাঁর অসম সাহস এবং অসামান্য প্রতিভার বলে দেশকে উন্নতির পথে চালিত করিতে পারেন।

এডল্‌ফ্‌ হিট্‌লার (বাঁদিকে); ফন্‌ প্যাপেনের সহিত আলাপ করিতেছেন

যুদ্ধের পর সেই চরম দুর্গতির দিনে ইয়োরোপের লোক তাই 'শক্তিমান্‌ পুরুষের' (Dictator) সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, জাতির

প্রকৃত প্রয়োজনের সময় এই ধরণের 'বীরের' সাক্ষাৎ পাওয়া যায়-ই, এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় প্রায়ই দেখা যায় অজ্ঞাত, অনাদৃত শ্রেণীর ভিতর হইতেই সে বীরপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইয়োরোপেও হইল তাই-ই—রাশিয়ায় বাহির হইলেন লেনিন, ইটালীতে মুসোলিনী, তুরস্কে কামাল পাশা, পোল্যাণ্ডে পিল্‌সিউড্‌স্কি, স্পেনে প্রাইমো-ডি-রিভেরা। সম্প্রতি ইয়োরোপে আর দুইটী ডিক্‌টেটারের উদয় হইয়াছে—একজন জার্ম্মেনীর হের্ হিট্‌লার অপর জন অষ্ট্রিয়ার ডক্টর ডলফস্। ডলফস্ এখনও নিতান্তই কনিষ্ঠ, কিন্তু হিট্‌লার তাঁর প্রচণ্ড শক্তিতে সমস্ত জগৎ কাঁপাইয়া তোলার গতিক করিয়াছেন।

এডল্‌ফ্ হিট্‌লারের কথা বলিতে গেলে আগে একটু গোড়ার কথা বলিয়া নেওয়া দরকার। মহাযুদ্ধে জার্ম্মেনীর তো হার হইল; সঙ্গে সঙ্গে কাইজারের আমল গেল ঘুচিয়া—স্থির হইল 'রাজা' বলিয়া জার্ম্মেনীতে আর কেউ থাকিবেন না, তার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইবে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র জিনিষটা কি একটু আগেই বলা হইয়াছে। ভার্সাইয়ের সন্ধিপত্রে জার্ম্মেনীকে স্বাক্ষর করিতে হইল—তার হার হইয়াছে কাজেই সন্ধির সর্ত্ত তার পক্ষে যে মোটেই সুবিধাজনক হইবে না তা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। ফ্রান্স্, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি জার্ম্মেনীকে চাপিয়া ধরিল, "তোমার সঙ্গে বাপু যুদ্ধ করিতে গিয়া আমাদের দেদার টাকা ক্ষতি হইয়াছে সে ক্ষতি তোমাকেই পূরাইয়া দিতে হইবে।"

জার্ম্মেনীর অবস্থা তখন এক কথায় বলিতে গেলে দারুণ শোচনীয়। একে সমস্ত দেশ শোকাচ্ছন্ন, না আছে অর্থ, না আছে বস্ত্র, তার উপর বোঝার উপর শাকের আঁটি—ক্ষতিপূরণের দাবী। এক দল জার্ম্মান তরুণতরুণী একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল—তারা চীৎকার করিতে লাগিল, "নেহি দেঙ্গা ক্ষতিপূরণের টাকা! কেন যুদ্ধ কি বাধিয়াছিল জার্ম্মেনীর একার দোষে নাকি? নেহি মানেঙ্গা ভার্সাইয়ের সন্ধিপত্র! পৃথিবীর অপরাপর দেশ চটিবে? চটুক, আমরা নাচার।" তাদের মূলমন্ত্র হইল জার্ম্মেনীর বৈভব, ঋদ্ধি আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে—জার্ম্মেনীকে নবজীবন দান করিতে হইবে। যাদের মধ্যে পবিত্র জার্ম্মান-রক্ত নাই—যেমন ইহুদীরা—তারা কখনোই প্রকৃত দেশপ্রেমিক হইতে পারে না; তারা "অস্পৃশ্য"

তাদের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া নিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। এই নতুন দলের নাম ন্যাসনাল সোসালিষ্ট্ বা নাৎসি (Nazi) এবং দলপতির নাম হিট্‌লার। তখন এ দলের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল সামান্যই কিন্তু আজ হিট্‌লারের নামে সমস্ত জার্ম্মেনী মাতিয়া উঠিয়াছে; নাৎসিদলের জয়জয়কার, তাদের নেতা এডল্‌ফ্ হিট্‌লার সে দেশের সর্ব্বময় প্রভু! এ কথা কি তখন কেউ কল্পনায়ও আনিতে পারিয়াছিল! আজ হিট্‌লারের নাম জানে না সভ্যজগতে এমন লোক খুব কমই আছে। পৃথিবীর সমস্ত মাসিক এবং দৈনিকে তাঁর ফটো ছাপা হইতেছে, রেডিওতে তাঁর বক্তৃতা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সিনেমা তাঁর মূর্ত্তি সমস্ত জগৎকে দেখাইতেছে। তাঁর কার্য্যপদ্ধতির উপর বহু বই লেখা হইতেছে, তাঁর নিজের লেখা জীবনচরিত "আমার জীবনসংগ্রাম" (My Struggle) সংস্করণের পর সংস্করণ পার হইয়া গেছে এবং পৃথিবীর নানান্ ভাষায় তার অনুবাদ হইতেছে। সভ্যজগৎ স্বীকার করিয়াছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আলেক্‌জেণ্ডার, জুলিয়াস্ সিজার, নেপোলিয়ন প্রভৃতির মত হিট্‌লারও একজন ক্ষণজন্মা বিরাট্ পুরুষ।

ইংরাজী ১৮৮৯ সনে অষ্ট্রিয়ায় হিট্‌লারের জন্ম হয়। তাঁর পিতা অষ্ট্রিয়ার শুল্কবিভাগে (Customs Department) চাকরী করিতেন। হিট্‌লারের বয়স যখন ষোল বছর মাত্র তখন তাঁর পিতামাতা ইহলোক ত্যাগ করেন। কপর্দ্দকশূন্য হিট্‌লার ভাগ্যপরীক্ষার জন্য ভিয়েনা সহরে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চিত্রালয়ে (Academy) ছাত্রবৃত্তি জোগাড় করিতে পারিলেন না। অগত্যা এক গৃহ-নির্ম্মাতার ফার্মে কাজ লইলেন। সেখানে চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা অনুশীলনের সুবিধা হইল না—দেওয়াল-চিত্র অঙ্কনে যত দূর বিকাশ সম্ভব শুধু তাই হইল। ১৯১২ সনে হিট্‌লার মিউনিক্ সহরে গেলেন, তার পর যুদ্ধ বাধিলে ব্যাভেরিয়ার এক সৈন্যদলে যোগ দিলেন। শীঘ্রই পশ্চিম-সীমান্তে তাঁর ডাক পড়িল। যুদ্ধে তিনি দুইবার আহত হন—একবার খুব সাংঘাতিক আঘাত পান। যুদ্ধ শেষ হইল—রিক্তহস্তে হিট্‌লার আবার মিউনিকে ফিরিলেন। অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন নাই—হিট্‌লার এখনও সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত, দীনহীন যুবক!

১৯২০ সনে হিট্‌লার শ্রমিকদলে (Workers' Party) যোগ দিলেন। শ্রমিকদলের সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ছয় জন। হিট্‌লার প্রকাশ্য ভাবে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাঁর বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা অসাধারণ। বক্তৃতার জোরে শীঘ্রই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে একজন শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে হিট্‌লারের পরিচয় হইল। যুবকের নাম গুষ্টাভ্‌ ফেডার (Gustav Feder)। ফেডারের সাহায্যে হিট্‌লার নাৎসিদলের সংস্কার-প্রণালী ঘোষণা করিলেন। ১৯২৬ সনে ঐ কর্ম্ম-প্রণালী ছাপার অক্ষরে বাহির হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল—সমর-বিজয়ী সেনানায়ক লুডেন্‌ডর্‌ফ্‌ (Ludendorff) হিট্‌লারের কর্ম্মপ্রণালীর সমর্থন করিলেন। তখন দুই জনে সদলবলে বার্লিন-অভিযানে (March on Berlin) বাহির হইলেন। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল—সরকারী গদি অধিকার করা হইল না—মিউনিক হইতে কয়েক মাইল দূরে বিদ্রোহী-দল বাধা পাইল, নেতারা ধরা পড়িল। লুডেন্‌ডর্‌ফ্‌কে যথেষ্ট অসম্মান ভোগ করিতে হইল, কিন্তু তিনি কোন রকমে মুক্তি পাইলেন। হিট্‌লারের তিন বৎসর কারাদণ্ড হইল। নির্জ্জন কারাগৃহে হিট্‌লার নিষ্কর্ম্মা রহিলেন না—তাঁর কাজ হইল আত্মজীবনী লেখা ও নাৎসিদলের (Nazi Party) কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্দ্ধিত করা।

বক্তা হিট্‌লার

১৯২৮ সনের নির্ব্বাচনে নাৎসিদল ৮০০০০০ ভোট্‌ পাইল এবং ব্যবস্থাপক সভায় ২৭টি স্থান অধিকার করিল। তাহাদের প্রভাব দিন দিন বিস্তার লাভ

করিতে লাগিল। ১৯৩০ সনের নির্ব্বাচনে তারা ৬৫০০০০০ ভোট্‌ পাইল এবং ব্যবস্থাপক সভায় ১০৭টি স্থান দখল করিল। ১৯৩৩ সনের নির্ব্বাচনে তারা শত করা ৯০টির অধিক ভোট সংগ্রহ করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিল। জার্ম্মেনীর শাসনক্ষমতা হিট্‌লার হাতে পাইলেন। তরুণ জার্ম্মেনীর অদম্য অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিক সাধনা সার্থক হইল—হিট্‌লারের যৌবন-স্বপ্ন সফল হইল!

হিট্‌লারের নেতৃত্বে তরুণ জার্ম্মেনী জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংস্কার আরম্ভ করিয়াছে। আর্থিক-অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, শাসনপ্রণালী ও শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অপদস্থ, অপমানিত, প্রাণহীন জার্ম্মেনী সবল, সজীব আত্মনির্ভর হইয়া উঠিয়াছে। নিখিল-জাতি-সঙ্ঘের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া, সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া সে বলিতেছে—"পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুধু আমরা করিব কেন? আমাদেরও বাঁচিতে হইবে। আমরা সমান অধিকার চাই।"

হিট্‌লারের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা চলিতেছে; কেউ কেউ তার উচ্চ প্রশংসা আবার কেউ কেউ তীব্র নিন্দা করিতেছেন। আমাদের মনে হয় হিট্‌লারের কার্য্যপ্রণালীর দোষগুণ বিচার করার সময় এখনও আসে নাই, আরও কিছুকাল না গেলে অপক্ষপাত বিচার করিবার মত 'মালমশলা' মিলিবে না। তবে তাঁর ইহুদী-দলনের বাড়াবাড়ি দেখিয়া সমস্ত জগৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মেনীতে ইহুদীর স্থান নাই, তা তিনি যত বড় ইহুদীই হোন্‌ না কেন। পৃথিবীবিখ্যাত অনেক ইহুদীকে (কেউ কেউ আবার নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া পণ্ডিত) হের্‌ হিট্‌লার নির্ম্মম ভাবে জার্ম্মেনী হইতে তাড়াইয়াছেন। অন্যে পরে কা কথা, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের কি দুর্গতি হইয়াছে! তাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি জাতে ইহুদী। তাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, জার্ম্মেনী হইতে গলাধাক্কা খাইয়া প্রাণভয়ে তাঁকে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে হইয়াছে। জার্ম্মেনীর ইতিহাস হইতে এ কলঙ্ক কি কখনো মুছিবে? আর এদিকে ফ্রান্স্‌, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড্‌ তাঁর দিকে দু হাত বাড়াইয়া বলিতেছে "এস পণ্ডিত-রাজ, আমাদের দেশে এস, আমরা তোমাকে

রাজার হালে রাখিব, জগতের কল্যাণের জন্য যে কাজ তুমি হাতে নিয়াছ সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা তার করিয়া দিব, কার সাধ্য তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে।"

নিউইয়র্কের ইহুদীরা উৎপীড়িত জার্ম্মান ইহুদীদের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

সকল দেশেরই ইচ্ছা তাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সহিত আইনষ্টাইনের নাম জড়িত হইয়া যায়।

যাক্, এ সব কথা ছাড়িয়া দিলেও হিট্‌লারের চরিত্রে যে অনুকরণীয় অনেক অনন্যসাধারণ গুণ আছে সে কথা অস্বীকার করার জো নাই। তাঁর মত অদম্য কর্ম্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস, অসম্ভব শ্রমশীলতা, কর্ম্মকুশলতা, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা পৃথিবীর খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা গিয়াছে।

সোনার খুঁটি

(শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়)

(এই গল্পের লেখক ফিডর্ সলোগাব্—তাঁর আসল নাম ফিডর্ কুজ্‌মিক্ টেটার্‌নিকফ্। আধুনিক যুগে রুষ-সাহিত্যে গল্প লিখে যাঁরা দেশ-বিদেশে সুনাম-সুযশ কিনছেন ইনি তাঁদেরই একজন। আমাদের দেশের কম লোকেই হয়ত এঁর নাম শুনে থাকবে, কিন্তু শেখভ্, কুপ্রিন্ ও গর্কির সঙ্গে এক আসনেই তাঁকে রুষবাসীরা বসায়।

১৮৬৩ সনে খুব গরীবের ঘরে এঁর জন্ম হয়। বাপ জুতো তৈরী করে অতি কষ্টে সংসার চালাতেন। তাও সলোগাবের বরাতে বেশীদিন সইল না। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর মা একজন ভদ্রলোকের বাড়ী ঝি'র কাজ ক'রে রুষদেশের এই ভবিষ্যৎ কবি ও সাহিত্যিককে মানুষ করেন। যে ভদ্রলোকের গৃহে সলোগাবের মা দাসী নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই ভদ্রলোকই সলোগাবের লেখাপড়ার সমস্ত রকম খরচ চালাতেন। সলোগাব্ লেখাপড়া শেষ ক'রে একটা ছোট সহরের এক স্কুলে মাষ্টারী পেলেন। পরে তিনি স্কুল-পরিদর্শক হয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস "দুঃস্বপ্ন" তেমন আদর পায়নি কিন্তু তার পরেই "ছোট দানব" বেরিয়ে সকলের হৃদয় জয় ক'রে বস্‌ল। তার পর দেশবাসীর সহানুভূতি পেয়ে সালোগাব্ কত ছোটগল্প, কত রূপকথা, কত না কবিতা দিয়ে রুষ-সাহিত্যকে সুন্দর ক'রে তুললেন।

সলোগাব্ নিজে একটু পাগ্‌লাটে ধরণের লোক, আর তাঁর লেখার মধ্যেও সে পাগ্‌লামি তিনি ঢাকতে পারেন নি। বাস্তবের চেয়ে অবাস্তব—যত আজ্‌গুবি, আষাঢ়ে জিনিষ—সেই সব নিয়েই তিনি কারবার করেছেন।

তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যাই বেশী—তা আবার এত ছোট যে ছাপা বইয়ের আধ পাতাও অনেক সময় ডিঙ্গিয়ে উঠতে পারে না। তারই একটা নমুনা তোমাদের দিলুম।

খোকন্ হঠাৎ বাপের ওপর ভারী খাপ্পা হ'য়ে তার দাসীকে বল্লে, 'এই আমি ব'লে রাখ্‌ছি আজ,—বড় হ'য়ে যদি না একটা মস্ত জেনারেল হই, আর যদি না তার পর কামান-বন্দুক-গুলি-গোলা নিয়ে এসে বাবার এই বাড়ীটা চড়াও ক'রে বাবাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখি ত আমার নাম নামই নয়।'

খোকনের বাবা কাছেই ছিলেন, শুনতে পেয়ে বল্লেন, 'ওরে আমার দুষ্টু ছেলে কোথাকার! য়্যাঁ, বাপকে নিয়ে গিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধ্‌বি নাকি রে হতভাগা? বাপের মনে যে তা'তে কত লাগবে সে বুদ্ধিটুকুও বুঝি তোর নেই রে গাধা?'

খোকন্ বড় ঘাব্‌ড়ে গেল, তার পর আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লে, 'তা-তা-তা বাবা, খুঁটিটা কিন্তু সোনা দিয়ে তৈরী করা হবে, আর তা ছাড়া তার সঙ্গে এক টুক্‌রো কাগজে লিখে লট্‌কে দেব—"বীরত্বের জন্য"।'

এবারকার হকি খেলা

(শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ)

কলকাতার হকি লীগ্ এবং বেইটন্ কাপ্ দুই-ই শেষ হয়েছে। একাদিক্রমে চার বছর লীগ্ জয় ক'রে এসে এবার কাষ্টম্স্‌কে মাথা নীচু করতে হয়েছে রেঞ্জার্সের কাছে। এবার লীগ্ বিজেতা রেঞ্জার্স্, বেইটন্ কাপ্ বিজেতাও রেঞ্জার্স্।

এক সময় ছিল যখন লোকে হকি টিম্ বল্‌তেই বুঝ্‌ত রেঞ্জার্স্ আর কাষ্টম্স্‌কে। অনেক দিন পরে রেঞ্জার্স্ এবার তাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার কর্‌ল। তাদের দুর্দ্ধর্ষ ব্যাক্ জর্জ্জ্, অমিতপরাক্রমশালী ওয়েল্‌স্ কেউই এবার ছিলেন না—পুরোনোদের মধ্যে ছিলেন মার্টিন্, য়্যাট্‌কিনসন্, লাম্‌স্‌ডেন আর নেষ্টর। নেষ্টরের খেলাই হচ্ছে সব-চেয়ে উপভোগ্য। এরাটুন্, ডেভিড্‌সন্ ভ্রাতৃদ্বয়—এঁরাও বেশ ভাল খেলেছেন। এ বছর লীগে এবং বেইটনে কোন ম্যাচেই রেঞ্জার্স্‌কে কেউ হারাতে পারে নি।

লীগে দ্বিতীয় হয়েছে কাষ্টম্স্। এরা গোড়ার দিকে খুব ভাল খেলেছিল কিন্তু শেষে তাদের মাসুদ—যিনি নিঃসন্দেহ এখনকার শ্রেষ্ঠ হাফ্‌ব্যাক্—না থাকায় এরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। লীগ্ না পাওয়ার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই। কাষ্টম্‌সের ক্লড্ ডিফোল্ড্‌স্ এবং ওয়েষ্টন্ খুব ভাল খেলেছেন। ডিফোল্ড্‌স্‌ই এবার লীগে সব চেয়ে বেশী গোল দিয়েছেন—সবশুদ্ধ ১৫ খানা।

তৃতীয় হচ্ছে পুলিশ। এরা মোহনবাগানের সঙ্গে পয়েণ্টে সমান হয়েছে কিন্তু গোল বেশী দেওয়ায় উপরে আছে। এদের স্মিথ্ একজন উঁচুদরের খেলোয়াড়।

চতুর্থ হচ্ছে মোহনবাগান। ফুটবলে মোহনবাগান বল্‌তে লোকে অজ্ঞান, এবার হকিতেও হয়েছে তাই। এদের পি, দাস, দেব, খাঁ, সেন প্রভৃতি অতি সুন্দর খেলা দেখিয়েছেন। দেবের ষ্টিক্‌ওয়ার্ক্ খুবই সুন্দর। সেন তেমনি দ্রুত। খাঁও চমৎকার। মোহনবাগানের রক্ষণবিভাগও খুব ভাল।

এর পরে যারা আছে তাদের আর নাম করার মত বৈশিষ্ট্য নেই। সেণ্ট্ যোসেফ্, ভবানীপুর, গ্রীয়ার—কেউই ভাল খেলা দেখাতে পারে নি। অথচ গ্রীয়ারই একমাত্র লীগ্-বিজয়ী বাঙ্গালী টিম্। এবার দ্বিতীয় বিভাগে নাম্‌ল বি, জি, প্রেস্ ও পোর্ট কমিশনার, প্রথম বিভাগে উঠ্‌ল মহামেডান্ স্পোর্টিং ও ডালহৌসী—যারা গত বছর দ্বিতীয় বিভাগে নেমেছিল।

বেইটন্ কাপে এবারকার বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে মোহনবাগানের খেলা। তৃতীয় রাউণ্ডে তারা গেল বারের বেইটন্-বিজয়ী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঝান্সী হিরোজ্‌কে হারিয়ে দেয়;—সেই ঝান্সী—যে দলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় দুই ভাই ধ্যানচাঁদ আর রূপসিং খেলেন। ধ্যানচাঁদ অবশ্য দেরী করে আসায় সেদিন খেলতে পারেন নি কিন্তু রূপসিং ছিলেন। মোহনবাগান সেদিন খুব ভাল খেলেছিল বিশেষতঃ তাদের পি, দাস। চতুর্থ রাউণ্ডে পুলিশকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান রেঞ্জার্সের কাছে হেরে যায়। কাষ্টম্স্ হারে ই-আই-আর-এর কাছে। ফাইনাল হয় ই-আই-আর এবং রেঞ্জার্সে। অগুণতি সুযোগ পেয়েও ই-আই-আর গোল দিতে পার্‌ল না, উল্টে দু'-গোল খেয়ে রেঞ্জার্সের হাতে কাপ্ দিয়ে গেল।

ধ্যানচাঁদ আসার পর ঝান্সী হিরোজ্ লক্ষ্মীবিলাস কাপের ফাইনালে জেতে। বিপক্ষে পড়েছিল এলাহাবাদের এম্-ওয়াই-এ। এরা খুব শক্তিশালী দল—মোহনবাগানকে খুব বিশ্রী ভাবে হারিয়েছিল। মাঝে মাঝে দু'-একটা অত্যদ্ভুত কৌশল দেখান ছাড়া ধ্যানচাঁদের খেলা গেল বারের মত হয় নি, তবে রূপসিং তাঁর নাম অনুযায়ীই অতি চমৎকার খেলা দেখিয়ে গেছেন।

শিশুর প্রশ্ন

(শ্রীঅমিয়া দেবী)

মাগো, আমায় সত্যি ক'রে বল্,
করিস্ নেকো ছল,
চাঁদের বুড়ী মা নাকি গো থাকে চাঁদের দেশে
কাজ কিছু নাই, দিনে-রেতে চরকা কাটে বসে ?

তবু কেন মায়ের বুকে ঘুমোয় নাকো চাঁদ,
পাতে সারাটি রাত মেঘের সাথে লুকোচুরির ফাঁদ ?
মা কি তারে নেয় না কোলে তুলে ?
চরকা নিয়ে সদাই থাকে ভুলে ?

সাঁঝের বেলা তারাগুলো দলে দলে আসে,
অন্ধকারে মিটি-মিটি হাসে ;
দুষ্টু ছেলের মত,
ওমা, রাতের বেলাই ওদের কি গো মজার খেলা যত ?
চোখের পাতায় দিয়ে হাজার চুমো
ওদের মা কি বলে নাকো 'ঘুমো খোকন্, ঘুমো ?'

আচ্ছা মাগো, সবাই বলে গাছরা মাটীর ছেলে,
বাঁচবে না তো মাটীর বুকের রস যদি না মেলে।
তবে কেন ফুলগুলো সব সমস্ত রাত জাগে,
সন্ধ্যে থেকেই ওদের মাঝে হাসির মাতন লাগে ?
সারাটি রাত আপন মনে বাতাস-দোলায় দোলে ?
মা কি ওদের ডাকে নাকো কোলে ?
ঘুমের মাসি, ঘুমের পিসি নেই কি ওদের দেশে ?
নিদের কাজল বুলায় নাকি চুপি চুপি এসে ?

মাগো, গভীর রাতে শুনি থেকে থেকে
গাছের ডালে হুতোম প্যাঁচা ওঠে ডেকে ডেকে ;
শুনে আমার বুকের মাঝে জাগে ব্যথার ঢেউ,
কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে নেই কি মা ওর কেউ ?

... ওই দেখ্ মা, গাছের পাতায় জোনাকীদের নাচ,
প'রে জরির সাজ
ওরা কি মা সারাটি রাত এম্‌নিতরই নাচে ?
গাছের পাতায় রুণুঝুণু বায়ুর বেণু বাজে ?

তুই মা নিতি বলিস্ কেন 'রাত যে হ'ল কত,
ঘুমোও খোকন লক্ষ্মী ছেলের মত।'
সবাই যদি দুষ্টু হ'য়ে রাতের বেলায় খেলে,
আমি শুধু একলা কেন হব লক্ষ্মী ছেলে ?
মাগো, আমায় একটি বারের তরে
ছেড়ে দে না, ঘরের মাঝে বিছানাতে রাখিস্ নেকো ধ'রে।
আজকে আমি দুষ্টু ছেলেই হ'ব,
সারাটি রাত জেগেই শুধু র'ব,
দেখ্‌ব ওদের কখন্ ভাঙ্গে খেলা,
ঘুমের মাসি আসে কি না আসে ভোরের বেলা।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

জ্যৈষ্ঠে

[জ-এর জাঁকজমক]

(শ্রীঅধীররঞ্জন দে)

জ্যৈষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের জীবন জালাময়। জাহ্নবীর জলে জীবন জুড়ায়। জ্যৈষ্ঠের জ্যোৎস্না জগৎ-জনোপভোগ্য। জ্যৈষ্ঠে জামরুল জমকালো ; জায়গায় জায়গায় জামও জন্মায়। জ্যৈষ্ঠের জামাই-ষষ্ঠীতে জিভে জল জমে। জামাতাদের জয়জয়কার! জ্যৈষ্ঠে জলধর জলপূর্ণ, জ্যৈষ্ঠশেষের জলধারায় জগৎও জলময়।

গ্রাহকের তোলা
ছবি
শ্রীতপেশচন্দ্র হালদার
গৃহীত ফটো

উশ্রী জলপ্রপাত—গিরিডি

শিলং

(শ্রীঅজিতকুমার দত্ত)

গত বছর পূজোর ছুটীতে আমরা শিলং গিয়েছিলাম। শিলং সহরটি মন্দ নয়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। পাহাড়ের মাঝে সুন্দর সহর দূর থেকে আরো সুন্দর দেখায়। উপরে তার নীল আকাশ, আর তার চারদিকে সবুজ পাহাড়।

এখানে অনেকগুলি ঝরণা আছে; যেমন—বিশপ্, সতী, সুইট্, ব্রিনোলাইন্ ইত্যাদি। তা ছাড়া সেভেন ফল্‌স্ ব'লে আর একটি ঝরণা আছে, এর সাতটি মুখ। তোমরা এই রকম একটা ঝরণা মনের মধ্যে এঁকে নাও; আর তার সাতটি মুখ দিয়ে ঝর্ঝর্ ক'রে জল পড়লে কেমন দেখায় বল ত? শিলংএর লেক্‌টিও অতি সুন্দর। আমরা যেখানে থাকতাম সেখান থেকে লেক্‌টি অতি কাছে ছিল।

শিলং থেকে কিছু দূরে চেরাপুঞ্জী বলে একটা জায়গা আছে। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আরো সুন্দর। এখানেও অনেক ঝরণা আছে, বাস্ কিংবা মোটরে ক'রে সেখানে যাওয়া যায়।

এখানে ডাঃ বিধান রায় ও তাঁর ভাইয়ের একটা ইলেক্‌ট্রিক্ পাওয়ার হাউস্ আছে। সেটা কিন্তু কলকাতার মত নয়। ঝরণার জলের সাহায্যে এখানে বিদ্যুৎ তৈরী হয়। এই পাওয়ার

হাউস্ দেখ্‌তে গিয়ে একজন বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তাঁর কাছে আমরা খাসিয়াদের কয়েকটি মজার আইন-কানুন শুনলাম। এদের বিবাহের সময়ে পাত্রী যায় বরের বাড়ীতে বিবাহ করতে। তা ছাড়া বাপের সম্পত্তি নাকি আমাদের দেশের মত ছেলেরা পায় না, পায় ভাগ্‌নে।

এখানকার সব বাড়ীই কিন্তু কাঠের, আমাদের বাড়ীর মত ইটের নয়। এখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়, কিন্তু ভূমিকম্প হলেও লোকেদের একটুও ভয় নেই; আমাদের মত তারা ঘর ছেড়ে বাইরেও বেরোয় না। রাত্রিবেলায় হয়ত আরামে ঘুমচ্ছে, এমন সময় ভূমিকম্প হ'ল। কিন্তু তারা শুয়েই থাকে, আর তাদের আস্‌বাবপত্র, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি নাচতে থাকে। কেমন মজা বল ত'!

চিঠি-পত্র

শ্রীঅধীররঞ্জন দে—"আমার দিদি শ্রীযুক্তা ননীবালা দত্ত, এম্-এ, বি-টি রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের একটি পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক। 'রামধনুতে র-এর রকমারি' নাম দিয়া শুধু 'র' অক্ষরযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া একটি কবিতা লিখিতে হইবে (যেমন বৈশাখে "গ্রীষ্মকাল" বাহির হইয়াছিল)। কবিতার সঙ্গে রামধনুর গ্রাহক নং ও গ্রাহকের ঠিকানা দিতে হইবে। সব চেয়ে ভাল কবিতাটি আমরা রামধনু-সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিব এবং পুরস্কার (বই) গ্রাহকের ঠিকানায় পাঠাইব। ২৮শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় কবিতা পাঠাইতে হইবে। শ্রীননীবালা দত্ত, এম্-এ, বি-টি; C/o শ্রীকুঞ্জমোহন দে, A. S. O. & S. D. M. Settlement Officer, বর্দ্ধমান।"

শ্রীজ্ঞানশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়—আমাদের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় ('জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী') বাঁকুড়ার শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১ম ও রামধনুর গ্রাহক শ্রীদেবকীনন্দন অধিকারী ২য় হইয়াছেন।

শ্রীনবকুমার কুণ্ডু—বৈশাখের রামধনুতে প্রকাশিত ছবি 'বারাকপুরের গঙ্গা'র তরুণ শিল্পীর সহিত পরিচিত হইতে চাই। তাঁর ঠিকানা কি? (ঠিকানা—৫৩বি, গর্চা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—রাঃ সঃ)

শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত (২০, রাণীশঙ্করী লেন, কালিঘাট) ও শ্রীসুনীল ব্যানার্জ্জি (৭, ক্লার্ক্ ষ্ট্রীট, কালিঘাট) আমরা গ্রাহকদের সহিত ডাকটিকেট পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক।

স্থানাভাবে অনেক চিঠি দেওয়া গেল না, আগামী বারে বাহির হইবে।)

সন্দেশ

এবারকার 'খ্যাওলা থেকে মানুষ' প্রবন্ধে তোমরা পড়িয়াছ বাছাই করার ফলে কেমন করিয়া কয়েক পুরুষ পরে এক জাতের গাছকে সম্পূর্ণ অন্য চেহারায় আনিয়া দাঁড় করান' যায়। নীচের ছবিটায় এরই একটা নমুনা দেখ। বাঁ দিকে যে বাজে শিকড়টিকে দেখিতেছ, বাছাই করার ফলে ঐটাই ক্রমে ক্রমে বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে কয়েক পুরুষ পরে একেবারে ডান দিকের মূলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। 'ক্রমে ক্রমে' কেমন করিয়া এই ব্যাপারটি হইল মাঝের শিকড়গুলিতে তাই দেখান হইয়াছে।

* * *

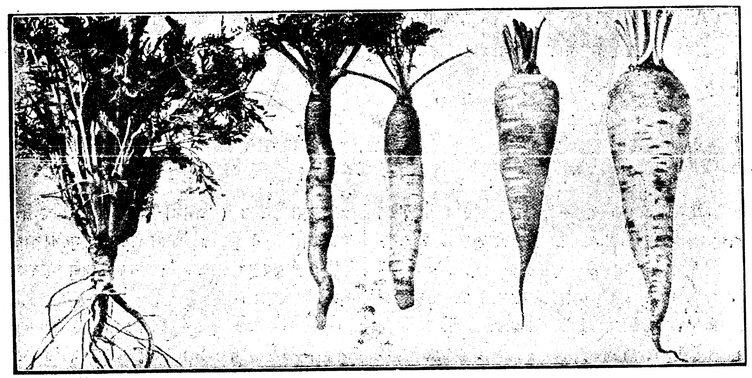

বাঁ দিকের বাজে শিকড়টিই ক্রমে ডান দিকের মূলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরার খনিতে মজুরেরা যাতে হীরা চুরি করিতে না পারে তার জন্য আজকাল এক্স-রের সাহায্য লওয়া হইতেছে। চোরেরা অনেক সময় হীরা গিলিয়া ফেলে, কিংবা হাতে-পায়ে গর্ত্ত করিয়া তার মধ্যে হীরা লুকাইয়া রাখে। মানুষের চোখকে ঠকাইলেও এক্স্-রেকে এই ভাবে ঠকান' যায় না।

* * *

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের যে সব সম্পত্তি আছে তা বিক্রী করিলে বোধ হয় তিনিই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইতেন। সম্পত্তির একটু আভাস দিতেছি। রাজকীয় ভোজের জন্য যে সব আসবাব আছে তারই দাম কম্ করিয়া দেড় কোটি টাকা হইবে।

* * *

স্পেনের একটি ব্যাঙ্কে একটি ছোট্ট মার্ব্বেলের পুতুল আছে। পুতুলটি আশ্চর্য্য রকম সুন্দর এবং অত্যন্ত পুরানো—৩০০ খৃষ্টাব্দের একটি কবরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া এটি একটি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য নমুনা। পুতুলটির দাম ১ লক্ষ পাউণ্ড্। পৃথিবীর মধ্যে এটাই বোধ হয় এখন সব চাইতে দামী পুতুল।

গত বছর বিদেশ হইতে ৮৩ লক্ষ টাকার সাবান, ৯৭ লক্ষ টাকার তামাক ও চুরুট, ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মদ, ৯৩ লক্ষ টাকার প্রসাধনের জিনিষ, ৪৮ লক্ষ টাকার খেলনা এবং ৮ লক্ষ টাকার বাজী আমদানী হইয়াছিল। তার আগের বছর আসিয়াছিল সাবান ৮৯ লক্ষ টাকার, তামাক ৯৫ লক্ষ টাকার, মদ ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার, প্রসাধনসামগ্রী ৭১ লক্ষ টাকার, খেলনা ৩৮ লক্ষ টাকার এবং বাজী ৫ লক্ষ টাকার।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মশা, মাছি, বিছা, পিশু, আরসোলা, প্রজাপতি।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

তাপসকুমার ভৌমিক (রংপুর); মাণিক; নারাণ, হাস্থ, তত্ত্বভারতী, কাকাবাবু, ছোটকাকা, কালী, গোপাল (পুরুলিয়া); জন্, রেম্, পিন্, কুঙ্কুম ও বাদল (মালদহ); অনসূয়া সান্যাল ও অরুণা সান্যাল (কুষ্টিয়া); তারা, গিরিধারী, মান্ত, অপু, বুলবুলি, ছোটকা (নশীপুর—মুর্শিদাবাদ); ৭৫ নং দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডস্থ কর্পোরেশন ফ্রি প্রাইমারী বালিকা-বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ; সোনু, মনু, মোহন, জগা, ভোলা, খুসি (বসিরহাট); সুরমা, প্রতিমা, বেলা, বৌদি, মেজবৌদি, সতী, ভুনি, প্রীতি (পাঁতিহাল), অমিতাভ, স্নেহমুকুল, বুল্‌বুল্ (কুতুবপুর—রঙ্গপুর); বাদল, সতু, খোকন, অমল, রটিক, সমীর, সুধাময়, অপু, রেখা, কাপু প্রভৃতি (পুরুলিয়া); যামিনী (বাবুঘাট); চিরু, কানু, দীপু, শতদল, মামা (কলিকাতা); সন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত (ভবানীপুর); জ্যোৎস্না ঘোষ (বগুড়া); ধর্ম্মদাস, দিলীপ, মনু, বকু, সেফু, লক্ষ্মী, বঙ্কিম, অনিল, রাসবিহারী, অরুণ প্রভৃতি (পুরুলিয়া)।

যাঁহাদের একটি ভুল হইয়াছে—

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ); রথীন্দ্রনাথ মিত্র (কালিঘাট); চন্দ্রশেখর প্রসাদ দে, বীণা, রথী, বড়দা, বৌদি, ছোড়দি, মেজদা, লীলা, ছায়া, ফণিদা প্রভৃতি (জামালপুর); অধীররঞ্জন দে, ভোলা, ভানু, কাশী, মণ্টু, বলাই, প্রবেশ, মনাবাবু, চঞ্চল, অসিত (বর্দ্ধমান); খুড়ো, বুদো, উদো, হীরু, শঙ্কু, মাইতি, ক্ষেপা, শ্যামা, হীরালালপ্রসাদ ও শশাঙ্কশেখর বসু (বেহালা); শঙ্করকুমার মিত্র (ভবানীপুর); সুনীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান, রবি, অনিল, আলোক, অশোক, রমাদি, নন্দদুলাল, সরোজদা, বিমল প্রভৃতি (ভবানীপুর); পঙ্কজকুমার ভৌমিক (উত্তরপাড়া); সুললিত, অমিয়া (মুড়াগাছা); অমর ও প্রতিভা (মুড়াগাছা); সুমুখনাথ মিত্র, রাণী, হরি, জ্যোতিঃ, বেণু, ভানু, লক্ষ্মী, গৌরী (দিনাজপুর); সুধীরচন্দ্র দাস

(ভবানীপুর) ; অজয়কুমার দাস ও অরুণা (বালীগঞ্জ) ; প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ) ; দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর—হাওড়া) ; ব্যোমকেশ রাহা (নন্দনকানন—চট্টগ্রাম)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

ডলি, তুলতুল, মেজকাকা, সেজদি, মেজদি, দিদি, দাদামণি (ভবানীপুর) ; পানু, ভানু, অনাথদা, বাবা, মা, চান্‌দা, মহিম, উপেন্দ্র, শরৎ (সেরপুরটাউন—ময়মনসিংহ) ; বিজু, শম্ভু, বোনা, অবনীদা, যশু, ননী, উপি, গেনু, ভুটু, গেঁড়া প্রভৃতি (রাধামোহনপুর) ; রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (মির্জ্জাপুর) ; নিখিলকুমার চৌধুরী, হেমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (নওগাঁ) ; সত্যেন, নীলরতন, স্মৃতি, কনককুমার সিংহ (বর্দ্ধমান) ; সুশান্ত, বৌদি, ছোটকা, দাদা, ডলি, টুটু, বড়কা (কলিকাতা)।

নূতন প্রশ্ন

(শ্রীবিশ্বজিৎ রায়)

নীচে একখানি চিঠি দেওয়া হইল। '——' চিহ্নিত স্থানে বাঙ্গালীদের এক-একটি পদবী (যেমন—ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি) দিলেই চিঠিখানি পড়া যাইবে। একই পদবী দু'বার দেওয়া চলিবে না।

ভাই শ্রী——,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমাদের —— ——টিকে নাকি আজকাল ——ার ভিতর রাখ ? অনেক চিড়িয়াখানায়ও ঐরূপেই —— হয়।

একটি —— কথা বলিতেছি, কাহাকেও —— করিয়া বলিও——ণক —— বলিয়াছেন যে মোকর্দ্দমার —— আমাদের অনুকূলেই ——ওয়া হইবে।

ভাল কথা, গো——এর সহিত কখনও ——ী করিও না, তাহাকে নাকি গুণ্ডা ——ণা করা হইয়াছে। সু——া পাশ করাতে ——তার কাছে ভোগ দেওয়া হইয়াছে। সু—— মামার খবর কি ? ——ক নেওয়ার কি হইল ? তিনি নাকি নে—— চলিলেন ? স——কল সংবাদ দিও। আসিবার সময় কিছু ——মচা ও ক——তে করিয়া আসিও। আর কি লিখি——ন্দর মামাকে প্রণাম। ইতি —— ——।

ভ্রম সংশোধন—এ মাসের ২৩৩ পৃষ্ঠায় 'জন্মদিনের উপহার' গল্পের প্রথম লাইনে 'বৃন্ত্য' স্থলে বৃন্ত হইবে।

রামধনু—

ফকির

শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে।

৭ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দোলন চাঁপা

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

দোলন চাঁপা! দোলন চাঁপা! দুল্‌ছ কেন ভাই?
আমি জান্‌তে তাহা চাই।
ঝিক্‌মিকিয়ে আলো দোলে
ফাগুন-ফোটা ফুলের কোলে,
হেসে হেসে ডালিম ফুলের
দোলার বিরাম নাই—
তুমি দুল্‌ছ বুঝি তাই?

দোলন চাঁপা! সোনার চাঁপা! ভর্‌ল তোমার বুক
নীল আকাশের সোনায় রাঙা আলোটী উৎসুক!
নাচ্‌ছে খোকন আঙিনাতে,
মা তালি দেন সাথে সাথে
সোনার হাসি কচি ঠোঁটে
উপ্‌ছে পড়ে তাই;
তুমি তাই কি দোল ভাই?

দোলন চাঁপা! তোমার মুখে পড়্‌ল সাঁঝের আলো
তুমি বাস্‌লে কারে ভালো?
তোমার দোলন দেখে দেখে
মেঘরা বুঝি দুল্‌তে শেখে,
বকুল-ডালে বকুল ঝ'রে
দেখ্‌ছে চেয়ে তাই;
তোমার দোলার বিরাম নাই।

চিকন পাতায় কাঁপ্‌ছে বাতাস, ফুলরা পড়ে ঝ'রে—
তোমার দোলায় সাঁঝের সারা আকাশ গেছে ভ'রে।
হঠাৎ মেঘের ঘোমটা খুলে
গোল চাঁদটী উঠ্‌ল দুলে
আকাশ বেয়ে ঝর্‌ছে হাসি
খুসীর সীমা নাই।
দেখে দুল্‌ছ তুমি ভাই?

বরফের কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এস্‌-সি)

উঃ, কি গরমটাই না পড়িয়াছে! কার সাধ্য দু'দণ্ড সুস্থির হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে? দরজা-জানালা আঁটিয়া পাখা চালাইয়া দিয়া বসিয়া আছি কিন্তু পিপাসার হাত হইতে নিস্তার নাই। কি করিব, বসিয়া বসিয়া শুধু ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম এমন সময় আমার ভাই-ঝি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কাকা, বওফ খাবে? এই নাও।" বওফ অর্থাৎ বরফ—ছোট্ট এক টুক্‌রা জমান' জল, কিন্তু মুখের মধ্যে পুরিয়া দিতে মনে হইল একেবারে বুঝি কুম্ভীপাক হইতে ব্রহ্মলোকে গিয়া হাজির হইলাম। মনে মনে বলিলাম, "ভগবান্‌, তুমি আছ।"

বাস্তবিক গ্রীষ্মের দিনে বরফ ভগবানের একটা মস্ত আশীর্ব্বাদ সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানে মনের মধ্যে না উঠিয়া পারে না। জল ঠাণ্ডা হইলে জমিয়া গিয়া বরফ হয় তা তোমরা সবাই জান। শীতপ্রধান দেশে শীতের সময় বরফ পাওয়া কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু এই গরমে—এই এক শ' চার—পাঁচ—দশ ডিগ্রী উত্তাপের সময় ৩২ ডিগ্রীর বরফ রাশি রাশি কেমন করিয়া আসিতেছে? (জল ঠাণ্ডা হইয়া ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইট্‌ কিংবা শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্‌ হইলেই বরফ হয়।) হিমালয়ের চূড়া হইতে বরফ কাটিয়া কাটিয়া আর কেউ নিশ্চয়ই পার্সেল্‌ করিয়া পাঠাইতেছে না! আসিতেছে কারখানা হইতেই; কিন্তু সেখানেই বা এই অদ্ভুত ব্যাপারটি কেমন করিয়া সম্ভব হইতেছে? সেই সম্বন্ধে আজ তোমাদের কিছু বলিব।

হাতের উপর খানিকটা মেথিলেটেড্‌ স্পিরিট্‌ পড়িলে একটু পরেই কি হয় বল তো? স্পিরিট্‌টা উড়িয়া যায় আর হাতটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হয়। য়্যালকহল্‌, কর্পূর প্রভৃতি আরও কতকগুলি জিনিষ পড়িলেও অমনি ধারা হয়। কিন্তু কেন হয় বলিতে পার কি? স্পিরিট্‌ উড়িয়া যাওয়া মানে কি? স্পিরিটের তরল অবস্থা হইতে বায়বীয় অর্থাৎ বাতাসের মত অবস্থায় বদ্‌লান। এই পরিবর্ত্তন আপনা-আপনি হইতেছে মনে হইলেও আসলে ঠিক তা নয়। তরল জিনিষকে

বায়বীয় অবস্থায় আনিতে হইলে তা ঠিক আপনা-আপনি হয় না, তার জন্য কোন রকমের খানিকটা শক্তির দরকার। উত্তাপ এই ধরণের একটা শক্তি। স্পিরিট্ তার উড়িবার শক্তি সংগ্রহ করে হাতের উপর হইতে উত্তাপ টানিয়া লইয়া। কাজেই স্পিরিট্ উবিয়া গেলে হাতটা ঠাণ্ডা বোধ হয়। অনেক বরফের কারখানায় এই ব্যাপারটিকেই কাজে খাটান হয়।

জলশূন্য য়্যামোনিয়া অনেকটা স্পিরিট গোছের জিনিষ। এটি তরল এবং বায়বীয় দুই অবস্থায়ই পাওয়া যায়। খানিকটা তরল য়্যামোনিয়া খোলা পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিলে আপনা-আপনি ফুটিতে থাকে এবং উড়িয়া বায়বীয় অবস্থায় গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ য়্যামোনিয়াকে সাধারণ অবস্থায় না রাখিয়া যদি খুব চাপের মধ্যে রাখা যায় তবে তা তরল অবস্থায়ই থাকে—অবশ্য বায়বীয় অবস্থায় বদ্‌লাইবার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটী হয় না। এখন, বরফের কারখানায় করা হয় কি, এই ধরণের জলশূন্য য়্যামোনিয়াকে অত্যন্ত চাপ দিয়া তরল করিয়া নিয়া কতকগুলি নলের ভিতর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঐ নলগুলি আবার ডুবান থাকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লবণ-জলের চৌবাচ্চার মধ্যে। নলের ভিতর ছাড়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে য়্যামোনিয়া তরল অবস্থা ছাড়িয়া বায়বীয় অবস্থায় বদ্‌লাইতে থাকে আর এই পরিবর্ত্তনের জন্য যে শক্তির দরকার তা যোগাড় করে ঐ লবণ-জলের ভিতরকার তাপ হইতে। ফলে লবণ-জল ঠাণ্ডা হইতে থাকে। ক্রমাগতঃ এই রকম করিতে করিতে ক্রমে লবণ-জলের উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ অথবা ৩২ ডিগ্রী ফারেন-

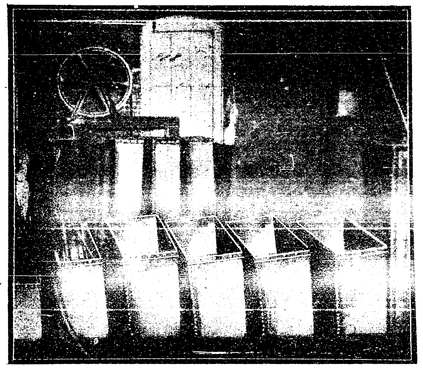

বরফ-কারখানার একটি দৃশ্য। এই চৌকা পাত্রগুলির মধ্যে জল ভরিয়া সেগুলি মেঝের নীচে ঠাণ্ডা লবণ-জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

হাইট্ (দু'টি একই জিনিষ)—এরও নীচে চলিয়া যায়। এদিকে কতকগুলি বড় বড় চৌকা বাক্সের মত পাত্রের মধ্যে পরিষ্কার (সাধারণতঃ ডিষ্টিল্ করা) জল ভরিয়া পাত্রের মুখ বেশ করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। তার পর সেগুলিকে ঐ লবণ-জলের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। লবণ-জলের চৌবাচ্চা সাধারণতঃ থাকে ঘরের মেঝের নীচে; জলের পাত্র বসাইয়া আল্‌গা টালি দিয়া তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা জিনিষের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে সব জিনিষই ঠাণ্ডা হয়, পাত্রের জলও ঠাণ্ডা হইতে থাকে। উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেরও কম না হইলে লবণ-জল জমে না, কিন্তু সাধারণ জল ঠিক শূন্য ডিগ্রীতে নামিলেই জমিতে থাকে। কাজেই খানিকক্ষণ ঐ ঠাণ্ডা লবণ-জলে থাকিলে পাত্রের জল সমস্তটাই জমিয়া বরফ হইয়া যায়। জলের পাত্রগুলিকে সাধারণতঃ ৪৮ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখা হয়।

বরফ জমিলে সেগুলি পাত্রের গায়ে এত আঁট হইয়া লাগিয়া থাকে যে ছাড়ানই হয় মুশ্‌কিল। তাই বরফ জমিলে পাত্রগুলিকে তুলিয়া আনিয়া প্রথমেই এক মুহূর্ত্তের জন্য সেগুলিকে একটা গরম জলের চৌবাচ্চায় ডুবাইয়া দেওয়া হয়। এর ফলে পাত্রের ঠিক গায়ের কাছাকাছি বরফগুলি গলিয়া জল হইয়া যায় এবং ঝাঁকুনি দিলেই ভিতরকার বরফের চাঁই বাহির হইয়া আসে। বড় বড় কারখানায় এ সমস্তই কিন্তু কলে করা হয়।

বরফের চাঁই তৈরী হইলে বাজারে পাঠাইবার আগে তাদের গুদামে রাখিতে হয়। এই গুদাম সাধারণ কারখানার গুদামের মত হইলে চলে না—বরফ তো তা হইলে আবার গলিয়া যে জল সে জলে গিয়া দাঁড়াইবে। বরফের গুদাম আগাগোড়া এমন ভাবে তৈরী করিতে হয় যার মধ্যে উত্তাপ যাওয়া-আসা করিতে পারে না। গুদামের দেয়ালগুলি সাধারণতঃ করাতের গুঁড়া আর কাঠ দিয়া তৈরী হয়;—এগুলির ভিতর দিয়া উত্তাপ বিশেষ ঢুকিতেও পারে না, বাহির হইতেও পারে না। গুদাম ঠাণ্ডা রাখিবার অন্যান্য বন্দোবস্তও থাকে। বরফ বাজারে পাঠাইবার সময় সেগুলিকে ভাল করিয়া করাতের গুঁড়া দিয়া মুড়িয়া পাঠান হয় তা' তো তোমরা দেখিয়াছই। এও ঐ উত্তাপ আটকাইয়া রাখিবার জন্যই।

যে য়্যামোনিয়ার সাহায্যে লবণ-জল ঠাণ্ডা করা হইল সেগুলিকে কিন্তু উড়িয়া

চলিয়া যাইতে দেওয়া হয় না—তা' হইলে নিত্য নূতন য়্যামোনিয়া কিনিবার খরচই দারুণ পড়িয়া যাইত, চার পয়সা করিয়া বরফের সের দেওয়া সম্ভব হইত না। ঐ বায়বীয় জলশূন্য য়্যামোনিয়াগুলিকে নলের ভিতর দিয়া নিয়া আবার বড় বড় এঞ্জিনের সাহায্যে চাপ দেওয়া হয়। এর ফলে অবশ্য সেগুলি গরম হইয়া পড়ে কিন্তু তা ঠাণ্ডা করিবার উপায় কর্ত্তাদের জানা আছে। ঐ নলগুলির উপর দিয়া অনবরত ঠাণ্ডা জল ঝরিতে থাকে, ফলে খানিক পরেই চাপ আর ঠাণ্ডায় মিলিয়া সে য়্যামোনিয়া আবার তরল হইয়া যায়। সেই তরল য়্যামোনিয়া আবার লবণ-জল ঠাণ্ডা করিবার কাজে ব্যবহার করা চলে। এমনি ভাবে একই য়্যামোনিয়া বার বার কাজে লাগান হয়।

যে এঞ্জিন দিয়া য়্যামোনিয়াকে চাপ দেওয়া হয় তা চালাইতে অবশ্য বাষ্পের দরকার এবং সে বাষ্পের জন্য লাগে কয়লা আর আগুন। কাজেই বরফের কারখানায় গেলে একটা মজার দৃশ্য দেখা যায়—একদিকে জ্বলিতেছে আগুন, অপর দিকে বাহির হইতেছে বরফ।

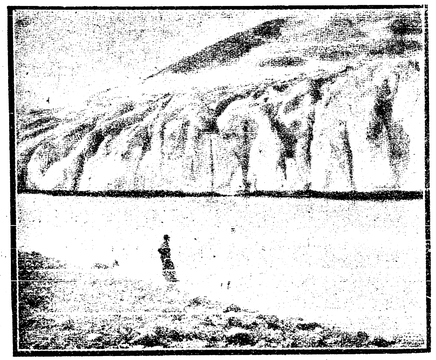

ঠাণ্ডার দেশে শীতকালে খাল-বিল জমিয়া বরফ হইয়া যায়।

কোন কোন জায়গায় অন্য রকম প্রক্রিয়ায়ও বরফ তৈরী করা হয়। অনেক শীত-প্রধান দেশে আবার কষ্ট করিয়া আর কারখানায় বরফ তৈরী করা হয় না। শীতকালে সে দেশের খাল, বিল, নদীর সমস্ত জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। যেখানে যেখানে বেশ পুরু বরফ জমে (অন্ততঃ ১২ ইঞ্চি পুরু) সেখানে বড় বড় করাত দিয়া কিংবা আরও বড় ব্যাপার হইলে ঘোড়া দিয়া লাঙল চাষের মত করিয়া বরফের উপর চারখানা সতরঞ্চির মত দাগ দেওয়া হয়। তার পর সেই

দাগ অনুযায়ী বরফ কাটিয়া ফেলা হয়। অনেক সময় মাইলের পর মাইল জায়গা যুড়িয়া আগাগোড়া এই রকম ছোট ছোট বরফের টুক্‌রা কাটা হয়। তার পর সেগুলিকে সরু খাল কাটিয়া তাতে ভাসাইয়া কিংবা চাকাহীন স্লেজ-গাড়ীতে করিয়া গুদাম-ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। এই সব গুদাম প্রায় বরফ-কারখানার গুদামের মতই, তবে অনেক সময় আরও বড় বড় হয়। গুদামের মধ্যে বরফগুলিকে খুব যত্নের সঙ্গে ঠাসিয়া ভাল করিয়া করাতের গুঁড়ায় মুড়িয়া সাজাইয়া রাখা হয়, আর ঘরটি যা'তে সর্ব্বক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে তার জন্যও যত্ন করিতে কসুর করা হয় না। এই সব গুদামে সারা শীতকাল বরফ জমিয়া থাকে—তার পর যথা সময়ে গরম পড়িলে বাহির করিয়া লইয়া দরকার মত খরচ করা হয়। আমাদের মত গরম দেশে অবশ্য এ সব উপায় খাটে না।

তোমরা কেউ কেউ বোধ হয় মনে করিতেছ—এত বরফ সব গরমের দিনে সরবৎ খাওয়ার জন্যই বুঝি লাগে। তা' মোটেই নয়—খাওয়ার জন্য খুব কম বরফই লাগে। বরফের দরকার হয় আরও অনেক কাজে। তোমাদের কলিকাতার বাজারে প্রত্যহ মাছ আসে কোথা হইতে জান? কলিকাতার গঙ্গা কিংবা কাছাকাছি পুকুর হইতে বেশী নয়—অনেক—অনেক দূর হইতে। গোয়ালন্দের, সারার (পদ্মার) ইলিশ, ধুবড়ীর মাছ এ সব তো হামেশাই আসে—আরও দূরের সামুদ্রিক মাছও কম আসে না। কিন্তু অতদূর হইতে আসিলেও ও সব মাছ কিন্তু একটুও পচে না, প্রায়

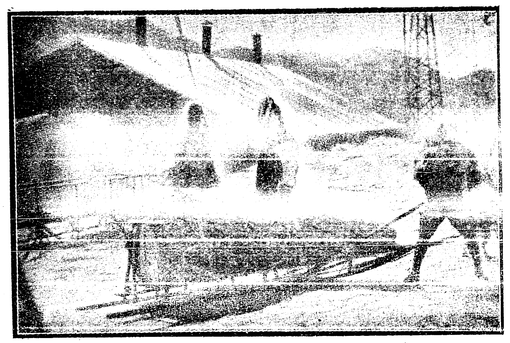

শীতের দেশে তুষার ও বরফে চারিধার ঢাকিয়া গেছে। বরফ কাটিয়া এই সব শ্লেজ-গাড়ীতে করিয়া গুদামে নেওয়া হয়।

টাটকা মাছের মতই তাজা থাকে। কেমন করিয়া থাকে বল তো? এই বরফের গুণে। বরফ দিয়া ঢাকিয়া দিলে কোন জিনিষ সহজে পচে না। যে সব জীবাণুর জন্য জিনিষপত্র পচে ঠাণ্ডা বরফের মধ্যে পড়িয়া তারা জমিয়া অসাড় হইয়া যায়—সব সময়ে না মরিলেও পচাইবার ক্ষমতা তাদের আর থাকে না। শুধু মাছ বলিয়া নয়—ফল, দুধ প্রভৃতি আরও নানা রকম খাবার এই বরফ দিয়া টাটকা রাখা যায়। শুনিলে বিশ্বাস হইতে চায় না—এই বরফেরই কৃপায় ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ঘরে বসিয়া প্রত্যহ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনা টাটকা মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। এই সব ব্যাপারে হাজার হাজার মণ বরফের দরকার।

তা ছাড়া অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে—বড় বড় কারখানায় ওষুধপত্র প্রভৃতি রকমারি জিনিষ তৈরী করিতেও প্রত্যহ রাশি রাশি মণ বরফ লাগে।

মণ্টুর মাষ্টার

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

বি-এ পাশ করে বসে আছে মিহির, কি করবে কিছুই স্থির নেই। এমন সময়ে দৈনিক আনন্দবাজারে একটা বিজ্ঞাপন দেখ্‌ল কর্ম্মখালির। কোন বনেদী গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের জন্য একজন বি-এ পাশ গৃহশিক্ষক চাই—আহার ও বাসস্থান দেওয়া হবে, তা ছাড়া বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা।

বিজ্ঞাপনটা পড়েই লাফিয়ে উঠ্‌ল মিহির, এই রকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল সে। খাওয়া-থাকাটা অমনিই হবে, তা ছাড়া ত্রিশ টাকা মাসে—কিছু কিছু বাড়ীও পাঠাতে পারবে, এম্‌-এটাও পড়া হবে সেই সঙ্গে, সিনেমা-ফুটবল্‌ম্যাচ্‌ দেখার মত পকেট খরচারও অভাব হবে না।

এক বার তার মনে হ'ল এই বিজ্ঞাপনটা এর আগেও যেন সে দেখেছে আনন্দবাজারে। হ্যাঁ, প্রায়ই সে দেখেছে। গত বছরেও দেখেছে, তখনই তার ইচ্ছা হয়েছিল একটা আবেদন

করে দেয় কিন্তু তখনো সে বি-এ পাশ করেনি। খুব সম্ভব ছেলেটি একটা গাধাকান্ত—তাই বেতন ভারী দেখে লোকে এগুলেও ছেলে আবার তার চেয়ে ভারী দেখে পিছিয়ে পড়ে।

সে কিন্তু পেছোবে না, প্রাণপণে পড়াবে ছেলেটাকে—পড়াতে গিয়ে যদি পাগল হয়ে যেতে হয় তবুও। ত্রিশ টাকা কম টাকা নয়—তার জন্য গাধা পিটিয়ে মানুষ করা আর বেশি কথা কি, মানুষ পিটিয়েও গাধা বানানো যায়। ভদ্রলোক অতগুলো টাকা কি মাগ্‌না দিচ্ছেন?

বিকেলেই মিহির সেই ঠিকানায় গেল। বি-এর সার্টিফিকেট্‌টা সঙ্গেই নিয়ে গেছ্‌ল কিন্তু ভদ্রলোক তা দেখ্‌তেও চাইলেন না, কেবল মিহিরকে পর্য্যবেক্ষণ করলেন আপাদমস্তক। মিহিরই যেন মিহিরের সার্টিফিকেট্‌, মিহির খুসীই হ'ল এতে।

অবশেষে ভদ্রলোক বল্লেন—"তোমার জামাটা একবার খোল তো?"

মিহির ইতস্ততঃ করে। জামা খুল্‌তে হবে কেন? সে বুঝতে পারে না।

"তোমার আপত্তি আছে?"

"না, না।" মিহির জামাটা খুলে ফেলে। ত্রিশ টাকার জন্য জামা খোলা কেন, যদি জামাই হতে হয় তাতেও সে রাজী।

"তুমি এক্‌সার্‌সাইজ্‌ করো?"

"একটু আধটু।"

"বেশ বেশ।" ভদ্রলোককে একটু চিন্তান্বিত দেখা যায়। মিহির ভাবে, এক্‌সার্‌সাইজ্‌ করার অপরাধে চাক্‌রিটা খোয়াল না তো! নাই বল্‌ত কথাটা, কিন্তু কি করেই বা সে জান্‌বে যে ভদ্রলোক এক্‌সার্‌সাইজের ওপর চটা। কিন্তু এও তো ভারী আশ্চর্য্য; সে গ্র্যাজুয়েট্‌ কিনা, কোন্‌ বছরে পাশ করেছে এ সব কিছুই তিনি জিজ্ঞাসা করছেন না।

"আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোমায়।"

মিহির পকেটের মধ্যে সার্টিফিকেটটা বাগিয়ে ধরে—এইবার বোধ হয় সেই প্রশ্ন আস্‌বে। আর সে উত্তর দিয়ে চমৎকৃত করে দেবে যে বি-এ তে সে ডিষ্টিঙ্‌শন্‌ পেয়েছে।

ভদ্রলোক মিহিরকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বল্লেন—"তোমার শরীরটা মন্দ নয়। তোমার ওজন কত?"

ওজন? আকাশ থেকে পড়ে মিহির—অবশেষে কিনা এই প্রশ্ন! "তা দু মণের কাছাকাছি!"

"বেশ বেশ। কিছুদিন টিক্‌তে পারবে তুমি আশা হয়। কি বলিস্‌ মণ্টু, তোর এ-মাষ্টার মশাই কিছুদিন টিকে যাবে, কি মনে হয় তোর?"

মিহিরের ছাত্র কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে সায় দিল—"হ্যাঁ, বাবা, এ-মাষ্টার মশায়ের গায়ে অনেক রক্ত আছে।"

ভদ্রলোক অবশেষে তাঁর রায় প্রকাশ করলেন—"কিছুদিন টেকা আশার কথা, বেশ কিছুদিন টেকাটাই হ'ল আশঙ্কার। যাক্, সবই ভগবানের হাত—"

মণ্টু বাধা দিল—"ভগবানের হাত নয় বাবা,—ছার্—"

"চুপ্। কথার ওপর কথা ক'স্ কেন? কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হ'ল না তোর। হ্যাঁ, দেখ বাপু, পড়াশুনার সঙ্গে একটু এটিকেট্‌ও একে শেখাতে হবে। পিতামাতা গুরুজনদের কথার ওপর কথা বলা, অতিরিক্ত হাসা—এই সব মহৎ দোষ এর সারাতে হবে। বেশ আজ থেকেই ভর্ত্তি হলে তুমি। ত্রিশ টাকাই বেতন হ'ল, মাসের পয়লা তারিখেই মাইনে পাবে, কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে। পুরো এক মাস না পড়ালে, এমন কি একদিন কম হ'লেও একটা টাকাও পাবে না তুমি। পাঁচ দিন দশ দিন পড়িয়ে অনেক প্রাইভেট্ টিউটার ছেড়ে চলে গেছে, সে রকম হ'লে আমি বেতন দিতে পারি না সে কথা আমি আগেই বলে রাখ্‌ছি—"

মণ্টু বল্‌ল, "একজন কেবল বাবা ঊনত্রিশ দিন পর্য্যন্ত ছিলেন—আরেকটা দিন যদি কোন রকমে থাক্‌তে পারতেন, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না।

"থাম্ তুই। তা তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এসো গে। আজ সন্ধ্যা থেকেই ওকে পড়াবে। মণ্টু যা, মাষ্টারমশায়ের ঘরটা দেখিয়ে দে, আর ছোট্ট রামকে বলে দে বেতন-নিবারকে মাষ্টারমশায়ের বিছানা পেড়ে দিতে।"

আগাগোড়াই অদ্ভুত ঠেক্‌ছিল মিহিরের—কিন্তু ত্রিশ টাকা—এক সঙ্গে ত্রিশ টাকা মাসের পয়লা তারিখে পাওয়াটাও কম বিস্ময়ের নয়। চিরকাল মাস গেলে টাকা দিয়েই সে এসেছে—কলেজের টাকা, মেসের টাকা, খবরের কাগজওয়ালার টাকা; এই প্রথম সে মাস গেলে নিজে টাকা পাবে। এই অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ের প্রত্যাশায় ছোটখাট বিস্ময়গুলো সে গা থেকে ঝেড়ে ফেল্‌ল।

সন্ধ্যার আগেই সে জিনিসপত্র নিয়ে ফির্‌ল। বেশ ঘরখানি দিয়েছে তাকে—ভারী পছন্দ হ'ল তার। এমন সাজানো গোছানো ঘরে এর আগে সে থাকে নি। একধারে একটা ড্রেসিং টেবিল—পুরনো হোক্, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। একটা ছোট বুক্‌কেস্‌ও আছে—তার বইগুলো সাজিয়ে রাখ্‌ল তাতে। আর এক ধারে পড়াশুনার টেবিল, তার দু'পাশে দুটো চেয়ার—বুঝল, এই ঘরেই পড়াতে হবে মণ্টুকে। সব চেয়ে সে চমৎকৃত হ'ল নিজের বিছানা দেখে।

ঘরের এক ধারে একখানা খাট, তাতেই তার শোবার বিছানা। চমৎকার গদি-দেওয়া, তার ওপরে তোষক, তার ওপরে ধব্‌ধব্ করছে সদ্য পাট্ ভাঙ্গা বোম্বাই চাদর। ভারী ভদ্রলোক এরা—না, কেবল ভদ্র বল্‌লে এদের অপমান করা হয়, সত্যিই এরা মহৎ লোক।

সত্যিই খাটে শোবার কল্পনা তার ছিল না। জীবনে কখনো সে গদি-মোড়া খাটে শোয়নি। আনন্দের আতিশয্যে সে তখনই একবার গড়িয়ে নিল বিছানায়। আঃ, কি নরম! আজ খুব আরামে ঘুমোনো যাবে—খেয়ে দেয়ে সে ত এসেছেই, আজ আর কোন কাজ নয়, এমন কি মণ্টুকে পড়ানও না, আজ কেবল ঘুম! তোফা একটা ঘুম বেলা আটটা পর্য্যন্ত!

মণ্টু এল বই-পত্র নিয়ে। মিহির প্রস্তাব করল, "এসো, এই বিছানায় বসেই পড়াই।"

"না সার্, আমি ও খাটে বস্‌ব না।"

মিহির বিস্মিত হ'ল, "কেন?"

"আপনি মাষ্টারমশাই গুরুজন, আপনার বিছানায় কি পা ঠেকাতে আছে আমার? বাবা বারণ করেছেন।"

"ওঃ তাই! তা চলো, চেয়ারেই বসি গে।" ক্ষুণ্ণমনে সে চেয়ারে গিয়ে বস্‌ল "কিন্তু যাই বলো, বেশ বিছানাটি তোমাদের। ভারী নরম। বেশ আরাম হবে ঘুমিয়ে।···দেখি তোমার বই।···Beans···বীন্‌স্ মানে জানো?"

মণ্টু ঘাড় নাড়ে।

"Beans মানে বর্‌বটি। বর্‌বটি এক রকম সব্জী—তরকারি হয়, আমরা খাই। Beans দিয়ে একটা সেন্‌টেন্স্ করো দেখি। পারবে?"

মণ্টু ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ। তার পর অনেক ভেবে বলে—"I had been there।"

মিহির অত্যন্ত অবাক্ হয়—এ আবার কি! উঃ, এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে কেন সব মাষ্টার পালিয়ে যায়। গবাকান্ত ব'লে গবাকান্ত! মোরিয়া হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে—"তার মানে কি হ'ল?"

মণ্টুও কম বিস্মিত হয় না—"তার মানে তো খুব সহজ! আপনি বুঝতে পারছেন না? সেখানে আমার বর্‌বটি ছিল।' 'আই হাড্ বিন্ দেয়ার্—আমার ছিল বর্‌বটি সেখানে'—সেইটাই ঘুরিয়ে ভালো বাংলায় হবে 'সেখানে আমার—'।"

"থামো থামো, আর ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না তোমায়। 'আই হাড্ বিন্ দেয়ার্' মানে 'আমি সেখানে ছিলাম'।"

মণ্টু আকাশ থেকে পড়ে—"তবে যে আপনি বল্লেন বিন্ মানে বর্‌বটি? তা হলে, 'আমি সেখানে বর্‌বটি ছিলাম' বলুন!"

মিহির সন্দেহ প্রকাশ করে, "খুব সম্ভব তাই ছিলে তুমি। 'Been' আর 'Bean' কি এক জিনিস হ'ল? বানানের তফাৎ দেখ্‌ছ না? এ-been হ'ল be-ধাতুর form—"

বাধা দিয়ে মণ্টু বলে—"হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না আমাকে। অর্থাৎ কি না এ-been হ'ল মৌমাছির চেহারা। বি মানে মৌমাছি আর ফর্ম্ম মানে চেহারা। আমি জানি।"

বিস্ময়ে হতবাক্ মিহির শুধু বলে, "জানো তুমি?"

"হ্যাঁ, একটু আগেই জেনেছি। আপনি চলে গেলে বাবা বল্লেন কিনা, তোর নতুন মাষ্টার মশায়ের বেশ ফর্ম্ম—তখনই জেনে নিলাম।"

মিহির কথাটা ঠিক ধর্‌তে না পেরে বল্লে "আমার চেহারা মৌমাছির মত? জান্‌তাম না তো। কিন্তু সে কথা যাক্, যে beans মানে বর্‌বটি তা দিয়ে সেন্‌টেন্‌স্ হবে এই রকম—**'Peasants grow beans'** অর্থাৎ 'চাষারা বর্‌বটি ফলায়।' অর্থাৎ 'চাষারা বর্‌বটি উৎপন্ন করে, বরবটির চাষ করে।' বুঝলে?"

মিহির ঘাড় নেড়ে জানায় বুঝেছে।

"অতটা ঘাড় নেড়ো না, ভেঙে যেতে পারে। তোমার তো আর মৌমাছির চেহারা নয় আমার মত। বেশ, বুঝেছ যদি এই রকম আর একটা সেন্‌টেন্‌স্ বানাও দেখি বীন্‌স্ দিয়ে।"

অনেকক্ষণ ধরে মণ্টুর মুখ নড়ে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বা'র হয় না। মিহির হতাশ হয়ে বলে "পারলে না? এই ধর যেমন, our cook cooks beans, আমাদের ঠাকুর বর্‌বটি রাঁধে। এখানে তুমি কুক্ কথাটার দু' রকম ইউস্ পাচ্ছ, একটা নাউন্, আরেকটা ভার্ব্। আচ্ছা, আর একটা সেন্‌টেন্‌স্ কর।"

এতক্ষণে বীন্‌স্ ব্যাপারটা বেশ বোধগম্য হয়ে এসেছে মণ্টুর। সে এবার চট্‌পট্ জবাব দেয়—"we are all human beans।"

"য়্যাঁ? বল কি? আমরা সবাই মানুষ-বর্‌বটি?"

"কেন? বাবাকে অনেকবার বল্‌তে শুনেছি যে হিউম্যান্ বিন্‌স্।"

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মিহির। অর্থাৎ বসে ত সে ছিলই মাথায় হাতটা দেয় কেবল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস এই ছেলেকেই পড়াতে হবে তাকে? ওঃ, এইজন্যই মাষ্টার টিক্‌তে পারে না? কি করে টিক্‌বে? পড়াতে আসা—কুস্তি করতে তো আসা নয়। রোজই যদি এ রকম ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে দুবেলা ওকে পড়াতে হয় তা হলেই ত সে গেছে। তা হ'লে তাকেও পালাতে হবে টুইশানির মায়া ছেড়ে, ত্রিশ টাকার মায়া ছেড়ে, নরম গদির মায়া ছেড়ে—

নাঃ, সে কিছুতেই পালাচ্ছে না। একজন উনত্রিশ দিন পর্য্যন্ত টিকেছিল—আর এক দিন টিক্‌তে পারলেই ত্রিশ টাকা পেত, কিন্তু একটা দিনের জন্য একটাকাও পেল না। বোধ হয়

তার কেবল পাগল হতেই বাকি ছিল—পাগল হয়ে যাবার ভয়ে পালিয়েছে। আর একটা দিন পড়াতে হলেই পাগল হয়ে যেত। কিংবা পাগল হয়েই সে পালিয়ে গেছে: হয় ত, নইলে ত্রিশ ত্রিশটা টাকা কোন সুস্থ মানুষ ছেড়ে যায় কখনো? কী সর্ব্বনাশ! ভাব্‌তেও হৃৎকম্প হয়।

সে কিন্তু চাক্‌রীও ছাড়বে না, পাগলও হবে না, তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মণ্টু যা বলে বলুক—না পড়ে না পড়ুক্—বোঝে বুঝুক্ না বোঝে না বুঝুক্—মণ্টুকে সে বই খুলে পড়িয়ে যাবে—এই মাত্র, ওকে নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামাবে না। আর মাথাই যদি না ঘামায় পাগল হবে কি করে? নির্ব্বিকার ভাবে সে পড়াবে—কোন ভয় নেই তার।

তার গবেষণায় বাধা পড়ে, মণ্টু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে—"বেতন-নিবারক বিছানা—এর ইংরিজি কি হবে সার্?"

"বেতন-নিবারক বিছানা আবার কি?"

"সে একটা জিনিস্। বলুন না, ওর ইংরিজিটা জেনে রাখা দরকার।"

"ও রকম কোন জিনিস হতেই পারে না।"

"হতে পারে না কি, হয়ে রয়েছে। আপনি জানেন না তা হ'লে ওর ইংরিজি। সেই কথা বলুন।"

"ওর ইংরিজি হবে পে-সেভিং বেড্ (Pay-Saving Bed)।"

মণ্টু সন্দেহ প্রকাশ করে—"শেভিং মানে তো কামানো। ছোট্টুরাম আমাদের চাকর, সে বেতন কামায়, বেতন-নিবারকে শোয় না ত সে। তাকে অনেকবার বলা হয়েছে কিন্তু কিছুতেই সে শোয় না। সেইজন্যই ত এ চাকরটা টিকে গেল আমাদের। বাবা ভারী দুঃখ করেন তাই।"

কী সব হেঁয়ালি বক্‌ছে? ছেলেটার মাথা খারাপ নাকি? যাক্, ও সব ভাব্‌বে না সে। সে প্রতিজ্ঞাই করেছে—মোটেই মাথা ঘামাবে না এদের ব্যাপারে। একবার ঘামাতে আরম্ভ করলে তখন আর থামাতে পারবে না—নির্ঘাৎ পাগল হতে হবে। আজ আর পড়ানো নয়, অনেক পড়ানো গেল, কেবল মাথা কেন, সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে তার ধাক্কায়। আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। মণ্টুকে সে বিদায় দিল।

এইবার একটা তোফা নিদ্রা—নরম গদির বিছানায়। দু'দুবার বৌবাজার আর বাগবাজার করেছে আজ, অনেক হাঁটাচলা হয়েছে—ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে। আজ রাত্রে সে খাবে না বলেই দিয়েছে—এক বন্ধুর বাড়ীতেই খাওয়াটা সেরেছে বিকেলে। ব্যস্, সুইচ্ অফ্ করে এখন শুলেই হয়।

নরম বিছানায় সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে আরামে মিহিরের চোখ বুজে এল—আঃ! নিদ্রার

রাজ্যে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে সে এমন সময়ে মনে হ'ল তার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন হাজার হাজার ছুঁচ্ এক সঙ্গে বিঁধিয়ে দিল। আর্ত্তনাদ ক'রে মিহির লাফিয়ে উঠ্‌ল বিছানা ছেড়ে। বাতি জেলে দেখে, সর্ব্বনাশ—সমস্ত বিছানায় কাতারে কাতারে ছারপোকা—কেবল ছারপোকা! হাজার হাজার, লাখ লাখ—গুণে শেষ করা যায় না। কেবল ছারপোকা!

এতক্ষণে বেতন-নিবারক বিছানার মানে সে বুঝল্—বুঝ্‌তে পারলে কেন মাষ্টাররা টেকে না। ও বাবাঃ! কেবল ছাত্রই নয়, ছারপোকাও আছে তার সঙ্গে। ঘরে বাইরে যুদ্ধ করে একটা লোক পারবে কেন—তবু সে ভদ্রলোক ঊনত্রিশ দিন যুঝেছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারলেন না—ছেড়ে পালাতে হ'ল তাঁকে। ত্রিশ টাকা মাইনেয় মাষ্টার রেখে বেতন না দিয়েই ছেলে পড়ানো—নাঃ, ভদ্রলোক কেবল উদার আর মহৎ নন্, বেশ রসিক লোক তিনি!

ভীতি-বিহ্বল চোখে সে ছারপোকা-বাহিনীর দিকে চেয়ে রইল। গুণে শেষ করা যায় না—ও-কি মেরে শেষ করা যাবে? আর সমস্ত রাত ধরে যদি ছারপোকাই মারবে তো ঘুমোবে কখন? নাঃ, চেয়ারে বসেই আজ কাটাতে হ'ল সমস্ত রাতটা।

আলো দেখা মাত্র ছারপোকাদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছ্‌ল—দু' তিন মিনিটের মধ্যে তারা আবার কোথায় মিলিয়ে গেল। মিহির ভাব্‌ল—বাপ্‌স্, এরা রীতিমত শিক্ষিত যে! যেমন কুচকাওয়াজ করে এসেছিল তেমনি কুচকাওয়াজ করে চলে গেল—আধুনিক যুদ্ধের কায়দা-কৌশল সব এদের জানা দেখ্‌ছি। কোথায় গেল ব্যাটারা?

সদ্য পাট ভাঙা ধব্‌ধবে চাদরের এক কোণ তুলে দেখে তোষকে গদির খাঁজে খাঁজে থুক্ থুক্ করছে ছারপোকা—অন্যধারেও তাই। আর বেশি সে দেখ্‌ল না, কি জানি এখন থেকেই যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়। চেয়ারে গিয়ে বস্‌ল, কিন্তু ভয়ে আলো নিব্‌ল না—কি জানি যদি তারা সেখানে এসে তাকে আক্রমণ করে। বলা যায় না কিছু।···

পর দিন মণ্টুর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—"বেশ ঘুম হয়েছিল রাত্রে?"

"খাসা! অমন বিছানায় ঘুম হবে না, বলেন কি আপনি?"

ভদ্রলোক একটু অবাক্ হয়ে বল্লেন—"বেশ বেশ, ঘুম হলেই ভালো। জীবনের বিলাসই হ'ল গিয়ে ঘুম। তা, তোমার ঘুম বোধ হয় খুব জমাট্?"

"আজ্ঞে, সে কথা আর বল্‌বেন না। একবার আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাশের বাড়ী চলে গেছ্‌লাম কিন্তু মোটেই টের পাইনি।"

"বল কি?"

"আমাদের বাড়ী বর্দ্ধমানে। শুনেছেন বোধ হয় সেখানে বেজায় মশা—মশারি না খাটিয়ে শোবার যো নেই। একদিন পাশের বাড়ীতে কি খুব দরকারে ডেকেছিল আমায়, কিন্তু

ভুলে গেছলাম কথাটা, যখন শুতে যাচ্ছি তখন মনে পড়লো, কিন্তু তখন রাত অনেক হয়ে গেছে, অত রাত্রে কে যায়, আর দরজা টরজা বন্ধ করে তারা তখন শুয়ে পড়েছে। আমি করলুম কি, সেদিন আর মশারি খাটালুম না! পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন দেখি পাশের বাড়ীতেই শুয়ে আছি।"

দারুণ বিস্মিত হলেন ভদ্রলোক, "কি রকম?"

"মশায় টেনে নিয়ে গেছে রাত্রে। সেইজন্যই ত মশারি খাটাই নি। অনায়াসে পাশের বাড়ী যাবার ওইটেই সহজ উপায় কিনা।"

ভদ্রলোক অত্যন্ত মুষ্‌ড়ে পড়লেন যেন—"মশাতেই যখন কিছু করতে পারেনি তখন আর—কিসে কি করবে তোমার! তুমি দেখ্‌ছি টিকে গেলে এখানে।"

মিহির বল্‌ল—"আমার কিন্তু একটা নিবেদন আছে। কয়েকটা টাকা আমাকে দিতে হবে আগাম। ছারপোকার অর্ডার দেব।"

"ছারপোকার অর্ডার! সে আবার কি?"

"ও, আপনি জানেন না বুঝি? ছারপোকার মত এমন মস্তিষ্কের উপকারী মেমারি বাড়ানোর মহৌষধ আর নেই। বিলেতে রীতিমত ছারপোকার চাষ হয় এইজন্য। গাধা ছেলে

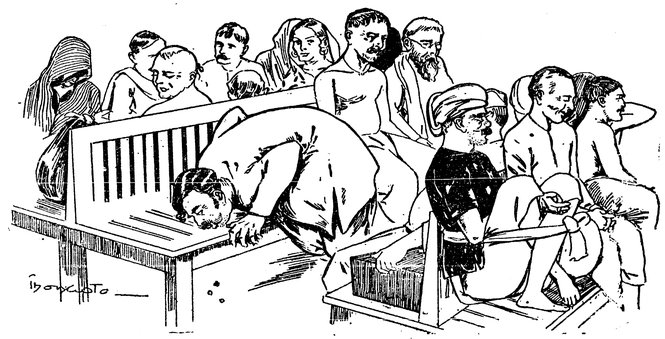

রেলগাড়ী থেকে ছারপোকা বার করে নেয়।

সব দেশেই আছে ত, তাদের কাজে লাগে। একটু থেমে সে আবার বল্লে, "আমার এক বন্ধু তো এজেন্ট্‌ই এপয়েন্ট্ করে ফেলেছে—রেলগাড়ী থেকে তারা সব ছারপোকা বার করে নেয়।"

সাগ্রহে ভদ্রলোক প্রশ্ন কর্লেন—"কি রকম কি রকম? বিলেতে ছারপোকার চাষ হয়?

দাম দিয়ে কেনে লোকে? আম্‌দানি রপ্তানি হয়, তুমি জানো? আমি বেচ্‌তে পারি—হাজার হাজার, লাখ লাখ—যত চাও।"

"বেচুন না। আমিই কিনে নেব। আমার নিজের কাজেই লাগ্‌বে। ছারপোকার রক্ত ব্রেনের ভারী উপকারী- একটা ছারপোকা ধরে নিয়ে এম্‌নি করে মাথায় টিপে মারতে হয়, এই রকম হাজার হাজার লাখ লাখ ছারপোকার রক্তে এক ছটাক্ ব্রেন্ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন্,—বি-এ পাশের সময়ে আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। সারা বছর ফাঁকি দিয়েছি, ফেল্ না হয়ে আর যাই না। এমন সময়ে এক বিলিতি কাগজে ছারপোকার উপকারিতা পড়া গেল, অমনি সমস্ত মেস্ খুঁজে যার বিছানায় যা ছারপোকা ছিল সব সদ্ব্যবহার করলুম। পরীক্ষা দেবার তখন মাত্র তিন দিন বাকি, তার পর ফল যা পেলুম নিজের চোখেই দেখুন, আমার কাছেই আছে—বি-এ পাশ করলুম উইথ্ ডিষ্টিঙ্কশন্—"

কাল থেকেই সে ব্যগ্র হয়ে ছিল,—এখন সুযোগ পেতেই সার্টিফিকেট্‌খানা মণ্টুর বাবার মুখের সামনে মেলে ধরল। ভদ্রলোকের চোখ দুটো ছানাবড়ার মত হয়ে উঠ্‌ল বিস্ময়ে—সত্যিইত! একটা কথাও মিথ্যে নয়, Passed with Distinction—লেখাই রয়েছে। বটে, এমন জিনিস্ ছারপোকা! কে জান্‌ত!

"পয়সা খরচ করে ছারপোকা কিন্‌তে হবে না, তোমার বিছানাতেই রয়েছে—হাজার হাজার লাখ লাখ,—যত চাও। তোমার ভয়ানক ঘুম বলে জান্‌তে পারনি।"

"এতক্ষণ বলেননি কেন আমাকে? অনেকখানি ব্রেন্ করে ফেল্‌তুম। এ বেলা আমার নেমন্তন্ন আছে ভবানীপুরে, এখনই বেরুতে হবে—দুপুরে ফিরেই ওগুলোর সদ্ব্যবহার করব। তার পরে পড়াব মণ্টুকে।"

মিহির চলে গেলে পিতাপুত্রে অনেকক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি হ'ল। অবশেষে মণ্টুর বাবা বল্লেন—"ছারপোকার সঙ্গে যে ব্রেনের সম্বন্ধ আছে অনেকদিনই এ কথা মনে হয়েছে আমার। ছারপোকার ব্রেন্‌টা একবার ভাবো দিকি, অবাক্ হয়ে যাবে তুমি। ঘুচ্ করে এসে কাম্‌ড়েছে, তক্ষুণি উঠে দেশ্‌লাই জ্বালো দেখ্‌তে পাবে না তাকে, কোথায় যে পালিয়েছে আর তার পাত্তা নেই। মানুষ যে দেশলাই আবিষ্কার করেছে এ পর্য্যন্ত ওদের জানা। এটা কি কম ব্রেন্? আর এ ব্রেন্ তো ওদের রক্তেই,—কেননা মাথা তো নেই ওদের, গায়েই ওদের ব্রেন্। ঠিক বলেছে মিহির।—মণ্টু, তুই কি বলিস্?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"তার পর ছারপোকার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধও কম না। ছারপোকা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার বাড়ে। ট্রামে বাসে সিনেমায় যেমন ছারপোকা বেড়েছে, তেম্‌নি হু হু করে

খবরের কাগজের কাট্‌তিও বেড়ে গেছে। এই সেদিন বায়স্কোপে আমাদের সাম্‌নেই চার আনার সীটে একটা কুলী বসেছিল, তোর মনে পড়ে না মণ্টু?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"সে ত লেখাপড়া কিছুই জানে না। দু' মিনিট না বস্‌তেই দু' পয়সা খরচ ক'রে একখানা আনন্দবাজার কিনে ফেল্‌ল সে। এতে শিক্ষার বিস্তার হ'ল নাকি? মণ্টু, তুই কি বলিস্?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"চল্ তবে এক কাজ করিগে। তোর মাষ্টার মশাই ফেরার আগে আমরাই ছারপোকা-গুলোর সদ্ব্যবহার করে ফেলি। ব্রেন্ তো তোরও দরকার—আর আমার মেমারিটাও দিন কত থেকে যেন কমে এসেছে। সেদিন শ্যামবাবুকে মনে হ'ল গোবর্দ্ধন বাবু আর গোবর্দ্ধন বাবুকে মনে হ'ল শ্যাম বাবু। এ ত ভালো কথা নয়। কি বলিস্ মণ্টু?"

"হ্যাঁ বাবা।"

সন্ধ্যার পরে ফিরল মিহির। কাল সারারাত ঘুম নেই, তার পর আজ সমস্ত দিন বন্ধুদের আড্ডায় তাস পিটে এমন ক্লান্ত হয়েছে যে ঘুমোতে পারলে বাঁচে। আজ সে আলো জ্বালিয়েই শোবে—আলোতে যদি না আসে ব্যাটারা। এখন "নমঃ নমঃ" ক'রে মণ্টুকে খানিকক্ষণ পড়াতে পারলেই ছুটি।

মণ্টু বই নিয়ে আস্‌তেই সমস্ত ঘরে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

"নতুন ধরণের এসেন্স্ টেসেন্স্ মেখেছ নাকি কিছু? ভারী গন্ধ আস্‌ছে তোমার গা থেকে।" মিহির জিজ্ঞাসা করল।

"গা নয়, মাথা থেকে সার্।"

"কিসের গন্ধ?"

"ছারপোকার। আপনি চলে যাবার পর বাবা আর আমি দু জনে মিলে 'বেতন-নিবারকের' সমস্ত ছারপোকা শেষ করেছি। ছোট্টরামকেও বলেছিলাম কিন্তু সে ব্যাটা মোটেই ব্রেন্ চায় না। আর একটাও ছারপোকা নেই আপনার বিছানায়। হি হি হি!"

"য়্যাঁ?—" সিংহনাদ ক'রে মিহির চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে সটান্ শুয়ে পড়ল। মণ্টু হতভম্ব। দারুণ চীৎকার শুনে মণ্টুর বাবা ছুটে এলেন।—"কি হয়েছে মণ্টু, কি হ'ল?"

"ছারপোকা নেই শুনে মাষ্টার মশাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।"

"তা তুই বল্‌তে গেলি কেন? শোকের প্রথম ধাক্কায় ওরকম হয়। বারণ করলুম না তোকে? অতগুলো ছারপোকার মৃত্যুশোক,—কম কথা নয় ত।"

"আমি কি করে জান্‌ব যে উনি অমন করবেন। মুখে জল ছিটোলে জ্ঞান হয় শুনেছি,—ছিটোব বাবা?

অজ্ঞান অবস্থাতেই মিহিরের গলা দিয়ে বেরুল—"উঁহুঁ।"

মণ্টুর বাবা বল্লেন—"কাজ নেই। জ্ঞান হলে যদি কাম্‌ড়ে দেয় রাগের মাথায়? প্রথম শোকের ধাক্কাটা কেটে যাক্। এক আধ দিন অজ্ঞান হয়ে থাক্‌লেই কেটে যাবে—সময়ই একমাত্র ওষুধ হচ্ছে শোকের। কথায় বলে, টাইম্ ইজ্ দি বেষ্ট্ হীলার্—কি বলিস্ মণ্ট?"

—"হ্যাঁ বাবা।"

মিহিরের জ্ঞান হ'ল তার পর দিন বেলা আটটায়।

খোকার স্বপ্ন

(শ্রীশোভা দেবী)

আকাশের ঐ রঙিন্ আলোর স্তরে
রাতের আঁধার বাসিফুলের মত
পড়্‌ল ঝরে দিনের হৃদিপরে
জ্যোতির পরাগ ছড়িয়ে পড়ে কত।

চোখে বুঝি ঘুম দিলি মা তাই
তাই বুঝি মা ঘুমে বলিস্ থাক্
খোকার আঁখি এখন মুদে নাই
স্বপনভরা সুপ্তি এখন রাখ।

কেন মা তুই কর্‌লি এমন ধারা
চোখের ছবি ভেঙ্গে দিলি কেন?
শুন্‌বি কথা কত মজায় ভরা
—শিয়রে মোর আস্‌ল পরী যেন।

সোনার ছটা পাখায় তারই জ্বলে
কপালে তার শুকতারাটির টিপ
মাথায় পরি পারিজাতের রাশি
হাতে তারই গুচ্ছভরা নীপ—

বলে আমায় 'এস খোকন্‌মণি
নিয়ে যাব সাত সাগরের তীরে
থাক্‌বে কেমন সেথায় গিয়ে তুমি
কোর্‌ব বিয়ে মুকুট দিয়ে শিরে'।

হাজার হাজার পুতুল কত দিল
রঙ-বেরঙের পোষাক কেমন ধারা
চোখ ঘোরাল যেই বসান ছিল,
শুইয়ে দিলাম ঘুমিয়ে হল সারা।

পরী আমায় কতই ভালবেসে
চল্‌ল নিয়ে যেথায় তাহার পুরী
হাল্কা মেঘের উল্কা-জ্বলা পথে
চল্‌ল কত দেশ বিদেশে উড়ি—

একটু হলেই পরী বৌএর সাথে
ফির্‌তেছিনু কর্‌তে মহোৎসব
এমন সময় "খোকন ওঠ" বলে
ভাঙ্গালে ঘুম ফুরিয়ে গেল সব

মরুভূমি

(শ্রীসুনীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর)

শিক্ষক—"বল তো তোমরা, মরুভূমি কি জিনিষ?
ছেলেরা—যে যায়গায় কিছুই জন্মায় না এমন জায়গা স্যর।
শিক্ষক—একটা উদাহরণ দাও দেখি—
ক্লাশের সব চেয়ে ছোট ছেলেটি—আমার ঠাকুরদাদার মাথাটা স্যর।

Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No. CSS 57	Condition Brittle
Title Rāmdhanu (রামধনু)	Colour B & W (text) Coloured illustrations
Periodicity Monthly / irregular	Size 16 x 20 cm (W x L)
Editor(s) Bisweswar Bhattacharya [v.1-v.2 - 1334-36 b.s. (1927-29)] Manoranjan Bhattacharya [v.3-12 : 1336-1348 b.s. (1929-38)] Kshitindranarayan Bhattacharya [v.12-62 : 1345-95 b.s. (1938-88)]	Place(s) of Publication Calcutta : 16 Townsend Road, Bhabanipur. Volumes in Record Vol. 1 – 46 : 1334 – 1380 b.s. [1927 – 73] Vol. 49 – 62 : 1383 – 1395 b.s. [1976 – 88] (irregular issues)

"আমি কি করে জান্‌ব যে উনি অমন করবেন। মুখে জল ছিটোলে জ্ঞান হয় শুনেছি,—ছিটোব বাবা?

অজ্ঞান অবস্থাতেই মিহিরের গলা দিয়ে বেরুল—"উঁহুঁ।"

মণ্টুর বাবা বল্লেন—"কাজ নেই। জ্ঞান হলে যদি কামড়ে দেয় রাগের মাথায়? প্রথম শোকের ধাক্কাটা কেটে যাক্। এক আধ দিন অজ্ঞান হয়ে থাক্‌লেই কেটে যাবে—সময়ই একমাত্র ওষুধ হচ্ছে শোকের। কথায় বলে, টাইম্ ইজ্ দি বেষ্ট্ হীলার্—কি বলিস্ মণ্ট?"

—"হ্যাঁ বাবা।"

মিহিরের জ্ঞান হ'ল তার পর দিন বেলা আটটায়।

খোকার স্বপ্ন

(শ্রীশোভা দেবী)

আকাশের ঐ রঙিন্ আলোর স্তরে
রাতের আঁধার বাসিফুলের মত
পড়্‌ল ঝরে দিনের হৃদিপরে
জ্যোতির পরাগ ছড়িয়ে পড়ে কত।

চোখে বুঝি ঘুম দিলি মা তাই
তাই বুঝি মা ঘুমে বলিস্ থাক্
খোকার আঁখি এখন মুদে নাই
স্বপনভরা সুপ্তি এখন রাখ।

কেন মা তুই কর্‌লি এমন ধারা
চোখের ছবি ভেঙ্গে দিলি কেন?
শুন্‌বি কথা কত মজায় ভরা
—শিয়রে মোর আস্‌ল পরী যেন।

সোনার ছটা পাখায় তারই জ্বলে
কপালে তার শুকতারাটির টিপ
মাথায় পরি পারিজাতের রাশি
হাতে তারই গুচ্ছভরা নীপ—

বলে আমায় 'এস খোকন্‌মণি
নিয়ে যাব সাত সাগরের তীরে
থাক্‌বে কেমন সেথায় গিয়ে তুমি
কোর্‌ব বিয়ে মুকুট দিয়ে শিরে'।

হাজার হাজার পুতুল কত দিল
রঙ-বেরঙের পোষাক কেমন ধারা
চোখ ঘোরাল যেই বসান ছিল,
শুইয়ে দিলাম ঘুমিয়ে হল সারা।

পরী আমায় কতই ভালবেসে
চল্‌ল নিয়ে যেথায় তাহার পুরী
হাল্কা মেঘের উল্কা-জ্বলা পথে
চল্‌ল কত দেশ বিদেশে উড়ি—

একটু হলেই পরী বৌএর সাথে
ফির্‌তেছিনু কর্‌তে মহোৎসব
এমন সময় "খোকন ওঠ" বলে
ভাঙ্গালে ঘুম ফুরিয়ে গেল সব

মরুভূমি

(শ্রীসুনীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর)

শিক্ষক—"বল তো তোমরা, মরুভূমি কি জিনিষ?
ছেলেরা—যে যায়গায় কিছুই জন্মায় না এমন জায়গা স্যর।
শিক্ষক—একটা উদাহরণ দাও দেখি—
ক্লাশের সব চেয়ে ছোট ছেলেটি—আমার ঠাকুরদাদার মাথাটা স্যর।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

১৩

কিন্তু, কোথায়? এ রাস্তা ও রাস্তা কত রাস্তা ঘুর্‌ল, মিনির বাড়ীর মত বাড়ীও দু'-চারটা তার চোখে পড়ল, কিন্তু সেগুলো মিনির বাড়ী নয়। কলকাতার পথের মত বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। এমন কি, স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাস পর্য্যন্ত তার টলে গেল। কলকাতা-জায়গাটা বোধ হয় সৃষ্টিছাড়া, এখানে কারু স্বপ্ন বুঝি ফলে না?

অনেক ঘুরে অবসন্ন হয়ে অবশেষে একটা জলের কলের কাছে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন ধুঁক্‌তে লাগ্‌ল। যা তেষ্টা পেয়েছে, এক বাল্‌তি জল এক নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দিতে পারে। রোদে ঘুরে জল খাওয়া মার বারণ, মা বলেন, জিরিয়ে খাবি। কে যেন কবে ভয়ঙ্কর গরম থেকে এসে ঠাণ্ডা জল খেয়ে হঠাৎ সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে মরেছিল, তাই থেকে মার ভারি ভয়। পাছে কাঞ্চন কোনদিন তাঁর এই নিষেধ অমান্য করে এইজন্য তিনি তাকে গা-ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন। কাজেই, কলের সন্নিকটে রোদে দাঁড়িয়েই কাঞ্চন বিশ্রাম করতে লাগ্‌ল। দিব্যি না মান্‌লে মা মরে যায় যদি।

কিছুক্ষণ পরে যখন কাঞ্চনের মনে হ'ল যথেষ্ট জিরোনো হয়েছে, এইবার জল খাওয়া যেতে পারে তখন কল টিপ্‌তে গিয়ে দেখে, এ কি, কল থেকে যে জল পড়েই না। আরো জোরে, আরো প্রাণপণ করে টেপে—না, এক ফোঁটাও না। এ কি হ'ল? একজন লোককে ডেকে বলে, ভাই, কলটা একটু টেপো না।

সে উত্তর দিল, "টিপে কি হবে? আর কি জল পড়বে? এগারোটা বেজে গেছে যে। জল আস্‌বে আবার সেই তিনটেয়।"

য়্যাঁ? জলও খেতে পাবে—সেই তিনটেয়?

সেই পার্কের ভেতরে একটা পুকুর আছে বটে, কিন্তু রাস্তা বিনে কি সেই

পার্কে পৌঁছুতে পারবে? কলকাতার পথকে তার আর বিশ্বাস হয় না। কাঞ্চনের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে।

দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই, হাঁট্‌তেই হবে। সেই পুকুর—তার আগে ও তিনটার আগে কোথাও জল নেই।

কিছু দূর গিয়ে দেখে—আঃ, এই ত জল রয়েছে। রাস্তার ধারে লোহার চৌবাচ্চায় চমৎকার জল। জল খেতে যাবে, এমন সময়ে একজন পাহারাওয়ালা এসে তাকে বাধা দিলে। মানুষের জন্য এ জল নয়, ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়ার জন্য।

লোকটা বলে কি? ঘোড়ার জন্য জল আছে, মানুষের জন্য জল নেই?

কাঞ্চন আর দাঁড়াতে পারে না, মাটিতে বসে পড়ে।

সাম্‌নে একটা ছোটখাট মুদীর দোকান, দোকানদার কাঞ্চনকে ডাক্‌ল—খোকা, এখানে এসে জল খেয়ে যাও।—খুব তেষ্টা পেয়েছে, না? না, না, ঘটি নয়, তোমরা কি? কায়স্থ? তা হোক্, তোমার হাত ভারী নোংরা। বল্‌ছ আল্‌গোছে খাবে? তা কেন, তুমি হাত পাতো, আমি ঢেলে দিচ্ছি।

যে নোংরা হাত ঘটিতে দেবার পক্ষে অনুপযুক্ত সেই নোংরা হাতে আকণ্ঠ জল খেয়ে কাঞ্চন অনেকখানি সুস্থ হ'ল; তার মুখ থেকে কথা বেরুল।

"বাঃ, তোমার দোকানে ছাতুও আছে দেখ্‌ছি যে!"

"তোমার চাই?"

"হ্যাঁ।"

হ্যাঁ বল্‌ল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মুখ চুণ হয়ে গেল। তার নিরুৎসাহ দেখে দোকানী প্রশ্ন করল—ক' পয়সার চাই তোমার?"

"পয়সাই যে নেই আমার কাছে। শুধু একটা আনি আছে, তাও আবার অচল।"

"দেখি আনিটা। অচলই বটে, তবে আমার কাছে চলে যাবে। এর বদলে তোমাকে দু পয়সার ছাতু দিতে পারি।"

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে কাঞ্চন বল্‌ল, "তাই দাও।"

একটা শালপাতায় তেল নুন লঙ্কা দিয়ে মাখা সেই ছাতু প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারের পর কাঞ্চনের কাছে সে রাত্রের সেই বিয়ে বাড়ীর ভোজের মতই উপাদেয় মনে হতে লাগ্‌ল। আহার সমাধা করে আর এক ঘটি জল খেয়ে কাঞ্চন দোকানীকে জিজ্ঞেসা করল "কাছাকাছি কোথাও পার্ক আছে বল্‌তে পারো?"

"হ্যাঁ, এই রাস্তা দিয়ে নাকের সোজা বরাবর চলে যাও, মির্জ্জাপুর পার্ক্ পাবে। কেন পার্ক্ কি জন্যে?"

"খাওয়া তো হ'ল, এইবার একটি তোফা ঘুম দিতে হবে। কাল থেকে বড্ড হাঁট্‌ছি, আজ আর তা নয়।"

"তুমি দেশ-পাড়াগাঁ থেকে এসেছ? একলা বুঝি—"

কাঞ্চন দোকানীর অনধিকার-চর্চ্চার প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ সঙ্গত মনে করল না, তার কৌতূহলের কোন জবাব না দিয়ে সে নাকের সোজা চলতে সুরু করে দিল।

পার্কে গিয়ে একটা ছাতওয়ালা পরিষ্কার বেঞ্চি দেখে শুয়ে পড়ল সে।

যখন তার ঘুম ভাঙ্‌ল তখন ভারী সোরগোল। সমস্ত পার্ক লাল পাগ্‌ড়িতে ভর্ত্তি। কি ব্যাপার? মিটিং হচ্ছে নাকি? এক ধার থেকে সব গেরেপ্তার কর্‌ছে বুঝি? কাঞ্চন তটস্থ হয়ে উঠে বস্‌ল। প্রথমেই তার মনে হ'ল পালাবার কথা। কিন্তু পালাতে হ'ল না, পার্কের ভেতর যে লোকজন ছিল পাহারওয়ালারা তাদের বার করে দিচ্ছিল। কাঞ্চনকেও বেরিয়ে যেতে হ'ল।

পার্কের চার পাশের রাস্তায় বেজায় লোকের ভীড়। চার ধারেই লোক জমে গেছে; তাদের কারু বিস্ময়, কারু উন্মাদনা, কারু শুধুই কৌতূহল।

একটু পরেই ঘটনাস্থলে ঘোড়ার পিঠে চেপে সার্জ্জেন্টরা এসে পড়ল। এসেই তারা লোক হটাতে আরম্ভ করে দিল। ঘোড়াদের এবং সোয়ারদের দেখেই জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জেগেছিল, সেই চাঞ্চল্য ক্রমে আন্দোলনে পরিণত হ'ল এবং সেই আন্দোলন অকস্মাৎ বেগবান্ হয়ে উঠ্‌ল। অর্থাৎ, সোজা কথায় জনতা প্রস্থানোদ্যত হল।

বাবা বলেন, শতহস্তেন বাজিনঃ। চাণক্যঋষি নাকি বলে গেছেন ঘোড়ার থেকে এক শ হাত দূরে থেকো। চাণক্যঋষি বোধ হয় এই সব ঘোড়াদের মানসচক্ষে দেখেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাক্‌বেন—তা না হ'লে ঘোড়ার থেকে একশ হাত কেন এক হাত দূরে থাকাও কাঞ্চন কোনদিন প্রয়োজন মনে করেনি; এমন কি ঘোড়া দেখ্‌লে তার পিঠের ওপরে থাকাই সে বাঞ্ছনীয় মনে করেছে। কিন্তু তাদের দেশের ঘোড়া আর এই সব হাতীর মত উঁচু ঘোড়া—এ ত ঘোড়া নয়, ঘোটক!

মা অবশ্য শ্লোকটার অন্য রকম ব্যাখ্যা করতেন, বল্‌তেন, যেখানে বাজি পোড়ানো হবে সেখান থেকে এক শ হাত দূরে থাক্‌বি। কাঞ্চন চিরদিনই ঘোড়ার সম্মুখে মার ব্যাখ্যাটা আর বাজির সম্মুখে বাবার ব্যাখ্যাটা বেশী পছন্দ করেছে, কিন্তু আজকের এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে সে বাবার ব্যাখ্যাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করল।

কিন্তু পালাবেই বা কোথায়? এক শ হাত ফাঁকা জায়গাই কি আছে? গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি। কাঞ্চন হতাশ চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ল, মহর্ষি চাণক্যকে অনুসরণ করবার কোন উপায়ই নেই।

কিন্তু ঘোড়ারা এদিক্ পানে এসে পড়্‌তেই অকস্মাৎ সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, সেই জমাট জনতা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। কাঞ্চন দেখ্‌ল আর সবার বাবাও ছেলেদের চাণক্যঋষির উপদেশ দিয়ে রেখেছে, অতএব ভরসা আছে। কাঞ্চনকে কষ্ট করে পাও চালাতে হ'ল না, আগের এবং পেছনের চাপে মাটিতে পা না ঠেকিয়েও সে অনেকটা পেরিয়ে এল। আকাশে হাঁটার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। যখন মাটিতে পা ঠেক্‌ল তখন সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌লে ঘোড়ারা ফিরে গেছে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ।

এত দিনে বাবার একটা কথার মানে বুঝল কাঞ্চন। পূজোর সময় হলেই বাবা পাঁজি দেখ্‌তেন আর মাথা নাড়তেন—"দেবীর এবার ঘোড়ায় আগমন! ফল—ছত্রভঙ্গ! ছত্রভঙ্গস্তু রঙ্গমে!" তখন কাঞ্চন ভাব্‌ত, এবার পূজোয় তাকে নতুন ছাতা না দেবার বাবার মৎলব। তাই এত ছাতা-ভাঙার অজুহাত! দেবী ঘোড়ায় এলে তার ছাতা ভাঙে কি করে এটা কাঞ্চন কিছুতেই বুঝতে পারে নি—

কিন্তু এখন সে দেখ্‌ল যে ঘোড়ার হাতে পড়লে ছাতা কেন মাথা ভাঙাও সম্ভব। আর ঘোড়ার হাতও যা পাও তাই—দু'টোর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, কাঞ্চনের মতে।

কিন্তু যাই হোক্, পালানোটা লজ্জার, আস্তে আস্তে কথাটা কাঞ্চনের মনে হ'ল। একলা থাক্‌লে সে হয়ত পালাতো না, ঘোড়াদের পাশ কাটাতো—বিশেষতঃ হস্ত দন্ত হয়ে এত দূর পালিয়ে আসাটা! ঘোড়ারাও তাদের ব্যবহার দেখেই বোধ হয় লজ্জিত হয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু সে কি করবে, তার ইচ্ছা না থাক্‌লেও না পালিয়ে উপায় ছিল না। যাক্ গে, সে আবার সেই পার্কের ধারে ফিরে গিয়ে দেখ্‌বে কি হচ্ছে সেখানে; এবার ঘোড়া কেন হাতী দেখ্‌লেও দৌড়াবে না, বড় জোর পাশ কাটাতে পারে।

সে ফিরতে উদ্যত এমন সময়ে সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা, যার ডিস্‌পেন্‌সারিতে ব'সে আগের দিন খবরকাগজ পড়ছিল। তিনি মোটরকারে বসে ছিলেন, লোকজনের ছুটোছুটিতে তাঁর মোটর দাঁড়িয়ে গেছ্‌ল। তিনি কাঞ্চনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "কি হে ছোক্‌রা, খবর কি, তোমাদের স্বরাজ কদ্দূর?"

কাঞ্চন গম্ভীর হয়ে গেল, কোন উত্তর দিল না।

"পালাচ্ছিলে যে? তুমি না বল্‌ছিলে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারো?

এবার কাঞ্চনেক জবাব দিতে হ'ল। সে বিরক্ত হয়ে বল্ল—দেশের জন্য পারি, কিন্তু ঘোড়ার জন্য নয়।"

ভদ্রলোক হেসে বল্লেন "বটে? তা এসো আমার মোটারে। তোমাকে এই গোলমাল থেকে বের ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।"

"চাই না যেতে। ঘোড়াকে আমি ভয় করি নাকি? অনেক ঘোড়ার পিঠে চড়েছি।"

বলে কাঞ্চন আর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে পার্কের দিকে পা চালাতে সুরু করল।

পার্কের কাছে এসে দেখে আবার চারিধারে ভীড় জমে গেছে। দৌড়াদৌড়ির পরিশ্রমে ঘোড়াদের জিব বেরিয়ে গেছে, তারা নিরুৎসাহ হয়ে হাঁপাচ্ছে।

কাঞ্চন বিস্ময় প্রকাশ করে বল্ল, এই মাত্র এত লোক তাড়াল, আবার লোক জমে গেছে?

সোনার চশ্‌মাপরা একজন বল্ল—কলকাতা সহর, এখানে লোক কি কম? একজন পিছ্‌লে পড়লে দু'শ লোক দাঁড়িয়ে যায়, মোটর চাপা পড়লে দু' হাজার। এখানে ভিড় তাড়িয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা কি সোজা কথা?

ক্ষিতীশ জবাব দিল—

এই লোক কেহ নাহি যেতে পারে তেড়ে।
যতই করিবে তাড়া তত যাবে বেড়ে॥ (ক্রমশঃ)

কলিযুগে সশরীরে স্বর্গারোহণ

(শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এস্-সি, বি-এল্)

তোমরা মহাভারতে পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের গল্প পড়িয়াছ। কেমন করিয়া যুধিষ্ঠিররা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীসহ পায়ে হাঁটিয়া হিমালয়ের উপর দিয়া সশরীরে স্বর্গে রওনা হইয়াছিলেন সেই কাহিনীর কথা বলিতেছি। এক যুধিষ্ঠির বাদে সেই সব মহা মহা রথীদের সকলকেই হিমালয়ের কাছে হার মানিতে হইয়াছিল—অমন যে ভীম আর অমন যে অর্জ্জুন, তাঁদেরও। সে ত গেল পুরাণের কথা, আজকালকার দিনেও কি মানুষ পায়ে হাঁটিয়া হিমালয়ের চূড়ায় উঠিবার স্পর্দ্ধা করে? করে বই কি? তার কথাই তো আজ বলিতে বসিয়াছি।

কিছু দিন আগে কাগজে একটা খবর লইয়া খুব হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছিল। লর্ড্ ক্লাইড্‌স্‌ডেল্, লেফ্‌টেনাণ্ট্ ম্যাক্‌ইন্‌টায়ার প্রভৃতি কয়েকটি অসমসাহসিক ভদ্রলোক এরোপ্লেনে চড়িয়া এভারেষ্টের উপর ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে সেখানকার দেদার ছবিও তুলিয়া আনিতে ভুলেন নাই। ভদ্রলোকদের বাহাদুরী দেখিয়া পৃথিবীশুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু পায়ে হাঁটিয়া হিমালয়ে উঠিবার কাহিনী বোধ হয় আরও বিস্ময়কর।

এভারেষ্ট হইতে তোলা গৌরীশঙ্কর বা এভারেষ্টের দৃশ্য

তোমরা নিশ্চয়ই জান পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে উঁচু পর্ব্বত হইতেছে হিমালয়, আর হিমালয়ের সব চাইতে উঁচু চূড়া হইতেছে এভারেষ্ট্—২৯০০২ ফিট্ উঁচু। ১৮৫২ সনে রাধানাথ শিকদার নামে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এভারেষ্ট্ আবিষ্কার করেন এবং তখনকার সার্ভেয়ার জেনারেল এভারেষ্টের নাম অনুযায়ী এই গিরিচূড়ার নাম এভারেষ্ট্ রাখা হয়। বর্ত্তমান যুগের মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই—পৃথিবীর কোনও জায়গা তারা অনাবিষ্কৃত রাখিতে চায় না।—বরফে জমিয়া মেরু আবিষ্কার করে, ডুবুরির বেশে সমুদ্রের একেবারে তলায় চলিয়া যায়, কাজেই এভারেষ্টকে তারা সহজে ছাড়িয়া দিবে কেন? কিন্তু মুখে বলিলেই কি চলে? পৃথিবীর অন্যান্য পর্ব্বতের সঙ্গে এর যে অনেকখানি তফাৎ! বিপদ্ এখানে প্রতিটি মুহূর্ত্তে, রক্ত-জমান শীত, দুরন্ত ঝড়, প্রচণ্ড বরফ-নদী, মাথার উপর যখন-তখন খসিয়া-পড়া বরফের চাঁই, পদে পদে পা হড়কাইয়া হাজার হাজার ফিট্ গভীর খাদে পড়িবার ভয়—এ সব তো আছেই, তা ছাড়া বাতাস সেখানে এত হাল্কা যে সঙ্গে প্রচুর অক্সিজেন না থাকিলে নিঃশ্বাসের অভাবেই দফা শেষ হইবে; আর পরিশ্রম তো আছেই। কিন্তু তবুও মানুষ পিছ-পা নয়—বছরের পর বছর ক্রমাগতঃ বিফল হইয়াও তারা এভারেষ্ট্-জয়ের আশা ত্যাগ করে নাই।

এভারেষ্টে উঠিতে হইলে তিব্বতের দিক্ দিয়া ওঠাই সুবিধাজনক কিন্তু তিব্বতের কর্ত্তা—প্রধান পুরোহিত এবং রাজা দলাই লামার অনুমতি ছাড়া তো তা আর সম্ভব নয়! গত মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত সে অনুমতি পাওয়া যায় নাই, কাজেই তখনকার অভিযানকারীদের উঠিতে হইত অন্য পথে। ডাঃ লঙ্‌ষ্টাফ্, ডাঃ ওয়ার্ক্‌ম্যান্ ও তাঁর স্ত্রী, ইটালির রাজপরিবারের জনৈক ডিউক্ প্রভৃতি কয়েকবার সেই পথেই উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—এবং প্রায় সাড়ে চব্বিশ হাজার ফিট্ উঠিয়াছিলেনও। কিন্তু প্রত্যেক বারেই তার পর তাঁদের নামিয়া আসিতে হয়। তোমরা হয়ত ভদ্রলোকদের বোকামীর কথা ভাবিয়া মনে মনে হাসিতেছ। মাত্র ৫০০০ ফিট্, অর্থাৎ এক মাইল্ও নয়—যা নাকি তোমাদের বাড়ীর পুসু, বাণী ও নেবু প্রতিদিনই ২০।২৫ মিনিটে বেড়াইয়া আসে—ঐটুকুর জন্য তাঁরা এতদিনের একটা অভিযান নষ্ট করিয়া দিলেন! কিন্তু আসল ব্যাপার অত সহজ নয়। অত

উঁচুতে বাতাসের যা অবস্থা তাতে নিঃশ্বাস নেওয়াই কষ্টকর—আর আবহাওয়া যে কী ভয়ঙ্কর তা আর কি বলিব! পূর্ব্বোক্ত ইটালির রাজপুত্রটি শেষ ঘণ্টায় মাত্র ১৬০ ফিট্ উঠিতে পারিয়াছিলেন। সেখান হইতে একদিনে তো আর চূড়ায় পৌঁছান যায় না, কাজেই তখন আবার খাওয়া-দাওয়া, তাঁবু বসান, রাত কাটান এই সবের ঝঞ্ঝাট আসিয়া পড়ে।

গত মহাযুদ্ধের পর তিব্বতের কর্ত্তার অনুমতি পাওয়া গেল। ১৯২১ সনে এক দল অসমসাহসিক বীর তিব্বত হইয়া এভারেষ্ট যাত্রার জন্য দার্জ্জিলিং হইতে রওনা হইলেন। ঠিক হইল ইয়ং হাসব্যাণ্ড্, কেলাস্, ম্যালরী, রিবার্ণ্ বুলক্, হুইলার মেস্‌হেড প্রভৃতি কয়েক জন শৃঙ্গে চড়িবেন। ৫০টি বাছা বাছা খচ্চরের পিঠে তাঁদের আবশ্যকীয় সাজ-সরঞ্জাম লইয়া সঙ্গে চলিল ২২ জন কুলি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে জেলেপ পাস্ পার হইয়া তাঁরা তিব্বতে পৌঁছিলেন। কিন্তু প্রথমেই সুরু হইল বিপদ্। হঠাৎ হার্ট্‌ফেল্ করিয়া কেলাস্ গেলেন মারা। কাম্পা জংএ তাঁকে সমাধিস্থ করা হইল। এবার নেতা হইলেন ম্যালরী।

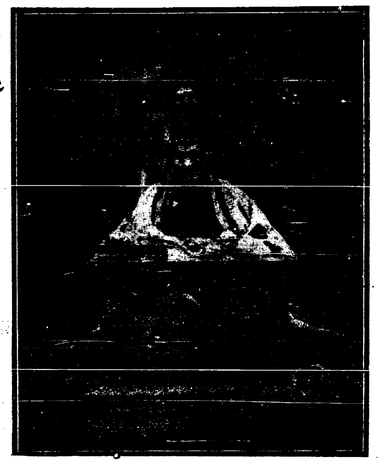

তিব্বতের প্রধান পুরোহিত বা দলাই লামা

তিব্বতে তাঁদের সুবিধা, অসুবিধা দুই হইল যথেষ্ট। লবণ, আর দুর্গন্ধযুক্ত মাখন মিশান চা খাইয়া ও তিব্বতীদের সেই উপাদেয় চা এর প্রশংসা করিয়া, তিব্বতীদের সাবান-জলের সংস্পর্শহীন পোষাক আর গায়ের সুতীব্র গন্ধ উপভোগ করিতে করিতে জীবন ধন্য হইল বলিয়া পরম বন্ধুর মত তাঁদের চলিতে হইল। অবশেষে একদিন আসল অভিযান সুরু হইল।

নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে ২৩০০০ ফিট্ উঠিয়া তাঁরা তাঁবু স্থাপন করিলেন; তার পর পরস্পরকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া পিরামিডের মত শৈলশৃঙ্গে উঠিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কয়েক দিন ধরিয়া এমন প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু আরম্ভ হইল আর প্রায় মেরুর মত শীত পড়িল যে আর অগ্রসর হওয়া গেল না। সেই জায়গাটির নাম 'নর্থ্‌পাস্' রাখিয়া তাঁরা ফিরিলেন।

সে বছরই অনেকে বিলাতে ফিরিয়া গেলেন। কয়েকজন পরের বছর (১৯২২) আবার রওনা হইলেন। এবার এঁদের সঙ্গে ছিলেন সামারভেল্, নর্টন্ ও ফিঞ্চ্। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে এই দল ১৬৫০০ ফিট্ উঁচুতে নর্থ্‌পাসের মাইল দশেক নীচে রংবুক্ তুষার-নদীর পাদদেশে তাঁদের প্রথম তাঁবু বা Base Camp গাড়িলেন। তার পর ক্রমে ক্রমে ১৮০০০, ১৯৩৬০ ও ২১০০০ ফিট্ উঁচুতে আরও তিনটি তাঁবু পড়িল। এক তাঁবু হইতে উচ্চতর তাঁবুতে জিনিষপত্র সরবরাহ হইতে লাগিল। তার পর ২৩০০০ হাজার ফিট্ উঁচুতে পড়িল আর একটি তাঁবু। ২০শে মে ম্যালরী, সামারভেল, মেস্‌হেড্ ও নর্টন্ অক্সিজেনের পাত্র সঙ্গে না নিয়াই ২৫০০০ ফিট্ উঁচুতে উঠিয়া ছোট ছোট আরও দু'টি তাঁবু বসাইলেন। আর ৪০০০ ফিট্ উঠিতে পারিলেই এভারেষ্টে পৌঁছান যাইবে। কিন্তু বিধাতা বাম। সকলেই কেমন যেন অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন, তা ছাড়া সারারাত্রি শুধু শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু তবু তাঁরা হটিবার পাত্র নন। পর দিন সকাল সকাল কিছু মুখে দিয়া আবার রওনা হইলেন। এক পা গিয়া আবার নিঃশ্বাস লইবার জন্য বিশ্রাম করিতে হয়, আবার চলেন, আবার বসেন; এমনি করিয়া আরও দু' হাজার ফিট্—২৬৯৮৬ ফিট্ ওঠা গেল। কিন্তু আর চলিল না; ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কোন রকমে অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে তাঁরা নামিয়া আসিলেন। তাঁবুতে আসিয়া দেখেন কুলীর দল চলিয়া গিয়াছে এবং বুদ্ধি করিয়া খাবার-দাবারও নিয়া গিয়াছে। যাহা হউক্ বিশ্রামের জায়গা তবু পাওয়া গেল। পর দিন তাঁরা প্রথম তাঁবুতে নামিয়া আসিলেন।

তার পর ক্যাপটেন্ ফিঞ্চ্, ব্রুস্ এবং গুর্খা সৈন্যাধ্যক্ষ তেজবীর আবার নতুন

করিয়া অভিযান সুরু করিলেন। এবার তাঁরা পিঠে বাঁধিয়া লইলেন অক্সিজেনের পাত্র—শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট যাহাতে না পাইতে হয়।

পূর্ব্ব রংবাক তুষার-উপত্যকার দৃশ্য

২৫শে মে তারিখে তাঁরা ২৫৫০০ ফিট্ উঁচুতে উঠিয়া এক তাঁবু বসাইলেন। কিন্তু প্রকৃতি বড় বাঁকিয়া বসিল, প্রচণ্ড ঝড় আর অবিরাম তুষার-পাত তাঁদের বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল—প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁবু ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া, উড়িয়া যাইবার গতিক হইল। অক্সিজেনের সাহায্যে সেই তাঁবুতে তাঁদের পর পর দুই রাত্রি কাটাইতে হইল। তৃতীয় দিন আবার যাত্রা সুরু হইল। কিন্তু একটু আগাইয়া তেজবীর আর চলিতে পারিলেন না; পরিশ্রমে, কষ্টে অবসন্ন হইয়া তিনি তখন মরণাপন্ন। এভারেষ্ট্-জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁকে ফিরিতে হইল—ভারতীয়ের অদৃষ্টে এভারেষ্ট্-বিজয় বুঝি ভগবান্ লেখেন নাই!

ক্রস্ ও ফিঞ্চ্ কিন্তু দমিলেন না, তাঁরা আরও উঠিতে উঠিতে অবশেষে ২৭৩০০ ফিট্ উঁচুতে গিয়া হাজির হইলেন। আর মাত্র ১৭০০ ফিট্—এক মাইলের

তিন ভাগের এক ভাগও বাকী নাই; একটু পরেই উত্তুঙ্গ হিমালয়কে মানুষের কাছে মাথা নীচু করিতে হইবে—তাঁদের তখন মনের কি অবস্থা ভাবিয়া দেখ। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্য রকম। হঠাৎ ক্রসের অক্সিজেন-যন্ত্র বিকল হইয়া গেল। ফিঞ্চ্ অবশ্য তাঁর নিজের অক্সিজেন দিয়া বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইলেন; তার পর সেই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫ মাইল উপরে বসিয়া ক্রসের যন্ত্রটি মেরামত করিতে বসিয়া গেলেন। যন্ত্র মেরামত হইল কিন্তু তাঁরা বুঝিলেন এ যাত্রা আর এভারেষ্ট্ বিজয় তাঁদের অদৃষ্টে হইল না। সে অবস্থায় কোন গতিকে এভারেষ্ট্ পৌঁছিতে পারিলেও সেখান হইতে ফিরিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। অগত্যা তাঁদের ফিরিতে হইল।

কিন্তু দলের উৎসাহ তখনও নিঃশেষ হয় নাই। আবার ৩রা জুন নূতন দল রওনা হইলেন। এবার দলে ছিলেন—ম্যালরী, সামারভেল্, ফিঞ্চ্, ওয়েকফিল্ড্ ও ক্রফোর্ড্। কিন্তু এবার আর বেশী দূর যাইতে হইল না—খানিক উঠিতেই উপর হইতে প্রকাণ্ড একটা বরফের চাক চাঙ্গিয়া ৭ জন কুলি মারা পড়িল। ৬ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেল, একজনকে আর পাওয়াই গেল না। সেবারকার অভিযান ঐখানেই শেষ।

দেখিতে দেখিতে দু'বছর কাটিয়া গেল। আবার ১৯২৪ সনে এক নূতন দল এভারেষ্টের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ক্রস্, নর্টন্, ম্যালরী, সামারভেল্, নোএল্, হাজার্ড্, আর্ভিন্ প্রভৃতি। এবার তাঁরা ভার কমাইবার জন্য বিনা অক্সিজেনেই চলিলেন। ২৬৭০০ ফিট্ উঁচুতে তাঁবু পড়িল। তার পর সামারভেল ও নর্টন্ ২৮০০০ ফিট্ উঠিলেন! এবার সামারভেল্ও বসিলেন কিন্তু নর্টন্ যুধিষ্ঠিরের মত একাই চলিতে লাগিলেন। ঘণ্টায় মাত্র ৮০ ফিট্ করিয়া উঠিতে উঠিতে শেষে ২৮১৬০ ফিটে গিয়া তিনি বুঝিলেন আর ওঠা মানে মৃত্যু নিশ্চিত। অত্যন্ত অনিচ্ছায় দুই বন্ধুকে নামিয়া আসিতে হইল।

কিন্তু এবারকার দল নাছোড়-বান্দা। আবার অক্সিজেনের পাত্র আসিয়া পৌঁছিল। ম্যালরী ও আর্ভিন্ শেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। নর্টনের চোখ তুষার লাগিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, বন্ধুরা তাঁকে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইলেন। ক্রস্ ও সামারভেল্কে আর উঠিতে দেওয়া হইল না।

৮ই জুন। ম্যালরী ও আরভিন্ দুই দিনে ক্রমশঃ নর্টনের চাইতেও ১০০ ফিট উচুতে উঠিলেন; ওডেল তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিছু নীচে থাকিয়া তাঁদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সম্মুখে একটা ঝড় উঠিল—তার পর ওডেল্ আর তাঁদের শত চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। এক দিন অপেক্ষা করিয়া আর একটু উপরে উঠিলেন, কিন্তু ম্যালরী ও আরভিনের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। অগত্যা তাঁকে ফিরিয়া আসিতে হইল। ম্যালরী ও আরভিন্ এভারেষ্টের চূড়ায় পৌঁছিয়াছিলেন কি না জানিবার উপায় নাই কিন্তু এই দুই মহাবীর যে যুধিষ্ঠিরদের মতই অমর লোকে গিয়া মিলিয়াছেন তা আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারি।

ইহার ৯ বছর পরে গত বছর অর্থাৎ ১৯৩৩ সনে রুটলেজের নেতৃত্বে আর এক দল পর্য্যটক পায়ে হাঁটিয়া এভারেষ্টের উদ্দেশ্যে রওনা হন কিন্তু তাঁরা ১৯২৪ সনের দলের চাইতে উপরে উঠিতে পারেন নাই। সেই ঊর্দ্ধলোকে তাঁরা ম্যালরীর পরিত্যক্ত একখানি কুড়াল কুড়াইয়া পাইয়াছেন। তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে এক দল ভারতবাসীও এভারেষ্ট-অভিযানে রওনা হইবেন বলিয়া এক সমিতি গড়িয়াছেন; এ দলে বাঙ্গালীও আছেন। এঁরা কয়েক বছর নানা জায়গায় গিরি-আরোহণ অভ্যাস করিয়া ১৯৩৬ কিংবা ১৯৩৭ এ এভারেষ্ট্ রওনা হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

'ও এণ্ড্ ও'র ক্যাপ্‌টেন

(শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

চারি পাশে ঘন গাঢ় অন্ধকার, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। জাহাজ বাঁশী দিয়ে বন্দর ছাড়ল। জাহাজের ক্যাপ্‌টেন্ সুরয সিং ডেকে এসে একটা উঁচু কাঠের ওপর বসে হাঁপাতে লাগ্‌ল। দরজার ফাঁক দিয়ে কেবিনের ক্ষীণ আলো তার

পায়ের কাছে এসে পড়েছে। সুরয সিং তার পকেট থেকে টর্চ্চটা বার ক'রে হাতের ঘড়িতে দেখল রাত তখন প্রায় একটা। তাকে খুব তাড়াতাড়ি—এক রকম ছুটেই—আস্‌তে হয়েছে ক্লাব থেকে, কারণ জাহাজ ছাড়ার কথা ছিল ঠিক একটার সময়। সুরয সিং এর পায়ের শব্দে তার মেট্ অমর সিং বেরিয়ে এল।

এক কালে এই সুরয সিং আর অমর সিং ছিল নিকটতম বন্ধু, কিন্তু আজ আর নেই; কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাদেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তারা একই দিনে নৌবিভাগের সামান্য কর্ম্মচারী হ'য়ে আসে, কিন্তু এখন সুরয সিং হচ্ছে জাহাজের সর্ব্বেসর্ব্বা ক্যাপ্‌টেন আর অমর সিং তার অধীনস্থ সহকারী। (জাহাজখানার মালিক ভারতবর্ষীয়, কাজেই আপাত-দৃষ্টিতে বিস্ময়কর হলেও ব্যাপারটাতে বাস্তবিক বিস্মিত হবার কিছু নেই।)

সুরয সিং যখন প্রথম এ জাহাজের ক্যাপ্‌টেন হয় তখন অমর সিংএর হিংসার পরিবর্ত্তে আনন্দই হ'য়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। সুরয সিংহের অটুট গাম্ভীর্য্য, নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি কড়া নজর প্রভৃতি কারণে জাহাজের কর্ম্মচারীমহলে তার উপর বেশ একটা বিদ্বেষের ভাব দেখা যেত। চক্রীর দল যখন এক চোখ টিপে অমরকে জানাল যে কর্ত্তৃপক্ষ একটা বড় রকমের অন্যায় করেছেন অমর সিংহের প্রতি, কেননা যোগ্যতার দিক্ থেকে বিচার কর্‌লে সুরয তার পদনখেরও সমান নয়—তখন চাটুকারদের সেই ফাঁদে অমর অতি সহজেই মাথা গলিয়ে দিল। তার ফলে আজ অমর সিংহের প্রধান বৈরী ক্যাপ্‌টেন সুরয সিং।

সুরয সিংকে অমন ক'রে বসে থাকতে দেখে অমর সিং এসে দাঁড়াল। খোলা দরজার ভেতর দিয়ে কেবিনের আলো তখন সুরয সিং এর গায়ে এসে পড়েছে। অমর সিং বল্লে, "কি ক্যাপ্‌টেন, অন্ধকারে যে!" সুরয সিং তখনও দম নিচ্ছে, তার পরিশ্রম হয়েছে বিশেষ—সে ক্লান্ত, কথার উত্তর না দিয়ে মুখ তুলে অমর সিং এর দিকে চাইল। হঠাৎ অমর সিং লাফিয়ে উঠ্‌ল "এ কি ক্যাপ্‌টেন, তোমার গায়ে রক্ত!" সুরয সিং প্রথমে একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল কিন্তু পরক্ষণেই সামলিয়ে নিয়ে শান্ত স্বরে বল্ল, "হ্যাঁ রক্ত।...কিন্তু অমর,

আজকের রাতটা তোমাকেই 'চার্জ্জ' নিতে হবে, আমি ক্লান্ত, একটু কেবিনে ঢুক্‌তে চাই।"

অমর সিং কিন্তু ক্যাপ্‌টেনের কথায় কর্ণপাতও কর্‌ল না, বল্লে "তোমার সমস্ত পোষাক-আসাক রক্তে ভেজা; ঘোড়ার মত ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসেই তুমি হুকুম দিলে জাহাজ ছেড়ে দিতে, আর এখন তুমি কেবিনের ভেতর ঢুকে আত্মগোপন করে থাক্‌তে চাইছ?" তার পর গলার স্বর আর এক পর্দ্দা উঁচু করে কর্কশ স্বরে অমর সিং বল্লে "ঠিক করে বল, কোথায় কাকে খুন করে এসেছ?" প্রতিহিংসার তাড়নায় তার চোক দুটো তখন অস্বাভাবিক ভাবে জ্বল্‌ছিল।

সুরয সিং একবার ভ্রূ কুঁচ্‌কে অমরের আগুন-হানা চোখের দিকে চাইল, তার পর একটু হেসে বল্লে, "ওহে শার্‌ল্‌ক্ হোম্‌সের সহোদর, তোমার গণনায় ভুল হয়েছে—খুন-টুন আমি করি নি।"

অমর সিংএর চীৎকার শুনে দু' একজন ক'রে কর্ম্মচারীরা আস্‌তে সুরু করেছে। ডেকের আলো জ্বলে উঠ্‌ল। লোকজন দেখে অমর সিং আরো চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগল, "মিথ্যেবাদী, খুন কর নি তো তোমার গায়ে রক্ত কেন? ভেবেছ রসিকতা করেই ছাড় পাবে?"

সুরয সিং কেবিনের দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বল্লে, "বাল্যবন্ধু বলে তোমার অনেক অসঙ্গত এবং অপমানকর কথাবার্ত্তা আমি সহ্য করেছি অমর, কিন্তু তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমি জাহাজের ক্যাপ্‌টেন, আমি কি করেছি—না করেছি এখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কর্‌বার তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী সেটা ভুলো না।" অমর সিং বোমা ফেটে উঠ্‌ল, "কি? অধিকার নেই? তুমি খুন কর্‌বে আর আমার তা বলবার অধিকার নেই? আমি আবার বল্‌ছি, আমরা আগে জান্‌তাম, তুমি ঠক্ ধাপ্পাবাজ, মিথ্যেবাদী,—ভগবানে তোমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু আজ আমরা দেখছি তুমি খুনীও…" বলে অমর সিং হাঁপাতে লাগ্‌ল। সুরয সিং আর একবার তার পানে তাকিয়ে ঠিক খুনীর মতই টল্‌তে টল্‌তে কেবিনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। অমর সিং পেছন থেকে আবার চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌ল, "অধিকার তোমার বার

করছি পরের বন্দরেই তোমাকে পুলিসের হাতে দিয়ে। আমি একা নয়, সকলেই দেখেছে।" সুরয সিং ততক্ষণে কেবিনের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। বাইরে তখন তার সম্বন্ধে আলোচনা চলেছে পুরোদমে।

—পরের দিনের কথা—

সেদিন সারা বেলা সুরয সিং কেবিনে রইল—বাইরে এল না। অমর সিং ক্যাপ্‌টেনের কাজ করছে, এখন সেই ত ক্যাপ্‌টেন হবে। তার আনন্দ ফুটে বেরোচ্ছে। সুরয সিং যে বাইরে আস্‌ছে না তার কারণ অমর সিং-ই সকলকে জানালে—সে খুনী, দিনের আলোতে এতগুলো লোকের সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে কেমন করে? হুকুম হ'ল, নিকটতম বন্দরে জাহাজ থাম্‌বে; সারাটা দিন জাহাজে সকলের মধ্যে আলোচনা চল্ল—সুরযের কি হবে ফাঁসি না দ্বীপান্তর। একবার অমর সিংএর আদেশে একজন চুপি চুপি গিয়ে দেখে এল সুরয সিং জাহাজেই আছে কি না।

সূর্য্য অস্ত গেছে—সন্ধ্যের অন্ধকার পৃথিবীর বুকের ওপর গুঁড়ি মেরে আসছে। ক্যাপ্‌টেন সুরয সিং ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল; তার চারি পাশে কৌতূহলে ভরা চোখ। হঠাৎ এমন সময় একটি লোককে সঙ্গে নিয়ে অমর সিং ও কতগুলি কর্ম্মচারী এগিয়ে এল। অমর সিং সুরযের সাম্‌নে এসে বল্লে, "দেখ সুরয, ভগবান্ তোমার সাম্‌নে একটা সুযোগ—মহা সুযোগ—এনে উপস্থিত করেছেন। এই লোকটি, ঐ যে দূরে জাহাজ দেখছ—ঐ জাহাজের লোক। ওটা নাকি পেট্‌রোলের জাহাজ—সব থেকে ওপর তলায় আগুন লেগে গেছে। এখুনি সমস্ত জাহাজ আগুনে উড়ে যাবে। ও তে অবিশ্যি লোক নেই, সব বন্দরের দিকে গেছে, তবুও তুমি যদি ঐ জাহাজের সাহায্য করতে তা হ'লে—"। সুরয সিং বাধা দিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক ত, ঠিক জান কেউ নেই?" লোকটা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্ল, "হ্যাঁ আছে, আমাদের ক্যাপ্‌টেনের এক মাত্র মা-মরা মেয়ে—সকলেরই প্রিয়—আমি জানি সে আছে, কোথাও যায় নি। কিন্তু আমি সত্যি ক'রে বল্‌ছি তাকে খুঁজে পেলাম না। সুরয সিং একবার সমুদ্রের বুকের ওপর জাহাজটার দিকে চাইল। অমর সিং তার খুব কাছে এসে বল্লে, "সুরয, এই তোমার শেষ

সুযোগ। তুমি যদি যাও তা হ'লে তুমি মর্‌বে বীরের মত; জগতের লোক জান্‌বে তুমি ভীতু নও, সাহসী বীর, পরের জন্যেই তুমি তোমার প্রাণ দিয়েছ—জান্‌বে না যে তুমি এক জন খুনী, ফাঁসির আসামী—" সুরয সিং অমর সিংএর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বল্লে, "বন্ধু, তোমার উপদেশের জন্যে ঋণী রইলাম" তার পর কর্ম্মচারীদের বল্লে, "শোন, একটা ছোট নৌকো দড়ি বেঁধে নামিয়ে দাও—খুব লম্বা দড়ি চাই—শক্ত ক'রে বাঁধা হয় যেন; আমার পিস্তলের শব্দ পেলেই সবাই মিলে সমান ভাবে টেনো যেন খুব তাড়াতাড়ি না হয়—বুঝলে?" বলে ক্যাপ্‌টেন সুরয সিং অমর সিংএর টুপিটা খুলে নিজের ক্যাপ্‌টেনের টুপিটা বসিয়ে দিলে অমর সিংএর মাথায়। পরক্ষণেই সকলে দেখ্‌লে সুরয সিং একটা জাহাজের সঙ্গে দড়ি-বাঁধা নৌকো সাঁতার দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। সকলে ব্যগ্র হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। যে লোকটা এসেছিল সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল, যা ঘট্‌ছে তা তার মাথায় কিছুই ঢুক্‌ল না। খানিক পরে দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে একটা বন্দুকের আওয়াজ এল; সকলে সমান টানে দড়ি টান্‌তে সুরু করলে। পরক্ষণেই পৃথিবী কাঁপিয়ে একটা ভীষণ শব্দ হ'ল। সন্ধ্যের আকাশ আগুনের ফুল্‌কিতে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। শব্দ আবার—আবার হ'ল, আগুন আরো—আরো প্রসার লাভ ক'রে উঠ্‌ল সমস্ত আকাশে।

—তার পরের দিনের কথা—

নতুন ক্যাপ্‌টেন অমর সিং আজ সকালে বন্দরের আফিসে বসেছে। বড় ঘর, জাহাজের কর্ম্মচারী, খালাসী প্রভৃতিতে ভর্ত্তি। এমন সময় এক জন ভদ্রলোক লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালেন। মাথায় তাঁর ক্যাপ্‌টেনের টুপি—কোন এক জাহাজের বুঝি তিনি ক্যাপ্‌টেন। সকলেই এই অপরিচিত আগন্তুকের দিকে ফিরে চাইল। আগন্তুক এসে অমর সিংএর সাম্‌নের চেয়ারে ব'সে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বল্লেন, "আপনিই বোধ করি 'ও এণ্ড্ ওর' ক্যাপ্‌টেন?" অমর সিং জানালে সেই। ভদ্রলোক বল্‌তে লাগলেন "আমি যে কি ক'রে আপনার ঋণ শোধ কর্‌ব জানি না। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম, আমাকে বোধ হয় জানেন না, আমি হচ্ছি 'সাহারা'র ক্যাপ্‌টেন। আপনিই—

মানে আপনার এক কর্ম্মচারীই কাল আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছে নিজের প্রাণ দিয়ে—"

অমর সিং জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার মেয়ে বোধ করি এখন ভাল আছে?" 'সাহারা'র ক্যাপ্‌টেন বল্লেন, "হ্যাঁ। আপনি আমাকে ধনেপ্রাণে বাঁচিয়েছিলেন, আবার কাল আপনারই লোক আমার মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে। আচ্ছা, আমি সেই লোকটির পরিবারের কোন উপকার করতে পারি না? অবিশ্যি আপনার ঋণ আমি জীবনে কখনো ভুল্‌ব না। দেখুন আর এক কথা, আপনি যে পরশু রাত্তিরে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন আমি তখন ঠিক—"অমর সিং বিস্মিত হয়ে বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌ল, "কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে এই বোধ হয় আমার প্রথম দেখা। আপনি কি বল্‌ছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—" 'সাহারা'র ক্যাপ্‌টেন ততোধিক আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে উঠলেন, "সে কি মশাই! আমি আর আপনি এক ক্লাবে খেয়ে পথে নাম্‌লাম—আমার পকেটে অনেক টাকা ছিল—তার পর গুণ্ডার দল আমাকে আক্রমণ করল, আপনি আমাকে বাঁচাবার জন্যে লাফিয়ে এলেন—ফলে আপনার ডান কাঁধটা গুণ্ডার ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল—আর আপনি বল্‌ছেন কিছুই জানেন না? আমি যদিও আপনাকে ঠিক দেখিনি অন্ধকারে, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করাতে আপনি যাবার সময় বলে যান, 'ও এণ্ড্ ওর ক্যাপ্‌টেন আমি'। আর আপনি—"

সকলেরই চোখের সাম্‌নে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। অমর সিং ধীরে ধীরে বল্লে, "আমি আপনার জীবনদাতা নই; যে আপনার মেয়েকে কাল বাঁচিয়েছে নিজের মরণকে বরণ ক'রে, সেই ছিল আপনার জীবনদাতা—এই জাহাজের ক্যাপ্‌টেন। আমি তাকে—" কথা শেষ হ'ল না, অমর সিংএর গলা কেঁপে উঠে থেমে গেল—চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল।

বিস্ময় ও শোকে ঘরের হাওয়া ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল।*

---

* একটী ইংরাজী গল্পের ভাবাবলম্বনে।

পুত্ররত্ন

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল)

নলহাটি গ্রামখানি গঙ্গার ঠিক উপরেই। এক কালে গাঁ খানায় শ্রী এবং শান্তি দুই-ই ছিল, আজকাল আশপাশে কতগুলি চিনির আর পাটের কল হওয়ায় আগের মত নীরবতা আর নাই। তবে কল বসায় গ্রামের লোকদের যে কোন লাভই হয় নাই এমন কথাও বলা চলে না—অনেক গরীব লোক এই সব কলে চাকরী পাওয়ায় বেশ খাইয়া পরিয়া আছে।

বেলা তখন আটটা, নলহাটির জমিদার মুরলীধর বাবু বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়ুক গুড়ুক শব্দে গড়াগড়া টানিতেছিলেন। তাঁর কপালে গভীর চিন্তার রেখা, মুখখানা বর্ষাকালের আকাশের মত অন্ধকার।

মিনিট পনেরো যাইতে-না-যাইতেই গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা একে একে মুরলী বাবুর বৈঠকখানায় জড় হইতে লাগিলেন। মুরলী বাবু তখন গড়গড়ার নলটি ফরাসের উপর রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "আরে প্রসন্ন, রাইচরণকে খবর দিয়েছিস্।"

"আজ্ঞে এই আমি এইছি" বলিতে বলিতে স্বয়ং রাইচরণ আসিয়া মুরলী বাবুর পায়ের কাছে গড় করিল। সে এ গ্রামেরই লোক, মুরলী বাবুর প্রজা। অল্প বয়সে পাটের কলে ঢুকিয়া এখন সে একজন সর্দ্দারস্থানীয় লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; পরিশ্রমের গুণে কলের সাহেবরাও তাকে খাতির করেন, আর বুদ্ধির দৌলতে গঙ্গার ধারে সে একখানা পাকা বাড়ী তুলিয়া মাসে মাসে ভাড়ার টাকা গুণিতেছে।

মুরলী বাবু কহিলেন, "তোমরা সবাই থাকতে গাঁয়ে এ সব কি উপদ্রব সুরু হ'ল রাইচরণ? পনেরো-কুড়ি বছরের ওপর হোল নলহাটিতে কল বসেছে—বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, উড়ে, কোন্ দেশী লোক না আছে এখানে? কিন্তু এক দিনের তরেও তো কই এতটুকু উৎপাতের কথা শোনা যায় নি! আর গেল মাস থেকে কি সব কাণ্ড ঘট্‌ছে বল তো? সেদিন শ্রীরাম চক্কোত্তির বাড়ী সিঁদ কেটে অতগুলো টাকার গয়না চুরি গেল। তার ক' দিন বাদেই দুপুর রাত্রে অঘোর সিঙ্গির বাড়ী হানা। সবার ওপর টেক্কা দিয়েছে কাল রাত্তিরে কুমোর পাড়ার ব্যাপার; একে বোধ করি ছোটখাটো ডাকাতিও বলা চলে। শুনেছ বোধ করি এতক্ষণে সব কথা?"

রাইচরণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে শুনিয়াছে। মুরলী বাবু আবার কহিলেন, "গাঁয়ে তো রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর বাস্তবিক, এতেও যদি আতঙ্ক না হয় তো হবে কিসে?"

রাইচরণ বলিল, "নিজের মুখে এখন কিছু বড়াই কর্‌তে চাইনে কত্তা, তবে এটাও ঠিক যে রাইচরণ মোড়ল বেঁচে থাক্‌তে বাবাজীদের আর বেশী দিন ট্যাঁ ফুঁ কর্‌তে হবে না। আমিও তাকে তাকে রইছি।"

মুরলী বাবু একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাদেরই ওপর গাঁয়ের এখন যত কিছু ভরসা। আমার বয়েস হয়েছে আগের মত শক্তিসামর্থ্য তো নেই! পুত্রটি যে আমার একটি রত্ন, নইলে…"

ছেলে অসিতের উল্লেখ করিতে হইলেই আজকাল মুরলী বাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, "পুত্ররত্ন"। ম্যাট্রিকুলেশন এবং আই-এস্-সি দুই পরীক্ষাতেই অসিত উঁচু বৃত্তি পাইয়াছিল, আর বি-এস্-সিতে হইয়াছিল সর্ব্বপ্রথম। এ হেন ছাত্র যখন দুই দুইবার এম্-এস্-সিতে ফেল করিয়া বসিল তখন মুরলী বাবু দিশাহারা হইয়া গেলেন, কড়া চিঠি লিখিয়া অসিতকে বাড়ী আনাইলেন। বাড়ী ফিরিয়াই অসিত বাপের কাছে বায়না ধরিল তার একটি ল্যাবোরেটারী চাই—সে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবে। বাপ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "ওঃ, গবেষণা! তোমার গবেষণা মানে তো গো এষণা—গরু খোঁজা। তা আর কষ্ট করে বাইরে গরু খুঁজ্‌তে হবে না, রোজ সকালে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখানাই একবার করে দেখে নিও। বাপের কাছে বিফল হইয়া অসিত মায়ের শরণ নিল, জানিত কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে পারিলেই এখানে কার্য্যসিদ্ধি। বাস্তবিক হইলও তাই; বর্ত্তমানে অসিত তার ছোট্ট ল্যাবোরেটারীতেই সারা দিন আবদ্ধ থাকে। তার মস্তিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে পাড়ায় নানা রকমের গুজোব রটিয়াছে। বন্ধ ঘরের মধ্যে লোকে নাকি তাকে নিজের মনে বিড় বিড় করিতে, উচ্চস্বরে হাসিতে, এমন কি কাঁদিতে পর্য্যন্ত শুনিয়াছে।

মুরলী বাবু সবে পুত্ররত্নের কথা পাড়িয়াছেন এমন সময় চাকর প্রসন্ন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, "হুজুর, শীগ্‌গির একবার বাড়ীর ভিত্‌রে এস্থন। মা ঠাক্‌রুণ মূর্চ্ছা গেছেন।"

উপস্থিত সকলেই প্রায় একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "সে কিরে?"

"হেঁ কত্তা, বামী-ঝি ছুট্টে এসে বল্লে। মা ঠাক্‌রুণ দাদাবাবুর ঘরের জান্‌লায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌লেন তার পর এসেই পালঙ্কের ওপর শুয়ে পড়েছেন। তেনার দাঁত নেগে গেছেন।"

মুরলী বাবু কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে হন্তদন্ত হইয়া অন্দরের দিকে ছুটিলেন। আসিয়া দেখেন দাসী-চাকরাণীর দল কর্ত্রী আনন্দময়ীর জ্ঞান ফিরাইয়া আনিয়াছে; তিনি চোখে আঁচল দিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছেন।

কর্ত্তা ব্যাপারটা মনে মনে অনেকখানিই আঁচিয়াছিলেন, কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে অসিতের ল্যাবোরেটারীর খোলা জানলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যে দৃশ্য দেখিলেন তা তাঁর কল্পনারও বাহিরে। অসিত বাঁ হাতে তার পোষা কুকুর-ছানা টেবীর বক্‌লেস্‌টি ধরিয়া ডান হাতে একটা পেন্সিলের সাহায্যে ক্রমাগত তার পেটে খোঁচাইতেছে, আর সেই অসহায় জীব ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বোধ করি আকাশস্থ দেবতাদের কাছেই ঘোরতর প্রতিবাদ জানাইতেছে। অশরীরী জীব-বিশেষের মত নাকি সুরে অসিত তাকে সান্ত্বনা দিতেছে "বাঃ রে টেবি বাঃ। আঁর একটু, আঁর একটু ; তোঁকে আঁজ মাংস খাঁওয়াবোঁ—পাঁঠার নাড়ি ভুঁড়ি—কঁচি পাঁঠা !"

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মুরলীধর বাবু আজ আর ঘুমাইলেন না, ঘুমাইবার মত তাঁর মনের অবস্থা ছিল না। দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল, চাকরের উদ্দেশ্যে তিনি হাঁক দিলেন, "আরে প্রসন্ন, তামাক দিয়ে যা। আর দেখ্, তোদের দাদাবাবুকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি।"

চাকর তামাক দিয়া গেল এবং তার একটু পরেই অসিত আসিয়া বাপের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুরলী বাবু পুত্রের আগমন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ইঙ্গিতে তাকে ফরাসের উপর বসিতে বলিয়া আরও মিনিট দুই নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "সোনার-গাঁয়ে বোসেদের বাড়ী আজ বিয়ের নেমন্তন্ন আছে, শুনেছ ?"

মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া অসিত কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ রাত্তিরে আপনি সেখানে যাবেন শুনেছি।"

মুরলী বাবু বলিলেন, "শেষ খবর তা হলে এখনও পাওনি দেখ্‌ছি। নেমন্তন্ন রাখ্‌তে আমি যাব না, যাবে তুমি। সন্ধ্যের পর ড্রাইভারকে হাজির থাক্‌তে বলে দাওগে।"

অসিতের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল, সে কহিল, "আজ রাত্রে ? আজ রাত্রে আমি তো কোথাও যেতে পারছি নে বাবা, আমার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌…"

"চুলোয় যাক্ তোমার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্" মুরলী বাবু বাধা দিয়া উঠিলেন, "তোমায় যা করতে বল্লাম, করো গে।"

সন্ধ্যার পর বিরসবদনে অসিত নিমন্ত্রণ রাখিতে সোনারগাঁ রওনা হইল আর তার একটু পরেই প্রসন্নকে সঙ্গে নিয়া কর্ত্তা ঢুকিলেন তার ল্যাবোরেটারীতে। বাড়ীর এক কোণে অসিতের ল্যাবোরেটারী—নানা বৈজ্ঞানিক দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ। মুরলী বাবু হাতের কাছে যে যে জিনিষ পাইলেন চূর্ণ করিলেন, বাকীগুলি জানালা দিয়া দূরে একটা ঝোপের আড়ালে ফেলিয়া দিতে দিতে মনে মনে বলিলেন, "পাগ্‌লামি তোমার ছুটোচ্ছি—দাঁড়াও না।"

রাত্রি দশটার পর বাড়ী ফিরিয়া অসিত যখন সমস্ত ব্যাপারটা টের পাইল তখন সে এমনই আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল যে আনন্দময়ী তো আনন্দময়ী, মুরলী বাবু পর্য্যন্ত থতমত খাইয়া গেলেম। পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে সে ঝোপের নিকট হইতে মুরলী বাবুর ফেলা সমস্ত জিনিষপত্র কুড়াইয়া আনিল ; তার পর ল্যাবোরেটারীর দরজায় খিল আঁটিতে আঁটিতে উচ্চকণ্ঠে বার বার সকলকে জানাইয়া রাখিল, যদি সে রাত্রে কেউ তার ঘরের ত্রিসীমানায়ও পদার্পণ করে তো কাল সকালে উঠিয়া এ গ্রামে আর কেউ তাকে দেখিতে পাইবে না।

ফেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন…

আধ ঘণ্টাটাক বাদে খট্ করিয়া ল্যাবোরেটারীর দরজায় একটু শব্দ হইল—অসিত বাহিরে আসিতেছে। কি জানি উন্মাদ কি কাণ্ড করিয়া বসে, এই ভয়ে বাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্নমনে জাগিয়া ছিল, আনন্দময়ী ঠাকুরের কাছে সঙ্কটা ব্রতের সঙ্কল্প জানাইয়া সবে সেই মাত্র দাওয়ার উপর একটু বসিয়াছেন, ধীরে ধীরে অসিত তাঁর কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "বাবা আজ রাইচরণকে কল্‌কাতা পাঠিয়েছেন, সত্যি ?"

"হ্যাঁ, বাবা, বিকেল পাঁচ টার গাড়ীতেই রাইচরণ রওনা হয়ে গেছে তো !"

অসিত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "ফির্‌বে কবে ?"

"কাল সকালের ট্রেনে। আজকে তো আর ফেরার গাড়ী পাবে না !"

কেবল অন্ধকার ছিল বলিয়াই আনন্দময়ী দেখিলেন না এ খবরে অসিতের মুখ অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; এক ঘণ্টা আগেকার সমস্ত দুঃখ-গ্লানি তার তখন ধুইয়া মুছিয়া গেছে।

পর দিন প্রাতে উঠিয়াই সমস্ত নলহাটি গ্রাম স্তম্ভিত, অভিভূত হইয়া পড়িল—গত রাত্রে

কালীবাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া দেবীর হাজার টাকা মূল্যের সোনার গহনা কে সরাইয়াছে। গ্রামবাসীরা যতই নিরীহ-নির্ব্বিবাদী হোক না কেন, সকলেরই সহ্যের একটা সীমা আছে; সে সীমা এবার ছাড়াইয়া গেল। সে দিনই মধ্যাহ্নে মুরলী বাবু গ্রামের জনা চারি মাতব্বর ব্যক্তিকে মহকুমায় পাঠাইয়া দিলেন—সমস্ত ব্যাপার হাকিমের (এস্. ডি. ও'র) গোচর করিয়া তাঁকে তারা ব্যাপারটার একটা কিনারা করিতে অনুরোধ করিবেন। নহিলে নলহাটি বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। মুরলী বাবুর বোধ হয় ইচ্ছা ছিল এই সঙ্গে অসিতকেও পাঠান কিন্তু যাত্রার সময় বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না।

তারই ঠিক পর দিনকার ঘটনা। বিকাল বেলায় খবর রটিল এস্. ডি. ও. নাকি স্বয়ং নলহাটিতে আসিয়াছেন এবং থানায় উঠিয়া গ্রামের অত্যাচার-অনাচার সম্বন্ধে নানা রকমের খোঁজ লইতেছেন। শুনিয়াই গ্রামের গণ্যমান্যেরা তাড়াতাড়ি থানায় আসিয়া জুটিলেন—আলোচনা, কল্পনা-জল্পনা সুরু হইল। হঠাৎ সেই সময় এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যা কেউ কখনো আশা করে নাই—একটা চামড়ার সুটকেশ হাতে অসিত আসিয়া সেখানে হাজির।

সোজা এস্. ডি. ও.র সাম্‌নে আসিয়া অসিত বলিল, "আপনি এ গাঁয়ের চুরি সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিতে এসেছেন শুনে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলাম। বোধ করি এ বিষয় আমি আপনাকে অনেকটা সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব।"

উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে এক জন তাড়াতাড়ি এস্. ডি. ও.র কানের কাছে মুখ নিয়া বলিল, "ছেলেটির মাথায় কিন্তু একটু দোষ আছে।" এস্. ডি. ও. অসিতের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একবার দেখিয়া নিলেন, তার পর বলিলেন, "কি ভাবে আপনি সাহায্য কর্‌তে চান? আপনার ও সুট্‌কেশটাতে কি? একেবারে চোরাই মাল শুদ্ধ উদ্ধার করে এনেছেন নাকি?"

একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। অসিত কিন্তু এতটুকু অপ্রস্তুত হইল না, বলিল, "প্রায় তাই-ই।" তার পর দারোগার দিকে ফিরিয়া কহিল, "অনাথ বাবু, ঘরের এ পাশটা একটু পর্দ্দার আড়াল করিয়ে দিতে পারেন?"

এই অদ্ভুত প্রস্তাবে অনাথ বাবু বিস্মিত হইলেন যথেষ্টই, কিন্তু তবু তিনি জনা দুই কনেষ্টবলকে হুকুম দিয়া অসিতের কথামত পর্দ্দা খাটাইয়া দিলেন। সকলের বিস্ময় আরও চড়াইয়া দিয়া অসিত সেই পর্দ্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইল।

একটু পরেই যে কাণ্ড ঘটিল তাকে 'আশ্চর্য্য' বলিলেও নিতান্তই কম বলা হয়, অন্য কোন বিশেষণের দরকার—পর্দ্দার ও পাশ হইতে বহু লোকের গলার সুস্পষ্ট আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। সেখানে ঠিক নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, শোনা গেল :—

"...তার পর সর্দ্দার, কালীবাড়ীর গহনাগুলো তো গাপ্ করা গেল, এবার মুরলী বাবুর বাড়ী লুট হচ্ছে কবে? আঃ, ব্যাটার ছাঁৎলা-পরা টাকা, হাত আমার নিস্‌পিস্ কর্‌ছে।"

"আস্‌ছে অমাবস্যার রাত্তিরে। কিন্তু খুব হুঁসিয়ারির সঙ্গে চল্‌তে হবে হে? কাল নাকি হাকিমের কাছে খবর গেছে। হাকিম বোধ করি শীগ্‌গিরই এগাঁয়ে এসে পড়্‌বে—তার আগেই গহনাপত্তর গুলো সরিয়ে ফেলা চাই; নেবুবাগানের মাটীর নীচে বেশী দিন ওভাবে ও গুলোকে রাখা চল্‌বে না.....।"

উপস্থিত সকলে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন—এ কি, এ যে রাইচরণের গলার স্বর! অনাথ বাবু গিয়া বিদ্যুদ্বেগে পর্দ্দার কাপড়টা সরাইয়া দিলেন; তার পরেই কিন্তু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন, ঘরে তো অসিত ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই! কে এ ভৌতিক রহস্যের মীমাংসা করিবে?

অসিত একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "দিনে দুপুরে অমন ভয় পাবেন না অনাথ বাবু; এই মাত্র যা শুন্‌লেন সেটা ভূতের গলার আওয়াজ নয়, আওয়াজটা বেরোচ্ছে আমারই এই খোলা সুটকেশটির ভেতর থেকে। আপনারা সব সুস্থ হ'য়ে নিজের নিজের জায়গায় বসুন, আমি এক্ষুণি রহস্যের দ্বার-উদ্‌ঘাটন কর্‌ছি।"

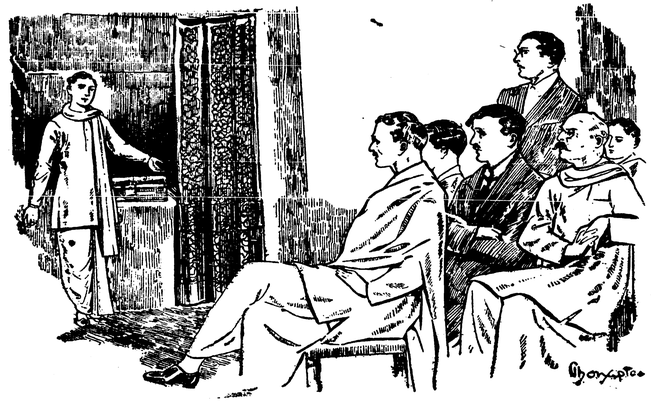

নিজের নিজের জায়গায় বসুন

স্বপ্নাবিষ্টের মত সকলেই বসিয়া পড়িল, অসিত বলিতে আরম্ভ করিল, "বছর কয়েক আগে ফিজিক্স নিয়ে যখন আমি এম্-এস্-সি ক্লাশে ভর্ত্তি হলাম তখন থেকেই পড়া-শুনার চাইতে

আবিষ্কারের নেশাই আমায় পেয়ে বস্‌ল বেশী। চব্বিশ ঘণ্টাই নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে ল্যাবোরেটারীতে পড়ে থাক্‌তাম—'শব্দ' সম্বন্ধে কতগুলো নতুন জিনিষ বার কর্‌ব এই আমার মৎলব। এক দিন মনে হ'ল, এডিসন্ গ্রামোফোন আবিষ্কার করে জগতের অনেক উপকার করেছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনো তাতে কতগুলি দোষ-ত্রুটী রয়ে গেছে। গ্রামোফোন শুন্‌লে আওয়াজটা যে একটা কল থেকেই বেরোচ্ছে, কোন স্বাভাবিক মানুষের গলা থেকে নয়, তা বোধ করি নিতান্ত ছোট ছেলেরাও বুঝ্‌তে পারে। মনে মনে ভাব্‌লাম, আচ্ছা, কল থেকে অবিকল মানুষের গলার আওয়াজ বার করা কি একেবারেই অসম্ভব? এ প্রশ্নের মীমাংসা কর্‌তে নানা রকমের কলকব্জা নিয়ে আমায় প্রচুর মেহনৎ কর্‌তে হল। মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, এম্‌নি ধারা একটী যন্ত্র আমায় তৈরী কর্‌তে হবে যে শুধু স্বাভাবিক আওয়াজ নয়, তার আশ-পাশে সামান্য—অতি তুচ্ছ—একটু শব্দ হলেও যাতে সেটা সে যন্ত্রে ধরা পড়ে। এ কাজে হাত দিয়ে সেই সঙ্গে এম্-এস্-সি পাশের পড়া তৈরী আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠ্‌ল না, পর পর দু' বচ্ছর তাই পরীক্ষায় ফেল্ হলাম। বাবা গেলেন চটে, অকর্ম্মণ্য মনে করে পড়া ছাড়িয়ে দিলেন। গাঁয়ে ফিরেও কিন্তু আমি আমার কাজ ছাড়িনি, মার কাছ থেকে কিছু টাকা জোগাড় করে বাড়ীতেই ছোট-খাটো একটা ল্যাবোরেটারী বসিয়ে নিয়েছি। নানা রকম আওয়াজের বিভিন্ন পর্দ্দা যাতে হুবহু সেইভাবেই কল থেকে বেরিয়ে আসে তারই জন্যে যন্ত্রের সুমুখে বসে সময় সময় অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ আমায় কর্‌তে হয়েছে—কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো নাকিসুর, কখনো বা জিনিষপত্র নিয়ে ঠোকাঠুকি। পোষা জানোয়ার এনে তাদের ডাক পর্য্যন্ত আমি আমার যন্ত্রে ধর্‌তে চেষ্টা করেছি। একটা লোকের আসল উদ্দেশ্য যদি না জানা থাকে, আর তাকে যদি অনবরত বদ্ধ ঘরে এই অবস্থায় দেখা যায় তবে তার সম্বন্ধে পাগল অপবাদ রটা কিছুই বিচিত্র নয়। বোধ করি গাঁয়ের কারো কারো, এবং বিশেষ করে আমার মা বাবার এমনই একটা ধারণা হয়ে থাক্‌বে। পরশু সন্ধ্যের পর নেমন্তন্নের ছুতোয় আমায় অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে বাবা আমার ল্যাবোরেটারী তছ্‌নছ্ করে ফেল্লেন, যন্ত্রপাতি বাইরে ফেলে দিলেন। বোধ হয় তিনি ভেবেছিলেন দিন কতক বাতিক বন্ধ রাখ্‌লে পাগ্‌লামি আপনা হতেই সেরে যাবে।

"বাড়ী ফেরার পর আমার যে কি রকম মনোভঙ্গ হল তা আপনারা হয়তো বুঝ্‌তে পারবেন না, কেন না সে দিন সকালেই আমি টের পেয়েছি যে আমার এক্স্‌পেরিমেণ্ট্ সফল হয়েছে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। বাবা যে ঝোঁপের ভেতর যন্ত্রটা ফেলেছিলেন সেখান থেকে সেটা তুলে এনে ঠিক আছে কি না পরীক্ষা কর্‌তে গিয়ে যন্ত্রে কি ধরা পড়ে গেছে, শুন্‌লাম? রাইচরণের গলার আওয়াজ। খাটো গলায় সে তার সঙ্গীর সঙ্গে যে কথা কইছিল তার ধরণটা আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ল না। তা ছাড়া বিস্ময়েরও একটু

কারণ ছিল—সন্ধ্যেবেলা ড্রাইভারের মুখে শুনেছিলাম বাবা নাকি সেদিন বিকেলে রাইচরণকে কি কাজে কল্‌কাতা পাঠিয়েছেন। বিকেলে যে লোক কল্‌কাতা রওনা হয়ে গেছে সন্ধ্যের পর বাইরে-ফেলা যন্ত্রে তার গলার স্বর ধরা পড়্‌ল কি করে? সে আর কিছু সে রাত্তেই গাঁয়ে ফির্‌তে পারে নি!

মার কাছে গিয়ে সামান্য একটু জিজ্ঞাসা-বাদ কর্‌তেই ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে এল—অর্থাৎ রাইচরণ গাঁয়েই রয়েছে অথচ লোকের মনে ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে সে গেছে কল্‌কাতায়।

ভোরে উঠেই শুন্‌লাম মা কালীর গায়ের সমস্ত গহনা কাল রাত্তিরে খোয়া গেছে। মনে আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল, এখন সেটা আরও দৃঢ় হল—আমাদের গাঁয়ের এই হঠাৎ-আসা দস্যুদলের নেতা রাইচরণ নয় তো? গঙ্গার ধারে ওর ওই ভাড়া-খাটানো বাড়ীটা ওদেরই রাত্তির বেলাকার আড্ডা নয় তো? পরখ্ কর্‌তে হচ্ছে ব্যাপারটা আজকেই। গাঁয়ে যেমন হৈচৈ পড়ে গেছে তাতে আমার এ অনুমান যদি সত্যি হয় তবে আজ রাত্তিরে ওখানে রাইচরণদের একটা সলা-পরামর্শের বৈঠক বস্‌বেই। দুপুর বেলা সমস্ত 'ভাড়াটেই' কলের কাজে বেরিয়ে যায়, সেই সময় কোন মতে যদি আমার যন্ত্রটাকে ওদের বস্‌বার বড় ঘরটায় কোথাও লুকিয়ে রেখে আস্‌তে পারি তবে রাত্তিরে কি আলোচনা ওদের হয় না হয় সমস্তই টের পাওয়া যাবে। চাদরের নীচে ছোট্ট যন্ত্রটি ঢেকে দুপুর বেলা তাই বেরিয়ে পড়া গেল। দেখ্‌লাম বাড়ী পাহারায় এক জন লোক ওদের মোতায়েন আছে বটে, কিন্তু তার চোখে আমি আধ-পাগ্‌লা বই আর কিছুই নই। বিতং করে সব কথা বল্‌বার আর দরকার নেই, শুধু এইটুকু শুনে রাখুন লোকটাকে ধাপ্পা দিয়ে আমার মনোমত জায়গায় যন্ত্রটিকে বসিয়ে রেখে আস্‌তে খুব বেশী বেগ আমায় পেতে হয়নি। তার পর আজ দুপুরে গিয়ে আবার ঠিক ওই ভাবেই সেটাকে বার করে এনেছি। কাল রাত্রে রাইচরণের বৈঠকে কি ধরণের আলাপ চল্‌ছিল তা তো একটু আগে আমার যন্ত্রই আপনাদের বলে দিয়েছে!"

অসিতের কথা শেষ হইল, সকলে তখন বিস্মিত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্। তার পরেই এস্. ডি. ও. উঠিয়া আসিয়া দুই হাতে অসিতের ডান হাতখানা সাগ্রহে চাপিয়া ধরিলেন, ইংরাজীতে বলিলেন, "ইয়ংম্যান্, আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্ ইউ" (যুবক, আমি তোমায় অভিনন্দিত কর্‌ছি।)

মা কালীর সমস্ত গহনাই ফেরৎ পাওয়া গেল, অবশ্য সেগুলির বদলে অনাথ বাবুও রাইচরণকে একখানা গহনা পরাইয়া দিলেন। চল্‌তি কথায় সেখানাকে বলে হাত-কড়ি। মুরলী বাবু অসিতকে একাণ্ড ল্যাবোরেটারী বানাইয়া দিয়াছেন, কথায় কথায় এখন আর তিনি 'পুত্ররত্ন' বলেন না, তবে আনন্দময়ী মাঝে মাঝে তাঁর 'গঙ্গাজল'দের বলেন বটে, "আহা, আমার ছেলে তো নয়—একটি রত্ন!"

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

আজকে আবার ফিরে এল কাল-বোশেখী ঝড়

(কুমারী সুজাতা গুপ্তা)

আজকে আবার ফিরে এল কাল-বোশেখী ঝড়
রাশি রাশি মেঘ জমেছে পূব আকাশের পর ॥
দুরন্ত সে ধরার ছেলে
ডাগর ডাগর আঁখি মেলে
আসছে যে আজ, তাইতে বাতাস কাঁপ্‌ছে থর থর
আজকে আবার ফিরে এল কাল-বোশেখী ঝড় ॥

নদীর বুকে ঢেউ তুলেছে, বইছে সে তর তর,
লুকিয়ে গেছে কলধ্বনি
জেগেছে আজ জোর তুফানী
নৌকা নিয়ে ছুট্‌ছে মাঝি পাবার আশে চর,
আজকে আবার ফিরে এল কাল-বোশেখী ঝড় ॥

জলসা ছেড়ে পাখীরা সব ছুট্‌ছে আপন ঘর
দোয়েল-শ্যামা নাচন ছাড়ে,
ভাঙ্গল বাসা ঐ ওধারে
ছোট্ট ছানার দশা ভেবে কম্পিত অন্তর
আজকে আবার ফিরে এল কাল-বোশেখীর ঝড় ॥

সবুজ মাঠে থেমে গেল রাখাল-বেণুর স্বর
ধেনু নিয়ে ঘরের পানে
ধায় যে তারা ব্যাকুল প্রাণে

পাঁচন হাতে, টুকরী মাথে, শঙ্কাতে কাতর
আজকে ধরায় দেখা দিল কাল-বোশেখী ঝড় ॥

গ্রাহকের আঁকা ছবি

বোঝার উপর শাঁকের আঁটি— শিল্পী শ্রীসুমুখনাথ মিত্র।

পাশের ছবিখানা 'রামধনু'র গ্রাহক শ্রীসুমুখনাথ মিত্র কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ছবির নাম বোঝার উপর শাঁকের আঁটি। ছবি আঁকায় শ্রীমান্ সুমুখনাথের বেশ পরিষ্কার হাত—তাঁর আরও কয়েকখানা ছবি 'রামধনু'তে প্রকাশিত করিব।

সতুর কীর্ত্তি

(শ্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়)

মরণের ভয় সকলেরই থাকে কিন্তু আমাদের উকীল বন্ধু সতুর সেটা আবার আছে একটু বেশী। যখনই কোনও অসুখের কথা সে শোনে তখনই একটু কিছু হলেই তার মনে হয় তার সেই অসুখই বুঝি করেছে। কার কাছ থেকে জানি না, কলকাতায় আজ কাল বড় বেশী থাইসিস হচ্ছে শুনে সতু তো কিছু দিন নাওয়া খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিল। রোজ বিকেলে বগলে থার্ম্মোমিটার দিয়ে সে বসে থাকতো আর সকাল বিকেল পাড়ার ডাক্তার শচীন বাবুর কাছে গিয়ে ধর্না দিত এই বলে যে তার বুকটায় বড় ব্যথা ধরেছে, থাইসিসের এটা পূর্ব্বলক্ষণ নয় তো? যাক, সেবার শচীন বাবু এবং আমরা সকলে মিলে তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি।

এই সেদিন আদালতের মধ্যে সতু আবার যে কাণ্ডটা বাধিয়েছিল সেইটাই আজ তোমাদের বল্‌ব। সতুর মুখ থেকেই আমরা সেটা শুনেছি। ঘটনাটার কয়েক দিন আগে সতুর এক মক্কেল সতুকে এসে বল্লে যে তার বড়দা হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে মারা যান। আর যাবে কোথা, সতুর মাথায় তখন থেকেই সেই কথাটা ঘুরছিল। সেদিন ছিল সোমবার। সকাল থেকে আদালতের নানা কাজে হয়রান হ'য়ে বেলা তিন টার সময় তার বড় পিপাসা পেয়েছিল। আদালতে সে কখনই জল খায় না, কারণ খাবার জলের গ্লাসে নানা লোকে মুখ দেয়, তার থেকে কি জানি কোনও রোগ এসে যেতে পারে। এই জন্য সে বরাবর ডাবই খায়। তাতে আর কোনও বীজাণুর ভয় নেই। সেদিনও সে ডাবটী খেয়ে সবেমাত্র ফেলতে যাবে এমন সময় তার মনে হল যে তার সর্ব্বাঙ্গ দুল্‌ছে। চোখের সামনে আদালতের ঘর-দুয়ার সব দুল্‌ছে। আর যাবে কোথা, মক্কেলের দাদার কথা সতুর মনে আসতেই ডাবটা তার হাত থেকে খসে পড়ল। সতু তার মুহুরী হরিপদকে ডাকতে লাগ্‌ল "হরিপদ, আমায় ধর শীগ্‌গির, আমি পড়ে যাচ্ছি।" হরিপদ কাছেই বসে আদালতের কাগজ দেখছিল। বাবুর ডাকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে সে সতুকে জাপটে ধরে বল্‌ল "বাবু, বাবু, অমন করছেন কেন? এই শীতে আপনার ডাবটা খেয়ে বুঝি এমন হল। একটা কমলা লেবু আন্‌ব কি?" বাবুর তখন আর কথা বলবার সামর্থ্য নেই। তিনি হরিপদর গায়ে এলিয়ে পড়েছেন। মিনিট কয়েক এই রকম থাকবার পর সতু যখন খানিকটা সুস্থ হল তখন দুজনেই দেখ্‌ল আদালত শুদ্ধ লোক বাইরে মাঠে বেরিয়ে পড়েছে আর 'ভূমিকম্প' 'ভূমিকম্প' বলে চেঁচাচ্ছে। তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সতুর লজ্জায় মাথা হেঁট। সে আর বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারল না, তাড়াতাড়ি কাগজপত্রের সুটকেসটা নিয়ে বাড়ী-মুখো রওনা হয়ে পড়্‌ল। আসতে আসতে সে শুনতে পেল, হরিপদ আর এক মুহুরীকে বল্‌ছে "আমাদের বাবু প্রাণের ভয়েই অস্থির। একটু গা দুল্‌ল, অমনি হরিপদ আমায় ধর; বাবুর জন্য আমার এমন ভূমিকম্পটাই দেখা হল না।" সতু সেদিন বাড়ী এসে প্রতিজ্ঞা করল যে আর সে ঐ রকম মিছামিছি ভয় পাবে না। তোমাদের কিন্তু চুপি চুপি বলছি সে তার প্রতিজ্ঞা দুমাসও রাখতে পারে নি, আবার একটা কাণ্ড বাধিয়েছিল। সে কথা সুবিধামত পরে বল্‌ব। *

☞স্থানাভাবে চিঠিপত্র এ মাসে বাহির করা গেল না☜

* সত্যঘটনা-অবলম্বনে।

সন্দেশ

সাতাশী বছর বয়সে সেদিন জাপানের এড্‌মিরাল টোগো পরলোকগমন করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া ভাবিতেছ কে সে ভদ্রলোকটি, কিন্তু বছর ত্রিশেক আগে তাঁর নাম ছিল পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের মুখে মুখে। ১৯০৪-৫ সনের কথা, ক্ষুদে জাপানের সঙ্গে বিরাট্‌কায় রাশিয়ার যুদ্ধ বাধিয়াছে—যেন দৈত্যের সঙ্গে বামনের লড়াই। রাশিয়ার উপকূল হইতে বাল্‌টিক ফ্লীট্‌ রওনা হইল, আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত ১২০ খানা বিরাট যুদ্ধজাহাজ; জাপানকে তারা পিষিয়া মারিবে, সাধ্য কি ক্ষুদে জাপান বাধা দেয়। বাল্‌টিক ফ্লীট্‌ পীতসাগরে আসিয়া পড়িল, সমস্ত জগৎ তখন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছে—এই বুঝি খবর আসিল রাশিয়ান্‌দের কামানের গোলায় জাপান উড়িয়া গেছে। খবর আসিল বটে, কিন্তু কী সংবাদ? জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল—এড্‌মিরাল টোগো যিনি জাপানের নগণ্য রণতরী নিয়া পীতসাগরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট বাল্‌টিক ফ্লীট্‌কে ছিন্নভিন্ন পর্য্যুদস্ত করিয়া পীতসাগরের জলে ডুবাইয়া দিয়াছেন। রুষ-জাপান যুদ্ধে—শুধু রুষ-জাপান যুদ্ধ কেন আধুনিক কালে—এত বড় অদ্ভুত কাণ্ড আর ঘটে নাই।

বাস্তবিকই জগতের একজন মহাবীর চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন জাপানের 'নেলসন্‌'।

* * *

কলিকাতায় ফুট্‌বলের মরসুম পড়িয়া গেছে, লীগ্‌ খেলার প্রথম অর্দ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এবারকার ফুটবলে সব চেয়ে বড় বিস্ময় মোহামেডান্‌ স্পোর্টিংএর খেলা—মোহামেডান, স্পোর্টিং যে দল মাত্র এ বছরই 'বি' ডিভিসন হইতে 'এ' ডিভিসনে উঠিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এ দলই প্রথম চলিয়াছে—দলের পাঁচটি ফর্‌ওয়ার্ড্‌ যেন আগুন! তার পরেই চলিয়াছে মোহনবাগান। মোহামেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে মোহনবাগানের যে খেলা হইয়াছিল এখন পর্য্যন্ত লীগ্‌ ম্যাচে সেইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলা—খেলোয়াড়দের অমন উৎসাহ আর কোন ম্যাচে দেখা যায় নাই। খেলা ড্র (১-১) হইয়াছে। সাহেবী দলগুলি এবার সুবিধা করিতে পারিতেছে না—অবশ্য মোটেই সুবিধা করিতে পারিতেছে না!—অবশ্য ডারহাম্‌সকে তার 'বি' টিম নামাইতে হইয়াছে কেননা 'এ'টিম এখানে নাই! একটা পরম আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে ক্যাল্‌কাটা—কলিকাতার মাঠে "শত সমর বিজয়ী" ক্যাল্‌কাটা—এবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে কিসের জন্য বল তো? না, লীগ কাপ্‌ নিবার আশা এবার তাদের নাই, যাতে 'বি' ডিভিসনে নামিতে না হয় সেই জন্য। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্‌!

সাউথ্‌ আফ্রিকায় যে ভারতীয় ফুট্‌বল-দল খেলিতে গেছে, কে ভট্টাচার্য্য, ছনে মজুমদার প্রভৃতি খেলোয়াড়েরা সেই সঙ্গে যাওয়ায় মোহনবাগান এরিয়ান্স্‌, প্রভৃতি ভারতীয় দল কিছু কিছু কাবু হইয়া পড়িয়াছে। কিছু দিনের মধ্যেই বর্ষা সুরু হইবে, তখন ভারতীয় টিম্‌গুলি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে আর সাহেবদের তখনই হইবে উঠিবার সুযোগ। শুনিতেছি এবার নাকি মোহন-বাগান দল বর্ষায় বুট্‌ পায়ে নামিবে। লীগ্‌

ম্যাচ্ শেষ হইয়া গেলে আমরা এবারকার ফুটবলের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

* * *

ওদিকে ইংল্যাণ্ডেও হুলুস্থুল, অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সেখানে ইংল্যাণ্ডের টেষ্ট্ ম্যাচ্ সুরু হইয়াছে। জার্ডিন আগেই জানাইয়া রাখিয়াছিলেন এবার তিনি ইংল্যাণ্ড-দলের ক্যাপ্টেনি করিতে পারিবেন না, ফলে ইংল্যাণ্ডের নতুন ক্যাপ্টেন মনোনীত হন ওয়্যাট্। লার্উড্ তাঁর অপারেশন-করা পায়ের আঙ্গুল নিয়াই ব্যতিব্যস্ত, তিনিও খেলায় যোগ দিতে পারেন নাই। ওয়্যাটের হাতের আঙ্গুল কিছু জখম ছিল, খেলার ঠিক অব্যবহিত আগে জানা গেল তিনিও অন্ততঃ প্রথম খেলায় ক্যাপ্টেনি করিতে পারিবেন না। তাঁর জায়গায় তখন ক্যাপ্টেন মনোনীত হন ওয়াল্টার্স্। ওয়াল্টার্সের খেলা তোমাদের অনেকেই বোধ হয় কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে দেখিয়াছ। ইংল্যাণ্ডের দলে এবার খেলিতেছেন—ওয়াল্টার্স্, সাট্ক্লিফ্, হ্যামণ্ড্, পাতৌদির নবাব, হেন্ড্রেন, লেল্যাণ্ড্, এমিস্, ভেরিটি, গিয়ারী, ফারনেস্, মিচেল ও নিকল্স্ (অতিরিক্ত); আর অষ্ট্রেলিয়ার দলে আছেন উড্ফুল, পন্স্ফোর্ড্, ব্র্যাডম্যান্, ব্রাউন, ম্যাক্কেব, ডার্লিং, চিপারফিল্ড্, ওল্ডফিল্ড, ওরিলি, গ্রিমেট্, ওয়াল এবং ব্রোমলি (অতিরিক্ত)।

* * *

ডাঙ্গায় যেমন বাঘ, জলের বিভীষিকা তেমনই হাঙ্গর। কাজেই এ শত্রুকে নিপাত করিতে মানুষের চেষ্টার ত্রুটী নাই। নিউ-সাউথ্ ওয়েল্সের সমুদ্রের ধারে আজ কাল এক ধরণের জীবের দ্বারা লোকে হাঙ্গর মারিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এ জীবটিকে কিন্তু তোমরা অসামান্য শক্তিশালী এক বিরাট্ জানোয়ার বলিয়া ঠাওরাইওনা—ছোট্ট এক রকমের পোকা, লম্বায় মাত্র ইঞ্চি খানেক।

* * *

না খাইয়া পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা যদি সম্ভবপর হইত তবে দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোকই মস্ত একটা দায় হইতে রেহাই পাইত। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে সব জীবের শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা তারা অনেক দিন অবধি না খাইয়া থাকিতে পারে। সাপ এম্নি ধারা একটা জীব, গোটা শীতকালটাই তারা এক রকম অনাহারে কাটাইয়া দেয়। এই জন্য সাপের এক নাম বায়ুভুক্। কিন্তু সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে শামুক—তারা নাকি ঝাড়া পাঁচটি বছর কিছুই না খাইয়া কাটাইয়া দিতে পারে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

'——' চিহ্নিত স্থানে নিম্নলিখিত পদবীগুলি পর পর বসিবে—

ধর, পালিত, সিংহ, গুহ, রক্ষিত, গুপ্ত, বিশ্বাস, নাগ, ঠাকুর, রায়, দে, বর্দ্ধন, মৈত্র, ঘোষ, মিত্র, দেব, শীল, দত্ত, পাল, দাস, কর, লাহা, বসু, চন্দ্র, নাথ।

কোনও কোনও স্থলে অন্য ২।১টি পদবী দিলেও চলে।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রীচি রোড্); সুনীল ব্যানার্জ্জি (কলিকাতা); অজয়কুমার দাস, অরুণা দাস, বাবা ও মা (বালীগঞ্জ); অনিল, অপু, বুলবুল, তারা, গিরিধারী, গদাধর, অন্নদা, গীতা (নসিপুর, মুর্শিদাবাদ); শঙ্কর, বকু, মধুজ, পার্থ (ভবানীপুর); বেলতলা গার্ল্স্ স্কুলের ছাত্রীগণ (ভবানীপুর); রামেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর, কলিকাতা); সুরমা, প্রতিমা, বেলা, বৌদি, মেজ বৌদি, সতী, প্রীতি, তমাল মজুমদার (পাঁতিহাল—হাওড়া); জামাই বাবু, দাদামণি, ন'দা, ছোড়দা, ছোড়দামণি, মেজদি, ছোড়দি ও অমিতাভ দাস (পুরী); অধীররঞ্জন দে, ভোলা, কাশী, ভানু, ননী, বলাই, মণ্টু, অসিত, চঞ্চল ইত্যাদি (বর্দ্ধমান), অমিতাভ রায়, স্নেহ মুকুলরায় ও বুল্বুল্ (কুতুবপুর, রঙ্গপুর); অনিল ও অরুণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (রাজসাহী); জন, রেম, পিল, কুঙ্কুম ও বাদল (মালদহ); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে, বীণা, রথী, বড়দা, বৌদি, ছোড়দি, লীলা, কানু, বেণু, ছোড়দা, মেজদা ইত্যাদি (ময়মনসিংহ); লতিকা দেবী (বালুরঘাট); সুমুখনাথ মিত্র, পূর্ণেন্দু, রাণী, হরি, বেণু, ভানু, লক্ষ্মী, গৌরী, পরাণ ইত্যাদি (দিনাজপুর) কামাক্ষীপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ, সুশীলদা, সুধীর, ভবানীদি, সুনীল, অমিয়, বুড়া, গোপাল ইত্যাদি (শিলং); তুহু, খুকী, মুকু, বেণু, বিশু, খুড়িমা, পালী, কচি, তুসু, বেলী, জিম্ (ময়নাগুড়ি) রণজিৎ, বেলা ও ধুসু (মাধিপুরা); শিবানী দেবী, বিন্দু, হাসি, খুকু, খোকা ও মাণিক মামা (ঢাকা); বরীন্দ্রনাথ ঘোষ, রেজিনা, হেসেন, মঞ্জুল, নমিতা (মির্জ্জাপুর); কৃষ্ণবরণ মুখোপাধ্যায়, অমর, প্রতিভা (বাণীমন্দির, মুড়াগাছা); সন্তোষরঞ্জন সেন (ভবানীপুর); মঞ্জু, প্রতু, আরতি, ছবু, সুব্রত ও শুভব্রত রায় চৌধুরী (চুঁচুড়া); নন্দরাণী, অনসূয়া ও অরুণা সান্যাল (কুষ্টিয়া); অতনুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মুঙ্গের); শৈবাল, মা, রাঙ্গাকাকীমা, নতুন কাকীমা, শীলা, ভোঁদা (ভবানীপুর); সত্যেন্দ্র, অজিত, নির্ম্মল, অনিল, করু, গুম্বা (চুঁচুড়া) কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর); নায়েব আলি, কটু, বটু, খুকু, মাণিক, জলী, শীতু ইত্যাদি; পানু, ভানু, অনাথদা, গবুদা, বাবা, মা, চান্দা প্রভৃতি (সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ); সমরেন্দ্র চৌধুরী (কুমিল্লা); অজিতকুমার সান্যাল ও নবকুমার সেন (পাবনা); সুরমা রায় (খড়্গপুর); হাবাদা, ছোড়দি, সেজদি, বৌদি, চুনু ও সমীরেশচন্দ্র দে (বেনারস সিটি); অক্ষণকুমার গুপ্ত (রায়পুর); অমিয়া, খোকন, মনু, দাদাবাবু, বেণ্টদা (ঝিনাইদহ); তরুণ, তপন, চিত্রা, মণিকা, (ভবানীপুর); জ্যোতির্ম্ময় বসু (শিবপুর, হাওড়া) যামিনী (বাবুঘাট); শুভেন্দু, শান্তনু ও কুমারী, শান্তি মুখার্জ্জি (বাসন্তী পাঠাগার, শ্রীরামপুর); বড়দি, অমু, ঝুণ্ট, বুড়ু, ক্ষুদেমাসী, অশ্বানদা প্রভৃতি ও নীলিমা চাটার্জ্জি (শিলচর); বিঠবা ঠাকুর, নারাণ ও সোমনাথ (নডিহা, পুরুলিয়া); সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ওরফে দুলু (বসিরহাট); মেমিও বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ—রাণু, ঝুনু, খুকী, বিভা, নীলিমা, সানিরেখা (মেমিও, বর্ম্মা); বেণুরাণী দত্ত (বেলেঘাটা, কলিকাতা); কিশোর লাইব্রেরির পরিচালিকাবৃন্দ—খেতুদি, মেজদি, সেজদি, রমা, গৌরী উমা প্রভৃতি (শ্রীরামপুর); মা, বাবা, ঠাকুমা, বাণী, কিকি, খোকা, খাঁদু, বিনয় (চাইবাসা); হিরণ্ময় দেব, মা, বাবা, অনিল বাবু, বড়মামা, ফণী, নীলু প্রভৃতি (গৌহাটি);

প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ); কমলকৃষ্ণ হাজরা চৌধুরী (যতীন্দ্রপাঠাগার, শ্রীরামপুর); শঙ্করকুমার মিত্র (ভবানীপুর)। একটি উত্তরে কোন নাম পাওয়া গেল না।

যাঁহাদের উত্তরে একটি ভুল আছে—

সনু, মনু, মোহন, সুসী (বসিরহাট); ডলি, তুলতুল, মীরা, অঞ্জু, কুটুমা, লক্ষ্মীমা (ভবানীপুর); সুধীরচন্দ্র দাস (ভবানীপুর); টুটু, মিনু ঘোষাল (লেক্‌পল্লী); চিরু, কানু, দীপু, সতী (ভবানীপুর); নরেন, মোহন, পূর্ণ, ঝেণ্ট, বিশ্বনাথ (ভবানীপুর); তপেশ হালদার, (বুদ্ধ) (মধুপুর); ভাট্টা উত্তরটোলা লাইব্রেরির সভ্যবৃন্দ ও দাদা দিদি, সরোজ, রাণী, মণি কানাই ও অতুল (ভাট্টা, পূর্ণিয়া) ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাষ্টার মহাশয়, গোবর্দ্ধন, গোপাল, খোকন, রাণু, বিনু, মিনু, পিনু ও ভজা (বড়া, হুগ্‌লী), আরতি, অনিল, হরিশ, মণি, টেপু, বীণা, মনোরমা, বাবা, মা ও ছোটকাকা; দুলালচন্দ্র দত্ত ও অরুণকুমার দত্ত (শিবপুর—হাওড়া); উষা, গীতা, অরুণ, অসীম, ঘণ্ট, ইণ্ট, ও অজিতকুমার দত্ত; অজিজ, সন্তোষ ও বন্ধুবান্ধব (নলহাটি)।

যাঁহাদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে—

রথীন্দ্রনাথ মিত্র (কালীঘাট); কনককুমার সিংহ, সতু (বর্দ্ধমান); নিখিলকুমার চৌধুরী ও শেখ বছির উদ্দিন (নওগাঁ); লতিকা ও সব্যসাচী (রাজসাহী), বলাই, পাঁচু, সুধীর, নির্ম্মল, রামপ্রসাদ সিং প্রভৃতি বেহালা এইচ্‌ ই স্কুলের ৮ম মানের ছাত্রবৃন্দ (বেহালা); গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য (রামপুরহাট); শেফালিকা রায় চৌধুরী (কলিকাতা); শান্তিময়, সন্তোষ, নীলরতন, নবকুমার সতীশ শশাঙ্কশেখর বসু প্রভৃতি (চতুর্থ শ্রেণী, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বেহালা); অমর চৌধুরী (রাজসাহী) পঙ্কজকুমার ভৌমিক (উত্তরপাড়া, হুগ্‌লী) দিদি, মেজদি ও অনন্তকুমার ওহ্‌দেদার (কাশীধাম); ব্যোমকেশ রাহা (নন্দনকানন, চট্টগ্রাম); কল্যাণ-কিশোর মুখোপাধ্যায় (গয়া); বিন্দু, দীনেশ, রমেশ, নরেশ, সুরেশ ও হাসি (করিমগঞ্জ); শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি (ভন্তারা, হুগ্‌লী); অশোকরঞ্জন দত্ত (সিংরৈল, ময়মনসিংহ); জ্যোৎস্না, মুকুল, ঝুলন (ভরদ্বাজহাট—চাটগাঁ); মণ্ট, ফডিং দ্বিজু, বিনয়দা, চরিং (কলিগ্রাম, মালদহ); ফচু, ভঙ্কু, মা, দাদা ও বৌদি (জেমসেদপুর); নন্দ, হাঁসি, ফাঁসী, টুনু গোপী, বুড়ু, চুড়ু ইত্যাদি (আন্দুল মৌড়ী)।

নূতন প্রশ্ন

(শ্রীঅরুণকুমার রায়)

এ কি সম্ভব ?—

লতা নাই—তৃণ-গুল্ম সেথা নাই কভু
চির সবুজের দেশ জানি তারে তবু

রামধনু—

'কং'

(৩৩৫ পৃষ্ঠা দেখ)

৭ম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪১ | ৭ম সংখ্যা

পশুরাজের পশুশালায়

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

একটী দিবস ঘুমের ঘোরে ভোরের বেলা
দেখ্‌তে গেলাম পশুরাজের পশুশালা।
তক্‌মা আঁটা চেনা শেয়াল সেলাম দিয়ে
সুসজ্জিত পশুশালা দেখায় নিয়ে।

ছোট ছোট কুঠারীতে টিকিট মেরে
দেশ-বিদেশের নরনারী রেখেছে রে।
কাফ্রী এবং হোটেন্‌টোদের দেখছি সাথী,
সকল দেশের সকল রকম নর-জাতি।

বাংলা দেশও বাদ পড়ে নি দেখছি সেথা,
এত রকম এত মানুষ পেলে কোথা ?
সত্য এরা যুদ্ধ করে জিন্‌লে নাকি ?
কিংবা প্রচুর অর্থ দিয়ে কিন্‌লে নাকি ?

পশুশালার কর্ত্তা নধর গরিলাটী
দন্তগুলি বাহির করে পরিপাটী
বল্লে, 'আসুন, দেখুন মোরা কেমন করি
বিশ্ব-মানব সত্য সত্য হেথায় গড়ি।
অসভ্য হ'ক মানব-জাতি ঘৃণ্য নহে,
পোষ মানালে পোষ মানে ও কথা কহে।
স্বভাব এদের নয়কো বটে বন্য বড়,
কৃতঘ্নতাই দোষটা এদের বৃহত্তর।
দেখি এরা বড় জবর অহঙ্কারী,
অকারণে নিজেকে দেয় বলিহারী।
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় দেখছি আমি,
এরা দারুণ আত্ম-সুখী, স্বার্থ-কামী।'

দেখতে পেলাম এনেছে নর ব্রিটেন থেকে,
বল্লে, 'বাপু, হয় ত তুমি চেনো একে।
এর পতাকায় পশুরাজের ছবি আঁকা,
দেখে বড় শক্ত হাসি চেপে রাখা।
ক্ষুদ্র হউক, দেখি ইহার উচ্চ আশা,
মোটের উপর বলতে হবে লোকটা খাসা।
হেথায় দেখ—জার্ম্মানীরই তনয় ইনি,
ঈগল হবার স্পর্দ্ধা কারো আকাশ জিনি।

কেহ চাহেন ব্যাঘ্র, কেহ ভালুক হতে,
প্রচার করেন কতই বাণী পথে পথে।

'দেখছ হেথা হয় ত তোমার স্বদেশবাসী,
এদের কথা শুনতে আমি ভালবাসি।
বুদ্ধি আছে কিন্তু এরা অলস ভারী,
ভালবাসে ঝগড়াঝাটি, আড়াআড়ি।
মানব-জাতি পশুর কাছে কত ঋণী
আমি হেথা চোখের মাঝে দেখছি দিনই।
শুনি আমি নর-জাতির নৃশংসতা,
এটা বড়ই লজ্জা এবং ঘৃণার কথা।
পক্ষী, পশু, মৎস্য পুষে আহার করে,
ডিম্ব এবং পাখীর ছানায় উদর ভরে ;
শুনি তারা কান্না উঠায় জলে স্থলে,
বল দেখি রাক্ষস আর কাকে বলে ?

'এরা হেথায় পশুরাজার পশুশালায়
হাজার রকম চীৎকারেতে বড় জ্বালায়।
সকালে দিই খেতে এদের চা আর রুটী,
ভালবাসে বন্য ফল ও মটরশুটী।
মোদের কাছে শিখেছে হায় মাংস খেতে,
দুর্ব্বল দাঁত, সিদ্ধ করে হয় তা দিতে।
মানুষরা দেয় পশুর মাংস পশুর তরে,
আমরা কিন্তু নরমাংস দিই না নরে।
শুনি তারা আমাদিকে দেয় যে গালি—
'পঞ্চতন্ত্র', 'কথামালা'য় সাজায় ডালি।

এখানেতে বলে সে সব শৃগাল এসে,
আমরা ছোটর মুখের কথা উড়াই হেসে।'

* * *

ভাঙ্‌ল স্বপন, ঘড়িতে মোর বাজ্‌ল ছ'টা,
মিলিয়ে গেল বিকট-হাসি গরিলাটা।

দিনের খোকা— রাতে

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্‌-সি)

খোকা—সন্তোষ বাবুর খোকা। সুন্দর ফুটফুটে, গোলগাল—চমৎকার। মুখে হাসিটী লেগেই আছে—কাঁদ্‌তে সে জানেই না। চমৎকার মিষ্টি আধ-আধ কথা—দিনের মধ্যে কত কথাই যে বলে তার ঠিক নেই। বয়স ত বোধ হয় এখনও পাঁচ বৎসর শেষ হয় নি কিন্তু কথা বলে যেন কত কালের বুড়ো। কখন কি বলে তার ঠিক নেই—আবোল-তাবোল কত কি? তার কথা বলা একটা শুনবার জিনিষ; রাস্তার লোকে দাঁড়িয়ে শোনে—পাড়ার মেয়েরা তাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে শোনে—পার্কে বেড়াতে গেলে তার পাশে লোক জড় হয়ে যায়—কখনও ভয় পায় না—যে লোকই সামনে থাক আর যত লোকই তাকে ঘিরে থাক, সে ঠিক অনর্গল বকে যাবে। পাড়ার মেয়েরা কেউ আদর করে ডাকে 'কলের গান', কেউ বা ডাকে "তোতা পাখী।"

সন্তোষ বাবু তাঁর ছেলের গর্ব্বে গদ্‌গদ। কিন্তু বেচারার দুর্ভাগ্য এমনি যে এমন যে ছেলে তাকে তাঁর এতটুকু কাছে পাবার উপায় নেই—তার মুখের দুটো মিষ্টি কথা শুনবার এক মুহূর্ত্ত অবসর নেই। তিনি ভোর বেলায় কাজে বার হয়ে যান, তখন খোকা থাকে ঘুমিয়ে, আবার সারাদিন পরে যখন কাজ থেকে

সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরেন তখন বেশীর ভাগ দিনই খোকা পড়ে ঘুমিয়ে। এক-আধ দিন যদি জেগে থাকে তবেই তিনি খোকার একটু-আধটু কথা যা শুন্‌তে পান—কিন্তু সে কতক্ষণ? সারাদিন দুষ্টুমির পর ক্লান্তিতে তার চোখ জড়িয়ে আসে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমে নেতিয়ে পড়ে। সন্তোষ বাবুর আশ আর মেটে না।

খোকার মা যাবেন তাঁর বাপের বাড়ী মাস খানেকের জন্য। ঠিক হ'ল খোকা মার সঙ্গে যাবে না, তার বাবার কাছে আর পিসীমার কাছে থাকবে। খোকা রোজ তার মায়ের বিছানায়, মায়ের কোলের মধ্যে শুয়ে থাকে। এই এক মাস খোকা তার বাবার বিছানায়, বাবার কাছে শোবে। খোকার তা'তে কোনও আপত্তি নেই, সে বাবার কাছে শুতে খুব রাজী।

সন্তোষ বাবুর আজ মহা আনন্দ। খোকা তাঁর কাছে শোবে; খোকার মিষ্টি-মিষ্টি, পাকা-পাকা, আবোল-তাবোল কথা শুন্‌বেন। আজ তিনি কাজ থেকে অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই ফিরলেন। পথে কত কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছেন। ভাবছেন 'খোকা, দুষ্টু খোকা নিশ্চয় তার বুড়ী পিসীকে সারাদিনে অস্থির করে তুলেছে বকে বকে। ঐটুকু মাথায় কত অদ্ভুত কথাই আসে! পাগলা ছেলেটা! ওর মা ত' রাগ করে বলেন—'খোকার বকুনির জ্বালায় ক্ষেপে উঠ্‌লাম!' আচ্ছা, আজ দেখি খোকা আমাকে কেমন ক্ষেপাতে পারে! অমন মিষ্টি কথায় মানুষ নাকি বিরক্ত হয়? খোকার মার যত অন্যায়। আমার যদি সময় থাক্‌ত তা হ'লে না খেয়ে না দেয়ে রা-ত দিন ওর কথা শুন্‌তে পার্‌তাম। খোকা, আমার সোনা খোকা, মাণিক খোকা, যাদু খোকা—' ভাব্‌তে ভাব্‌তে সন্তোষ বাবুর মনটা আনন্দে ভরে উঠ্‌ছে। সারা দিন আজ তাঁর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি গেছে। অন্য দিন হ'লে রাস্তা দিয়ে ক্লান্তিতে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী ফিরতেন কিন্তু আজকে খোকার চিন্তা তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিয়েছে—রাস্তা দিয়ে যেন তিনি উড়ে চলেছেন।

বাড়ী ঢুকেই ডাক্‌লেন—'খোকা, খোকন বাবু, খোকন সোনা—'

খোকন সোনা ততক্ষণ ঘুমে অচেতন। তার পিসী বল্লেন, 'সারা দিন্ দুষ্টুমি

করেছে—এই ঘুমুলো। একটু আগেও জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল, 'পিসীমা, বাবা কখন আসবে, এখনও আস্‌ছে না কেন?'

সন্তোষ বাবু একেবারে মুষড়ে পড়্‌লেন। ছিঃ, ছিঃ, আর একটু আগে বার হ'লেই হ'ত। তাঁর নিজের গালে চড় মার্‌তে ইচ্ছা হ'ল।

খোকাকে দু'-একবার নাড়া দিলেন, ডাক্‌লেন, 'খোকন বাবু, ও খোকন!' খোকন বাবু ততক্ষণে ঘুমিয়ে পাথর। সন্তোষ বাবু হতাশ হ'য়ে পড়্‌লেন।

রাতের খাওয়া শেষ করে নিয়ে সন্তোষ বাবু তাঁর বিছানাটীতে আশ্রয় নিলেন, কোলের কাছে খোকা রইল ঘুমিয়ে।

সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বিছানায় শুতে শুতেই সন্তোষ বাবু অন্য দিন ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েন। ভোরে যখন উঠ্‌তে হয় তখনও উঠতে ইচ্ছা করে না মোটেই—মনে হয় যদি আর একটু ঘুমানো যেত! আজও তিনি সারা দিনের পরিশ্রমের পর অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লেন।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। খোকা ডাক্‌ল, 'বাবা!' সে জেগেছে।

খোকার ডাকে সন্তোষ বাবুর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ভারী মিষ্টি লাগ্‌ল খোকার ডাক। কিন্তু ঘুমে তখনও তাঁর চোখ জড়িয়ে রয়েছে। চোখ বুজে বুজেই খোকাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে খুব মিষ্টি করে উত্তর দিলেন—'কি বাবা?'

খোকা বল্‌লে—'তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ।'

দুষ্টু, দুষ্টু—খোকার মুখে 'দুষ্টু' কি মিষ্টিই লাগ্‌ছে সন্তোষ বাবুর। চোখ বুজেই সন্তোষ বাবু বল্‌লেন—'দুষ্টু হয়েছি কেন বাবা?'

—'দুষ্টু ত হয়েছ-ই, অত দেরী করে এলে কেন?'

'অফিসের কাজ শেষ না হলে আস্‌ব কি করে?'

—'কাজ কর্‌তে হবে না তোমার, কাজ কর্‌লে আড়ি করে দেব।'

সন্তোষ বাবুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে—কিন্তু এ দিকে আস্তে আস্তে ঘুমও আসে আবার।

খোকা ডাকে—'বাবা!' সন্তোষ বাবুর কানে যায় না, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

খোকা আবার ডাক্‌ল—'বাবা!' সন্তোষ বাবুর এবার ঘুম ভেঙ্গে গেল, উত্তর দিলেন, 'কি বাবা?'

—'মা আপিসে যায় না কেন বাবা?'

—'মা যে মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষে কি অফিসে যায় বোকা?'

—'তুমি কি বাবা? মেয়ে মানুষ নও?

—'দূর্ বোকা ছেলে, আমি পুরুষ মানুষ; পুরুষ মানুষ—বেটাছেলে অফিসে যায়, বুঝলে? এখন ঘুমোও।'

মিনিট কয়েক চুপ্‌। তার পরেই আবার খোকা ডাক্‌ল, 'বাবা!' সন্তোষ বাবু ভাবলেন চুপ করে থাক্‌বেন নইলে ও আজ সারা রাত্রি বক্‌বে। সন্তোষ বাবুর ইচ্ছা থাক্‌লেও ওর সঙ্গে বক্‌তে পার্‌ছেন না কারণ চোখ শুন্‌ছে না—চোখ ঘুমে জড়িয়ে আস্‌ছে। কিন্তু চুপ করে থাক্‌লে কি হবে? খোকা তার বাবার গাল দু'টো ধরে ডাক্‌ল—'ও বাবা!'

সন্তোষ বাবু উত্তর দিতে বাধ্য হলেন—'কি বল্‌ছ?'

—'আমি কি বাবা? বেটাছেলে না মেয়ে মানুষ?'

—'বেটাছেলে।'

—'তবে আপিসে যাই না কেন?'

—'বড় হ'লে যাবে—এখন ঘুমোও, লক্ষ্মী ছেলে।'

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। খোকা আবার ডাক্‌ল—'বাবা!'

সন্তোষ বাবু ভয়ানক ঘুমুচ্ছেন—নাক ডাক্‌তে সুরু করেছে।

—'বাবা, বাবা, ও বা—বা!'

নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল, সন্তোষ বাবু খোকার দিকে পিছন ফিরে শুলেন; বল্লেন, 'কি বল্‌ছ?'

—'তুমি জেগে আছ বাবা?'

—'জেগে ছিলাম না, তবে এখন জেগে আছি বটে।'

—'আমিও জেগে আছি বাবা।'

—'সে ত দেখছিই, ঘুমোও, জেগে থাক্‌তে হবে না আর।' সন্তোষ বাবুর সুর এবার আর মিষ্টি নয় বরং একটু বিরক্তিতেই ভরা।

চুপচাপ অনেকক্ষণ। ঢং ঢং—ঘড়িতে দু'টো বাজ্‌ল। সন্তোষ বাবুর আবার সজোরে নাক ডাক্‌ছে।

খোকা বোধ হয় এবার ঘুমিয়েছে—না, আবার ডাক্‌ছে, 'বাবা'! উত্তর নেই।

—'বাবা বাবা, বাবা, ও বা—বা, বা—বা!'

'কি বল্‌ছ'? বেশ তাড়া দিয়েই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন সন্তোষ বাবু।

'কিছু না'

'কিছু না ত চেঁচাচ্ছ কেন? তোমার চোখে কি ঘুম নেই। ঘুমোও শীঘ্রি।'

আবার খানিকক্ষণ চুপ। তার পরেই—'বাবা'!

—'আবার বাবা? কি বল্‌ছ পাজি ছেলে?'

—'তোমার যদি অনেক টাকা হয় তা হ'লে আমাকে কি কিনে দেবে?'

—'কিছু না—কিছু না'—সন্তোষ বাবু ভীষণ বিরক্ত।

—'না, কিনে দিতে হবে, হুঁ'—একটু আবদারে ভরা কান্নার সুর।

সন্তোষ বাবু দেখ্‌লেন মহা মুস্কিল, বল্‌লেন, 'আচ্ছা রেলগাড়ী কিনে দেব।'

ব্যস্, খোকা এতক্ষণ তবু শুয়ে ছিল, এবার একেবারে উঠে বস্‌ল।

'রেলগাড়ী দেবে বাবা? ইষ্টিমের রেলগাড়ী—হুস্ হুস্, ঘ্যাচা ঘ্যাচা, হুস্ হুস্, ঘ্যাচা ঘ্যাচা, ঘ্যাচা ঘ্যাচা ঘ্যাচা হুস্ হুস্'—খোকার হাত দু'টো রেলের চাকার মত ঘুরতে লাগ্‌ল।

রাত তিনটে, সন্তোষ বাবুর চোখ দু'টো কট্ কট্ কর্‌ছে; সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—ঘুমে চোখ দু'টো ঢুলে আস্‌ছে অথচ ঘুমোতে পার্‌ছেন না; মাথাটা ভীষণ রকম ধরে উঠেছে।

—'বাবা, আমার যখন অনেক টাকা হবে তখন তোমাকে রেলগাড়ী, ইষ্টিমার, বিস্কুট, লজেঞ্চুস্, কুকুরের বাচ্চা—আর ঘড়ি, আর তিন চাকার সাইকেল, আর কুল, পেয়ারা আর—আর—'

—'আর কিছু না, ঘুমোও—নইলে এবার ভীষণ শাস্তি দেব।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। এবার সে এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়েছে, রাত এখন তিনটে। যাক্, তবুও ত' দু' ঘণ্টা এখনও ঘুমান যাবে। সন্তোষ বাবু একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ভাল করে শুলেন।

—'বাবা!'

সন্তোষ বাবু এবার রীতিমত ক্ষেপে গেছেন; খোকনকে একলা ফেলেই উঠে চল্‌লেন অন্ধকারের মাঝে। মাঝখানে ছিল খোকন বাবুরই ট্রাইসাইকেলটা; ভয়ানক জোর ধাক্কা লাগ্‌ল তার সঙ্গে, হাঁটুর কাছে ভীষণ চোট লাগ্‌ল; যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এসে আবার বিছানায় বসে পড়লেন—পা'টায় ভয়ানক ব্যথা কর্‌ছে। —'বাবা, তোমার লাগ্‌ল? তুমি অন্ধকারে দেখ্‌তে পাও না বুঝি?—আমিও পাই না'।

সন্তোষ বাবু এবার খেঁকিয়ে উঠ্‌লেন—'বাঁচিয়েছ, হতচ্ছাড়া, পাজি ছেলে, সারারাত একটু চোখের পাতা বুজ্‌তে দিলে না'—

—'বাবা!'

—'কী, কী, কী—ঈ—ঈ, শূয়ার ছেলে?'

—'তুমি 'অভয়' বানান কর্‌তে পার বাবা? আমি পারি—অ—ভ—আর একটা কি বাবা?'

—'আর কিছু নয়, তুমি ঘুমোও'। সন্তোষ বাবু দেখ্‌লেন, কথার উত্তর দিলে ওর কথার শেষ হবে না—তাড়া দিলেও থাম্‌বে না, ভোলাতে হবে।

বল্লেন—'খোকন সোনা, ঘুমোও ত এবার, তুমি যদি এক্ষুণি চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড় তা হ'লে কালকে তোমাকে একটা ট্রাম গাড়ী কিনে দেব। লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, ঘুমোও ত বাবা!'

—'কিনে দেবে বাবা? আচ্ছা আমি এক্ষুণি ঘুমাব। আমি তোমার লক্ষ্মী সোনা ছেলে—কত লোকের আমার মত খোকন নেই। তোমার ত আমি একটা খোকন, আরও খোকন হবে বাবা—এক দুই, পাঁচ দশ, উনিশ এ-ক-শ', পাঁ-চ-শ''

এবার সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

সন্তোষ বাবু মনে মনে বল্‌লেন—'ঈশ্বর, রক্ষা কর, একটী খোকনেই অস্থির, আর যদি'—তিনি ভয়ে শিউরে উঠ্‌লেন।

সন্তোষ বাবু পাশ ফিরে শুতে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ঢং করে চারটে বাজ্‌ল। আর ঘুমান চলে না, তা হ'লে দেরী হয়ে যাবে।

সন্তোষ বাবু পাঁচটায় কাজে বার হয়ে গেলেন—দেখ্‌লেন সারারাত বকর বকর ক'রে এখন নিশ্চিন্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে খোকা ঘুমুচ্ছে।

* * * *

কাল সারারাত জেগে, তার পর আজ সারাদিন খেটে সন্ধ্যায় সন্তোষ বাবু কোনও রকমে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী ফিরছেন। কাল এমন সময় খোকনকে পাশে নিয়ে শোবেন ভেবে তিনি আনন্দে অধীর হচ্ছিলেন, আর আজ তাকে কাছে নিয়ে শুতে হবে ভেবে ভয়ে শিউরে উঠ্‌ছেন আর ভাবছেন —খোকনের মা'র ফিরতে এখনও ঊনত্রিশ দিন বাকী —সবে ত এই এ—ক দিন গে—ল।

'সূয্যি মামা'র কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

সূর্য্যদেব নাকি আমাদের মামা। এ সম্পর্ক কে পাতাইল বলা মুশ্‌কিল, তবে যেই করুক সে ভুল করিয়াছে; 'মামা' না বলিয়া বরঞ্চ বলা উচিত ছিল 'দাদামশাই'—কারণ আমাদের মা বসুন্ধরা জন্মিয়াছেন সূর্য্য হইতে।

তা মামাই হোন্ আর দাদামশাই-ই হোন্ আকাশের গ্রহ-তারাদের মধ্যে সূর্য্য ঠাকুরই আমাদের সব চাইতে আপনার জন। তাঁরই আলো—তাঁরই তেজ পাইয়া আমরা বাঁচিয়া আছি—গোটা পৃথিবী বাঁচিয়া আছে। আবার সূর্য্য শুধু পৃথিবীতেই আলো ছড়াইতেছে না—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, চাঁদ—এক কথায় সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ এই সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করিতেছে। সূর্য্যের আলোর কতটুকু অংশই বা পৃথিবীতে আসে। পৃথিবীর মত দু'শ' কোটি পৃথিবী

যদি আলোর জন্য সূর্য্যের মুখ চাহিয়া থাকিত তবুও সূর্য্যদেব বিন্দুমাত্র ঘাবড়াইতেন না।

এত প্রচণ্ড আলো যেখান হইতে আসে সে জিনিষটি নেহাৎ ছোট হইবার কথা নয়। আমরা দূর হইতে সূর্য্যকে একখানা থালার চাইতে বড় দেখি না, কিন্তু আসলে ঐ থালাটি কত বড় জান? আমাদের পৃথিবীর মত ১৩ লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে যত বড় হয় তত বড়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে পৃথিবীর মাঝখান (কেন্দ্র) দিয়া এ পিঠ ও পিঠ ফুঁড়িয়া একটা লাইন্ টানিলে সেটা হয় ৮০০০ মাইল্, আর সূর্য্যের ভিতর দিয়া ঐ রকম একটা লাইন্ টানিলে সেটা দাঁড়ায় ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার মাইল্। তুমি যদি ঘণ্টায় চার মাইল করিয়া হাঁটিতে পার এবং একটুও না জিরাইয়া ক্রমাগতঃ হাঁটিতে থাক তবে নয় মাসের কিছু কম সময়ে পৃথিবীর চারদিকে একটা চক্কর দিয়া আসিতে পার। কিন্তু ঐ রকম ভাবে চলিলে সূর্য্যের চারদিকে একটা চক্কর দিয়া আসিতে তোমার লাগিবে প্রায় সাড়ে সাতাশী বছর।

এত বড় একটা বিরাট্ জিনিষকে যখন পৃথিবী হইতে মাত্র অতটুকু দেখায় তখন সেটা কি ভয়ানক রকম দূরে আছে তা সহজেই বুঝা যায়। বাস্তবিকই পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব খুবই বেশী। আকাশে সূর্য্যোদয় হইলে তার আলো পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিতে পৌঁছিতে প্রায় আট মিনিট সময় কাটিয়া যায়। অথচ আলোর গতি কত জান? সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল্। এই হিসাবে দেখা গিয়াছে পৃথিবী হইতে সূর্য্য সাধারণতঃ নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল্ দূরে থাকে। বছরের মধ্যে কোনও কোনও সময়ে এই দূরত্ব এর চাইতে সামান্য একটু কম-বেশীও হয়, কারণ পৃথিবী ঠিক গোল পথে সূর্য্যকে ঘোরে না, একটু ডিমের মত চেপ্টা পথে ঘোরে। এ পর্য্যন্ত মানুষ নানা রকম চেষ্টা করিয়াও পৃথিবীর ডাঙ্গা হইতে ১০।১২ মাইলের বেশী উপরে উঠিতে পারে নাই। ভাবিয়া দেখ সূর্য্য কত দূরে!

অত দূরের সূর্য্য, অথচ ওখানে বসিয়াই সময় সময় সে আমাদের জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া মারে—তার দিকে তাকান পর্য্যন্ত যায় না। কাজেই সূর্য্য কি ভয়ানক রকম গরম তা তো বুঝিতেই পার। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন সূর্য্যের গায়ের উত্তাপ

অন্ততঃ ১৪।১৫ হাজার ডিগ্রীর কম নয়। (তোমরা বোধ হয় জান, জল যখন ফুটিতে থাকে তখন তার উত্তাপ হয় মাত্র ১০০ ডিগ্রী)। পৃথিবী যদি কোন দিন নিজের পথ ছাড়িয়া সূর্য্যের দিকে রওনা হয় তবে সূর্য্যে পৌঁছিবার অনেক আগেই সে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই নয়—প্রথমে তরল এবং শেষে একেবারে বাষ্প হইয়া আবার নিজের উত্তাপেই জ্বলিতে সুরু করিয়া দিবে।

এখন কথা হইতেছে সূর্য্যে এত আলো আর তাপ হয় কেমন করিয়া? আগুনকে জ্বালাইয়া রাখিতে হইলে তা অমনি অমনি হয় না—তার জন্য কাঠ কিংবা

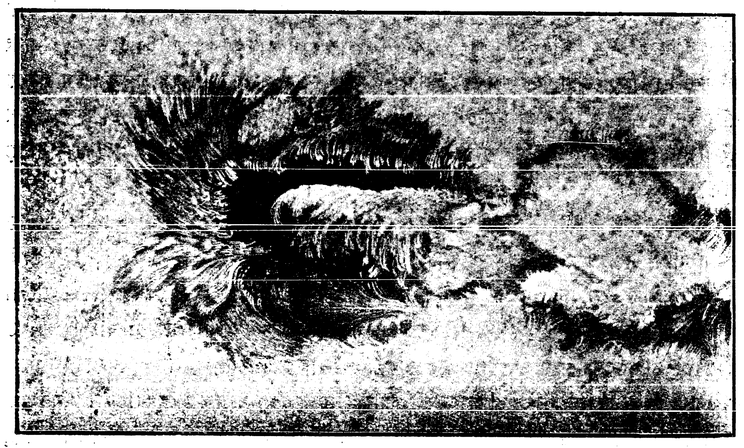

সূর্য্যের একটি কলঙ্ক

কয়লা কিংবা ঐ রকম কোনও জ্বালানীর দরকার। সূর্য্যকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে কে? সূর্য্যের দেহটা পৃথিবীর মাটী-পাথরের মত শক্ত জিনিষ দিয়া গড়া নয়, জলের মত তরলও নয়—আগাগোড়া নানা রকম গ্যাসে ভর্ত্তি। এই বিরাট্ গ্যাসের রাশিই সূর্য্যের জ্বালানী—দিবারাত্র দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে আর তার ফলে সূর্য্যকে অত উজ্জ্বল এবং গরম করিয়া রাখিয়াছে।

সূর্য্যের সম্বন্ধে আর একটা খবর শোন। তোমরা সবাই জান পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকেও পাক খাইতে থাকে। এই শেষের কাজটা এক-এক বার হাসিল করিতে তার লাগে ২৪ ঘণ্টা। সূর্য্যদেবকে অবশ্য আর কারও চারদিকে ঘুরিতে হয় না কিন্তু নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে পাক তিনিও খান এবং এক-একটি পাক খাইতে তাঁর সময় লাগে প্রায় ২৬।২৭ দিন। সূর্য্যের এই পাক খাওয়ার কথা পণ্ডিতেরা জানিতে পারিয়াছেন তার গায়ের উপরকার কলঙ্ক দেখিয়া।

তোমরা এইখানে হয়ত একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছ। সূর্য্যের আবার কলঙ্ক কি? কলঙ্ক তো চাঁদের! চাঁদের সঙ্গে বুঝি আমি সূর্য্যের গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছি! না গো, তা নয়, সূর্য্যেরও কলঙ্ক আছে। তবে সে কলঙ্ক চাঁদের মত চিরজীবন তার গায়ে আঁকা থাকে না, মাঝে-মাঝে দেখা দেয়। এই কলঙ্কগুলি দেখিতে কালো কালো গর্ত্তের মত, তবে আকারে নেহাৎ ছোট নয়। তাদের এক-একটার মধ্যে ২।১০টা এবং কোন কোনটার মধ্যে হাজারটা পৃথিবীকে গুঁজিয়া রাখা যায়। ইংরাজীতে এদের বলা হয় Sun spot। এই গর্ত্ত বা কলঙ্কগুলি এক-একবার দেখা দিয়া আস্তে আস্তে একটু একটু করিয়া সরিয়া সূর্য্যের এক ধারে চলিয়া যায়; একটা গোল জিনিষকে এক পাশ হইতে দেখিলে যেমন চেপ্টা দেখায় তাদের তখন দেখায় তেমনি। তার পর কলঙ্কগুলি কিছু দিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায় কিন্তু আবার ১২।১৩ দিন পরে যেদিকে অদৃশ্য হইয়াছিল ঠিক তার উল্টা দিকে আসিয়া দেখা দেয়, তার পর আবার আগেকার মত সরিতে থাকে। এমনি ভাবে দেখিলে মনে হয় এক-একটা কলঙ্ক যেন ২৬।২৭ দিনে সূর্য্যকে এক-এক পাক ঘুরিয়া আসিতেছে। সব কলঙ্ক কিন্তু সমান জোরে ঘোরে না, কোন কোনটা আবার ২৫ দিনেও পাক খায়। যে কলঙ্ক সূর্য্যের দেহের যত মাঝামাঝি সেটা তত জোরে ঘোরে। আবার মজা, সূর্য্যের সব অংশেই কলঙ্কগুলি ছড়ান থাকে না—বিশেষ বিশেষ জায়গায়ই তাদের বেশী দেখা যায়। সূর্য্যের দুই মেরু, বিষুব-রেখা ইত্যাদিতে কলঙ্ক প্রায়ই দেখা যায় না। কলঙ্কগুলির সংখ্যা এবং আকারও চির কাল সমান থাকে না—নিয়মিত

ভাবে খানিকটা বাড়িয়া আবার তেমনি ভাবে কমিতে থাকে। ঠিক ১১ বছর পর পর সেগুলি আগেকার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়।

সূর্য্যের কলঙ্ক দেখিয়া তার নিজের পাক খাওয়ার কথা পণ্ডিতেরা কেমন করিয়া আবিষ্কার করিলেন এবার তা শোন; কোন গোল জিনিষ যদি লাট্টুর মত ঘোরে তবে দূর হইতে তার দিকে চাহিয়া আমরা তার ঘুরিবার কথা কিছু বুঝিতে পারি না। কিন্তু সেই গোল জিনিষের গায়ে যদি কোন দাগ থাকে তবে তার ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই দাগও ক্রমাগতঃ ঘুরপাক খাইবে আর সেই দাগের আসা-যাওয়া দেখিয়া গোল জিনিষটির ঘুরপাকের বিষয় টের পাওয়া যাইবে। সূর্য্য একটা গোল জিনিষ আর সূর্য্যের গায়ের কলঙ্কগুলি হইতেছে তার দাগ। এই কলঙ্ক-দাগের ঘুরপাক দেখিয়াই সূর্য্যের ঘুরপাকের খবর জানা গিয়াছে—কারণ কলঙ্কগুলি নিজেরা যে সূর্য্যের গায়ের উপর ঘুরিতেছে না তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এইখানে তোমরা হয়তো একটা প্রশ্ন করিবে। সূর্য্যের ঘুরপাক খাওয়ার জন্যই যদি কলঙ্কগুলি ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয় তবে তাদের সবগুলি সমান জোরে ঘোরে না কেন? কারও ঘুরিতে লাগে ২৫ দিন, কারও লাগে ২৭ দিন। এর উত্তর বেশী কঠিন নয়। আগেই বলিয়াছি সূর্য্যের শরীরটা পৃথিবীর মত শক্ত মাটী-পাথরের নয়—কতকগুলি জ্বলন্ত গ্যাসের একটা পিণ্ড। কাজেই সূর্য্যর সমস্ত শরীরটা সমান জোরে না ঘুরিলে অবাক্ হইবার কিছু নাই।

সূর্য্যের এই কলঙ্কগুলি কেমন করিয়া হইল সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখনও একমত হন নাই। সূর্য্যের গায়ে লক্ষ লক্ষ মাইল্ যুড়িয়া নানা রকম গ্যাস রাতদিন হু হু করিয়া জ্বলিতেছে; ফলে সেখানে সেই সব জ্বলন্ত গ্যাসের অবিরাম ঠেলাঠেলি, গুঁতাগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি চলিতেছে—ঝড়-ঝাপ্‌টা সেখানে লাগিয়াই আছে। আমাদের পৃথিবীর মেঘলা আকাশে হঠাৎ ঝড় উঠিলে যেমন ব্যাপার দেখা যায়—মেঘ জায়গায় জায়গায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং তার ভিতর দিয়া পিছনের আকাশ উকি মারে—সূর্য্যের এই সব ঝড়েও অনেক সময় তাই হয়; উপরের গ্যাসের আবরণ ঝড়ে ছিঁড়িয়া ভিতরকার অপেক্ষাকৃত কম গরম, কম উজ্জ্বল অংশ উকি মারে। অনেকের মতে এইগুলিই সূর্য্যের কলঙ্ক। বিরাট্ সূর্য্যের সবই

বিরাট্। তার ঝড়ও বিরাট্। একবার উঠিল তো মাসের পর মাস চলিতে থাকে। গর্ত্তগুলিও তাই একবার দেখা দিলে খুব শীঘ্র যাইতে চায় না।

অনেকের মতে আবার সূর্য্যের কলঙ্কগুলি আসলে এক-একটি বুদ্‌বুদ্। ভিতরকার জ্বলন্ত গ্যাস প্রচণ্ড বেগে উপরে ঠেলিয়া উঠিয়াই নাকি এর সৃষ্টি করে।

আমাদের পৃথিবীর চারদিক্ ঘিরিয়া যেমন একটা বাতাসের আবরণ আছে (যাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি) সূর্য্যের গায়েও ঠিক তেমনি ধারা গ্যাসের আবরণ আছে। সূর্য্যের ভিতরকার অংশটাও যদিও গ্যাসে তৈরী কিন্তু সেটা ঠিক সাধারণ গ্যাসের মত নয়; গ্যাসকে খুব চাপের মধ্যে রাখিলে সেটা যেমন ঘন হইয়া যায় তেমনি। এই ঘন গ্যাসকে মেঘের মত ঘিরিয়া আছে আর একটু পাৎলা একটা গ্যাসের আবরণ। মেঘের মত বলিলাম বটে কিন্তু এগুলি মেঘের মত ঠাণ্ডা নয়, প্রচণ্ড গরম—দিবারাত্র জ্বলিতেছে এবং দিগ্বিদিকে আলো ছড়াইতেছে; প্রচণ্ড প্রচণ্ড আগুনের ঝড় তার মধ্যে লাগিয়াই আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিয়াছেন "ফোটোস্ফিয়ার"। (ফোটো=আলো, স্ফিয়ার=মণ্ডল) অর্থাৎ আলোক-মণ্ডল। দূরবীণ দিয়া এই আলোক-মণ্ডল বেশ ভাল দেখা যায়।

গ্রহণের সময়ে সূর্য্য (আংশিক)
নীচেকার কালো অংশটি আলোক-মণ্ডল—উহা গ্রহণে ঢাকা পড়িয়াছে। তার উপর বর্ণ-মণ্ডলের শিখা এবং তারও উপরকার ধোঁয়াটে জিনিষটা কিরণ-মুকুট।

সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলকে ঘিরিয়া আবার আরও দু'টি আবরণ আছে। প্রথমটির নাম দেওয়া হইয়াছে "ক্রোমোস্ফিয়ার" (ক্রোমো=রং) অর্থাৎ বর্ণ-মণ্ডল। এটি সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলকে ঘিরিয়া আরও প্রায় হাজার দশেক মাইল্

জায়গা যুড়িয়া জ্বলিতেছে। এই বর্ণমণ্ডলের বিশেষত্ব এর অতি চমৎকার—অতি তীব্র রঙ্গিন অগ্নিশিখা। সে কি যেমন তেমন শিখা? আট হাজার—দশ হাজার মাইল্ লম্বা এক-একটি আগুনের ফণা সাপের জিভের মত আকাশের গায়ে লাফাইয়া উঠিতেছে। কোন কোনটা আবার আরও লম্বা। তিন লক্ষ লম্বা শিখাও দেখা গিয়াছে। কী তার দারুণ বেগ! বন্দুকের গুলির চাইতেও ১০০ গুণ জোরে তা ছুটিয়া চলিয়াছে।

বর্ণ-মণ্ডলকে ঘিরিয়া "করোণা" বা কিরণ-মুকুট। অনেক সময় দেবদেবীর ছবিতে তাঁদের মাথার চারদিকে যেমন খানিকটা ছটা দেখা যায় এটিও দেখিতে অনেকটা সেই রকম। এটির আয়তন ৮।১০ হাজার মাইল্ নয়, লক্ষ লক্ষ মাইল্।

সূর্য্যের বর্ণ-মণ্ডল এবং কিরণ-মুকুটকে কিন্তু সব সময়ে দেখা যায় না—খুব ভাল দূরবীণ দিয়াও নয়। সূর্য্যের ভিতরকার অগ্নিপিণ্ড এত উজ্জ্বল যে তার আলো এদের সারাক্ষণ ডুবাইয়া রাখে। কাজেই এদের দেখিতে হইলে এমন বন্দোবস্ত করা দরকার যাহাতে সূর্য্যের ভিতরটা এবং আলোক-মণ্ডল কিছু দিয়া ঢাকা থাকে। তা কি সম্ভব? সম্ভব বৈকি।

তোমরা সূর্য্যগ্রহণের কথা সবাই শুনিয়াছ। বছরের কোনও কোনও অমাবস্যার দিন দিনের বেলা হঠাৎ সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া যায়—মনে হয় দুপুর বেলাই বুঝি সন্ধ্যা হইয়া গেল। কেন অমনটা হয় জান? তোমাদের ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়তো বলিবেন রাহু নামে একটা দৈত্য সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে তাই। কিন্তু সে সব যে আজগুবি কথা তা আজকালকার সবাই জানে। আসল কারণ আমাদের চাঁদা মামার কীর্ত্তি। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তা তোমরা সবাই জান। মাসের সব দিনে চাঁদকে সমান দেখা যায় না, আবার রোজ এক সময়েও দেখা যায় না। অমাবস্যার দিন তো একেবারেই দেখা যায় না। কেন যায় না? ঐ দিন চাঁদ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে ওঠে আবার সূর্য্যাস্তের সঙ্গে অস্ত যায়। এখন, বছরের কোন কোন অমাবস্যায় চাঁদ ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী আর সূর্য্যের মাঝামাঝি এমন জায়গায় আসিয়া পড়ে যে পৃথিবীর কোন কোন অংশ হইতে সূর্য্যকে আর দেখাই যায় না, চাঁদের আড়ালে সে বিলকুল চাপা পড়িয়া

যায়। চাঁদ সূর্য্যের চাইতে অনেক ছোট, তবুও পৃথিবীর খুব কাছে আছে বলিয়াই অত বড় দেখায় এবং সূর্য্যকে একদম ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। চাঁদ যখন সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে তখনই আমরা বলি 'সূর্য্যগ্রহণ'। সূর্য্যগ্রহণ অবশ্য কয়েক মিনিটের বেশী থাকে না। তা ছাড়া পৃথিবীর সব জায়গা হইতেই এক সময়ে চাঁদকে পুরাপুরি সূর্য্য ঢাকিতে দেখা যায় না—বেশীর ভাগ জায়গা হইতেই দেখা যায় আংশিক গ্রহণ। শুধু এক-একবার এক-একটা বিশেষ বিশেষ জায়গা হইতে সূর্য্যকে চাঁদের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা দেখা যায়। সে সব গ্রহণকে বলা হয় সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ। এই পূর্ণ গ্রহণের সময় সূর্য্যের ভিতরকার অংশ এবং আলোক-মণ্ডল চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া যায়, শুধু বর্ণ-মণ্ডল আর কিরণ-মুকুট বাহির হইয়া থাকে। সেই সময়ে ভিতরকার আলো আসিয়া আর শেষোক্ত দু'টির উপর কোনও উপদ্রব করিতে পারে না, এবং কেবল তখনই তাদের ভাল করিয়া দেখা যায়। এই জন্য এক-একটি পূর্ণ গ্রহণের আগে পণ্ডিতদের মধ্যে একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া যায়, নানা রকম যন্ত্রপাতি লইয়া তাঁরা পৃথিবীর যেখান হইতে সব চেয়ে ভাল পূর্ণগ্রহণ দেখা যাইবে সেখানে—তা সে যত দুর্গম জায়গাই হোক্ না কেন—গিয়া হাজির হন এবং ঐ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করেন। ফলে এক-একটা গ্রহণের পর নতুন নতুন তথ্যও বাহির হয় বিস্তর।

সূর্য্যের কিরণ-মুকুট (পূর্ণ গ্রহণের সময়)

কিন্তু অত অল্প সময় দেখিয়া পণ্ডিতদের তৃপ্তি হইবে কেন? তাই তাঁরা অন্য উপায় ঠাওরাইয়াছেন। স্যার লকিয়ার নামে একজন পণ্ডিত এমন একটা

যন্ত্র বাহির করিয়াছেন যার সাহায্যে গ্রহণের সময় ছাড়াও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সূর্য্যের বর্ণ-মণ্ডলকে দেখা যায়। তবে কিরণ-মুকুটকে ভাল করিয়া দেখিতে হইলে পূর্ণ গ্রহণের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

পণ্ডিতদের ক্ষমতা অসীম। তাঁদের কাছে এমন সব যন্ত্র আছে যার সাহায্যে তাঁরা যে কোন জিনিষের আলো দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন সে জিনিষটির মধ্যে কি আছে। কাজেই সূর্য্যের আলো পরীক্ষা করিয়া তার উপাদান সম্বন্ধে অনেক খবর জানা গিয়াছে। সূর্য্যের যে তাপ তাহাতে কোন যৌগিক জিনিষ টিকিয়া থাকিতে পারে না, ভাঙ্গিয়া মৌলিক জিনিষে গিয়া হাজির হয় এবং সেটাও থাকে গ্যাস হইয়া। এই ভাবে জানা গিয়াছে সূর্য্যের মধ্যে আছে প্রচুর হাইড্রোজেন, হিলিয়াম্, ক্যাল্‌সিয়াম্, ম্যাগ্‌নেসিয়াম্, লোহা, সীসা, টিন এবং ঐ ধরণের আর কতকগুলি মৌলিক জিনিষ। তা ছাড়া আরও কয়েকটি এমন জিনিষ আছে যা আমাদের পৃথিবীতে আছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই ধরণের একটা জিনিষের নাম দেওয়া হইয়াছে 'করোণিয়াম্'। সূর্য্যের করোণা (কিরণ-মুকুটের) মধ্যে এটি পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই এই নাম-করণ।

বিজ্ঞাপন

(শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-টি)

(১)

চরণের দুশ্চিন্তা

রবিবার—সন্ধ্যা। গোপাল বসুর লেনে তেতালার একটি ঘুপ্‌চি ঘরে কেরোসিনের তক্তপোষের উপর বসিয়া চরণ চা খাইতেছিল। তক্তপোষের আশপাশে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম ছড়ানো। চায়ের বাটিতে চুমুক দিবার অবসরে আপন মনে চরণ যেন বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছিল—হয়তো তার ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎটাই সে মনে মনে খতাইয়া দেখিতেছিল।

আজ তিন বছর হইল সে কলিকাতা আসিয়া বইয়ের দোকান ফাঁদিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের

এক অজ পাড়াগাঁয়ে তাহার বাড়ী। সমবয়সী আর দশটি ছেলের মত চরণও টানিয়া-বুনিয়া ক্লাশ টেন্ অবধি উঠিয়াছিল। হয়তো সুবিধা ও সুযোগ পাইলে হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া সে 'এলাউ' অবধি হইতে পারিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট্ দুয়ারে একটা ঢুঁ মারিয়া অন্ততঃ একটু মার্কা-মারা হইয়া ফিরিতে পারিত। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে ম্যাট্রিক ফেল করা তাহার আর ঘটিয়া উঠে নাই। নানা চিন্তার পর শেষে সে কলিকাতায় আসিয়া "চাকুলাদার পাব্‌লিশিং হাউস্" নামে একখানি বইয়ের দোকান খুলিয়াছে। ব্যবসায়ে নাকি তাহার ছোট বেলা থেকেই বেজায় ঝোঁক্। সারা কলেজ স্কোয়ার বইয়ের দোকানে দোকানে একেবারে ভরিয়া গেছে, নতুন দোকান বুঝি আর চলে না। তবু চরণদাস—চাটখালির চরণদাস চাকুলাদার—পান-বিড়ি বা অন্য কিছুর দোকান না খুলিয়া বইয়ের দোকানই ফাঁদিয়াছে। বর্ত্তমানে চরণদাসের মহা সমস্যা ক্যাপিট্যাল্—মোটা পুঁজি ব্যতিরেকে ব্যবসা চলে না চরণ এ কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। ঐ একটি সমস্যাই চরণের মনের মধ্যে অনবরত পাক খাইতেছিল। হঠাৎ তাহার অলক্ষ্যে 'ক্যাপিট্যাল্' শব্দটা মুখ দিয়া একটু জোরেই বাহির হইয়া আসিল।

"বাহ্, বেশ তো, ক্যাপিট্যাল্"—হঠাৎ চরণকে চম্‌কাইয়া দিয়া সেই অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তাহার সাহিত্যিক বন্ধু ও ক্যান্‌ভাসার নটবর বাবু। ক্যান্‌ভাসারি করিয়া নট নন্দী বেশ দু' পয়সা গুছাইয়াছে বলিয়াই বাজারে গুজব।

"আরে নটবর বাবু যে! আসুন, আসুন। এই মশাই, 'ভূঁড়িকম্প' বইখানার কথাই ভাব্‌ছিলাম। খাসা বইটুকু হ'ল অথচ···"

"আর বলেন কেন মশাই! য্যামোন হয়েছে খদ্দের গুলো—খবরের কাগজের সমালোচনা পড়ে বাবুরা বই কিন্‌বেন। আর কাগজওয়ালাগুলোও হয়েছে তেম্‌নি—ব্যাটাদের পায়ের তেলো মালিশে মালিশে পালিশ হয়ে উঠ্‌ল। যতো সব ইয়ে···"

"যা বল্লেন"—চরণদাস হাসিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাহার দুঃখের হিসাব চলিতে লাগিল। আজ চারি মাস হইল ভূঁড়িকম্প বাজারে বাহির হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় চারি টাকার বইও বিক্রী হয় নাই। অথচ নিজের যথাসর্ব্বস্ব এবং স্ত্রীর হাতের সম্বল বালা ক'গাছি বন্ধক রাখিয়া ঐ ভূঁড়িকম্পের টাকা জোগাড় করিতে হইয়াছে। মাসিকের পাতায় এ অবস্থায় ক'দিন বিজ্ঞাপন চালান যায়? এদিকে পত্রিকা-সম্পাদক মশায়রা তো খাতির না থাকিলে কথাই পাড়েন না।

"দেখুন"—হঠাৎ চরণ বলিয়া উঠিল, "ইচ্ছে হয় নিজের ফার্ম্ম থেকে একটা পেপার বার করে নিজেদের সমালোচনা নিজেরাই ছাপি। ওরা যে সব বই পক্ষপাত ক'রে ভাল বলে থাকে সেগুলোকে কলমের তীব্র খোঁচায় ভোঁতা করে দি।"

"ক্ষেপেছেন? বই ছাপ্‌বার পয়সা হয় না তো মাসিকপত্রিকা? গ্রাহক হবে কে? হাঃ হাঃ হাঃ!"

"আপনি হাস্‌ছেন বটে, কিন্তু ও ব্যাটারা ঐতেই শুধু জব্দ হবে। ছাপানো কথা ছাড়া পোড়া দেশের কোন খদ্দের যদি কিছু পাতে নেয়!"

একটু চিন্তা করিয়া নটবর বাবু কহিলেন, "কি জানেন, প্রোপাগাণ্ডা—স্রেফ্ প্রোপাগাণ্ডা! শুধু বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু নয়। জোর বিজ্ঞাপন হ'লে আপনার ও দু' হাজার কপি দু' হপ্তায় উড়ে যাবে, জানেন?"

চরণ কহিল, "বুঝ্‌লাম তো সবই, কিন্তু ওতে যে ঢের টাকার প্রয়োজন—পাই কোথা?"

"কুছ্ পরোয়া নেই, আপনি আমায় পাঁচটি টাকা দিয়ে দেখুন, আমি অঘটন ঘটিয়ে দিচ্ছি।" নটবর বাবু হাতের তেলো দিয়া তক্তপোষের উপর সজোর চপেটাঘাত করিলেন।

"ঠিক?"

"ঠিক।"

"আচ্ছা নেবেন। এতই গেল, পাঁচটি টাকা না হয় কপাল ঠুকে দিলাম-ই।" চরণ দুঃখের হাসি না হাসিয়া পারিল না।

(২)

আলাপের দৌড়

পর দিন বেলা সাড়ে ন'টার সময় কলেজ স্কোয়ারের একটি অপরিসর ছোট্ট দোকানের দুয়ার খুলিয়া গেল। দুয়ারের ভিতর দিক্‌কার বুকে বড় বড় রঙ্গীন হরফে লেখা—

বাহির হইল! বাহির হইল!!

ভূঁড়িকম্প!!!

ভূঁ—ড়ি—ক—ম্—প

পড়িতে পড়িতে হাসিতে হাসিতে পাঠকের কাঁপুনি ধরিবে।

—মূল্য আট আনা মাত্র—

ভিতরে একটি চারি থাকের মজ্‌বুৎ আলমারী। তার তিন থাক্ ভর্ত্তি ভূঁড়িকম্প।

দোকানের দুয়ার খুলিয়াই চরণ সর্ব্বপ্রথমে কুলুঙ্গিতে তোলা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিল। তার পর হিসাবের খাতা, দোয়াত, কলম ইত্যাদি কপালে ছোঁয়াইয়া চেয়ারে বসিতে না বসিতেই দুইটি ভদ্রলোক দোকানে প্রবেশ করিলেন। উঁহাদের একজন সাদাসিধা জামা-কাপড় পরা, অপরটি অপেক্ষাকৃত ফ্যাসন-দুরস্ত।

চরণ প্রশ্ন করিল, "কি চাই আপনাদের?"

"দেখুন, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে কোন ভাল মজাদার বই-টই আছে আপনার এখেনে? অল্প দাম হলেই ভাল হয়।"

"আছে বৈকি, বসুন না" বলিয়া চরণ উঠিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোক দুইটি চেয়ার অধিকার করিয়া চরণের অপরিসর কুঠুরীর চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। হঠাৎ কপাটের উপর লেখা বিজ্ঞাপনখানার উপর চোখ পড়িতেই তাঁহাদের মধ্যে একজন হাসিয়া উঠিলেন, "ভূঁড়িকম্প! হাঃ হাঃ হাঃ"—

"হ্যাঁ বইটা সত্যিই কিন্তু বেশ হয়েছে—ছেলেমেয়েদের জন্য ঠিক বইটি; দেখুন না" বলিয়া চরণ আলমারী হইতে দুইখানি বই নামাইল।

খানিকক্ষণ সবাই নির্ব্বাক্। তার পর হঠাৎ যুবক ভদ্রলোকটি আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—"শুয়োরের তেল—হাঃ-হাঃ-হাঃ-আঃ"

তাঁহার সঙ্গী একটু জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তার মানে?"

"মানে বুঝ্‌বেন এখুনি" বলিয়া যুবক ভদ্রলোকটি বইখানি হইতে কতগুলি লাইন জোরে জোরে রিডিং পড়িয়া শুনাইলেন। আশার আনন্দে চরণের বুক তখন দুরু দুরু করিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, "অম্‌নি অনেক আছে, অ-নে-ক।"

কিন্তু অপর ভদ্রলোকটির নিকট হইতে এবার অপ্রত্যাশিত রকমের কড়া জবাব আসিল; তিনি চরণকে লক্ষ্য করিয়া সবিনয় ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "মাফ্ করবেন মশাই, এ বই আমরা চাই নে। ভাল বই যদি কিছু থাকে তো বার করুন।" তার পর অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিলেন, "যত্তো সব বাজে—ট্র্যাস্…" বইখানাকে তিনি ছুঁড়িয়া টেবিলের উপর ফেলিলেন।

এইরূপে অপ্রতিভ হওয়ায় যুবকটির মুখচোখ জ্বালা করিয়া উঠিল, তিনি উদ্ধতস্বরে সঙ্গীকে কহিলেন, "বইখানা বাজে হয়ে গেল? আপনি কি বোঝেন মশাই সাহিত্যের? আপনি সাহিত্যের 'স' বুঝ্‌লেও এ বইএর নিন্দে করতেন না।"

"যান্ যান মশাই, বাজে বক্‌বেন না, সাহিত্য বোঝা যেন আপনারই একচেটে ব্যবসা! 'রস-ভঙ্গে'র সাহিত্যপঞ্জীতে যে বইএর নামটা পর্য্যন্ত বেরুল না, কোন মাসিকে এ পর্য্যন্ত যার একটু 'হাঁ' 'না' সমালোচনা বার হ'ল না, সেটা আবার একটা বই? ছাপা কাগজ হলেই হল?

"এই রে, তবেই হয়েছে। চিরটা কালই কি আপনারা পরের মুখেই ঝাল খাবেন?, আপনাদের নিজস্ব মত বলে কি কিছু নেই—যত সব কাওয়ার্ড্।"

"কী, আমি কাওয়ার্ড্?"

"আলবৎ। নিজের আলাদা মত যার নেই, আমি তাকে হাজার বার কাওয়ার্ড্ বলি।"

ইহার পরের ঘটনাগুলি একটির পর একটি এমনই তাড়াতাড়ি ঘটিয়া গেল যে সাধ্য কি চরণ তাহাতে বাধা দেয়—প্রথম মিনিট দু'-তিন ইংরাজী অভিধান মন্থন করিয়া গরম গরম শব্দোৎপত্তি, তার পর উদ্যোগ-পর্ব্ব অর্থাৎ আস্তিন গুটানো, এবং তার পরেই মুষল-পর্ব্ব, অর্থাৎ মুষল-ধারায় পরস্পরের প্রতি ঘুসি বর্ষণ। দোকানের মধ্যে এই মহা কেলেঙ্কারীর আশঙ্কায় চরণ দস্তুর মত ঘা মি য়া উঠিল, কিন্তু কে শোনে তা হা র কথা! দেখিতে দেখিতে দোকানের সম্মুখে বিরাট্ জনতা ভিড় বাঁধিয়া দাঁড়াইল, বীটের পাহারা-ওয়ালা আসিল। বহু কষ্টে যুধ্যমান দুই বী র ব র কে নিরস্ত করিয়া পাহারাওয়ালা তাহাদের নাম-ধাম লিখিয়া ছাড়িয়া দিল।

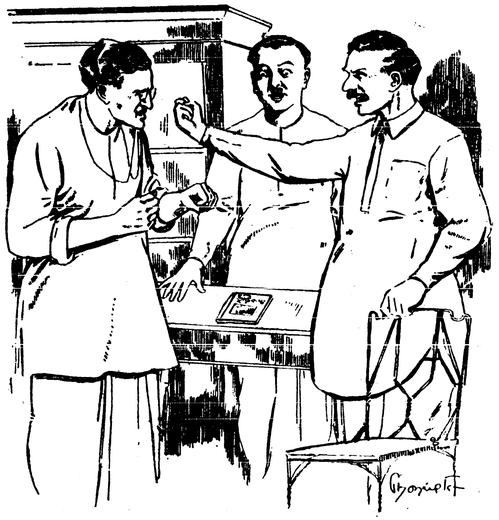

তার পর উদ্যোগ-পর্ব্ব

ক্রমশঃ জনতা চলিয়া গেলে বেচারা চরণ দেখিল তাহার টে বি লে র উপর কালির দোয়াত উল্টাইয়া খা তা প ত্র মসীময় হইয়া গি য়া ছে। মনটা তাহার আগে হইতেই বিশ্রী হইয়া রহিয়াছিল, বিক্রী তো হইলই না, মাঝে হইতে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড। দোকান নির্জ্জন হইতেই সে তাই দরজায় তালা লাগাইয়া সোজা গোপাল বসুর লেনে ফিরিয়া গেল।

(৩)

নিজস্ব সংবাদদাতা

চরণের ধারণা ছিল আপদ্ ঐখানেই চুকিয়া গেছে। কিন্তু এ ফ্যাসাদ অত সহজে মিটিবার নয়। বাসায় ফিরিয়া সে অন্যমনস্ক ভাবে ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিতেছে হঠাৎ বাহির হইতে শব্দ আসিল, "মশাই কি ঘুমিয়ে না জেগে?"

চরণ চম্‌কাইয়া উঠিল, নটবর বাবু নয় তো? লোকটা কাল বলিয়া গেল বিজ্ঞাপন দিয়া রাতারাতি দোকানের উন্নতি করিয়া দিবে, তা না উল্টে এ যে গোদের উপর বিষফোঁড়া—থানা-পুলিশ কাণ্ড!

"বলি ও মশাই…"

স্বর নটবর নন্দীর নয়। চরণ শিকল খুলিয়া দিতেই যিনি ঘরে ঢুকিলেন তিনি বিশেষ পরিচিত না হইলেও নিতান্ত অপরিচিতও নহেন,—"রসভঙ্গ" পত্রিকার সহ-সম্পাদক স্বয়ং পাঁচকড়ি প্রামাণিক। চরণ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ অসময়ে গরীবের দুয়ারে?"

"হেঁ হেঁ, তাই ত বল্‌ছি, বসুন। তার পর, ব্যাপারটা কি হয়েছিল আনুপূর্ব্বিক বলুন তো স্যর!"

"কিসের ব্যাপার?" চরণ যেন আকাশ হইতে পড়িল। বেচারা ভাবিতেই পারে নাই আজিকার ভদ্রলোক দুইটির হন্তালাপ এতখানি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে স্বয়ং 'রসভঙ্গের' সহ-সম্পাদক সে বিষয় তদারকে আসিবেন।

"বিলক্ষণ! কোন্ ঘটনা তাও জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? দুপুরে হঠাৎ দোকানপাট বন্ধ ক'রে ঘরে এসে বসে আছেন যে বড়?" পাঁচকড়ি বাবু না হাসিয়া পারিলেন না।

"ওঃ, সেই কথা?" চরণ একটু লজ্জিত হইল। তার পর কথায় কথায়, হাসিতে হাসিতে সে ঘটনাটা যথাযথ বলিয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ভুঁড়িকম্পের প্রশংসাই থাকিল তাহাতে বেশী। পাঁচকড়ি বাবু চরণের প্রত্যেকটি কথা যেন গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন; আবার মধ্যে মধ্যে চরণ লক্ষ্য করিল তিনি তাঁহার পকেট-বুক্‌খানাতেও কি সব টুকিতেছেন।

সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করার পর শেষটায় চরণ কহিল, "আচ্ছা এ সবে আপনাদের কি হবে মশাই? দেখ্‌বেন আমায় যেন আবার নতুন ফ্যাসাদে জড়াবেন না স্যর। গরীব মানুষ, সম্বলের মধ্যে তো ঐ দোকানখানি আর সবে ধন নীলমণি ঐ ভুঁড়িকম্প!"

"না না, ভয় নেই আপনার কোন। আমাদের 'রসভঙ্গ' কোন দিন আপনার কোন ক্ষতির কারণ হয়েছে? বলুন দিকিনি! হ্যাঁ, বরং…"

"তা তো ঠিকই। তবে এ কথাও অঠিক নয় যে 'রসভঙ্গ' যেদিন যার বিরুদ্ধে কলম ধর্‌বে তাকে তার পর দিন পাততাড়ি গুটোতে হবেই হবে।"

একটু মৃদু হাসিয়া পাঁচকড়ি বাবু ছোট্ট একটি নমস্কার করিলেন, তার পরেই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রামাণিক দুয়ার পার হইতেই চরণ ভাবিতে বসিল হঠাৎ এ লোকটার আবির্ভাবের

কারণ কি! কোন দুরভিসন্ধি নাই তো? উহাদের কাগজখানার উপর চরণের অশ্রদ্ধার অন্ত নাই, কাজেই তাহার এত চিন্তা।

(৪)

অঘটন-সংঘটন

পরদিন—মঙ্গলবার। সকালে উঠিয়া চরণ ভাতেভাত রাঁধার বন্দোবস্ত করিতেছিল। বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে যা হোক্ কিছু মুখে গুঁজিয়া প্রত্যহই তাহাকে রওনা হইতে হয়।

ভাত রান্না করিতে করিতে চরণ ভাবিতেছিল 'রসভঙ্গের' সহ-সম্পাদককে ঘটনাটা অত বিস্তারিত ভাবে না বলিলেও চলিত। ভারী ছেলেমানুষি হইয়া গেছে···বোকার মত অত বকা উচিত হয় নাই। আচ্ছা, নটবর নন্দীই বা কী ধরণের লোকটা? তাহার এই ফ্যাসাদ, অথচ তার একটু খোঁজ নাই। সুদূর আহিরীটোলায় বসিয়া রসভঙ্গের সহ-সম্পাদক যে খবর পাইলেন, নট নন্দী মশাই এত কাছে থাকিয়াও তার আঁচটুকু পাইলেন না। বলিহারি! ইতিমধ্যে তাহার সামান্য আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, আহারান্তে চরণ তার পেটেণ্ট্ জামাটি গায়ে চড়াইয়া দোকানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। কলেজ স্কোয়ারের নিকট আসিতেই কিন্তু সে থমকিয়া দাঁড়াইল। একি? লোকে লোকে তাহার ক্ষুদ্র দোকানের সম্মুখটা ছাইয়া গেছে। চরণের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল—কালিকার থানা-পুলিশ ব্যাপারের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই তো?

আরও একটু আগাইতেই চরণ লক্ষ্য করিল, ভিড়ের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রদলই বেশী। সাধ্য কি সে জনতা ঠেলিয়া দোকানের দরজায় সে উপস্থিত হয়!

উহাদের মধ্যেই কেহ কেহ হয়তো চরণকে চাকলাদার পাব্লিশিং হাউসের কোন কর্ম্মচারী বলিয়া ঠাওরাইয়াছিল, কেননা চরণের জন্য ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া রাস্তা পরিষ্কার হইতেছে দেখা গেল। 'চরণ তালায় চাবি লাগাইয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিতেই সেই বড় বড় হরফে ভূঁড়িকম্পের বিজ্ঞাপন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। "আরে এই তো এই! এইটেই ভূঁড়িকম্পের কারখানা!" জনতা ভেদ করিয়া মিলিত হাসির রোল উঠিল। চরণ ঘরে ঢুকিতেই হুড়মুড় করিয়া প্রায় ২৫।৩০ জন এক সঙ্গে ঘরে ঢুকিল, "আমাকে আগে মশাই, আমাকে···"

"কি বই চাই আপনাদের?" চরণ প্রশ্ন করিল।

"তার মানে? ভূঁড়িকম্প মশাই—'কম্প!" এক সঙ্গে আট দশটি কৌতূহলী সুর চরণকে বিব্রত করিয়া তুলিল। চরণ দুই হাতে একগাদা ভূঁড়িকম্প বাহির করিয়া ফুঁ দিয়া ঝাড়িয়া লইল। তার পর? তার পর যাহা হইল তাহা চরণের জীবনে কোন দিন ন ভূত, ন ভবিষ্যতি। শেল্ফ্ হইতে ভূঁড়িকম্প টানিয়া নামাইতেই যা দেরী—ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে

চারি শত বইএর আলমারীটি উজাড়।···আনন্দে, বিস্ময়ে চরণের মস্তিষ্ক বোঁ বোঁ করিতে লাগিল, এ সময়ে নটবর নন্দী কোথায় ডুব মারিয়া রহিয়াছেন!···ক্যান্‌ভাসারদের কেবল মুখেরই ফষ্টি! চরণ জাগিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—বালা জোড়া ছাড়ানো হইয়াছে, ছাপাখানা, কাগজওয়ালা, ব্লক্-মেকার, দপ্তরী সকলের দেনা শোধ হইয়াছে···

হঠাৎ চরণের খেয়াল হইল স্কুল-কলেজের টিফিন অথবা লিজার-পিরিয়ডে যদি আবার ছেলেরা আসিয়া বই চায়! দোকানে তো আর বই নাই! দপ্তরীর টাকার কিস্তি শোধ করিতে পারে নাই বলিয়া ভূঁড়িকম্পের বাকী ফলিও গুলি গণি মিঞার বৈঠকখানাতেই পচিতেছে। হঠাৎ চরণের মাথায় এক খেয়াল জাগিল—টাকা হাতে পড়িলে বোধ হয় বুদ্ধিও সাফ্ হয়। তাড়াতাড়ি সেদিনও দোকান বন্ধ করিয়া চরণ গণি মিঞার বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হইয়া পড়িল।

সে গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়াছে হঠাৎ পেছন হইতে কে তাহার জামার খুঁট্‌টা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। পেছন ফিরিয়া চরণ দেখিল—হাস্যমুখ নটবর নন্দী। "বটে! খুব যা'হোক্; এ ক' দিন কোথায় ডুব মেরে ছিলেন বলুন তো? এদিকে···"

"বল্‌ছি, চলুন বাসায়," নন্দী হাসিয়া উঠিল।

"উহুঃ, বাসায় নয়, চলুন আমার সঙ্গে; খবর আছে—ভারী জোর খবর।"

"হবে'খন ব্যস্ত কি? বসুন" গোলদীঘির পার দিয়া যাইতে যাইতে নটবর বাবু এক রকম জোর করিয়াই চরণকে লইয়া একটি বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন কোন রকম ভূমিকার বাহুল্য না করিয়াই চরণ কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সাড়ম্বরে বলিয়া শেষে কহিল, "দুঃখু এই যে বই আর বাঁধানো নেই। আচ্ছা আমি তা'হলে উঠি, গণি মিঞার ওখানে একবারটি যেতে হবে।"

নটবর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আহা, বসুন না স্যর; বলি এত যে সব হোল, কই আমাকে তো একবার খবরও দিলেন না। আমার ঠিকানাটা তো মশায়ের অজানা ছিল না। বুঝি ভেল্কিচালেই মজে ছিলেন দু'দিন? যাক্, এই নিন্ মশাই, আপনার সাড়ে তিন টাকা ফেরৎ। ভদ্রলোক দু'টিকে আট আনা করে মিষ্টি খাইয়েই সেরেছিলাম; তা ছাড়া পান টান বাবদ আর আট আনা। গণি মিঞার বাড়ী আর এখন যেতে হবে না, সে কাজও আমি সেরে এলাম—তাকেও পাঁচ টাকা দেওয়া হয়েছে—কাল আটটা নাগাদ ভূঁড়িকম্পের বাকী কপি সব বাঁধাই হয়ে আস্‌ছে।"

বিস্মিত, স্বপ্নগ্রস্ত চরণকে অভিভূত করিয়া দিয়া নটবর বাবু পকেট হইতে ভাঁজ করা এক খণ্ড খবরের কাগজ তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "কিছু তো খোঁজ রাখ্‌লেন না স্যর! খবরের কাগজটাও কি পড়া হয় নি এ যাবৎ?" চরণের হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল—'রসভঙ্গে'র পাতাখানি

খুলিয়া যাহা সে দেখিল তাহাতে সে হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা 'রসভঙ্গ' প্রথম পাতার বুকের ফলকে বড় বড় হরফে লিখিয়াছে।

আজব ব্যাপার! অদ্ভুত কাণ্ড!!

দোকানে দাঙ্গা আলাপে প্রলাপ

ভূঁড়িকম্পের ভীষণ ধাক্কা

তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইয়া চরণ নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ পড়িয়া দেখিল কাল সন্ধ্যায় সে পাঁচকড়ি বাবুর কাছে যাহা যেমন বলিয়াছে তাহাতেই চটকদার রং চড়াইয়া 'রসভঙ্গ' দুইটি 'কলম' ভরিয়া দিব্যি আসর জমাইয়াছে।

পড়িতে পড়িতে চরণের কেবলই মনে হইতে লাগিল 'রসভঙ্গ' অফিসের ফটকে চারি মাস ঘুরিয়াও সে এত দিন ভূঁড়িকম্পের বিষয় চারিটি ছত্র লিখাইতে পারে নাই। ইহাকেই বলে বরাত।

অতিকায়ের কাণ্ড

(শ্রীসুবিনয় রায়)

সিনেমায় একটা নতুন ফিল্ম্ এসেছে—তা' নিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ প'ড়ে গেছে। বিকালের আর রাত্রের 'শো'তে এক তিল জায়গা পাওয়া যায় না;—সব 'রিজার্ভ্' সিটের টিকিট আগেই বিক্রী হ'য়ে যায়। রামধনুর সম্পাদক মশাই পর্য্যন্ত সেই ফিল্ম্ দেখ্‌বার জন্য ব্যস্ত। এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আপনি 'কিং কং' দেখেছেন?" আমি বল্‌লাম "না"। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আপনি দেখেছেন?" তিনি বল্‌লেন, "গত কাল জায়গা পাওয়া যায় নি, আগামী কাল নিশ্চয়ই যাব দেখ্‌তে। আপনিও অমন ফিল্ম্ দেখ্‌তে ছাড়্‌বেন না।"

'কিং কং' বাস্তবিকই আসর জমিয়ে ফেলেছে। মাসের পর মাস মাঝে মাঝে কোন না কোন সিনেমায় দেখি, আবার 'কিং কং' এসেছে। ভিড়ও হয় যথেষ্ট। হবেই বা না কেন? সেকালের সব অদ্ভুত অদ্ভুত অতিকায় জীব—টেরোড্যাক্‌টিল

নামে অদ্ভুত পাখী (অথবা 'পাখী জাতীয় জীব' বলা যেতে পারে), ব্রণ্টোসরাস্ নামে সেকালের বিরাট্ গণ্ডার, টিরানোসরাস নামে অতিকায় ডাইনোসর (টিকটিকির অতি-বিরাট্ পূর্ব্বপুরুষ বলা যেতে পারে)—সকলে সিনেমার কল্যাণে জীবন্ত মূর্ত্তি ধ'রে এই ফিল্মে এসে হাজির হয়েছে;—শুধু হাজির নয়, পরস্পরে ভীষণ লড়াইও বাধিয়েছে। সঙ্গে আছেন আমাদের প্রধান আলোচ্য 'কং' বা 'কিং কং'—গরিলার অতিকায় পূর্ব্বপুরুষ। যেম্‌নি তা'র বিরাট্ চেহারা, তেম্‌নি বিকট তা'র ভঙ্গী, আবার তেম্‌নি অদ্ভুত তা'র কাণ্ড-কারখানা! আবার, 'টকি'র কল্যাণে এই সব অদ্ভুত কিম্ভূত জীবের সকলেরই আওয়াজও শোনা যায়! সমস্ত গল্পটা বল্‌বার জায়গা এখানে নাই; এই আশ্চর্য্য ফিল্ম্ তৈরী করা সম্বন্ধেই আমি আজ দু'-চারটা কথা তোমাদের বল্‌ব।

'কিং কং'এ কয়েক জায়গায় দেখা যায়, বিরাট্-আকার গরিলা 'কং' বড় সহরের মধ্যে ঢুকে, এরোপ্লেনকে কাবু ক'রে বিষম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। কেউ হয়তো বল্‌বে, "সাবাস ফটোগ্রাফার! প্রাণের মায়া ছেড়ে এমন সব ছবি তুলে ফেলেছে!" অবিশ্বাসী কেউ বল্‌বে, "হ্যাঁঃ! তোমারও যেমন কথা! এ রকম একটা ঘটনা ঘট্‌ল, অথচ আমরা তা'র কথা কোনদিন খবরের কাগজেও পড়্‌লাম না!" প্রথম ব্যক্তি তখন বল্‌বেন, "ছবি যখন তুলেছে, তখন ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে। ও ছবি তো আর হাতে আঁকা যায় না!" একজন সমজদার ব্যক্তি তখন তা'দের বুঝিয়ে হয়তো বল্‌বেন, "বায়োস্কোপের অসাধ্য কিছু নাই। 'কিং কং'এ চোখে যা' দেখ্‌ছ তা' আসল ঘটনায় হয়তো ঘটে নি। রাস্তা-ঘাটের ছবি আর লোকজনের ছবি আল্‌গা তোলা হয়েছে, 'কং'এর ছবি আল্‌গা তোলা হয়েছে; তা'র পর ফটোগ্রাফারের কেরামতিতে দু'টো একত্র ক'রে একটা নতুন দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। 'কং' মানুষেরই সৃষ্টি, সেকালের জীবগুলিও মানুষেরই সৃষ্টি।" আসলে কিন্তু সত্যিই তা'ই।

'কং'এর বিরাট্ শরীর (লম্বায় প্রায় ত্রিশ হাত) ত্রিশটি ভাল্লুকের চামড়া দিয়ে তৈরী হয়েছে; নাক, ঠোঁট রবারের তৈরী; চোখ কাচের তৈরী। শরীরের ভিতর ছয় জন লোকের জায়গা আছে; তা'রা ভিতরে থেকে, নানা যন্ত্রপাতির

সাহায্যে 'কং'কে চালায়। শরীরের উপর ভাল্লুকের ছাল, তা'র নীচে ধাতুর কাঠাম।

সেকালের অন্যান্য জন্তুগুলিও ধাতু, চামড়া, লোমশ ছাল, রবার প্রভৃতির তৈরী; তাদের ভিতরে লোক ব'সে নানা যন্ত্রের সাহায্যে শরীরকে চালায়।

এই অদ্ভুত ফিল্ম্ তৈরী কর্‌তে পুরো দু'টি বৎসর সময় লেগেছে;—কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে খরচ হয়েছে তা'র হিসাব কে রাখে? সব চেয়ে মুস্কিল হয়েছে সেকালের জীবগুলির আওয়াজ, নিঃশ্বাসের শব্দ ইত্যাদির নকল কর্‌তে। প্রথম শুধু ফিল্মের ছবিটি তোলা হয়। সেটিকে কেটেকুটে, সংশোধন ক'রে ঠিকঠাক ক'রে, তা'র পর এই নির্ব্বাক্ ছবির সঙ্গে শব্দ যোগ ক'রে সবাক্ করা হয়—অর্থাৎ 'টকি' তৈরী করা হয়। বড় বড় পণ্ডিতদের এই কাজে সাহায্য কর্‌বার জন্য ডাকা হয়েছিল।

শব্দের অংশটুকু বানা'বার সময়ই আসল মুস্কিল উপস্থিত হয়েছিল। বহু

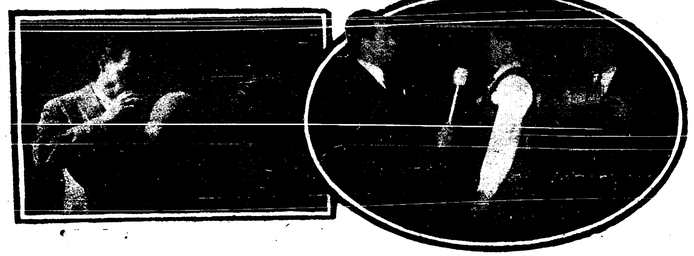

লাউয়ের মুখে আওয়াজ ক'রে ব্রণ্টোসরাসের আওয়াজের নকল

বুকে ঢাক-কাঠি মেরে 'কং'এর বুক বাজাবার আওয়াজের নকল

জন্তুর—বাঘ, সিংহ, চিতা, হাতী প্রভৃতির—আওয়াজের ফিল্ম্ তোলা ছিল; সেগুলিকে প্রথমে পরীক্ষা ক'রে, কোনটাকে একটু চড়িয়ে, কোনটাকে নামিয়ে দেখা হয় কোন্ রকমে সুবিধা। তার পর সেগুলিকে কাটাকুটি ক'রে, জোড়া লাগিয়ে নূতন রকমের আওয়াজ তৈরী করা হয়। কোন কোন সময়ে আবার

২।৩টি আওয়াজ একত্র মিলিয়ে এক অদ্ভুত আওয়াজের সৃষ্টি করা হয়। এই ভাবে অতিকায় জানোয়ারদের আওয়াজের 'টকি' তোলা হয়েছে। 'কিং কং'এর আওয়াজ নাকি বাঘের আওয়াজের ফিল্ম্ উল্টো ভাবে চালিয়ে তৈরী করা হয়েছে।

স্বাভাবিক শব্দগুলো না হয় ঐ ভাবে করান' হ'লো; এবার অন্য আওয়াজের কথা একবার ভাবা যাক্। 'কিং কং' এর ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ, বুক বাজা'বার আওয়াজ, ঘন গভীর নিঃশ্বাসের আওয়াজ, মরণাপন্ন জীবের মরণ-চীৎকার বা শব্দ—এগুলোর নকল কর্‌তে বা সৃষ্টি কর্‌তেই আসল মাথা-ঘামানির দরকার হয়েছে। কত বার কত পরীক্ষা বিফল হয়েছে, কত বিভিন্ন রকমে একই আওয়াজের সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে—তার পর সেটা সফল হয়েছে।

'কং'এর বুক বাজা'বার শব্দের নকল কর্‌তে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। ঢাকের উপর চামড়ার বদলে কাপড় লাগিয়ে, কাঠির উপর ন্যাকড়া জড়িয়ে প্রথমে চেষ্টা করা হয়েছিল—ভাল হ'ল না। তা'র পর একটা গদির উপর একটা চেয়ার বসিয়ে চেয়ারের বেতের উপর ঐ কাঠির বাড়ি মেরে চেষ্টা করা হয়েছিল—সেটাও ভাল হ'ল না। ওস্তাদেরা বল্‌লেন, "নাঃ, এ সব শব্দের যেন রক্তমাংসের সঙ্গে যোগ নাই ব'লে মনে হচ্ছে।"—অম্‌নি শব্দ-যন্ত্রের ওস্তাদের মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

হাপর দিয়ে 'কং'এর গভীর নিঃশ্বাসের নকল

একজন লোককে দাঁড় করিয়ে ঢাক-কাঠি দিয়ে তার বুকে বাড়ি মারা হ'তে লাগ্‌ল আর পিছন দিকে 'মাইক্রোফোন' যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। সামান্য আওয়াজ মাইক্রোফোন যন্ত্রের সাহায্যে ভীষণ জোর আওয়াজে পরিণত হ'ল। সেই আওয়াজ শুনে

ওস্তাদেরা বল্‌লেন, "হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।" সেই ভাবেই বুক বাজাবার শব্দের 'টক্কি' তোলা হ'ল।

একটা শুক্‌নো লাউয়ের খোলার মুখের একটি ছেঁদায় মুখ লাগিয়ে, তা'র ভিতরে আওয়াজ ক'রে অতিকায় গণ্ডার-জাতীয় ব্রণ্টোসরাসের আওয়াজের নকল করা হয়েছিল;—অবশ্য, এই আওয়াজকেও মাইক্রোফোনের সাহায্যে জোর করা হয়েছিল।

'কং'এর ঘন-গভীর নিঃশ্বাসের নকল করা হয়েছিল একটা হাপরের সাহায্যে; মরণোন্মুখ অতিকায় জীবের আওয়াজের নকল করা হয়েছিল গ্রামোফোনের দলের মধ্যে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ ক'রে।

মানুষের বুদ্ধির বলে সব বাধা অতিক্রম ক'রে 'কিং কং'এর শত শত 'অসম্ভব' ব্যাপারকে সম্ভব ক'রে তোলা হয়েছে; সুদূর অতীতের ছবি আবার জ্যান্ত হয়ে আমাদের চোখের সাম্‌নে ফিরে এসেছে।

বাদল

(শ্রীবিমলজ্যোতি সেনগুপ্ত)

আজ্‌কে তোমার ঘরের পাশের
ঘাসের আঙিনায়
আমরা দু'জনায়
খেল্‌ব ব'লে হয়েছিলাম জড়,
সাঁঝের বেলা আকাশ, আলো ঢেকে
কাজল মেঘে মেঘে
বাদল কেন নাম্‌ল এমনতর?

ওই শোন মা,
বাঁশের বীথিকায়
বায়স ব'সে বিরস গীতি গায়;
আচম্‌কা এক দম্‌কা হাওয়ার ঘায়ে
টগর গাছের ছায়ে
ঝ'রে ঝ'রে পড়্‌ল কত ফুল,
পাগল-করা সৌরভে আকুল।

বাদল যদি অঝোর-ধারে ঝরে,
ফোটা ফুল আজ ঝ'রেই যদি পড়ে,
দুঃখ মোদের নাই;
উতাল মাতাল বাতাস থেকে থেকে
কইছে ডেকে ডেকে—
'কুটীর হ'তে বাইরে এস ভাই'।

মাঠের বাটে রাখাল ছেলে যত
বাদ্‌লাতে আজ ভিজ্‌ছে অবিরত,
আজ্‌কে তাদের মত
আমায় তোমার আঁচল থেকে
মুক্ত করে দাও;
ছুট্‌ব মোরা ওই দূরে কোথাও
মাঠের ধারে, নদীর পারে পারে;
আজ্‌কে আমার মন হ'ল উধাও।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

১৪

কাঞ্চন তখনো সেই অতিকায় অশ্বগুলোর দিকে তাকিয়ে। ঘোড়াগুলোকে তার আন্তরিক পছন্দ হয়েছিল। এদের পিঠে চড়তে না জানি কি আরাম! দেশের বেঁটে বেঁটে টাট্টু বিস্তর চাপা গেছে, একটু ঢ্যাঙা লোকের পক্ষে সে-ঘোড়ায় চেপে যাওয়ার মানে পায়ে হেঁটে যাওয়া। দস্তুরমত মাটিতে পা ঠেকে। কিন্তু এই ঘোড়ায় যদি চাপা যায়, যতই ঢ্যাঙা সে হোক্ না কেন, মাটিতে পা ঠেকার তার ভয় নেই। বরং ভয় এই, লোকের মাথায় না ঠেকে যায়।

আচ্ছা, সার্জ্জেণ্ট্‌দের চাক্‌রি কি পাওয়া যায় না? বেশ কাজ ওদের। বেশ আরামের কাজ। সব চেয়ে ভাল কাজ। সে অনেক বিবেচনা করে দেখ্‌ল, রাস্তায় জল ছিটানোর কাজও ভাল বটে, কিন্তু সার্জ্জেণ্টের চাক্‌রি পেলে সে কাজ ছেড়ে দিতে এখুনি সে প্রস্তুত। অবশ্য সার্জ্জেণ্টদের বেতন কত তার জানা নেই, যারা জল দেয় তারা পায় মাসে আ-ঠা-রো টা-কা! সে অনেক টাকা, সার্জ্জেণ্ট্‌রা

কত পায় কে জানে! বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে—বোধ হয় ঘোড়াটাই ওদের বেতন! কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে ঘোড়ায় চাপ্‌তে পাওয়াটাই কি কম হ'ল? কাঞ্চন বিনা বেতনেই সার্জ্জেণ্ট্ হতে রাজী।

ঘোড়ারা লোলুপ নেত্রে জনতার দিকে কটাক্ষ করছিল। তারা জিরিয়ে নিচ্ছে কিংবা আবার তাড়া করবার মৎলবে আছে কাঞ্চন ঠিক বুঝতে পারছিল না। যদি আবার তাড়া করে তা হ'লে সে ভারী রেগে যাবে। একটু আগেই তাদের তাড়নায় পা না চালিয়ে বেগে চলার অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছিল, কিন্তু সেই ইতিহাস পুনরাবৃত্তির অভিলাষ তার আদৌ ছিল না। আকাশ-পথে বেশী চলাচল ভাল নয়, নিরাপদও নয়—বিশেষ করে স্থলচরের পক্ষে। তাতে ক'রে চিঁড়ে-চ্যাপ্‌টা হয়ে যাবার ভয় আছে। ওখান থেকে সরে পড়াটাই কাঞ্চন সমীচীন মনে কর্‌ল।

কিন্তু কোথায়ই বা যাবে? ভিড় ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে দেখে একজন ফেরিওয়ালা আলু-কাব্‌লি হেঁকে চলেছে। কলকাতায় পা দিয়ে অবধি এই অপূর্ব্ব খাদ্যটি বহুবার তার চোখে পড়েছে, দেখা মাত্র তাকে খাদ্য বলে সনাক্ত করতে তার বিলম্ব হয় নি এবং তার অপূর্ব্বতা সম্বন্ধেও তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ট্যাঁকে পয়সা না থাকায় জিনিসটা কেবল চোখে দেখাই হয়েছে, চেখে দেখা হয় নি।

সে মনে মনে প্রশ্ন কর্‌ল, সকালে যখন অচল আনিটার বদলে দু'পয়সার ছাতু সে কিন্‌ল তখন এই ফেরিওলা ব্যাটা ছিল কোথায়? কাছাকাছি থাকে নি কেন? তা হ'লে ত সে ছাতু না কিনে আলু-কাব্‌লিই কিন্‌ত—আনিটার বদলে দু'পয়সার না দিক এক পয়সার দিতে কি খুব আপত্তি হ'ত ওর?

এই সব দার্শনিক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় সে যখন ব্যতিব্যস্ত সেই সময়ে সকাল বেলার আলাপী সেই ছেলেটীর সঙ্গে তার দেখা হ'ল। ছেলেটা হন্ হন্ ক'রে চলেছে, কাঞ্চন তাকে ডাক দিল—'এমন ছুটে চলেছ কোথায়?'

—'মিটিংএ যাচ্ছি। কেন মিটিং হচ্ছে না?'

—'যেয়ো না, যেয়ো না, সেখানে ভারী ঘোড়ার উপদ্রব!'

—'তাই বুঝি পালিয়ে এসেছ তুমি?'

—'পালিয়ে আস্‌ব কেন? আলু-কাব্‌লি কিন্‌তে এলাম আমি।'

ছেলেটি তাকে ধিক্কার দিল—'দেশের চেয়ে আলু-কাব্‌লিই তোমার কাছে বড় হ'ল!'

কাঞ্চন অপ্রতিভ হবার ছেলে নয়, বল্‌ল—'বাঃ, তোমরা যদি একটা আস্ত নিমগাছ তার সব ছোট-খাট শাখা-প্রশাখা সমেত খেয়ে শেষ করতে পার, আমার বেলা আলু-কাব্‌লি খেলেই দোষ? নিমের চেয়ে আলু-কাব্‌লিটা কি খারাপ হ'ল?'

কাঞ্চনের যুক্তির বহরে ছেলেটা ধাক্কা খেল। সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্ল—'নিমগাছের চেয়ে ভাল হতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে কি দেশের চেয়েও?'

—'বারে! দেশ সেখানে কোথায়? কেবল মানুষ আর ঘোড়া, ঘোড়া আর মানুষ! দেশ-টেশ সেখানে দেখ্‌তে পেলুম না তো!'

ছেলেটি সবিস্ময়ে বল্‌ল—'বল কি!'

—'তাও আবার মানুষগুলো ঘোড়ার ঠেলায় ছুটোছুটি করে মরছিল, কোথায় পালাবে পথ পাচ্ছিল না। তাই ত আমি বিরক্ত হয়ে চলে এলাম। তাকে যদি তুমি মিটিং বল ত বল্‌তে পার, কিন্তু আমার মতে সেটা মিটিং নয়, রানিং!—মানুষ আর ঘোড়ার রানিং!'

ছেলেটি বিরক্তি প্রকাশ কর্‌ল—'ওগুলো মানুষ নয়, সব গাধা।'

কাঞ্চন ভারী বিস্মিত হ'ল, ছেলেটা বলে কি, রীতিমত জলজ্যান্ত মানুষ—সেগুলো সব গাধা হয়ে গেল? গাধা তো তার মধ্যে একটাও তার চোখে পড়ে নি! অনর্থক দ্বিপদ প্রাণীদের চতুষ্পদে প্রোমোশন দেওয়া সে সঙ্গত মনে কর্‌ল না, কিন্তু কথা আর না বাড়িয়ে ছেলেটির মতেই সায় দিল—'তা হবে তুমি যখন বল্‌ছ।'

—'তা হবে কি, নিশ্চয় তাই। গাধা থাক্‌তে দেশের কি আশা বল?'

—'তা বটে, কিন্তু ঘোড়া থাকতেও দেশের কোন আশা নেই। তা মিটিংএ তুমি কেন যাচ্ছিলে?'

—'বক্তৃতা দিতে।'

—'আরে দূর্ দূর্, বক্তৃতা আবার মানুষে দেয়!'

—'কেন? মানুষে দেয় না ত গরুতে দেয় নাকি বক্তৃতা?'

—বক্তৃতা দিতে হলে দম আট্‌কে আসে, কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। কাপড়-জামা ঘামে ভিজে যায়। আমাদের ইস্কুলের মিটিংএ আমি একবার বক্তৃতা দিয়েছিলাম, জীবনে আর কখনো আমি দেব না। বাবা, কি নাকাল!'

—'আমার কিন্তু ভালো লাগে বেশ।'

—'ভারী খারাপ কাজ বক্তৃতা দেওয়া। ওর চেয়ে Essay লেখা ভাল। অন্য বই থেকে টোকা যায়, কিন্তু বক্তৃতার বেলা কি মুস্কিল দেখ, তোমাকে হরদম্ বলে যেতেই হবে, অথচ টোক্‌বার কোন উপায় নেই। তার চেয়ে বক্তৃতার শেষে কসে হাততালি দিতে ভারী মজা! আজকাল আমি বক্তৃতা দিই না, হাততালি দিই।'

ছেলেটি গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—'আমি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারি। তোমার মত অমন হাঁপিয়ে উঠি না। অনেক বক্তৃতা দিয়েছি আমি।'

কাঞ্চন ওকে উৎসাহ দিল—'বেশ, তা হ'লে এখানেই দিয়ে ফেল না কেন একখানা। আমি খুব জোর হাততালি দেব।'

—'একজন হাততালি দিলে কি হবে? আর শোনার লোক কই?'

—'আরম্ভ কর্‌লেই সব এসে জুট্‌বে। কিন্তু ওই আলু-কাব্‌লিওলাকে শোনানো চাই, তোমার বক্তৃতায় দেশের প্রশংসা ত করবেই সেই সঙ্গে ওর আলু-কাব্‌লির একটু প্রশংসা ক'রে দিয়ো—ও যদি খুসী হয়ে এক পয়সার আলু-কাব্‌লি আমাদের দিয়ে দেয়!'

ছেলেটিরও এই আইডিয়াটা নেহাৎ মন্দ লাগ্‌ল না। সে উৎসাহিত হয়ে বল্‌ল—'বেশ হয় তা হ'লে! হাততালি আর আলু-কাব্‌লি— দু' দু'টো লাভ। বেশ আমি রাজী—'

ভাল কথা শেষ হতে না হতে, কাঞ্চন এক ছুটে পাশের সরু গলি দিয়ে কোথায় যে ভোঁ দৌড় দিল দেখা গেল না। ছেলেটি বিমূঢ় হয়ে এদিক্ ওদিক্

তাকিয়ে দূরে এক অশ্বারোহী সার্জ্জেণ্টের আবির্ভাব লক্ষ্য কর্‌ল। অশ্বভীত কাপুরুষ কাঞ্চনের ওপর তার অত্যন্ত ঘৃণা হ'ল। ছিঃ, ভারী ভীতু ত ছেলেটা!

কাঞ্চন ফিরতেই সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—'পালালে যে হঠাৎ?'

—'বাবার মত একজন লোক ওই ফুটপাথ দিয়ে আস্‌ছিল যেন দেখ্‌লুম, পরে দেখ্‌লুম বাবা নয়, তাই আবার চলে এলুম।'

—'বাবাকে বুঝি তোমার বড্ড ভয়? আমি ভেবেছিলুম তুমি ঘোড়ার ভয়ে পালালে।'

—'হুঁঃ! ঘোড়াকে আমি ভয় করি নাকি? দিক্ না আমায় ছেড়ে, আমি চেপে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ছেলেটি বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—'ঘোড়ায় তুমি চাপ্‌তে জান? চেপেছ কখনো?'

—'আক্-ছার।'

—'কিন্তু যদি পিঠে নিয়ে ছুট্ মারে?'

—'ছুট্‌লেই ত মজা! কিন্তু ছোটে কই? যে-সব বেঁটে বেঁটে ঘোড়া আমাদের দেশের,—দশ ঘা মার্‌লে তবে এক পা নড়ে।'

—'ওঃ, বেঁটে বেঁটে ঘোড়া! তাই বল। এ ঘোড়ায় আর তোমায় চড়তে হয় না—কী উঁচু দেখেছ!'

—'উঁচু হ'ল ত কী! হাতীতে যেমন করে ওঠে তেম্‌নি করে উঠ্‌ব।'

—'কেমন করে?' ছেলেটির বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। এই পাড়াগাঁর ছেলেটি কলকাতার ছেলের কাছে নতুন মহিমা নিয়ে দেখা দেয়। ঘোড়াতে ত ও চেপেইছে, হাতীতে চাপ্‌তেও ওর বাকী নেই। হাতীতে ওঠা দূরে থাক্, চিড়িয়াখানায় অমন যে জনপ্রিয় মানুষ-বৎসল হাতী তার কাছে যেতেও তার ভয় করে। যদি দৈবাৎ ভুলে মাড়িয়ে দেয় তা হ'লেই ত সদ্য ছাতুত্ব-প্রাপ্তি!

কাঞ্চন অবলীলায় উত্তর দেয়—'কেন, লেজ ধরে উঠ্‌ব।' সেই সঙ্গে ছেলেটির দিকে কৃপার চক্ষে তাকায়। ছেলেটি এবার মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করে—'কিন্তু

তুমি সাইকেল্ চালাতে জান না তো! ঘোড়ায় চাপা তো সোজা, সাইকেলে ব্যালান্স্ রাখ্তে হয়।'

—'ঢের ঢের সাইকেল চালিয়েছি।' সাইকেল চালানো যে একটা বাহাদুরি কাঞ্চন সে কথা আমলই দিতে চায় না।

'কখনো মটর চেপেছ?'

ছেলেটি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাঞ্চনের জবাবের প্রতীক্ষা করে। এরই উত্তরের ওপর যেন তার আত্মসম্মান নির্ভর করছে। কাঞ্চন এবার দমে যায়, মটরের ওপর ওর ভীষণ লোভ কিন্তু এখনো চাপ্বার সুযোগ হয় নি ওর। সেই ডাক্তার হতভাগা বলছিল বটে তাকে চাপ্তে, ইচ্ছাও হয়েছিল তার, কিন্তু অমন বিশ্রী লোকের সঙ্গে মটরে যেতে কেন, স্বর্গে যেতেও তার রুচি নেই—অনেক কষ্টে সে তখন আত্মসম্বরণ করেছে। কিন্তু চাপ্লেই যেন ভাল ছিল, এখন ত সে অনায়াসেই 'হাঁ' ব'লে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করে দিতে পার্ত। মিথ্যে ক'রে হাঁ বল্তে তার নিজের কাছে মাথা কাটা যায়—সে কথা সে কিছুতেই বল্বে না।

ছেলেটির প্রশ্নকে যেন সে গ্রাহ্যই করে না এমনি ভাবে জবাব দেয়—'মটর আমরা খাই। পাবা মাত্রই খেয়ে ফেলি।'

যথার্থ উত্তর না পেয়ে ছেলেটি মনে মনে চটে যায়। এ রকম বদ্ বাক্যবাগীশের সঙ্গে কথায় কে পারবে? বিরক্ত হয়ে সে অদূরে পাশের বাড়ীর রোয়াকে গিয়ে বসে পড়ে। (ক্রমশঃ)

কাঞ্জিলাল এণ্ড্ নেফিউ

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

সেবার পূজার ছুটীর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় রকমের প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম, বেনারসে দিন তিনেক, দিন তিনেক এলাহাবাদে এবং সুবিধা ঘটিলে আগ্রা আর ফতেপুর-সিক্রিতেও কয়েক দিন। যাত্রী মাত্র দুই জন, আমি এবং আমার ছোট ভাই রণেন্দ্র।

আয়োজন সমস্তই ঠিকঠাক, হঠাৎ ঠাকু'মা বাধা জন্মাইয়া বসিলেন—দেশের পূজা ফেলিয়া বিদেশ-বিভূঁয়ে টৈটৈ? আজকালকার ছেলেগুলা হইল কি?

আমি একা হইলে বোধ করি ঠাকু'মার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়াই ধরাশায়ী হইতাম, রেলে চাপিবার আর শক্তি থা কি ত না। কিন্তু র ণে ন্দ্র ভা য়া বাস্তবিকই রণ+ইন্দ্র, অর্থাৎ যুদ্ধের রাজা; বীরবিক্রমে ঠাকু'মার স ম্মু খী ন হইয়া সে ক হি ল, "সে কি ঠাকুমা, আমরা কাশী-প্রয়াগে তীর্থ কর্তে যাচ্ছি আর তুমি তাইতে বাধা দিচ্ছ?" তার পর চোখ উল্টাইয়া গলা কাঁপাইয়া থি য়ে টা রী ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "তুমি কি সে—ই হিন্দু নারী যারা একদিন নাত্তিরা তীর্থে যাবে শুন্লে নিজ হাতে গেরুয়া রঙ্গে তাদের কাপড় ছাপিয়ে দিত, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁচা তেঁতুল পেড়ে তাদের কমণ্ডলু মাজিয়ে দিত, ধর্ম্ম ছিল যাদের প্রাণ, তীর্থ ছিল যাদের জান,—নারী, তুমি কি সেই মহামহিমান্বিতা, ত্রিলোক-বন্দিতা, নোলক-মণ্ডিতা আর্য্যদুহিতা?"

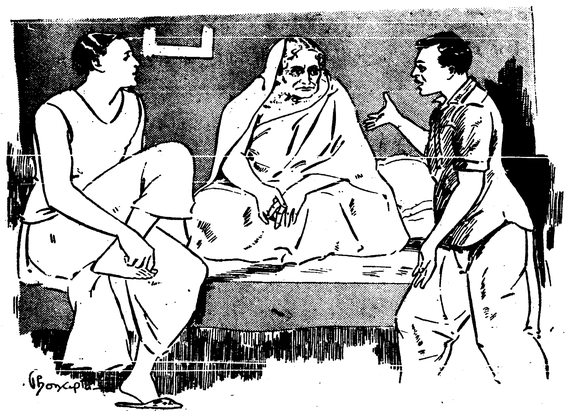

তুমি কি সে—ই হিন্দু নারী?

'আর্য্যদুহিতা' এবারে অত্যন্ত প্রলুব্ধা হইয়া এক ভয়াবহ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন, কহিলেন, "তীর্থে যাবি তো আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল্; তোদের রান্না করে খাওয়াব'খন।"

রণেন বলিল, "কিন্তু নারী, আমরা যে সেখানে উঠ্ব হোটেলে! ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করে কে তোমাকে তুলসীপত্র চয়ন করে দেবে? তোমার গঙ্গোদকের শুচিতাই বা সেখানে কি প্রকারে রক্ষিত হবে?"

তখন আপোষে একটা রফা হইল—আমরাই ঠাকুমার নামে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় ফুল, বেলপাতা আর দুধ ঢালিব।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়ার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা একটি বন্ধু লাভ করিলাম। ভদ্রলোকের নাম প্রকাশচন্দ্র কাব্যবিনোদ, ভারতীভূষণ; এলাহাবাদের কি একখানা মাসিকের তিনি সহকারী সম্পাদক। খানিকক্ষণ আলাপের পরই বুঝিলাম বন্ধুটি জীবনের গোড়াতেই এক মারাত্মক ভুল করিয়া বসিয়াছেন; হওয়া উচিত ছিল তাঁর দালাল কিংবা ক্যান্‌ভাসার, হইয়াছেন সাহিত্যরসিক। নাকে মুখে এবং চোখে যে একসঙ্গে খই ফুটানো যায় এত দিন এ শুধু একটা কথার কথা বলিয়াই জানিতাম, কাব্যবিনোদ মশাই প্রমাণ করিলেন যে তা বাস্তবিকই সম্ভব। কেবল মাত্র স্রেফ্ বোল্‌চালের দৌড়েই দুই মাড়োয়াড়ীর বিশাল ভুঁড়ির মধ্যে নির্ব্বিবাদে শোয়ার জায়গা করিয়া নিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ জমাইতে বসিলেন। রণেন বলিল, "আপনি কদ্দুর যাবেন, বাক্যবিনোদ মশাই?"

"বাক্যবিনোদ নয়, কাব্যবিনোদ। হ্যাঁ—আপাততঃ মোগলসরাইতে একবার ব্রেক্‌জার্ণি করতে হবে, এদিকে কাজ আছে। তার পর নিজের ডেরায়—য়্যাল্‌হাবাদে।"

দিন দুত্তিন কাশীবাসের পর আবার একদিন অতি প্রত্যূষে তল্পিতল্পা গুটাইয়া বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনের দিকে রওনা হওয়া গেল। যাত্রাটা বড় সুবিধার হইল না, প্রথমেই ঘটিল পরাজয়। হোক্ অতি তুচ্ছ ঘটনা—আমি কিন্তু বরাবরই এগুলি খুব মানি। রণেন আর আমি এক টঙ্গায় চাপিয়া যাইতেছিলাম, গোধুলিয়ার মোড়ে আর এক ভদ্রলোক টঙ্গাওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আমাদের অশ্বনন্দনটি এতক্ষণ গজেন্দ্রগমনে চলিতেছিলেন, হঠাৎ দেখি তিনি পবনবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কারণটা পরের মুহূর্ত্তেই অবশ্য টের পাইলাম, একখানা একার সঙ্গে আমাদের 'রেস' সুরু হইয়াছে। উঃ, তখন দুই পক্ষের কী প্রচণ্ড উৎসাহ! আমাদের গোধুলিয়ার মোড়ে-ওঠা বাবুটি পারেন তো বোধ করি নিজেই ঘোড়ার সঙ্গে গাড়ী টানেন। ও গাড়ীর সওয়ারদেরও উৎসাহের অন্ত নাই, মুখ দিয়া কত রকম শব্দ করিয়াই না তারা তাদের ঘোড়াকে উস্‌কাইতেছে। খানিকক্ষণ সমান তালে চলিতে চলিতে হঠাৎ আমাদের গাড়ীখানা আগাইয়া গেল। গোধুলিয়ার বাবুটি তখন একটা সিগারেট্ হাতে নিয়া ওপক্ষকে শুনাইয়া শুনাইয়া অবজ্ঞাভরে গাড়োয়ানকে বলিলেন, "হ্যাঃ, গরুর গাড়ী নিয়ে রেস দিতে এয়েছে—হেরে ম'ল। দে দে তোর ম্যাচিস্‌টা একবার দে, একটা সিগারেট ধরাই।"

বাবু মনের আনন্দে ধোঁয়া ছাড়িতেছেন হঠাৎ দেখি আমাদের পাশ কাটাইয়া সাঁ করিয়া একাখানা বাহির হইয়া গেল। শুধু তাই নয়, সেই একা হইতে গলা বাড়াইয়া পরিষ্কার ঢাকাই 'সহুরে' ভাষায় কে একজন গোধুলিয়া-বাবুকে বলিয়া গেল, "কর্‌তা, ছিগারেট্‌টা এইবার লিবাইয়া ফ্যালান।"

যে যাত্রার সুরুতেই এমন ব্যঙ্গ না জানি তার শেষের দিকে কতখানি রঙ্গ জমানো আছে।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি গাড়ী একেবারে গরু-বোঝাই, বসিবার জায়গা মেলে না। একটি লোক কিন্তু দেখিলাম ভারী ওস্তাদ্, ওরই মধ্যে দিব্যি পা টান করিয়া সারা গা চাদরে মুড়িয়া পরম আনন্দে ঘুমাইতেছে।

রণেন তাকে নাড়া দিয়া জাগাইয়াই পর মুহূর্ত্তে সাশ্চর্য্যে চেঁচাইয়া উঠিল, "আরে বাক্য-বিনোদ মশাই যে! কোত্থেকে কোত্থেকে?"

"বাক্যবিনোদ নয়, কাব্যবিনোদ। য়াল্‌হাবাদ যাচ্ছি। আপনারাও য়্যাল্‌হাবাদ? কোথা, উঠ্‌বেন কোথা?"

"সেইটেই তো সমস্যা। কোথায় ওঠা যায় বলুন দেখি, ভালো হোটেল-টোটেল আছে?"

"হাঃ হাঃ হাঃ, এটা বলেছেন ভালো। হোটেল আর নেই য়্যাল্‌হাবাদে? বেষ্ট হোটেল, কাঞ্জিলাল্‌স্ ইথিরিয়াল হোটেলে গিয়ে উঠ্‌বেন—প্রোপ্রাইটার রসিকলাল কাঞ্জিলাল এণ্ড্ নেফিউ। বাঙ্গালীর হোটেল না হলে মশাই বাঙ্গালীর পোষায়?"

শুধু হোটেলের সন্ধান দেওয়া নয়, এলাহাবাদ ষ্টেশনে নামিয়া কাব্যবিনোদ মশাই ভদ্রতাও করিলেন প্রচুর। নিজেই গাড়ী ডাকিয়া মালপত্র তোলাইলেন এবং গাড়োয়ানকে বিশদ ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন কোথায় আমাদের নামাইয়া দিতে হইবে।

যথা সময়ে হোটেলে পৌঁছিলাম, ম্যানেজার স্বয়ং খাতির করিয়া অনেকগুলি রুম্ দেখাইলেন। কোন কাম্‌রাই তেমন জুৎসই মনে হইল না, তবুও ওরই মধ্যে একখানা বাছিয়া নিতে হইল। ম্যানেজার জানাইলেন, ঘরভাড়া রোজ পাঁচসিকা করিয়া দিতে হইবে, আর তা ছাড়া প্রত্যেক বেলার জন্য জনা-পিছু খাওয়ার চার্জ্জ বারো আনা। অবশ্য ইচ্ছা হইলে খাওয়ার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত আমরা নিজেরাও করিতে পারি, তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস একবেলা হোটেলে খাইলে সে ইচ্ছা আমাদের আর আদবেই হইবে না।

বেলা তখন দশটা বাজিয়া গেছে, সেই সকাল হইতে পেটে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পড়ে নাই, রণেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "না না না, সে রকম ইচ্ছে আমাদের একদম্ নেই; আপনি দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থাটা কর্‌বেন।"

তার পর দেড় ঘণ্টা সময় চলিয়া গেল, খাওয়ার ডাক কিন্তু পড়িল না। জানালা দিয়া হতাশ ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম, গাড়ী ঘোড়া, লোকজন, রাস্তাঘাট কিছুই আর চোখে পড়ে না, পড়ে কেবল রাশি রাশি সরিষা ফুল। রণেন রান্নাঘরের সাম্‌না দিয়া ঘুরিয়া কয়েক পাইচারি করিয়া শেষে আসিয়া কহিল "ছোড়দা, ব্যাটারা খাওয়ার দামটা আগাম নেয় নি তো?

আর ঘণ্টা খানেক এ ভাবে রাখ্‌তে পার্‌লেই আমাদের নিশ্চিত অর্দ্ধ-লাভ আর সেই সঙ্গে ব্যাটাদেরও ঝাড়া দেড়টি টাকা লাভ।"

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটিল, তার পর ম্যানেজার বাবু আসিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা মাংস খান্ তো?"

আঃ, মাং—স! কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্দ্ধেক পেট ভরিয়া গেল, স্মরণে চোখ বুঁজিয়া আসিল, ড্রিলক্লাশের ছাত্রের মত দু'জনে ঠিক এক সঙ্গে মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, খাই।

মিনিট পনেরো ফের চুপ্‌চাপ্, তার পর ম্যানেজার বাবু আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "আপনারা আসন পেতে খাবেন, না টেবিল চেয়ারে?"

নাঃ, কাব্যবিনোদ, বাস্তবিকই য়্যারিষ্টোক্র্যাটিক্ হোটেলের সন্ধানই তুমি দিয়াছ। মুখে বলিলাম, টেবিল-চেয়ারই তো ভাল!"

এইবার সত্যি-সত্যিই ডাক পড়িল; খাওয়ার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমরা একেবারে নিভিয়া গেলাম টেবিল এবং চেয়ার দুইটির জৌলসে। টেবিল খানাকে কেরোসিন কাঠের তৈরী বলিলেও বোধ করি তাকে সম্মান করা হয়। আর চেয়ার? সেদিকে একবার একটুখানি দৃষ্টিপাত করিয়াই রণেন আমার দিকে তাকাইল—ঠিক সেই ভাবে যে ভাবে রাক্ষস-বধের আগে লক্ষ্মণ অনুমতির জন্য শ্রীরামের দিকে তাকাইতেন। ভাবখানা এই, ছোড়দা, বসিব কি? বসিলেই কিন্তু চেয়ারখানির নির্ঘাৎ মৃত্যু।

বামুন ঠাকুর আসিয়া আমাদের সাম্‌নে দু'খানা থালা রাখিয়া গেল। রসিক কাঞ্জিলালের ঠাকুর, তার রসবোধ থাকিবে না? ও টেবিলের উপর অপর কোন থালা যে মানায় না সে তা বিলক্ষণ জানে। এলুমিনিয়ামের থালা দু'খানি, গায়ে পঁচিশ-ছাব্বিশটি টোল, কবে শেষ মাজা হইয়াছিল জানিতে হইলে গত বছরের গৃহস্থালীর খাতা খানা দেখা দরকার। তার পর খাবারের পালা; সর্ব্বপ্রথম যে জিনিষটি পাতে পড়িল প্রথম দৃষ্টিতে সেটিকে মনে হইল মাটী-সিদ্ধ। মুখে দিয়া দেখি রূপের মত গুণও তার অসীম—পরম বিনয়ী, নিজের স্বাদ এবং গন্ধ জাহির করিতে মোটেই ব্যস্ত নয়। বিনা বাক্যব্যয়ে দুইজনে খাইয়া চলিলাম, মনে মনে ভরসা, যাক্ মাংস তো আছে, মারে কে? মিথ্যা কথা বলিব না, ডাল তরকারিগুলি ঠিকঠিকই চিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষাশেষি দুইটি পিতলের গ্লাস ভরিয়া দু'গ্লাস গঙ্গাজল ঠাকুর কেন যে আনিয়া উপস্থিত করিল, বাস্তবিকই বুঝিলাম না। বোধ হয় এ হাত ধোয়ার সুবন্দোবস্ত, মনে করিয়া রণেন গ্লাসের মধ্যে হাত পুরিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল দু'খণ্ড হাড়।

"ওহে রসিক কাঞ্জিলালের রসময় ঠাকুর, এ আবার তোমার কি রসিকতা?" বলিয়া রণেন্দ্র সাম্‌নের দিকে তাকাইতেই দেখিল স্বয়ং ম্যানেজার তদারক করিতে আসিয়াছেন।

আমাদের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, মাংসও দিয়ে গেছে দেখ্‌ছি—রান্নাটা কেমন হয়েছে?"

এর পর রণেন এমনি বিষম খাইয়া ফেলিল যে পনেরো মিনিট লাগিল তাকেই সুস্থ করিয়া তুলিতে।

বেলা তিনটার সময় রণেন ডাকিল, "ছোড়দা!" সে যে কি প্রস্তাব করিবে আগেই জানিতাম, তবু বলিলাম "কি?"

"এ বেলা ফের দেড়টি টাকা জলে ফেলে আর কি হবে? দেড় টাকায় অনেকগুলো পয়সা, একটা ভাল দেখে রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে রাত্তিরের খাওয়াটা সেখানেই সেরে নেওয়া যাবে'খন।... এই যে ম্যানেজার বাবু, দেখা হ'ল ভালই, আপনার কাছেই যাব যাব কর্‌ছিলাম। দেখুন, ও বেলার মাংসটা বড়ই গুরুপাক হয়ে গেছে; আমাদের কারুরই ক্ষিধে নেই, রাত্রে তাই কেউ কিছু খাব না।"

ম্যানেজার একটু বেজার মুখে চলিয়া গেলেন। খানিক পরেই রান্নাঘরের দরজায় তাঁর গলা শুনিতে পাইলাম। চাপা গলায় তিনি রসুয়ে বামুনকে ধম্‌কাইতেছিলেন, "তুমি একটা আস্ত উজবক্। এত করে বল্লাম বাবুদের বেছে বেছে হাড় দেবে, মাংসগুলো সবটাই তুলে রাখ্‌বে, তা না মাংস খাইয়ে দিলে তাদের পেটের অসুখ করিয়ে!"

জবাবে বামুন ঠাকুর কহিল সে তো বাছিয়া বাছিয়া হাড়ই দিয়াছিল, বাবুরা যে দুর্ভিক্ষের দেশের লোক, হাড়কে হাড়ই ঠুসিয়া সাবাড় করিবে তা কি সে জানিত?

বিকালে সহর দেখার অছিলায় দু'জনে বাহির হইয়া পড়িলাম। শুনিলাম, এদিকটা ভারতীয়দের আড্ডা, 'সিভিল লাইন' নয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেড়াইলাম খুব। কোন রেষ্টুরেণ্ট চোখে পড়ে কি না সেদিকেও লক্ষ্য ছিল বটে, তবে তেমন চাড় ছিল না। সন্ধ্যার পর কিন্তু রেষ্টুরেণ্ট্ আবিষ্কারই হইয়া পড়িল প্রধান কাজ। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উৎকণ্ঠাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, রেষ্টুরেণ্ট্ যে দেখি একটাও চোখে পড়ে না—কেবল সারি সারি নান্-খাটাই সোহন হালুয়া প্রভৃতি অপূর্ব্ব হিন্দুস্থানী মেঠাইএর দোকান। তন্ন তন্ন, পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—নাঃ এ অঞ্চলে রেষ্টুরেণ্ট্ নাই—নিশ্চয়ই নাই। ও বেলা এক রকম অনাহারেই গেছে, এ বেলাও কি শেষে নান্‌খাটাই খাইয়াই কাটাইতে হইবে? কলম্বসের মতই তখন আমাদের আবিষ্কারের নেশা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। রাত আটটা, সাড়ে আটটা অবশেষে ন'টা বাজিতে চলিল। সমস্ত আশা-ভরসাই তখন উবিয়া গেছে।

হঠাৎ মরুভূমির মধ্যে জলের সন্ধান পাইলে লোকে যেমন আত্মহারা হইয়া যায়, আমরাও ঠিক তেম্‌নি আত্মহারা হইয়া গেলাম সাম্‌নেই একটা সাইনবোর্ড্ দেখিয়া—তা'তে লেখা আছে বাঙ্গালী-পরিচালিত আপ্-টু-ডেট্ রেষ্টুরেণ্ট্।

সটান ভিতরে ঢুকিয়াই ফর্‌মাস করিলাম, "দু'ডিস্ মাংসের কারি-দেখি!"

রেষ্টুরেণ্ট্-ওয়ালা হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে হাসি-হাসি মুখে খানিকটা বিনয় ঝাড়িয়া কহিল, "কারিটা স্যর ছিল, ফুরিয়ে গেছে।"

একটু পরেই দেখিলাম, শুধু কারি নয়,—এ আপ্-টু-ডেট্ রেষ্টুরেণ্টে সমস্ত আপ্-টু-ডেট্ খাবারই ছিল, কিন্তু সমস্তই ফুরাইয়া গেছে। ডিম ছিল, ফুরাইয়া গেছে, মাম্‌লেট্ ছিল ফুরাইয়া গেছে, কাট্‌লেট্ ছিল ফুরাইয়া গেছে, চপ্ ছিল, তাও ফুরাইয়া গেছে। আমরা নিতান্তই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছি দেখিয়া রেষ্টুরেণ্ট্-ওয়ালা বলিল, "আধ ঘণ্টাটাক্ যদি অপেক্ষা করেন স্যর, তো কাছেই আমাদের হেড্ অপিস্, মাংসটা অন্ততঃ আনিয়ে দিচ্ছি।"

"কাছেই হেড্ অফিস্?" আমরা লাফাইয়া উঠিলাম, "তবে তো সেখানে গেলেই হয়!"

"আজ্ঞে তা খুব হয়। কোন কষ্ট হবে না আপনাদের সেখানে—এক্‌সেলেণ্ট্ ব্যারেঞ্জমেণ্ট্। এ মোড়টা বেঁকলেই দেখ্‌বেন প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড্।"

"কি লেখা দেখ্‌ব সাইন্‌বোর্ডে?"

"কাঞ্জিলাল্‌স্ ইণ্ডিয়িয়াল হোটেল। প্রোপ্রাইটার রসিকলাল কাঞ্জিলাল এণ্ড্ নেফিউ।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। রণেন একটু ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "রসিকলালের রসিকতার কথা জানি, তাঁর এ নেফিউটিও বোধ হয় আর এক রসিক।"

রণেনের কথার অর্থ রেষ্টুরেণ্ট্-ওয়ালা বোধ করি বুঝিতে পারিল না, বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তাঁর নাম শ্রীপ্রকাশচন্দ্র কাব্যবিনোদ, ভারতীভূষণ।"

আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া, রেষ্টুরেণ্ট হইতে বাহির হইয়াই একেবারে আট আনার নানখাটাই কিনিয়া ফেলিলাম।

হাস্য-কৌতুক

(শ্রীঅজয়কুমার দাস)

অভিনেতা—কাল আমি যখন রঙ্গমঞ্চে মৃত্যুর ভান করি তখন তা এত স্বাভাবিক হয়েছিল যে একজন দর্শক অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

বন্ধু—সেই লোকটা কে? তুমি যে ইনসিওরেন্সে জীবনবীমা করেছ তার এজেণ্ট্ বুঝি?

ফুটবল্

(শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

এবার প্রথম বিভাগের লীগ্-বিজয়ী হয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং। ভারতীয় ফুলবল্ লীগে ভারতীয় দলের সাফল্য এই প্রথম। এই বছরেই তারা দ্বিতীয় বিভাগ থেকে উঠেছে। এই টিম্ স্থাপিত হয় ১৮৯১ সনে। তার পর তারা ১৯০২, ১৯০৬, ১৯০৯এ কুচবেহার কাপ্ জয় ক'রে বিশেষ নাম করে। ১৯২১ সনে তারা তৃতীয় বিভাগে খেল্‌তে সুরু করে ও তার পর ১৯২৬এ দ্বিতীয় বিভাগে ওঠে। এমন সময়ও গেছে ১৯২৮—২৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিভাগ থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে এ দল বেঁচে গেছে। কিন্তু আজ তাদের যে কী উন্নতি তা তাদের খেলা এবং তার ফল দেখলেই বোঝা যায়। এদের পাঁচটা ফর্‌ওয়ার্ড যেন পাঁচটা আরবী ঘোড়া—যেমন দম্, তেম্‌নি ক্ষিপ্র গতি, আর তেম্‌নি উপস্থিত বুদ্ধি। চির্-নবীন সামাদ এবার এ দলে খেলছেন। তাঁর বয়সের সঙ্গে কিন্তু খেলার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেনি। এদের সেণ্টার ফরওয়ার্ড রসিদ গোল্ দেওয়ার রাজা; এ বছর ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে বেশী গোল দিয়েছেন তিনিই। রহ্‌মৎ তাদের আর একজন ফরওয়ার্ড্। এঁর বল্ নিয়ে দৌড়, পা'য়ের কায়দা আর 'পাশ' করার কৌশল সত্যিই চমকপ্রদ। ব্যাক খেলছেন আন্‌ওয়ার তাঁর বিশাল বপু নিয়ে—দৈত্যের মত। মহামেডান স্পোর্টিং দু'বার খেলার মধ্যে প্রায় সকলকেই হারিয়েছে, শুধু মোহনবাগান আর হাওড়া ইউনিয়ন্‌কে ছাড়া। এদের সঙ্গে দু'বারই ড্র হয়েছে। মহামেডান স্পোর্টিংএর শেষ খেলায় খুব জল হওয়াতে ১১ জনই বুট পায়ে খেলেন। কিন্তু ডালহউসী আর কাস্টম্‌স্‌এর কাছে ছাড়া আর সব সাহেব দলের কাছেই এদের একবার ক'রে হারতে হয়েছে। তবু মহামেডান স্পোর্টিং

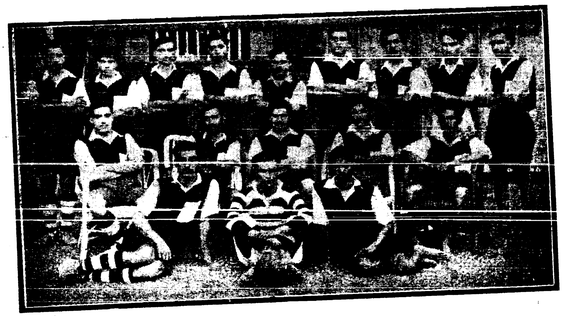

প্রথম ভারতীয় লীগ্-বিজয়ী দল—মহামেডান স্পোর্টিং

যে ভারতীয় খেলার ইতিহাসের এক পাতা নতুন ক'রে তাদের কীর্ত্তি দিয়ে পূর্ণ করেছে তা বিশেষ আনন্দ এবং গৌরবের বিষয়।

ডালহউসী এবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, মোহনবাগানের সঙ্গে। তারা প্রায় এই টিম্ নিয়েই দু' বছর আগে সব থেকে নীচে নেমেছিল, কিন্তু নেমে যায় নি। মজা, সেই টিম্ নিয়েই তারা এবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তারা সব থেকে কম গোল খেয়েছে, তার প্রধান কারণ তাদের বিখ্যাত গোল্-কীপার ডেভিসের অদ্ভুত গোল-রক্ষা।

জন্মে অবধি শুনে আসছি—আহা আহা, গোল হ'তে হ'তে হ'ল না, আর লীগ্ পেতে পেতে পেল না—এ বছরও তাই হ'য়েছে মোহনবাগানের। প্রথম দিকে তারা একটাও হারেনি—কিন্তু শেষের দিকে হিসেব ক'রে একটা ক'রে হেরেছে আর একটা জিতেছে বা ড্র রেখেছে। শেষে ক্যালকাটা আর হাওড়ার কাছে—সব শুদ্ধ সাত গোল খেয়ে তারা তাদের সব আশা চূর্ণ করে দিল। অবশ্য তাদের সন্মথ দত্ত, করুণা ভট্টাচার্য্য আর সতু চৌধুরী—এই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ক'টি এখন সাউথ আফ্রিকায়। মোহনবাগানকে এবার আবার পুরানো সারথিদের ডাকতে হয়েছিল। মোনা দত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূল বপু নিয়ে এবার আবার খেলেছেন এবং শুধু খেলা নয়, খুব ভালই খেলেছেন। এখনও যে তাঁর পূর্ব্বনৈপুণ্য অটুট তার প্রমাণ পাওয়া গেছে; সবগুলো খেলা না খেলেও তিনি ৬ খানা গোল দিয়েছেন, আর সব থেকে আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে তিনি এবার নতুন হয়ে, অর্থাৎ বুট পরে মাঠে নেমেছিলেন। 'রিটায়ার্ড' ক্ষেত্র বোসকেও এবার মাঠে নামতে হয়েছিল। বিমল মুখুয্যের ফর্ম্ম এবার গত বছরের থেকে ভাল। এস, দে আর একজন ফরওয়ার্ড—অল্প বয়সে বুট পায়ে বেশ খেলেছেন। মোহনবাগানের নতুন ক্যাপ্টেন্ আব্দুল হামিদ মোটের ওপর খেলেছেন ভালই কিন্তু তাঁর খেলার যেন কিছু অবনতি ঘটেছে। ভোলা সরকার এবার খুব সাফল্য দেখিয়েছেন। তাঁর পাশে 'পাহাড়' এবার

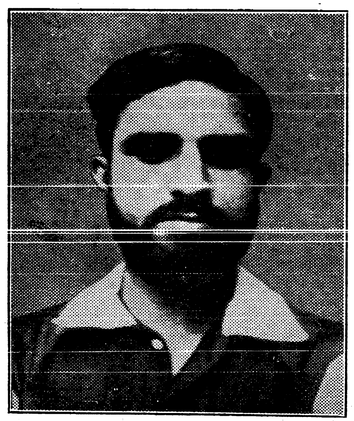

মোহনবাগানের ক্যাপটেন্ হামিদ (ইনি দু'টো ইন্টার-ন্যাশানালেই ভারতীয় দলের ক্যাপটেন্ ছিলেন।)

ছিল না রক্ষা করবার জন্যে—অবশ্য শেষে গোষ্ঠ পালকে সকলে ধরে আন্‌ল। তাঁর শরীর খুব খারাপ ছিল তাই ক্যাপটেন্ হয়েও তিনি সাউথ আফ্রিকায় যেতে পারেন নি। তাঁর দু'দিনকার খেলাতেই প্রমাণ হয়েছে যে কল্‌কাতার মাঠে এখনও তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যাক্। সেদিনও তিনি মাঠের মাঝখান থেকে গোল দিয়েছেন।

মোহনবাগানের পরে পর পর কে-আর-আর, ডারহাম্‌স্, হাওড়া ইউনিয়ন্, ইষ্টবেঙ্গল, ক্যালকাটা, কালিঘাট এবং সব চেয়ে নীচে হয়েছে এরিয়ান্স্। এদের কথা আসছে বার বলা যাবে। দু'টো ইন্টারন্যাশানাল্ খেলাও—ভারত বনাম গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতীয় বনাম ইয়োরোপীয়—শেষ হয়েছে। ১ম টিতে ভারতীয়েরা ১ গোলে জেতে, ২য় টিতে ৪ গোলে হারে। ভারতীয় দলের ক্যাপটেন দু'বারেই হয়েছিলেন মোহনবাগানের হামিদ।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বিমল বিয়োগে

(শ্রীঅরুণ)

[বিমলেন্দু সরকার রামধনুর একজন উৎসাহী গ্রাহক ছিল। রামধনুকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত। নিজেও সে সুন্দর সুন্দর কবিতা, গল্প লিখিতে পারিত। লেখাপড়ায়ও বিমল বড় ভাল ছিল। ভাগলপুর C. M. S. স্কুলের প্রথম শ্রেণীর সে ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র। বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের দিকে ছিল তার ভয়ানক ঝোঁক। বাড়ীতেই সে ছোটখাট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিত। বড় হইয়া একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক হইবে এই ছিল তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু

হায়, সে সাধ তার মিটে নাই! মাত্র ১৫ বছর বয়সে সে আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের কাঁদাইয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে।]

মা তোমাকে ডাক্‌ছে যে আজ, বিমল, তুমি জাগ,
বিমল তুমি জাগ এবার, বিমল তুমি জাগ।
মা যে আছে বিমল, তোমার মুখের পানে চেয়ে,
মা যে আছে তোমার বুকে, তোমার স্বপন ছেয়ে;
কেমন করে তুমি, বিমল, ঘুমিয়ে পড়ে থাক?
বিমল, তুমি জাগ এবার, বিমল তুমি জাগ।

তোমার স্নেহের বটগাছটা ঐ যে হাওয়ায় দোলে,
তোমার চেনা নদী যে আজ হাজারো ঢেউ তোলে,
তোমার পুষি বসে আছে তোমার শয্যা-কোলে,
তোমার কুকুর দাঁড়িয়ে আছে পাশে;
তুমি বিমল, ঘুমিয়ে আছ, তুমি কেন ঘুমিয়ে আছ?
মায়ের চোখে জল যে ভরে' আসে।

পথের মাঝে লোক চলে যে, রোদ আসে যে ঘরে,
শিউলি গাছের ফুলগুলি সব একটি ক'রে ঝরে;
মায়ের চোখে জল জানি না জাগে কাহার তরে!
বিমল, তুমি ঘুমিয়ে তবু থাক?
বিমল, তুমি জাগ এবার, বিমল তুমি জাগ।'

জেনে রাখ

(শ্রীগৌরী চট্টোপাধ্যায়)

কাপড়ে চায়ের দাগ লাগলে তা তুলবার জন্য আলু সিদ্ধ করা জল বেশ কাজ দেয়।

* * *

দুধে পোড়া গন্ধ হ'লে খানিকটা নুন এবং চামচটাক চিনি ফেলে দিলে সে গন্ধ দূর হয়।

পাশের ছবিখানি গ্রাহকের আঁকা

শিল্পী শ্রীমান্ সুমুখনাথ মিত্র
(দিনাজপুর)

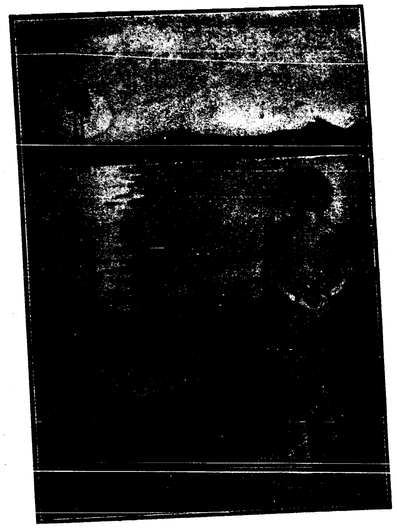

তন্ময়

সন্ধি

(শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস)

'বল ত অন্য+অন্য কি সন্ধি হয়?'

'আজ্ঞে, আমি কি বামুনঠাকুর যে অন্নের সন্ধি জান্‌ব? আমি ইতিহাসের সন্ধি জানি।'

চিঠি-পত্র

"জ্যৈষ্ঠের রামধনুতে 'রামধনুতে র-এর রকমারি' নামক কবিতার জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল উহাতে মাত্র ২টি লেখা পাওয়া গিয়াছে। তাও পুরস্কারের উপযুক্ত নয়। একটি আবার গদ্য, পদ্যটিরও ছন্দ ঠিক হয় নাই। বিষয়টি বোধ হয় একটু কঠিন হইয়াছিল, তাই আমরা পুরস্কারটি অন্যরূপে দিতে চাই। ২০ লাইনের বেশী না হয় এমন একটি হাসির কবিতা লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা-লেখক পুরস্কার পাইবেন। গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নং সহ ২৫শে শ্রাবণের মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় কবিতা পাঠাইতে হইবে।"—শ্রীঅধীররঞ্জন দে, C/o শ্রীকুঞ্জবিহারী দে, A. S. O. & S. D. M, Settlement Officer, বর্দ্ধমান।

"কাশীতে আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদের

সাহিত্যানুরাগ বাড়াইবার জন্য একটি সমিতি করিয়াছি, এবং উহা হইতে 'ছাত্রমহল' নাম দিয়া একখানি ত্রৈমাসিক বাহির করিতেছি। তোমরা ইহাতে তোমাদের ছোট হাতের লেখা পাঠাইতে পার। বিস্তৃত বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ডে নিম্ন ঠিকানায় চিঠি লিখিবে।"—শ্রীঅনন্তকুমার ওহদেদার, 2nd year, Science, Queens' College, Benares.

"রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যে যদি কেহ Modern Student-এর গ্রাহক থাকেন তবে জানাইবেন"—শ্রীতড়িৎ মুখোপাধ্যায়, "অবসর", মধুপুর।

"আষাঢ় মাসের ধাঁধার রচয়িতা অরুণকুমার রায়ের ঠিকানা কি? তাঁর সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে চাই।"—শ্রীদুলালচন্দ্র দত্ত ৫, হেম ব্যানার্জ্জি লেন, শিবপুর।

"উশ্রী জলপ্রপাতে"র শিল্পী তপেশচন্দ্র হালদারের ঠিকানা কি?" শ্রীরবীন্দ্রনাথ পালিত (ঠিকানা—C/o জে, সি, হালদার, মধুপুর S.P.)

"বাংলা দেশের কোথায় এয়ারশিপ্ ট্রেনিং দেওয়া হয়? সে বিষয়ে বিস্তারিত খবর কোথায় পাইব?" শ্রীশঙ্করশেখর মুখার্জ্জি গ্রাঃ ১৪০৫। (এয়ারশিপ্ চালনা শিক্ষা বাংলায় কোথাও দেওয়া হয় বলিয়া আমরা জানি না। এরোপ্লেন চালাইবার শিক্ষা দমদমে দেওয়া হয়। Secretary, Bengal Flying Club, Dum-dum—এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলেই বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে। —রাঃ সঃ)

"ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে যে সব লেখা বাহির হয় পরের মাসে গ্রাহকদের লেখা তার সমালোচনা বাহির করিলে ভাল হয়"—শ্রীসুধীর (খোকা); শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ) (ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে প্রকাশিত রচনা গ্রাহকদের ভাল লাগিল না খারাপ লাগিল তা অবশ্য সকলেই জানাইতে পারেন, কিন্তু যথার্থ সমালোচনা বলিতে যা বুঝায় তা গ্রাহকেরা এই বয়সে পারিয়া উঠিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। —রাঃ সঃ)

সন্দেশ

এ বছর গোটা ভারতবর্ষ যুড়িয়াই নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে। এই সেদিন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়া গেল, তার পর হইতে ঝড়, বৃষ্টি, ঘূর্ণিবাত্যা—রোজই কাগজ খুলিলে একটা-না-একটা নতুন খবর চোখে পড়ে। সম্প্রতি আসামে আবার প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছে। গ্রামকে গ্রাম একেবারে জলের তলায় চলিয়া গিয়াছে, হাজার হাজার লোক মারা পড়িয়াছে—যারা আছে তারাও গৃহহীন, অন্নহীন, নিঃসম্বল। জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত বাঁচিবার কোন আশাই তাদের নাই।

* * *

আর একটি দুঃসংবাদ তোমাদের শুনাইতে হইতেছে। কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ও আর ইহজগতে নাই। আজকালকার দিনে আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসায় যাঁরা গোটা ভারতবর্ষ যুড়িয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বাচস্পতি মহাশয় ছিলেন তাঁদের

অন্যতম। শুধু তাই নয়, পাণ্ডিত্যও ছিল তাঁর সর্ব্বজনবিদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তিনি ছিলেন সহকারী সভাপতি। বাংলা দেশে তাঁর জায়গা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কম।

* * *

মাদাম্ কুরি আর নাই। মাদাম্ কুরির নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। এই রামধনুতেই কয়েক বছর আগে তাঁর জীবন-কথা আর তাঁর অতি-অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বাহির হইয়াছিল। মাদাম্ কুরি প্রফেসার কুরির স্ত্রী, রেডিয়াম্ নামে এক অদ্ভুত ধাতু আবিষ্কার করিয়া তিনি পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শুধু রেডিয়াম্ নয়, ঐ ধরণের আরও এমন কতক-গুলি জিনিষ তিনি বাহির করিয়াছেন যা দিয়া একটা নতুন বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি দুই দুইবার বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার পান। (প্রথমবার তাঁর স্বামী কুরি ও বেকরেলের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া পাইয়াছিলেন।) তাঁর মৃত্যুতে বিজ্ঞান-জগতে একটা মস্ত ক্ষতি হইয়া গেল।

মাদাম্ কুরি

* * *

১৬০ বছর বয়সে জারো আগার মৃত্যু হইয়াছে। কিছু দিন আগে পৃথিবীর মধ্যে বৃদ্ধতম লোক বলিয়া ইনি পরিচিত হন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম, ইনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ জীবনে ইনি ১১ বার বিবাহ করেন। মৃত্যুশয্যায় তাঁর ছোট স্ত্রী এবং ৮৮ বছরের একটি মেয়ে তাঁর সেবা করিয়াছে। জারো আগার মৃত্যুর কারণটিও বড় অদ্ভুত। কোন লোক, তাঁর বয়স ১৬০ নয় ১২০ বছর মাত্র, বলিয়া সন্দেহ করায় মনে প্রচণ্ড দুঃখ পাইয়াই নাকি ইনি

শয্যাগ্রহণ করেন।

* * *

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট্ টেষ্ট্ ম্যাচ্ সুরু হইয়াছে সে খবর তোমাদের গত বারেই দিয়াছি। ১ম, ২য় ও ৩য় টেষ্ট্ শেষ হইয়াছে। ১ম টেষ্টে ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন ছিলেন ওয়াল্টার্স্, ২য় ও ৩য় টেষ্টে ছিলেন ওয়্যাট্। অষ্ট্রেলিয়া দলের ক্যাপটেন তিন বারই ছিলেন উডফুল্। ১ম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া অনেক রানে জয়লাভ করে; ২য় টেষ্টেজেতে ইংল্যাণ্ড্—একেবারে এক ইনিংস্এ। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংএর সময় বৃষ্টিতে মাঠ এমনি ভিজিয়া গিয়াছিল যে তাহাতে ক্রিকেট্ খেলা এক রকম অসাধ্য হইয়া পড়ে; তাদের হারিবার ইহাই প্রধান কারণ। তৃতীয় টেষ্টে ড্র হইয়াছে। এবার কিন্তু ইংল্যাণ্ড চমৎকার ব্যাটিং করিয়াছে। তারা ১ম ইনিংস্এ ৯ উইকেটে ৬২৭ রান্ তুলিয়া ডিক্লেয়ার করে। টেষ্টে এত রান্ বড় একটা দেখা যায় না। সব ক'টি টেষ্ট্ শেষ হইলে খেলার বিবরণ তোমাদের শুনাইব।

* * *

ফরিদপুর জেলার একটি ৬৫ বছরের নিরক্ষর বৃদ্ধ নাতিদের সঙ্গে পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছে। উদ্দেশ্য—লেখাপড়া শিখিয়া শেষ জীবনে সে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া জীবন ধন্য করিবে।

* * *

পাঞ্জাবের লায়ালপুরের একটি সাড়ে এগার বছরের শিখ মেয়ে এবার প্রথম বিভাগে পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। মেয়েটি ৮ মাস আগেও ইংরাজী অক্ষর চিনিত না। এই ৮ মাসের মধ্যে বর্ণ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার সমস্ত পাঠ্য সে শেষ করিয়াছিল। কী অসাধারণ ক্ষমতা বল দেখি!

* * *

ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ার অঞ্চলের একটি চার বছরের জন্মান্ধ মেয়ে সেদিন অদ্ভুত উপায়ে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। সে রাত্রে জানালার ধারে শুইয়া ছিল এমন সময় প্রচণ্ড ভাবে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমুল রবে বজ্রপাত হয়। সে ভয় পাইয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া ফেলে। পর দিন দেখা যায় যে সে চমৎকার দেখিতে পাইতেছে। ডাক্তারেরা মনে করেন চোখের উপর অতিরিক্ত বিদ্যুতের আলো লাগিয়াই এমন অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে।

* * *

আমেরিকার ঔপন্যাসিক হার্ডি এলেন বলেন যে সিগারেট্ না খাইলে তাঁর এক কলমও লেখা আসে না। দিনে তাঁর কম করিয়া তিন শ' সিগারেট্ খরচ হয়। কি রকম ভয়ের কথা বল দেখি!

* * *

চাঁদে একটুও বাতাস নাই তা তোমরা বোধ হয় জান। আমরা যে কথা বলি সে শব্দ যায় বাতাসের ঢেউএর ভিতর দিয়া। কাজেই বাতাস যেখানে নাই সেখানে শব্দও হইতে পারে না। কাজেই চাঁদ যে একেবারে শব্দ-হীন দেশ তা'তে সন্দেহ নাই। এমন চাঁদে যাইতে ইচ্ছা হয় কি?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

গ্রীন্‌ল্যাণ্ড্

উত্তরদাতাদের নাম

রথীন্দ্রনাথ মিত্র (ভবানীপুর); সুধীরচন্দ্র দাস (ভবানীপুর); সত্যেন্দ্রকুমার ও কনক-কুমার সিংহ (বর্দ্ধমান); সুধীরচন্দ্র কুণ্ডু (বসিরহাট); ডলি, তুলতুল, পুলক (ভবানীপুর); বিঠবা ঠাকুর, আভা, বিভা, নারায়ণ, হাঁসু (পুরুলিয়া—নড়িহা); রামেন্দু দাশ, দিব্যেন্দু, নির্ম্মলেন্দু, যোগজীবন (ভবানীপুর); সুনীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান, অনিল (ভবানীপুর); ধীরাজকুমার ব্যানার্জ্জি, রত্নরেখা চ্যাটার্জ্জি (জলপাইগুড়ি); তপেশ, রেণু, জ্যোৎস্না, রমা, বিজয়া (মধুপুর); খোকন, অমল, কালিদাস ও প্রতুল গুপ্ত (মালদহ); সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ); খোকা, বাণ্ড, পুলিন, বৈদ্যনাথ, বাণীপদ, শীতল, কাজলরেখা (তাঁতীবাজার, ঢাকা), সনু, মনু, মোহন, খুসী, বুড়ী (বসিরহাট); রাধাশ্যাম, সুনীতি, রাঙ্গু, গোবিন্দ, রাঘু, কালিপদ, বুলু (আদরা); অমিয়কুমার সেন ও নীলিমা সেন (কুমিল্লা); রমাপ্রসাদ, সুধীর, বলাই, রজনী, দেবেন, কেশব, সত্যেন প্রভৃতি (বেহালা); অধীররঞ্জন দে, ভোলা, ভানু, কালী, ননী, মণ্টু, চঞ্চল প্রভৃতি (বর্দ্ধমান); সেজদি, ছোড়দি, বৌদি, টটু, কমলেশ, সমীরেশ দে (বেনারস); কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (শিলং); জন, রেম, পিন, কুঙ্কুম, বাদল (মালদহ); চিরু, কানু দীপু, সতী (ভবানীপুর); জিতেন্দ্রনাথ দাস (জলপাইগুড়ি); তড়িৎ নীলা, মঞ্জু, বামাচরণ (ব্রজ) (মধুপুর); অরুণকুমার রায় (কালিঘাট); রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, হীরু, বেবী, জুলু, শান্তি, শান্ত (মির্জাপুর); ছোড়দামণি ও আভা (সিমলা); গোপালচন্দ্র বাগছী (দেওঘর); মণ্ট, ফড়িং, দ্বিজু, চড়িং, অমরদা, টুলু, শুনু (কালিগ্রাম—মালদহ), রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, রেণুকা, সবিতা, কবিতা, নমিতা (মাদিপুরা—ভাগলপুর); সুরমা, প্রতিমা, বেলা, বৌদি, মেজবৌদি, ছোড়দামণি, তমাল প্রভৃতি (পাতিহাল—হাওড়া); দীপক গুহ, রূপক, গুপি, বাবুই (কলিকাতা); অনিল ও অরুণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (রাজসাহী); গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য (খাগড়া); বিনয়, বিলাস (শ্রীরামপুর); শেফালিকা রায় চৌধুরী (কলিকাতা); জ্যোৎস্না নাহা (রাজাপুর—চট্টগ্রাম); সত্যেন্দ্র অজিত, অনিল, সুনীল, নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া); কামাখ্যা, রাঙ্গাদা, মামা, ভানু, খুকু, মুকু, রেণু প্রভৃতি (ময়নাগুড়ি); টুটু, মিনু, চিনু ঘোষাল (লেকপল্লী); অমিয়া, মনু, খোকন, পটাসি, বড়দি (ঝিনাইদহ); কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর); তপেন, তারণ, ডলি পলি, বাবা, মা সিমলা); হীরালাল প্রসাদ ও শশাঙ্কশেখর বসু (বেহালা); কল্যাণকিশোর মুখোপাধ্যায়, ছোটমামা, বড়মামা, মাষ্টার মহাশয়, রাণী (গয়া); নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কলিকাতা); দুলালচন্দ্র দত্ত, অরুণকুমার রায় (শিবপুর); প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (পাখী), শাখী, বাদল, দেবী, গীতা, খুকী (কিশোরগঞ্জ); তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়, কমলেশ সেনগুপ্ত (কাতরাসগড়);

ঝণ্টু, তুলু, বাবু (বসিরহাট), কচু, ভন্টু, মা, দাদা, বৌদি (জামসেদপুর) ; বিভা দেবী, মন্মথ রউডেন ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর) ; দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডস্থ কর্পোরেশন্ বালিকা-বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ (কলিকাতা) ; অরুণচন্দ্র গোস্বামী (কলিকাতা) ; সন্তোষকুমার বসু (রানাঘাট) ; সুমুখ, হরি, রাণী, বেণু, কানু, লক্ষ্মী, গৌরী (দিনাজপুর) ।

দ্রষ্টব্য ঃ—মাঝে মাঝে আমরা চিঠি পাই যে কোন কোন গ্রাহক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্ভুল উত্তর দিয়াও তাঁহাদের নাম উত্তরদাতাদের তালিকায় যথাস্থানে কিংবা একেবারেই দেখিতে পান না। গ্রাহকেরা মনে রাখিবেন সঙ্গে গ্রাহক নং দেওয়া না থাকিলে কোন উত্তর (শুদ্ধ হইলেও) গ্রাহ্য করা হয় না। অনেক গ্রাহক এই গ্রাহক নম্বরটি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যান কিংবা দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন না। গ্রাহকেরা উত্তর লিখিয়া একবার পড়িয়া দেখিবেন তাঁহারা কি লিখিতেছেন। অনেক সময় যথার্থ উত্তর বাহির করিয়াও লিখিবার এবং 'রিভাইজ্' না করিবার ত্রুটীতে তাঁহাদের নাম বাহির হয় না—গ্রাহকেরা ভাবেন তাঁরা ঠিকই লিখিয়াছেন কিন্তু তাড়াতাড়িতে অনেক সময়ই ভুল হয়। প্রত্যেক বারেই এমন কয়েকখানা চিঠি আসে যাহাতে সবই থাকে শুধু উত্তরটুকু কিংবা নামটুকু লিখিতেই ভুল হইয়া যায়। ঠিকানা লিখিতেও এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। গ্রাহকেরা উত্তর পাঠাইবার আগে কি চাওয়া হইয়াছে তাহাও মনোযোগ দিয়া দেখিবেন। এ সবের দিকে দৃষ্টি রাখিলে তাঁদের আর কোনরূপ অনুযোগ করার প্রয়োজন হইবে না।

—রাঃ সঃ

নূতন প্রশ্ন

আমাদের মণ্টু একখানা সাঙ্কেতিক চিঠি পাইয়াছে, কিন্তু চিঠিখানার পাঠোদ্ধার কিছুতেই সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তোমরা তাকে একটু সাহায্য করিবে কি? চিঠিখানা এই রকম—

মণ্টু, খবর সঙ্গে খুব চুপে সারা নচেৎ তুমি কর্ম্মেরই সুশীল কিছু না আর পূর্ব্বে জানাইবার নাই। জানি কখন ভণ্ডুল বসিবে! অসাধ্য নাই। চিঠি এখানকার হইবে। শরৎ ইতি। ব্যবস্থা পাইলে তোমার কিছুই উহার বাধাইয়া কি বাপু, কি প্রয়োজন কিছু ভোলাকেও পারে, জানিতে যেন নও। কোন বুঝিব চাই, কাজ চুপে পাঠাইলাম। এই সমস্ত

"আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে!"

শিল্পী—শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

৭ম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪১ | ৮ম সংখ্যা

ষাঁড়াষাড়ির বান

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

ঢেউ-এর পরে ঢেউ ছুটিয়ে সাগর করে খেলা—
বান ডেকে যায় গাঙ্গের জলে, কূলে লোকের মেলা।
ভয়ে চেঁচায়—পাড় ভেঙ্গে যায়, জল ঢুকে যায় গাঁয়ে,
সামাল! সামাল! দাঁড়ি-মাঝি যাত্রী হাঁকে নায়ে।
ভেবে সারা যত বুড়া—কী হবে নাই জানা;
ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাঙ্‌-পিটেরা, কে শোনে কার মানা!
হাতে তালি দিয়ে খালি ছেলেরা গায় গান—
ভাদ্র মাসের ভরা গাঙ্গে ষাঁড়াষাড়ির বান!

"একই চীজ্ হায়"

(শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্-সি)

"দেখো ভাই সব, হামারা এক হাত্মে হায় এক্ঠো মাট্টিকা ঢেলা, ঔর দোস্রা হাত্মে হায় এক্ঠো রূপায়া। দোনো ত' একই চীজ্ হায়।" বাজারের ধারে গায়ে ছাই মাখা এক সাধু এই বলে খুব বক্তৃতা দিচ্ছিল দেখে আমিও একটু দাঁড়িয়ে গেলুম। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, "দেখিয়ে বাবুজী, আপ্লোক ত' আংরেজী পড়্তে হেঁ, আপ্কো বিজ্ঞানমে কেয়া লিখা হায়?" হঠাৎ আমার ওপর এই আক্রমণ দেখে একটু হক্চকিয়ে গেলুম। আম্তা আম্তা ক'রে বল্তেই হ'ল—"হ্যাঁ, তাই ত' বোধ হ'তা হায়"। কিন্তু মাথার মধ্যে ব্যাপারটা ঠিক ঢুকছিল না—একটা মাটীর ঢেলা আর একটা রূপোর টাকা—এই দু'টো হয়ে গেল এক?

কিন্তু মাথাটা আরও ঘুরে গেল বাড়ীতে এসে বিজ্ঞানের বইএর পাতা খুলতে। বৈজ্ঞানিকেরা কি সত্যি সত্যিই আজকাল নেশা করতে আরম্ভ করেছেন নাকি? তাঁরাও যে ঐ একই গৎ আওড়াতে সুরু করেছেন!

পণ্ডিতেরা ত' অনেক দিন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন যে আমাদের চোখের সামনে অনেক জিনিষ থাকলেও সেগুলো তৈরী হয়েছে মাত্র কয়েকটা (এ পর্য্যন্ত ৯৩টা পাওয়া গেছে) জিনিষ থেকে; যেমন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোনা, সীসা, কার্ব্বন (অঙ্গার) ইত্যাদি। এদের নাম দেওয়া হয় "মৌলিক পদার্থ" বা Element। এই মৌলিক পদার্থগুলিকেই নানা ভাবে নানা পরিমাণে মিশিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষ গড়া হয়েছে। ধর, দু' ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ অক্সিজেন মিশলেই আমরা পাই জল; আবার এগার ভাগ জলের সঙ্গে বারো ভাগ কার্ব্বন মেশালেই আমরা পাব চিনি। কিন্তু মনে ক'র না এই মেশান ব্যাপারটা খুব সহজ। এ ভয়ানক কঠিন, এবং কি ক'রে এগুলো মিশেছে কিংবা কি ক'রে এগুলোকে মিশ খাওয়াতে হ'বে তা' ঠিক করতে গিয়ে অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিককেও হিম্সিম্ খেয়ে যেতে হয়েছে।

তার পর বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করলেন যে এ সমস্ত মৌলিক পদার্থগুলো তৈরী করতে বিশ্বকর্ম্মাকেও বেশ একটু কায়দা দেখাতে হয়েছিল। কেননা এক টুক্রো সোনাকে তুমি যতই ছোট করতে থাক শেষ পর্য্যন্ত সে সোনাই থাকবে। অবশেষে তুমি এমন এক অবস্থায় আসবে যখন ঐ টুক্রোগুলোকে তুমি আর ছোট করতে পারবে না। এই শেষ অবস্থার অংশটুকুর নাম দেওয়া হ'ল 'এটম্' বা পরমাণু। তা' হ'লে অনেকগুলো সোনার পরমাণু মিলে এক টুক্রো সোনা তৈরী হয়েছে। আবার হাইড্রোজেনের দু'টো পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের একটা পরমাণু মিশলেই আমরা পাব জল। এই পরমাণু যে কত ছোট তা' তোমরা কল্পনাই করতে পারবে না। একটা এক ইঞ্চি লম্বা লাইনের উপর তুমি প্রায় ১৫,০০,০০,০০০ পরমাণু পাশাপাশি সাজিয়ে রাখতে পার।

নীল বোর

গোলমাল বেধেছে এই পরমাণু নিয়ে। এত দিন লোকের বিশ্বাস ছিল যে একটা মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণুই এক জিনিষ দিয়ে তৈরী।

এই গোলমালটা সৃষ্টি করেছেন নীল বোর (Niels Bohr—এঁর বাড়ী ডেন্মার্কে), রাদারফোর্ড, জে, জে, টম্সন্ (ইংরেজ) প্রভৃতি। প্রথম গোলমালটা বাধ্ল একটা সাধারণ কাচের টিউবের মধ্যে। তোমরা কেউ কেউ হয়ত কলকাতায় বা অন্য কোথাও বড় বড় দোকানে লক্ষ্য করে দেখেছ যে সে সব জায়গায় সাধারণ গোল ইলেক্ট্রিক্ আলোর বদলে অনেক সময়ে খুব লম্বা কাচের টিউবের মত থাকে। এর রং সাদা কিন্তু এর ভিতরে আলো জ্বল্লে তার রং কখনো লাল

কখনো নীল হয়। এই রকম একটা আলো নিয়েই প্রথম পরীক্ষাটা হয়। কাচের ভিতরের বাতাস বা গ্যাস্‌কে প্রথমে পাম্প্ করে খুব কমিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে খুব জোরালো বিদ্যুৎ এর মধ্য দিয়ে চালিয়ে দিলে একটা অদ্ভুত আলো দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করেছেন যে এই আলোটার সৃষ্টি হয় এর ভিতরের গ্যাসের পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে। পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে তার চেয়েও ছোট জিনিষ বার হয়; তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেক্‌ট্রন্'। এইগুলো ছাড়া পেলেই ভয়ানক জোরে ছুটতে থাকে কারণ এই ইলেক্‌ট্রনের একটা অদ্ভুত বৈদ্যুতিক শক্তি আছে এবং তারই জন্যে এর এই নাম। এই রকম বিদ্যুতের কতকগুলো বিশেষ গুণের জন্য একে বলা হয়েছে 'বিয়োগাত্মক' (negative)। এই বিশেষ গুণগুলোর কথা তোমরা বড় হয়ে পড়বে। আবার সেই সঙ্গে অন্য উপায়ে পরমাণুকে ভেঙ্গে আমরা আর এক রকমের আলো পাই। তার কণাগুলো কিন্তু 'যোগাত্মক' (positive) অর্থাৎ ঠিক উল্টো বৈদ্যুতিক শক্তিবিশিষ্ট এবং তারা ছোটেও উল্টো দিকে।

এর পর বৈজ্ঞানিকেরা যা ঠিক করলেন তা' আরও অদ্ভুত। তাঁরা ঠিক করেছেন যে পরমাণুগুলো একেবারে ফাঁপা। এত ফাঁপা যে একটা আস্ত মানুষের শরীরের সমস্ত পরমাণুগুলো একত্র ক'রে তাকে পিটিয়ে যদি ফাঁকা জায়গাগুলি ভরাট করে দেওয়া যায় তবে সেগুলো—অর্থাৎ ঐ আস্ত মানুষটা—একটা মটরের দানার চেয়েও ছোট আকার নেবে। ঠিক হয়েছে যে প্রত্যেক পরমাণুর ঠিক মাঝখানে একটা যোগাত্মক কেন্দ্র আছে। এখন, 'যোগাত্মকের' স্বভাব হচ্ছে 'বিয়োগাত্মক'কে টানা—যেমন সূর্য্য তার গ্রহগুলোকে টানে এবং আপনার চারদিকে ঘোরায়। প্রত্যেক পরমাণু তা' হ'লে ঠিক এক একটা সৌর জগতের মত। এর সূর্য্য হচ্ছে একটা যোগাত্মক কেন্দ্র, আর তার গ্রহ হচ্ছে কতকগুলো 'ইলেক্‌ট্রন্'—সেগুলো বন্‌বন্ করে যোগাত্মক কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে। তা হ'লে ভেবে দেখ সামান্য এক টুক্‌রো মাটীর মধ্যেও দিবা-রাত্রি কি ভয়ানক কাণ্ড চলছে!

কিন্তু সোনা আর সীসার মধ্যে তা' হ'লে তফাৎটা কি? তফাৎটা হচ্ছে শুধু এই ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যায়। সোনার পরমাণুতে একটা যোগাত্মক কেন্দ্রের চারদিকে ৭৯টা ইলেক্‌ট্রন্ ঘুরছে, পারা (mercury)তে আছে ৮০টা। তা হ'লে পারার

পরমাণুগুলোর ভিতর থেকে যদি কোন রকমে এক একটা ক'রে ইলেক্‌ট্রন্ তাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে সে হয়ে যাবে সোনা। এই জন্যই পারা থেকে সোনা করার এত চেষ্টা চল্‌ছে। সীসাতে ইলেক্‌ট্রন্ আছে ৮২টা। হাইড্রোজেনে মাত্র একটা ইলেক্‌ট্রন্ আছে।

বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এখানেই থামেন নি'। ইলেক্‌ট্রন্‌কে নিয়ে তাঁরা ভারী গোলমালে পড়েছেন। সে গোলমালটা ভাল ক'রে বোঝাবারও ক্ষমতা আমাদের নেই। গোলমালটা হচ্ছে ইলেক্‌ট্রন্‌টা কি তাই নিয়ে। হাইসেনবের্গ্, শ্রয়ডিঙ্গের (জার্ম্মান্) প্রভৃতি আজকালকার বড় বড় পণ্ডিতেরা ভারী অদ্ভুত কথা বলেন। ইলেক্‌ট্রন্ নাকি একটা পদার্থই নয়, অনেকটা ঢেউএর মত একটা কিছু—শুধু একটা শক্তির বিকাশ। কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না বোধ হয়? কিন্তু এ বুঝতে

জে, জে, টম্‌সন্

হ'লে তোমাদের বড় হয়েও অনেক বই পড়তে হবে।

তা' হলে এখন বোধ হয় তোমাদের মানতে আপত্তি নেই যে গোড়া থেকে দেখলে একটা মাটীর ঢেলা আর একটা টাকা 'একই চীজ্ হায়'। কিন্তু তাই বলে যেন তোমরা দোকানদারের কাছ থেকে জিনিষ নিয়ে তাকে টাকার বদলে মাটীর ঢেলা দিও না, কিংবা তোমাদের দিদিদের এবার থেকে সোনার বদলে

সীসার ছুল তৈরী করাতে উপদেশ দিতে যেও না; তা হ'লে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আমার ভালুক শিকার

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

তোমরা আমাকে গল্প-লেখক বলেই জান। কিন্তু আমি যে একজন ভাল শিকারী এ খবর নিশ্চয়ই তোমাদের জানা নেই। আমি নিজেই এ কথা জানতুম না—শিকার করার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত!

সেই রোমাঞ্চকর ঘটনাটা এবার তোমাদের বলি। আমার মাসতুতো বড়দা' সুন্দরবনের দিকে অনেক জমিটমি নিয়ে চাষবাস সুরু করেছেন। সেদিন তাঁর চিঠি পেলাম—"এবার গ্রীষ্মটা এধারেই কাটিয়ে যাও, নতুন জীবনের আস্বাদ পাবে, অভিজ্ঞতাও বেড়ে যাবে অনেক।"

বলা বাহুল্য এ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার কোনও হেতু ছিল না। সুতরাং সুট্‌কেস্‌টা গুছিয়ে নিয়ে একদিন সুন্দরবনে গিয়ে হাজির হ'লাম।

আমার মাসতুতো দাদাও একজন বড় শিকারী। এ তথ্যটা আগে জান্‌তাম না, এবার গিয়ে জান্‌লাম। শুধু হাতেই অনেক দুর্দ্ধর্ষ বাঘকে তিনি পট্‌কে ফেলেছেন। বন্দুক নিয়েও শিকারের অভ্যাস তাঁর আছে, কিন্তু সে রকম সুযোগে তিনি বন্দুককে লাঠির মত ব্যবহার করতেই ভালবাসেন। তাঁর মতে কেঁদো বাঘকে কাঁদাতে হলে বন্দুকের কুঁদোই প্রশস্ত—গুলি করা কোন কাজের কথাই নয়। কিছু দিন আগে এক বাঘের সঙ্গে তাঁর বড় হাতাহাতি হয়ে গেছ্‌ল, তাঁর নিজের মুখেই আমার শোনা। বাঘটার অত্যাচার বেজায় বেড়ে গেছ্‌ল, সমস্ত গ্রামটার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাত ব্যাটা, এমন কি তাদের স্বপ্নের মধ্যে এসে হানা দিত পর্য্যন্ত।

দাদার নিজের ভাষাতেই বলি:—"তার পর তো ভাই বেরুলাম বন্দুক নিয়ে। কি করি, সমস্ত গ্রামের অনুরোধ। ঠেলা তো যায় না—একাই গেলাম। সঙ্গে লোকজন নিয়ে শিকারে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। একবার অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম, কি বল্‌ব। বাঘ করল তাদের তাড়া, তারা এসে পড়্‌ল আমার ঘাড়ে, মানুষের তাড়ায় প্রাণে মারা যাই আর কি। গেলাম। কিছু দূর যেতেই দেখি সম্মুখে বাঘ, বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে দেখি টোটা আনা হয়নি—আর সে বন্দুকটা এমন ভারী যে তাকে লাঠির মতও খেলানো যায় না। কি করি, বন্দুক ফেলে দিয়ে শুধু হাতেই বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জোর ধস্তাধস্তি, কখনও বাঘ উপরে আমি নীচে, কখনও আমি নীচে বাঘ উপরে—বাঘটাকে প্রায় কাবু করে এনেছি এমন সময়ে—"

আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছি, বৌদি বাধা দিয়ে বল্লেন—"এমন সময়ে গেলেন তোমার দাদা তক্তপোষ থেকে পড়ে। জলের ছাঁট দিয়ে হাওয়া করে অনেক কষ্টে ওঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। মাথাটা গেল কেটে, তিন দিন জলপটি দিতে হয়েছিল।"

এর পর দাদা বারো দিন আর বৌদির সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না এবং মাছের মুড়ো সব আমার পাতেই পড়তে লাগ্‌ল।

দাদা একদিন চুপি চুপি আমায় বল্লেন—"তোমার বৌদির কীর্ত্তি জান না তো? খুকীকে নিয়ে পাশের জঙ্গলে জাম কুড়োতে গিয়ে পড়েছিলেন এক ভালুকের পাল্লায়। খুকী তো পালিয়ে এল, উনি ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা উইয়ের ঢিপির উপর ব'সে পড়ে এমন চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি সুরু করে দিলেন যে ভালুকটা ওঁর ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।"

আমি বল্লাম—"ওঁর ভাষা না বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছ্‌ল এমনও তো হতে পারে?"

দাদা বিরক্তি প্রকাশ করলেন—"হ্যাঃ! ভারী ত ভাষা! প্রত্যেক চিঠিতে ছ'শ' ক'রে বানান ভুল।"

বৌদির পক্ষ সমর্থন করতে আমাকে, অন্ততঃ মাছের মুড়োর কৃতজ্ঞতা-সূত্রেও,

বল্‌তে হ'ল—"ভালুকেরা শুনেছি 'সাইলেণ্ট্ ওয়ার্কার', বক্তৃতা-টক্তৃতা ওরা বড় পছন্দ করে না। কাজেই বৌদি ভালুক তাড়ানোর ব্রহ্মাস্ত্রই প্রয়োগ করেছিলেন, বুঝলে দাদা?"

দাদা কোন জবাব দিলেন না, আপন মনে গজ্‌রাতে লাগ্‌লেন। বৌদির তরফে আমার ওকালতি শুনে তিনি মুষ্‌ড়ে পড়লেন কি ক্ষেপে গেলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সেদিন বিকালেই তাঁর মনোভাব টের পাওয়া গেল। দাদা আমাকে হুকুম করলেন পাশের জঙ্গল থেকে এক ঝুড়ি জাম কুড়িয়ে আন্‌তে—সেই জঙ্গল যেখানে বৌদির সঙ্গে ভালুকের প্রথম দর্শন হয়েছিল।

দাদার গরহজম হয়েছিল তাই জাম খাওয়া দরকার, কিন্তু আমি দাদার চালাকী বুঝতে পারলাম। আমাকে ভালুকের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমাকে শুদ্ধ বিনা আয়াসে হজম করার মৎলব। বুঝলাম, বৌদির পক্ষে যাওয়া আমার ভাল হয়নি। আম্‌তা আম্‌তা করছি দেখে দাদা বল্লেন—"আমার বন্দুকটা না হয় নিয়ে যা, কিন্তু দেখিস্, ভুলে ফেলে আসিস্ না যেন।"

ওঃ, কি কূটচক্রী আমার মাসতুতো বড়দা'! ভালুকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা বরং আমার পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে কিন্তু বন্দুক ছোঁড়া—? একলা থাক্‌লে হয়ত দৌড়ে পালিয়ে আস্‌তে পার্‌ব, কিন্তু ঐ ভারী বন্দুকের হ্যাণ্ডিক্যাপ্ নিয়ে দৌড়তে হ'লে সেই রেসে ভালুকই যে প্রথম হবে এ বিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ ছিল না, দেখ্‌লাম দাদাও তেমনি স্থির-নিশ্চয়।

দাদা জামের ঝুড়ি আর বন্দুকটা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—"চট্ করে যা, দেরি করিস্ নি। তোর ভয় কর্‌ছে নাকি?"

অগত্যা আমায় বেরুতে হ'ল। বেশ দেখ্‌তে পেলুম আমার মাসতুতো বড়দা' আড়ালে একটু মুচ্‌কি হেসে নিলেন। মাছের মুড়োর বিরহ তাঁর আর সহ্য হচ্ছিল না। নাঃ, এই বিদেশে বিভুঁয়ে মাসতুতো ভাইয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে ভাল করি নি।

বেরিয়ে পড়লাম। এক হাতে ঝুড়ি, আর এক হাতে বন্দুক। নিশ্চয়ই আমাকে খুব বীরের মত দেখাচ্ছিল। যদিও একটু বিশ্রী রকমের ভারী, তবু বন্দুক আমাকে

বেশ মানায়। ক্রমশঃ মনে সাহস এল—আসুক না ব্যাটা ভালুক, তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং বড়দা'কেও। মাসতুতো ভাই কেবল চোরে-চোরেই হয় না, শিকারীতে-শিকারীতেও হতে পারে। উনিই একজন বড় শিকারী, আর আমি বুঝি কিছু না?

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলাম। আসুক না ব্যাটা ভাল্লুক এইবার! ঝুড়িটা হাতে নেওয়ায় যতটা মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা-লাঘব হয়েছিল বন্দুকে তার ঢের বেশী পুষিয়ে গেছে। আমাকে দেখাচ্ছে ঠিক বীরের মত। অথচ দুঃখের বিষয়, এই জঙ্গল-পথে একজনও দেখ্‌বার লোক নেই। এ-সময়ে একটা ভালুককে দর্শকের মধ্যে পেলেও আমি পুলকিত হ'তাম।

বন্দুক কখনও যে ছুঁড়ি নি তা নয়। আমার এক বন্ধুর একটা ভাল বন্দুক ছিল, হরিণ-শিকারের উচ্চাভিলাষ-বশে তিনি ওটা কিনেছিলেন। বহু দিনের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তিনি সেটা দিয়ে গাছ-শিকার করতে পারতেন। তিনি বল্‌তেন—গাছ শিকারের অনেক সুবিধে, প্রথমতঃ গাছেরা দৌড়ে পালায় না, দ্বিতীয়তঃ—ইত্যাদি, সে বিস্তর কথা। তা তিনি সত্যিই গাছ-শিকার করতে পারতেন—অন্ততঃ বাতাস একটু জোর না বইলে, উপযুক্ত আব্‌হাওয়ায় এবং গাছটাও হাতের কাছে হ'লে তিনি অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন—প্রায় প্রত্যেক বারই।

আমিও তাঁর সঙ্গে গাছ শিকার করেছি। তবে যে কোন গাছ আমি পারতুম না, আকারে-প্রকারে কিছু বড় হ'লেই আমার পক্ষে সুবিধে হ'ত, গুঁড়ির দিক্‌টাতেই আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। বৃক্ষ-শিকারে যখন এত দিন হাত পাকিয়েছি তখন ঋক্ষ-শিকারে যে একেবারে বেহাত হব না এ ভরসা আমার ছিল।

জঙ্গলে গিয়ে দেখি পাকা পাকা জামে গাছ ভর্ত্তি। জাম দেখে জাম্বুবানের কথা আমি ভুলেই গেলাম। এমন বড় বড় পাকা পাকা খাসা জাম! জিভ লালায়িত হয়ে উঠ্‌ল, বন্দুকটা একটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে দু'হাতে ঝুড়ি ভর্‌তে লাগ্‌লাম। কতক্ষণ কেটেছে জানি না, একটা খস্ খস্ শব্দে আমার চমক্ ভাঙ্‌ল। চেয়ে দেখি—ভাল্লুক!

ভালুকটা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমি যা কর্‌ছি সেও

আস্বাদতেই ব্যাপৃত। এক হাত দিয়ে জামের একটা নীচু ডালকে সে বাগিয়ে ধরেছে, অন্য হাতে নির্ব্বিচারে মুখে পুর্ছে—কাঁচা, ডাঁসা সমস্ত। আমি বিস্মিত হ'লাম বল্লে বেশী বলা হয় না, বোধ হয় আমি ঈষৎ ভীতই হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হ'ল, ভালুক-দর্শনের বাঞ্ছা একটু আগেই করেছি বটে, কিন্তু দেখা না পেলেই যেন আমি বেশী আশ্বস্ত হ'তাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের চারি চক্ষুর মিলন।

আমাকে দেখেই ভালুকটা জাম খাওয়া স্থগিত রাখ্ল এবং বেশ একটু পুলকিত বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগ্ল। আমি মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্লাম। গাছে উঠ্তে পারলে বাঘের হাত থেকে নিস্তার আছে কিন্তু ভালুকের হাতে কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। ভালুকেরা গাছে উঠ্তেও ওস্তাদ্।

অগত্যা শ্রেষ্ঠ উপায়—পালিয়ে বাঁচা। বন্দুক ফেলে যেতে দাদার নিষেধ, বন্দুকটা বগল-দাবাই করে চোঁ-চা দৌড় দেবার মৎলব করছি, দেখ্লাম সেও আস্তে আস্তে আমার দিকে এগুচ্ছে। আমি দৌড়লে সে যে আমার পিছু নিতে দ্বিধা করবে না আমি তা বেশ বুঝতে পারলাম। ভালুক জাতির ব্যবহার আমার মোটেই ভাল লাগ্ল না।

আমিও দৌড়চ্ছি, ভালুকও দৌড়চ্ছে। বন্দুকের বোঝা নিয়ে ভালুক-দৌড়ে আমি সুবিধা করতে পার্ব না বুঝতে পারলাম। যদি এখনও বন্দুকটা না ফেলে দিই তা হ'লে নিজেকেই এখানে ফেলে যেতে হবে। অগত্যা অনেক বিবেচনা ক'রে বন্দুককেই বিসর্জ্জন দিলাম।

কিছু দুর দৌড়ে ভালুকের পদশব্দ না পেয়ে ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে আমার বন্দুকটা নিয়ে পড়েছে। ওটাকে নতুন রকমের কোন খাদ্য মনে করেছে কিনা ওই জানে! আমিও স্তব্ধ হয়ে ওর কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করছিলাম।

ভালুকটা বেশ বুদ্ধিমান্। অল্পক্ষণেই সে বুঝতে পার্ল ওটা খাদ্য নয়, হাতে নিয়ে দৌড়বার জিনিস। এবার বন্দুকটা হস্তগত ক'রে সে আমাকে তাড়া কর্ল। বিপদের উপর বিপদ্—এবার আমার বিপক্ষে ভালুক এবং বন্দুক। ভালুকটা কি রকম শিকারী আমার জানা ছিল না, বন্দুকে ওর হাত অন্ততঃ আমার চেয়ে খারাপ নয় বলেই আমার আন্দাজ।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। কয়েক লাফ না যেতেই পেছনে বন্দুকের আওয়াজ। আমি চোখ কান বুজে সটান্ শুয়ে পড়লাম,—যাতে গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়—যুদ্ধের তাই রীতি কিনা। তার পর আবার দুড়ুম্! 'আবার আবার সেই বন্দুক-গর্জ্জন!' আমি দুরু দুরু বক্ষে শুয়ে শুয়ে দুর্গা-নাম করতে লাগ্লাম। ভালুক শিকার করতে এসে ভালুকের হাতে না 'শিকৃত' হয়ে যাই।

আমি চোখ বুজেও যেন স্পষ্ট দেখ্ছিলাম ভালুকটা আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আস্ছে। তার গুলিতে আমি হতাহত—অন্ততঃ একটা কিছু যে হয়েছি সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। গুলির আঘাতে না যাই ভালুকের আঘাতে এবার গেলাম! মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে জীবনের সমস্ত ঘটনা বায়স্কোপের ফিল্মের মত মনশ্চক্ষের উপর দিয়ে চলে যায় বলে একটা গুজব শুনেছিলাম। সত্যিই তাই—একেবারে হুবহু! ছোটবেলার পাঠশালা পালিয়ে আম্র-শিকার থেকে সুরু ক'রে আজকের ভালুক-শিকার পর্য্যন্ত—প্রায় চার শ' পাতার একটা মোটা সচিত্র জীবনস্মৃতি আমার মনে মনে ভাবা, লেখা, ছাপানো, প্রুফ্ কারেক্ট্ করা—এমন কি তার পাঁচ হাজার কপি বিক্রী অবধি শেষ হয়ে গেল।

জীবন-স্মৃতি রচনার পর আত্মীয়-স্বজনের কথা আমার স্মরণে এল। পরিবার আমার খুব সামান্যই—এক মাত্র মা এবং এক মাত্র ভাই—সুতরাং সে দুশ্চিন্তা সমাধা করাও খুব কঠিন হ'ল না। এক সেকেণ্ড্—দু' সেকেণ্ড্—তিন—চার—পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল কিন্তু ভালুক বেটা এখনও এসে পৌঁছল না তো! কি হ'ল তার? এতটা দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নাকি?

ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখি, ওমা, সেও যে সটান্ চিৎপাত! সাহস পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম—এ ভালুকটা তো ভারী অনুকরণ-প্রিয় দেখ্ছি! কিন্তু নড়ে না—চড়ে না যে! কাছে গিয়ে দেখ্লাম নিজের বন্দুকের গুলিতে নিজেই মারা গেছে বেচারা! বুঝলাম, অত্যন্ত মনক্ষোভেই এই অন্যায়টা সে করেছে। প্রথম দিন বৌদির ব্যবহারে সে লজ্জা পেয়েছিল, আজ আমার কাপুরুষতার পরিচয়ে সে এতটা মর্ম্মাহত হয়েছে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

বন্দুক হাতে সগর্ব্বে বাড়ী ফিরলাম। আমার জাম-হীনতা লক্ষ্য ক'রে

দাদার অসন্তোষ-প্রকাশের পূর্ব্বেই ঘোষণা ক'রে দিলাম—"বৌদির প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ভালুকটাকে আজ নিপাত করে এসেছি। কেবল দু'টো শট্—ব্যস্, খতম্।"

দাদা, বৌদি, এমন কি খুকী পর্য্যন্ত দেখ্‌তে ছুটল; আমিও চল্লাম। এবার আর বন্দুকটাকে সঙ্গে নিলাম না, পাঁচ জনে যাত্রা নিষেধ, পাঁজিতে লেখে। দাদা বহু পরিশ্রমে ও বৌদির সাহায্যে ভালুকের লেজটাকে দেহচ্যুত ক'রে এই বৃহৎ শিকারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সযত্নে আহরণ ক'রে নিয়ে এলেন। এই সহযোগিতার ফলে দাদা ও বৌদির মধ্যে আবার ভাব হয়ে গেল। আপনি আত্মদান ক'রে ভালুকটা দাদা-বৌদির মধ্যে মিলনগ্রন্থি রচনা করে গেল—তার এই অসাধারণ মহত্ত্বে সে নতুন মহিমা নিয়ে আমার কাছে প্রতিভাত হ'ল। আমার রচনায় তাকে অমর করে রাখ্‌লুম, অন্ততঃ আমার চেয়ে সে বেশীদিন টিক্‌বে আশা করি।

বাড়ী ফিরেই দাদা বল্লেন—"অমৃতবাজার পত্রিকায় খবরটা পাঠিয়ে দিই, কি বলিস্? A big wild bear was heroically killed by my young brother aged—aged কত রে?"

"আমার 'এজ্' তুমি তো জানই!" আমি উত্তর দিলাম।

"উঁহু, কমিয়ে লিখ্‌তে হবে কিনা! নইলে বাহাদুরী কিসের? দশ-বারো বছর কমিয়ে দিই, কি বলিস্?"

কিন্তু দশ-বারো বছর কমিয়েও আমার বয়স যখন দশ-বারো বছরের কাছাকাছি আনা গেল না তখন বাধ্য হয়ে "young" এই বিশেষণের উপর নির্ভর ক'রে আমার বয়সাল্পতাটা লোকের অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া গেল।

সেদিন আমার পাতে দু'-দু'টো মুড়ো পড়্‌ল, খুকী মাকে বলে রেখেছে তার মুড়োটা কাকামণিকে দিতে। আমি আপত্তি করলাম না, ভালুকের আত্মবিসর্জ্জনে যখন করি নি, খুকীর মুড়ো-বিসর্জ্জনেই বা কর্‌ব কেন? সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই, আমার ঝোলের বাটির অস্বাভাবিক উচ্চতা দেখেও দাদা ভ্রূক্ষেপ করলেন না!

ভাবের অভিব্যক্তি

আধুনিক শ্রীকৃষ্ণ

"রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজরে বারেক বাজরে!"

শ্রীকৃষ্ণ—কুমারী সীতা দেবী (বয়স পাঁচ বৎসর)
আলোকচিত্রগ্রহিত্রী—শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ

ফলাহার

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

ককু খায় কমলা, কেসুর, কিস্‌মিস,
কদলী ও কুল তরে জিভ নিস্‌পিস্।
খেঁদু খায় খরমুজ, খোবানি, খেজুর,
ভুট্টা পেলেই ভুঁদু নাচিবে প্রচুর।
পনু খায় পানিফল, পেস্তা ও পীচ,
পেয়ারা, পনস খায়, ফেলে দেয় বীজ।

আমু খায় আঙ্গুর, আতা, আনারস,
আপেল, আনার, আম অতীব সরস।
জগু খায় জামরুল, জলপাই, জাম,
ফনু ফুটি ফল্‌সাই খায় অবিরাম।
বুলু খায় বেদানা, বাদাম আর বেল,
নদু খায় নাসপাতি, নোনা, নারিকেল।

লিলি খায় লেবু, লীচু, আবার লকেট,
গন্নু শুধু পাকা গাবে ভরেছে পকেট।
সন্নু খুসি সর্দ্দায়, তুতু চায় তুঁত,
চাঁদু চাঁদ নাহি পেয়ে করে খুঁৎ খুঁৎ।
গেবু 'গাব খাব' ব'লে করে চীৎকার,
মুরু মেওয়া খেতে চেয়ে খায় শুধু মার।

জন্মদিনের উপহার

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

প্রথম দৃশ্য

রাণী। (টেলিফোনে) হ্যালো ?

সুষমা। (তারের অন্য প্রান্ত থেকে) এই, রাণী—

রাণী। আপনি কে ?

সুষমা। চিনতে পারছিস্ না ?

রাণী। আরে, সুষমা ! ভালো—তোর সঙ্গে কথা ছিলো একটা। শোন্—

সুষমা। আগে আমার কথা শোন্। আমাকে একটা বিষয়ে সাহায্য করতে পারিস্ ?

রাণী। তুই এমন ক'রে কথা বলছিস্ যেন আমি একটা বিপন্ন-ত্রাণ-সমিতি, কি ঐ গোছের কিছু।

সুষমা। ফাজলেমি রাখ্—শোন্। আজ নেলির জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যাচ্ছিস্ নিশ্চয়ই ?

রাণী। তুই যাচ্ছিস্ না ?

সুষমা। যেতে তো হবেই, সবাই যাচ্ছে। এখন সমস্যাটা—সব চেয়ে ভয়ানক, ঘোরতর, অ-স-হ-নী-য় সমস্যাটা হচ্ছে এই যে—

রাণী। যে—?

সুষমা। কী প্রেজেন্ট্ নেয়া যায় ? তুই ভেবেছিস্ নাকি কিছু ?

রাণী। তুই ভেবেছিস্ ?

সুষমা। কেবল তো ভাবছিই। ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে এখন মনে হচ্ছে ঠিক পাগল হয়ে যাবো।

রাণী। ঠিক, আমারও ঠিক তা-ই।

[একটু চুপচাপ]

সুষমা। শোন্, রাণী।

রাণী। বল্।

সুষমা। সেইজন্যই ডাকলুম তোকে। তুই কি কিছু ভাবতে পারিস্ নে ?

রাণী। আমি কতগুলো বলছি শোন্। প্রথমে, ধর্, সেই নতুন ধরণের পার্কারের পেন্সিল—ওরা বলে আইডিয়েল গিফ্ট্—

সুষমা। হ্যাঁ, সেটা তো আছেই। আর সেই আসল মরক্কো চামড়ার হ্যাণ্ড্ব্যাগ ; আর সেই ফরাসী এসেন্স্ যার নামটা উচ্চারণ করা ভীষণ শক্ত ; আর বাফ্ রঙের সিল্কের মোজা ; আর সেই ভয়ানক রকম উঁচুদরের চিঠির কাগজের বাক্স—ও-সমস্তই আমি ভেবে রেখেছি।

রাণী। কিছু ঠিক করতে পারলি নে ?

সুষমা। তোর কি মনে হয় না সবগুলোই নিতান্ত সাধারণ—এমন সব জিনিস যার কথা যে-কোনো লোকের মনে হ'তে পারে ? আর সাধারণ কিছু করতে ভারী বিশ্রী লাগে আমার।

রাণী। ভেবে দেখ্ সুষমা, সব জিনিসই তো সাধারণ।

সুষমা। তোর পায়ে পড়ি, রাণী, মিস্ বিশ্বাসের মত ক'রে কথা বলিস্ নে।

রাণী। তার চেয়েও খারাপ ক'রে কথা বলা যায়।

সুষমা। দুঃখিত। জানতুম না, তুই মিস্ বিশ্বাসের চেলা।

রাণী। যা-ই হোক্, তুই অসাধারণ কী জিনিসটার কথা ভাবলি, শুনি?

সুষমা। তা যদি ভাবতে পারতুম তা হ'লে আর তোকে টেলিফোন করতুম না।

রাণী। একটা ফুলের তোড়া নিলে কেমন হয়?

সুষমা। কি বল্‌লি? ফুল?

রাণী। শোন্। বইয়ে পড়িস্ নি যে উপহার হবে এমন জিনিস যা সাধারণ, সুন্দর, আর যা কোনো কাজে লাগে না?

সুষমা। কাজে লাগলে কি দোষ?

রাণী। বুঝছিস্ না—যে-সব জিনিস কাজে লাগে, সব কেমনতর বিশ্রী যেন—যেমন ষ্টোভ, সস্‌প্যান্—ঐ সমস্ত জিনিস। উপহার হবে এত সুন্দর যে তা কোনই কাজে লাগে না—বুঝতে পারছিস্? উপহার হবে ফুলের মত। সত্যি, ফুলের তোড়ার মত উপহার আর নেই। বেজায় সস্তা তা ছাড়া।

সুষমা। উঃ, রাণী, কি ক'রে ও-কথাটা বলতে পারলি?

রাণী। তা ছাড়া এমন ঘোরতর সেকেলে যে সবাই চমকে উঠবে।

সুষমা। এটা বলেছিস্ ঠিক।

রাণী। কি একটা বইও নিতে পারিস্। বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপহার, বইয়ের মত কিছু আর নেই। লোকে এক পাতা পড়ে, একটু হাসে, আর যে দিয়েছে তার কথা ভাবে। সব চেয়ে ভালো সুভেনির। আর তুই যে একটা বই দিবি তা অবিশ্যি কেউ ভাববে না—সবাই অবাক্ হ'য়ে যাবে।

সুষমা। তোর কথা খানিকটা ঠিক তা মানতেই হবে। আশ্চর্য্য, ফুলের তোড়া কি বই—এ-সব তো চোখের সামনেই রয়েছে। আগে ভাবি নি কেন?

রাণী। চোখের সামনে রয়েছে ব'লেই চোখে পড়ে নি বোধ হয়?

সুষমা। যা-ই হোক্, অনেক ধন্যবাদ তোকে। কী মুস্কিলে যে পড়েছিলাম তুই বুঝবি নে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পনেরো মিনিট পর]

সুষমা। কী ব্যাপার, বীণা?

বীণা। সুষমা, আজ যে নেলির জন্মদিনের পার্টি।

সুষমা। তা'তে কি হয়েছে?

বীণা। ভাবছিলাম, কী প্রেজেণ্ট্ নিলে ভালো হবে।

সুষমা। এত ভাবিস্ কেন? যে কোনো জিনিস দিলেই তো চলে।

বীণা। তা-ই মনে করিস্ যদি—

সুষমা। আমি তো তা-ই মনে করি।

বীণা। আমি করি নে। উপহার একজনের শিক্ষা ও রুচিকে প্রকাশ করে।

সুষমা। এ-সব কথা তোর মাথায় কে ঢোকায় বল্ তো?

বীণা। আমার যা মনে হয় তা-ই বললুম। আজ সমস্ত সকালটা আমি 'লেডীজ্ হোম্ জর্নলের' পাতা উল্‌টিয়ে কাটিয়েছি। বিজ্ঞাপনের মধ্যে সত্যি-সত্যি নতুন কিছু একটা পেয়ে যাবো, মনে মনে এই আশা ছিলো। কিন্তু যত জিনিস দেখলুম সব হয় একেবারে বাজে, নয় এমন দাম যে ছোঁয়া যায় না। আমি যে কী করবো কিছু ভেবে উঠতে পারছি নে।

সুষমা। শোন্, বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথম যে দোকানটা চোখে পড়ে তাতে ঢুকে প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ে সেটা কিনে আন্।

বীণা। এখন এ সব ফাজলেমি ভালো লাগছে না মোটেও। কী অবস্থা, তা যদি জানতিস্! সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত দাদার সঙ্গে তিনবার ঝগড়া করেছি।

সুষমা। এত হৈ-চৈ করবারই বা কী আছে? যা-ই বল্ না—যে দেয়, উপহারকে সে-ই তো দামী করে।

বীণা। দেখ্, দয়া ক'রে বইয়ের মত কথা বলিস্ নে। বুঝিস্ না কেন?

সুষমা। বুঝি বইকি। কি করবি তা-ও ব'লে দিচ্ছি। একটা ফুলের

তোড়া নিয়ে যা, কি একটা বই। ফুলের তোড়ার মত উপহার আর কিছু নেই—বই ছাড়া। এমন চমৎকার সেকেলে। আর কারো মাথায় আসবে না। ও ছাড়া পৃথিবীতে আর তো কিছু দেখি নে যা নতুন মনে হ'তে পারে।

বীণা। তা কখনো ভাবি নি তো!

সুষমা। ভেবে দেখ্ একবার। ফুল কোনো কাজেই লাগে না—সেটাই তার বিশেষত্ব। আর একটা বই—একটা সত্যিকারের ভালো বই—নেলি যখনই তা খুলবে, ওর মনে হবে তুই ওর সঙ্গে আছিস্। যদি এটা চাস্ যে তোর বন্ধু তোকে মনে রাখুক তা হ'লে একটা বই দে।

বীণা। বই! বই-ই তা হ'লে দেবো। বাঁচলাম। তুই আমাকে বাঁচালি, চিরকাল তোর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

তৃতীয় দৃশ্য

[আরো দশ মিনিট পরে]

বীণা। আমি বুঝতে পারি নে, রাণী, এ নিয়ে তুই এত ভাবছিস্ কেন?

রাণী। এ তো ভাবনারই বিষয়। আর, তোকে বলবো কি—আমি এমন ভাবছি, বসে-বসে ভাবছি আর ভাবছি, তবু যদি একটা কিছু পেতাম যা সত্যি-সত্যি—

বীণা। সত্যি-সত্যি কী?

রাণী। সত্যি-সত্যি অসাধারণ—বুঝলি নে?

বীণা। পৃথিবীতে অসাধারণ ব'লে কী আছে জানি নে।

রাণী। তুই কি সমস্ত জীবন বোকার মত কথা ব'লে কাটাবি?

বীণা। দুঃখিত। বুদ্ধিমানের মত এখন কী করতে পারি তা-ই বল্।

রাণী। আজ সমস্তটা সকাল আমি ভেবেছি একটা রূপোয় বাঁধানো আয়না নেবো কি সেই রঙিন বীডের মালা। তুই বলতে পারিস্, কোন্‌টা ভালো হবে?

বীণা। কোনোটাই নয়।

রাণী। তুই কি বলিস্?

বীণা। ও-সব আয়না আর বীড দিয়ে কী হবে—ও-সব জিনিস নেলির এত আছে যে রাখবার জায়গা নেই।

রাণী। ঠিক ও-কথা ভেবেই তো এতক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করছি। উঃ—কী করি? কী করি?

বীণা। শোন্, একটা বই নিয়ে যা।

রাণী। একটা বই!

বীণা। কি ফুলের তোড়া একটা।

রাণী। কী যা-তা বলছিস্!

বীণা। শোন্, যত জিনিসের কথা তুই ভেবেছিস্ কি ভাবতে পারিস্ বইয়ের মত কিছু নয়। ভেবে দেখ্, কেউ সেটা আশা করবে না।

রাণী। বাজে বকছিস্ কেন?

বীণা। কি একটা ফুলের তোড়া। এমন নিষ্প্রয়োজন—

রাণী। তুই চুপ করবি কি না বল্!

চতুর্থ দৃশ্য

সন্ধ্যা। নেলির জন্মদিনের পার্টিতে তিন বন্ধুর দেখা হয়েছে। ঘরের কোণে একটা টেবিলে প্রেজেন্ট্‌গুলো সব পরিপাটি ক'রে সাজানো। রাণী এসে টেবিলটার ধারে দাঁড়ালো, জিনিসগুলো দেখতে লাগ্‌লো। নেলির ছোট বোন বাবলি তার পাশে দাঁড়িয়ে। একটু পরে বীণা আর সুষমাও সেখানে এলো।

রাণী। সুষমা, তোর প্রেজেন্ট্ কোন্‌টা?

বাবলি। (তাড়াতাড়ি নতুন ধরণের একটা পার্কারের পেন্সিল দেখিয়ে) এইটে; ভারী সুন্দর—না?

সুষমা। (তাড়াতাড়ি) রাণী, তোর?

বাবলি। (এক জোড়া বাফ্ রঙের সিল্কের মোজা দেখিয়ে) বাফ্ রঙের মোজা দিদির ভারী পছন্দ।

রাণী। আর বীণার কোন্‌টা?

বাবলি। (রূপোয় বাঁধানো একটা আয়না দেখিয়ে) চমৎকার আয়নাটা।

রাণী। কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, বীণা—
বীণা। } [সবাই এক সঙ্গে] সুষমা, তুই না বলেছিলি—
সুষমা। রাণী, তোর সেই বই—

তিন জনেই হঠাৎ থেমে গেলো। প্রত্যেকেই একজন থেকে আর একজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

নিখিল বঙ্গীয় ঢোলক-সঙ্ঘ

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

আমাদের পাড়ার ক্ষীরমোহন দা'র সঙ্গে বোধ হয় তোমাদের জানা-শোনা নাই? অতি অমায়িক ভদ্রলোক; আয়নার মত চক্‌চকে একখানি টাক, ছোটখাট কয়েকখানা ভুঁড়ি (একটি পেটে, একটি থুৎনির নীচে এবং গোটা দুই ঘাড়ের উপর), প্রকাণ্ড বাড়ী এবং দেদার টাকার মালিক। এক কথায় অতি ভাল মানুষ।

সেদিন কাগজে পড়িলাম বিহারের ভূমিকম্পে ক্ষীরমোহন দা' বেশ একটা মোটা রকম চাঁদা দিয়াছেন, আর দিয়াছেন কোথাকার কোন্ এক লাইব্রেরীর জন্য। এই ত' চাই! টাকা তো থাকে অনেকেরই কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করে ক'জন? ভাবিলাম, ক্ষীরমোহন দা'কে একটু তোয়াজ করিয়া আসা উচিত।

ক্ষীরমোহন দা'র বৈঠকখানায় গিয়া দেখি বন্ধুবান্ধবে ঘর একেবারে গুলজার। ক্ষীরমোহন দা' চাদর গায়ে দিয়া পরম আদরে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন; ভিতর হইতে অবিরাম চা সরবরাহ হইতেছে। আমিও গিয়া আসরের খানিকটা দখল করিয়া বসিলাম।

আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ দরজা খুলিয়া কয়েক জন লোক ঘরে ঢুকিল। তাদের একজন অতি মাত্রায় মোটা—কচুরির মত ফোলা ফোলা গাল, গায়ের রং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু বেশভূষায় পারিপাট্য আছে। আর একজন

ঠিক উল্টা—যেমন ঢেঙ্গা তেমনি রোগা, গাল দুইটি যেন কেউ চড় মারিয়া মারিয়া গর্ত্ত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তারই উপর বড় বড় জুলপী নামিয়া আসিয়াছে। চুলগুলি বাবরি করা, গায়ে চওড়া কালো-পাড় চাদর। অপর কয়েক জনও যেন একটু কেমন ধারা।

ঘরে ঢুকিয়া লম্বা লোকটিই প্রথমে কথা বলিল। অত্যন্ত মোলায়েম গলায়

দরজা খুলিয়া কয়েক জন লোক ঘরে ঢুকিল।

কহিল, "আমরা ক্ষীরমোহন বাবুর সঙ্গে একটু—" ক্ষীরমোহন দা' ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আমিই ক্ষীরমোহন বাবু"। লোকটি এবার ভাবে গদগদ হইয়া নমস্কার করিতে করিতে বলিল, "বড় খুসী হলেম, বড় খুসী হলেম; সকাল-বেলাই আপনার মত দেবতুল্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। আপনার দানের কথা কে না জানে? আপনারা আছেন বলেই না দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো আছে! আপনারা—" ক্ষীরমোহন দা' তাড়াতাড়ি আরও কয়েক পেয়ালা চা আনিতে ফরমাস দিলেন।

চা পানের পর লোকটি তাদের আসিবার কারণ জানাইল। আজকাল

বিদেশী প্রভাবে পড়িয়া আমাদের দেশী সঙ্গীত-কলার আর কিছু রহিতেছে না। বলিল, "পিয়ানো, অর্গান্, ম্যাণ্ডোলিন্—এদের সঙ্গে কি আর দিশী গান খাপ খায়? সব মিলে এক অদ্ভুত জগা-খিচুরী ব'নে গেছে। এর প্রতিকার করতে হ'লে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে সেই ঢোলক-যুগে। সেই প্রাচীন আদর্শে বিশুদ্ধ ভারতীয় ছাগচর্ম্মনির্ম্মিত ঢোলকের সাহায্যে আমাদের সেই লুপ্ত কলাবিদ্যা ফিরিয়ে আনতে হ'বে। সেজন্য আমরা একটা "নিখিল বঙ্গীয় ঢোলক-সঙ্ঘের" প্রতিষ্ঠা করেছি। এর দ্বারা আমরা দেখাব যে বিশুদ্ধ সঙ্গীত কেবল একমাত্র ঢোলকের সাহায্যেই সৃষ্টি করা যায়।" একটু থামিয়া লোকটি আবার বলিল, "আমার নাম শ্রীশ্যামসুন্দর বটব্যাল, আমাদের দলের গুরু হচ্ছেন এই ইনি—শ্রীজনার্দ্দন পাণ্ডে। না না, ভয় পাবেন না, এঁর পূর্ব্বপুরুষ বিহার-বাসী হ'লেও ইনি এখন সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হয়ে গেছেন।" বলিয়া সেই মোটা লোকটিকে দেখাইয়া দিল। "ইনি বড় যে সে লোক মনে করবেন না, ইনি সেই সেকালকার গদাধর ওস্তাদের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র অর্থাৎ ছেলের ছেলের ছেলের ছেলের ছেলে। গদাধর ওস্তাদের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

ক্ষীরমোহন দা' ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন তিনি শোনেন নাই, আমরাও নাড়িলাম। বটব্যাল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "শোনেন নি? আশ্চর্য্য! গদাধর ওস্তাদ্—নবাবী আমলে যিনি গান গেয়ে এত এত জায়গীর পেয়েছিলেন—স্বয়ং বিঠলরাম তেওয়ারী যাঁর কাছে বাহাদুরী করতে এসে নাকালের চূড়ান্ত হয়েছিলেন—শোনেন নি তাঁর কথা! বিঠলরামের নামও না? আশ্চর্য্য। শুনুন তবে, সে ভারী চমৎকার গল্প—

"অনেক দিনের কথা, প্রায় দেড়শ'-দু'শ' বছর হবে। গদাধর পাণ্ডে আর বিঠলরাম তেওয়ারী দু'জনেই তখন গাইয়ে ব'লে হিন্দুস্থান-যোড়া নাম কিনেছেন। নবাব-বাদশা'রা পর্য্যন্ত তাঁদের দস্তুরমত খাতির ক'রে চলেন। বিঠলরাম ছিলেন একটু হিংসুটে; গদাধরের অত নাম তাঁর সহ্য হ'ত না—কি ক'রে তাঁকে ছোট করবেন এই চিন্তায় তাঁর রাতে ঘুম হ'ত না। এক দিন তিনি আর থাকতে না পেরে চল্‌লেন গদাধরের কাছে, তাঁকে সঙ্গীত-যুদ্ধে আহ্বান ক'রে আজ একটা

হেস্তনেস্ত ক'রে নেবেন। নিজের ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস—পাল্লায় তিনি যে নিজে জিতবেন সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। গদাধর তখন স্নান ক'রে লোটা হাতে ফিরছিলেন, বিঠলরাম গিয়ে তাঁকে পাকড়াও কর্‌লেন। তখনই, সেই মুহূর্ত্তে তাঁকে তাঁর সঙ্গে গানের পাল্লা দিতে হবে। কি করেন, অত বড় ওস্তাদ্ স্বয়ং এসে জোর করছেন, গদাধর আস্তে লোটাটা একটা পাথরের ওপর নামিয়ে রেখে সেইখানেই ঘাসের ওপর ব'সে পড়লেন। বিঠলরাম বল্‌লেন, 'বিচার পরে হবে, তুমি আগে সুরু কর গান, তার পর আমি কর্‌ব।' গদাধর খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তার পর ধরলেন টেনে একখানা রামকেলি। সে কি গান! গাছের পাতাগুলো সেই সুরের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে কাঁপতে লাগ্‌ল, নদীর জলে সুরু হ'ল জলতরঙ্গ, আকাশ যুড়ে সে যেন অদ্ভুত এক সুরের খেলা। গান থামলে গদাধর বিঠলরামকে বল্লেন, "আমার লোটাটা তুলে দাও, একটু জল খাব।" বিঠলরাম লোটা তুলতে গিয়ে দেখেন লোটা আর ওঠে না—পাথরের ভেতর সেটা একেবারে জমে আছে। গদাধর এমন গানই গেয়েছেন যে সে সঙ্গীতে অমন যে কঠিন পাষাণ সেও গলে তরল হ'য়ে গেছে, আর সেই সময় লোটাটা তার মধ্যে ডুবে গেছে। গান থামলে পাথর আবার জমে আগের মত শক্ত হয়ে গেছে, তাই লোটা আর টেনে তোলা যাচ্ছে না। গদাধর আবার বল্লেন, 'কই, লোটাটা তুলে দাও।' বিঠলরাম বল্‌লেন, 'কি ক'রে তুলি? পাথরের মধ্যে যে একেবারে জমে আছে!' গদাধর বল্লেন, 'কেন, তুমি এবার গান ধর; আমি যেমন ক'রে গান গেয়ে পাথর গলিয়ে দিয়েছি তুমিও তেমনি ক'রে আবার ও পাথর গলিয়ে দাও; পাথর গললে ও লোটা আপনি আবার উঠে আসবে।' বিঠলরামের মুখটা শুকিয়ে গেল, তবু তিনি গান ধর্‌লেন। আবার গাছের পাতা কাঁপতে লাগ্‌ল, নদীতে জলতরঙ্গ আরম্ভ হ'ল, কিন্তু কঠিন পাষাণ সে সঙ্গীতে গল্‌ল না। বহুক্ষণ বিফল চেষ্টা ক'রে বিঠলরামকে হার মানতে হ'ল, লোটা আর তিনি তুলতে পারলেন না। তখন গদাধর আবার গান গেয়ে পাথর গলিয়ে নিজের লোটা তুলে নিলেন। বিঠলরাম উঠে 'গুরু' বলে গদাধরের পদধূলি নিলেন।"

আমরা হাঁ করিয়া এই আশ্চর্য্য সঙ্গীত-যুদ্ধের কাহিনী শুনিতেছিলাম, বটব্যাল

বলিল, "আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু এ কাহিনী একেবারে সত্যি, আর সেই গদাধর পাণ্ডের প্রতিভার উত্তরাধিকারী—তাঁরই অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র স্বয়ং জনার্দ্দন পাণ্ডেকেই আমরা আমাদের এই সঙ্ঘের গুরু রূপে পেয়েছি।"

আমরা সকলেই খুব বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। এত বড় একটা ওস্তাদের দর্শন পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয় তো। বটব্যাল ক্ষীরমোহন দা'কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম কিছু ছন্দকের জন্য।"

ক্ষীরমোহন দা' অবাক্ হইয়া বলিলেন, "ছন্দ? ছন্দ-টন্দের আমি কি বুঝি? আমি তো জীবনে কোন দিন গান বা কবিতা লিখি নি!"

"আজ্ঞে, না না, ছন্দ নয়—ছন্দক। ঐ যাকে আপনারা চলতি কথায় চাঁদা বলেন। ছন্দক বল্লে কথাটার মধ্যে একটু আভিজাত্য থাকে, চাঁদা বল্লে সেটা মিইয়ে যায়।" সত্যিই তো, এ কথাটা তো এত দিন ভাবিয়া দেখি নাই। বটব্যাল তখন বলিয়া চলিয়াছে—"ভেবে দেখুন, দেশ যুড়ে একটা কত বড় আদর্শের প্রতিষ্ঠা হবে। ঢোলক-সঙ্গীতকে লোকে এত দিন কত হেনস্থা ক'রে এসেছে কিন্তু তার আসল রূপ কি হ'তে পারে জগতের সামনে আমরা তা' তুলে ধর্‌ব। আর এই মহান্ ব্রতে আপনি হবেন আমাদের পৃষ্ঠপোষক। এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কী হ'তে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু ঢোলক তো অতি অল্প দামের বাজনা, তার জন্য আবার ছন্দক তোলার কি দরকার?"

বটব্যাল হাসিয়া বলিল, "ঐ তো আপনাদের ভুল; ঢোলকের দাম কিছুই নয়, কিন্তু ভাল গান বার করতে হ'লে কি তা' ফাঁকি দিয়ে চলে? আগে ভেতরে দস্তরমত মোগলাই খানা পড়া দরকার। তেমন তেমন একখানা গমক ছাড়তে এক পো' ঘি ধোঁয়া হ'য়ে বেরিয়ে যায়, জানেন? ভাল গান আর ভাল ঘিয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ছন্দক সেই ঘি সংগ্রহের সহায়ক।

"কিন্তু আমাদের বিশ্বম্ভর বাবু তো ঐ 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়া'র রোগী, ঘি হজম করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার—তিনি তো দেখেছি যখন-তখন এখানে এসে গজাল ঠুকে যান এবং সে গজাল বেশ ভালও হয়।"

"আজ্ঞে, ওটা গজাল নয়, গজল। কবিরাজের পরামর্শ নিয়ে দেখবেন ঘি খান না বলেই তাঁর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। এক-একখানা ভাল গজল-গান বার করতে তাঁর শরীরের কতখানি চর্ব্বি খরচ করতে হয় সে খবর নেবেন একবার। কিন্তু ক্ষীরমোহন বাবু, আসল কথাটা তা' হ'লে ভেবে দেখবেন। দেশের মধ্যে কত বড় একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া হবে—কত বড় একটা—" উপস্থিত সকলের মনই কেমন একটু ভিজিয়া গেল।

পর দিন শুনিলাম ক্ষীরমোহন দা' ঢোলক-সঙ্ঘের জন্য বেশ মোটা একখানা চেক্ লিখিয়া দিয়াছেন এবং শুধু তাই নয়, তাঁর বাড়ীর একখানা ঘরও সঙ্ঘের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এক সপ্তাহ পরের কথা। নিখিল বঙ্গীয় ঢোলক-সঙ্ঘ পাড়ায় খুব জাঁকিয়া বসিয়াছে এবং ঢোলক-সঙ্গীতই যে সঙ্গীত-কলার শ্রেষ্ঠ বিকাশ তা' আমরাও ইতিমধ্যে টের পাইয়া গিয়াছি। এর সঙ্গে পাল্লা দিতে হইলে অন্য যে কোন সঙ্গীত লজ্জায় বাপ বাপ বলিয়া পালাইবার পথ পাইবে না তাহা সুনিশ্চিত। সকালে, দুপুরে, বিকালে—টিনের পর টিন ঘি আসিতেছে; সেই ঘি কড়াইএ চাপিয়া চারিধারে সুগন্ধ ছড়াইতেছে—তার পর নানা অনুপান সহ ওস্তাদ্‌দের শরীরে ঢুকিয়া খানিক পরে ঢোলকের চাঁটির সঙ্গে সুরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিপুল শব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা এবং সারারাত এই কাণ্ড! আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়িতে গিয়া এ কি বীভৎস ব্যাপারের মধ্যে পড়া গেল! ওদিকে সঙ্ঘের উৎসাহ এবং গর্জ্জন প্রত্যহই বাড়িয়া চলিয়াছে।

যখন পর পর কয়েক রাত্রি সঙ্গীতের প্রভাবে ঘুম হইল না তখন একদিন পাড়াশুদ্ধ ক্ষেপিয়া গিয়া ক্ষীরমোহন দা'র বাড়ী চড়াও করিলাম।

ক্ষীরমোহন দা'কে বুঝাইয়া বলিলাম, আর কেন দাদা, তোমার নাম তো অমর হইয়া গিয়াছেই, এবার উহাদিগকে খেদাইয়া দাও। মানি, তোমার বাড়ীতে ছেলেপুলে নাই, মেয়েছেলেও কেউ নাই, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে তো আছে! তা' ছাড়া সারাদিন গাধার খাটুনি—রাত্রিটাও জিরাইতে দিবে না? মণিরাম কুস্তি

করে, সে বলিল, "হুকুম দিন ক্ষীরমোহন দা', এক-একটার ঠ্যাং ধ'রে ঝুপ্‌ঝুপ্ ক'রে রাস্তায় ফেলে দি।" ক্ষীরমোহন দা'ও দেখিলাম বিচলিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি লোকটি বড় দুর্ব্বল, আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "সবই তো বুঝি ভাই, কিন্তু ভদ্রলোকদের কথা দেওয়া হয়েছে, এখন ওঁরা নিজেরা না গেলে কি জোর করা যায়? হাজার হোক্ ওঁরা গুণী লোক—একজন আবার স্বয়ং গদাধর পাণ্ডের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র—ওঁদের কি অমনি ক'রে তাড়ান যায়?"

"বেশ, মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বিদায় করুন।"

"তা' কি আর করি নি? কিন্তু সঙ্ঘের মধ্যে থাকলে তখন ওঁদের কথাবার্ত্তা একটু যেন কেমন হয়ে যায়—কিছু বুঝি-টুঝি না। প্রশ্ন করলে শুধু গিটকিরি দিয়ে গমক ছাড়েন।"

তখন ঠিক হইল 'বলে' যখন ভাল দেখায় না তখন 'ছলে কিংবা কৌশলে' কাজ হাসিল করিতে হইবে। মণিরাম বলিল, "বেশ, ওদের ঢোলকগুলো আজই ফুটো ক'রে রেখে আস্‌ব'খন।" ক্ষীরমোহন দা' বলিলেন, "না না, সেটাও বড় খারাপ দেখাবে।" রমেশ বলিল, "এক কাজ করা যাক্ না, ব্যাটাদের নেমন্তন্ন ক'রে খুব ক'ষে আইস্‌ক্রীম্ খাইয়ে দাও, গলা ভেঙ্গে গেলে গাইবে তখন কচু!" কিন্তু সেও বড় ব্যয়সাপেক্ষ এবং স্থায়ীও হয়ত নয়। তার পর অনেক জল্পনা-কল্পনা হইল। অবশেষে আমারই মাথায় চন্ করিয়া এক মতলব আসিয়া গেল। ক্ষীরমোহন দা'কে বলিলাম, "দাদা, ঢোলক-সঙ্ঘের দু' পাশের দু'খানা ঘর আমার কয়েক দিনের জন্য চাই। একটা তো খালি আছেই, আর একটা খালি ক'রে দেবেন। আর গোটা কয়েক টাকাও দেবেন।"

বাড়ী গিয়া চাকর ভজুয়াকে ডাকিয়া বলিলাম, "হ্যাঁরে, সেদিন তোরা যে দল বেঁধে হোলি খেলতে বেরিয়েছিলি তাদের সব একবার যোগাড় করতে পারবি? এই নে—" টাকায় কি না হয়? টাকার উপরই পৃথিবী ঘুরিতেছে, ও শূন্যটুন্য সব বাজে কথা। দেখিতে দেখিতে মন্ত্রবলে ব্যবস্থা হইয়া গেল। সেইদিনই সন্ধ্যার পর আঠারো দু'গুণে ছত্রিশটি হিন্দুস্থান-তনয় ক্ষীরমোহন দা'র বাড়ীতে ঢোলক-সঙ্ঘের দু' পাশের দু'খানি ঘরে ঢুকিল; আর ঢুকিল আঠারোটি ভাড়া-করা

ঢোলক, আঠারো যোড়া করতাল আর আঠারো বালতি সিদ্ধির সরবৎ। পাড়ার ছেলেপুলে এবং মেয়েদের সে রাত্রির জন্য মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী, বাপের বাড়ী—ইত্যাদি সুবিধামত এক-একটা বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম।

জনার্দ্দন ওস্তাদ্ তখন সবে ডান হাতের তর্জ্জনী ও বুড়া আঙ্গুলের নখ একত্র লাগাইয়া হাতখানা যথা সম্ভব বিস্তৃত করিয়া একটি গভীর 'আ—' বলিয়া টান দিয়াছেন, বটব্যাল চোখ বুঁজিয়া ঢোলকের গায়ে সবে একটি মাত্র চাঁটি মারিয়াছে, সঙ্ঘের অন্যান্য সভ্যবৃন্দ একবার করিয়া গলা খাঁকাড়ি দিয়া সবে হাঁ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে—

এমন সময়ে সহসা তুমুল বেগে আঠারোটি ঢোলক গর্জ্জিয়া উঠিল, ততোধিক

'সীতারাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম—'

জোরে আঠারো যোড়া করতাল ঝনৎকার দিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশের দু'ঘর হইতে একযোগে ছত্রিশটি কণ্ঠে অবিরাম "সীতারাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম" ধ্বনি আকাশ-বাতাস মন্থন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। পাড়ায় আমরা যে ক'জন

বাড়ী পাহারার জন্য ছিলাম—ইতিপূর্ব্বেই কানে মোম লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারও ফাঁকে ফাঁকে সেই অভূতপূর্ব্ব কলা-ধ্বনি প্রবেশ করিয়া মাথা গরম করিয়া তুলিল। চোখ বুঁজিয়া জপ করিতে লাগিলাম—"ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বুক, বাঁধ বুক।"

বলা বাহুল্য দু' ঘরের হিন্দুস্থানীদের মধ্যে রেষারেষি রাখিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল, কাজেই তাদের উৎসাহ সে রাত্রে থামিল না। তা ছাড়া ঢোলক, করতাল এবং সিদ্ধি দিয়া উহাদের ছাড়িয়া দিলে পুরস্কার না দিলেও বোধ হয় ক্ষতি হইত না। সে প্রচণ্ড উৎসাহের চাপে ঢোলক-সঙ্ঘ একেবারে পিষিয়া গেল।

ভোর বেলা ক্ষীরমোহন দা'র কাছে গিয়া দেখি ঢোলক-সঙ্ঘের দলও সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে এবং গত রাত্রের ব্যাপারের প্রতিবাদ জানাইতেছে। আমরা তাদের বুঝাইলাম উচ্চ আদর্শের কাছে তুচ্ছ আত্মস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জনই মহতের লক্ষণ। গোটা ভারত যুড়িয়া একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়াই আমাদের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা দূর করিয়া 'নিখিল বঙ্গীয়ে'র বদলে 'নিখিল ভারতীয় ঢোলক-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠার জন্যই এই চেষ্টা। এখন একটু কেমন কেমন লাগিতেছে, সপ্তাহ খানেক একত্র বাস করিলেই ও ঠিক হইয়া যাইবে।

ঢোলক-সঙ্ঘের সভ্যদের মুখ আমসীর মত শুকাইয়া গেল। "বলেন কি! ওরা আরও এক সপ্তাহ ওখানে থাকবে নাকি?" সংশোধন করিয়া বলিলাম, "না না, এক সপ্তাহ কেন, বরাবরের জন্যই ওদের ওখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।" মুখ কালো করিয়া বটব্যালের দল চলিয়া গেল।

সেই যে গেল আর তারা ফিরিল না। হিন্দুস্থানীবৃন্দকে প্রচুর ভুট্টা খাওয়াইয়া বিদায় করিয়া দিলাম। ক্ষীরমোহন দা'কে বুঝাইলাম—শাস্ত্রেই আছে বিষে বিষক্ষয়। নিজের জিনিষ সকলের কাছেই ভাল লাগে কিন্তু তার আসল রূপ বুঝা যায় যখন সেই জিনিষটাই অপরের নিকট হইতে আসে। কাজেই ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

হাঙ্গর

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

পাশের ঘরে জোর তর্ক চলিতেছিল; তার্কিক আমার দুই ভাগ্নে এবং তর্কের বিষয় হাঙ্গর-চরিত। এক ভাগ্নে বলিতেছিল, হাঙ্গরের মত লক্ষ্মীছাড়া, হিংস্র, মানুষখেকো জন্তু জলের রাজ্যে আর দু'টি নাই; অপর ভাগ্নের অভিমত হাঙ্গর অতি নিরীহ গোবেচারা জন্তু, কখনো মানুষের পেছনে লাগিতে যায় না, দুষ্ট লোকেই তার যত মিথ্যা বদ্‌নাম রটায়। সে নাকি ছাপার অক্ষরে এসব কথা পড়িয়াছে।

তর্কটার হঠাৎ যে কোন মীমাংসা হয় এমন সম্ভাবনা দেখিলাম না, বরং হাতাহাতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী আছে মনে হইল। এমন সময় শেষরক্ষা করিলেন আমাদের গোঁপাল দা। তিনি গোড়াতেই আসিয়া প্রশ্ন করিলেন "আচ্ছা, বুনো জানোয়ারদের তোমরা কোন্ দলে ফেল্‌বে? তারা মানুষ-খেকো না নিরীহ গোবেচারা?"

ভাগ্নেদের মধ্যে বয়সে বড় যেটি সে জবাব দিল, "এ আবার কেমন ধারা প্রশ্ন হ'ল? বুনো জানোয়ার বল্‌তে এক রকমের জন্তু বোঝায় নাকি? জঙ্গলে হরিণ থাকে, জিরাফ-জেব্রা থাকে, তাদের আর কিছু মানুষ-খেকো বলা চলে না! আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঘ-সিংহ-চিতাও রয়েছে—তারা আলবৎ হিংস্র।"

গোপাল দা হাসিয়া বলিলেন, "বৎস হে, হাঙ্গর সম্বন্ধেও ওই একই কথা। এক রকমের নয়, প্রায় আড়াই শ' ভিন্ন ভিন্ন রকমের হাঙ্গর আছে। তাদের মধ্যে কোন কোনটা অতি হতভাগা, মানুষ দেখ্‌লেই গেল্‌বার চেষ্টা কর্‌বে, আবার কোন কোনটা অতি 'ভাল মানুষ,' মানুষের সঙ্গে তাদের এতটুকু শত্রুতা নেই। যারা প্রথম দলের সংস্পর্শে এসেছে তাদের বিশ্বাস হাঙ্গর মাত্রেই মানুষ-খেকো, আবার যারা দ্বিতীয় দলের সাক্ষাৎ পেয়েছে তারা গলা উঁচিয়ে বল্‌বে, 'ও কথা একদম্ ভুল।'

গোপাল দা এতটুকু বাড়াইয়া বলেন নাই। মানুষ বা অন্যান্য জন্তু-

জানোয়ার যত দিন ধরিয়া ডাঙ্গায় বাস করিতেছে তার লক্ষ লক্ষ বছর আগে হইতে জলের বুকে হাঙ্গরের বাস। এই কোটি কোটি বছরে নানান্ রকমের হাঙ্গরের সৃষ্টি হইবেই তো। অবশ্য সেই আদিম যুগের বিশাল বিশাল হাঙ্গর আজকাল আর নাই, তাদের বংশধরেরা আকারে ঢের ছোট হইয়া গেছে। কোটি কোটি বছর আগে যে সব জায়গা জলে জলময় ছিল এখন তার অনেক জায়গাই শুকাইয়া ডাঙ্গা হইয়া গেছে, কোথাও কোথাও বা পাহাড় গজাইয়াছে। এই সব পাহাড়ে এখনো মাঝে মাঝে আস্তিকালের হাঙ্গরের দাঁত দেখা যায়। উঃ, সে কি দাঁত, ইঞ্চি পাঁচেক করিয়া এক একটা লম্বা, করাতের দাঁতের মত ছুঁচালো—গোড়ার দিকটাই তার ইঞ্চি চারেক। মহাপ্রভুরা লম্বায় যে অক্লেশে শ' দেড়েক ফুট পর্য্যন্ত হইতেন তা'তে আর কোন ভুলই নাই। ভগবানের উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, "হে পরম পিতা, এই অসুর-কুল নিপাত করিয়া কি উপকারই না তুমি আমাদের করিয়াছ! দুই থাকে সারবন্দী এ হেন দাঁতের এক চাপুনি খাইলে আমরা কোথায় থাকিতাম?"

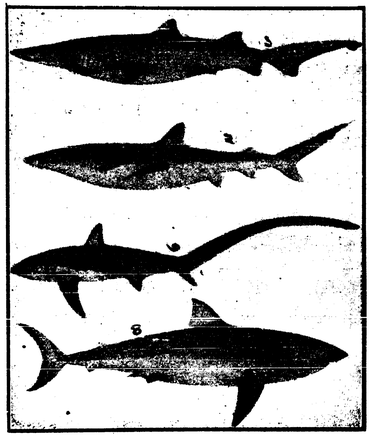

১। বেলে-হাঙ্গর (Sand shark) ২। ধূসর-হাঙ্গর (Gray shark) ৩। শিয়াল-হাঙ্গর (Fox shark বা Thresher shark) ৪। শ্বেত-হাঙ্গর (White shark) শ্বেত-হাঙ্গরই সব চাইতে ভয়ানক।

অবশ্য আজকালকার মহাপ্রভুদের দাঁতকেও আমি কিছু মাত্র খাটো করিতেছি না। বাস্তবিক, হাঙ্গরের দাঁতের মত মারাত্মক বস্তু দুনিয়ায় কমই আছে। করাতের মত ধারাল ছুঁচালো দু'পাটি দাঁতের তাদের এমনই জোর যে শুধু মাত্র একটি কামড়েই নিমেষের মধ্যে তারা আস্ত একজন মানুষকে দু'খণ্ড করিয়া ফেলিতে

পারে। তবে একটা ভরসার কথা এই যে হাঙ্গরের মুখটা তার শরীরের অনেকখানি নীচে—বুকের খানিকটা উপরে। কাজেই সোজাসুজি ভাবে কামড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়, কামড়াইবার আগে রীতিমত কাৎ হইতে হয়। মানুষের পক্ষে সটকাইবার এই মহা সুযোগ। তার কোমরবন্ধে যদি একখানা ছোরা লটকানো থাকে তবে হাঙ্গর পাশ ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে এক ডুবে তার পেছনে গিয়া তাকে ঘায়েল করা হয়তো চলিতে পারে। তবে হাঙ্গরের সম্মুখে পড়িলে অতখানি সাহস এবং বুদ্ধি ক'জন লোকের ঘটে জোগায় সেইটাই হইল কথা।

বড় জাতের হাঙ্গরের প্রচণ্ড শক্তি। সমুদ্রের উপর দিয়া বিশালকায় জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে, এক দিন নয়, দু'দিন নয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ হিংস্র হাঙ্গর তার পেছু পেছু সমান তালে সাঁৎরাইয়া চলিবে। জাহাজের অনেক খালাসী-লস্করের কেমন একটা ধারণা আছে, হাঙ্গর যদি কোন জাহাজের পেছু লইল তো বুঝিতে হইবে জাহাজের উপর কেউ না কেউ শীঘ্রই মরিতে বসিয়াছে। ব্যাপারটা অবশ্য নিছক কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। জাহাজ হইতে নানান্ জিনিষ অনবরতই সমুদ্রে পড়িতেছে তো—হাঙ্গরের পক্ষে তাহাই মহাভোজ। আর যদি দৈবাৎ পা ফস্কাইয়া কোন দুর্ভাগা জলে পড়িল তবে তো কথাই নাই।

হাঙ্গর জাতের মধ্যে মানুষের সবার বাড়া শত্রু হইতেছে শ্বেত-হাঙ্গর। আকারেও এগুলি বিরাট্—এক একটা ৩৫ হইতে ৪০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। গরমটাই এদের ধাতে বেশী সয়, কাজেই বিষুব রেখার আশপাশেই এগুলিকে দেখা যায় বেশী। বপুর দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আর এক প্রভু আছেন, তার নাম রোদ-পোহান হাঙ্গর (basking shark)। আকারে বিশাল হইলেও এরা কিন্তু 'লোক' ভাল। একে এরা কুঁড়ের হদ্দ, তার উপর দাঁতগুলি খুব ছোট ছোট হওয়ায় ক্ষুদে মাছটাছ ছাড়া অন্য কোন জানোয়ারের প্রতি এদের লোভ নাই। মানুষের বিরুদ্ধে এদের বিন্দুমাত্র বিদ্রোহ নাই, অবশ্য মানুষ যদি আগে গায়ে পড়িয়া লাগিতে না যায়। তবে মানুষের ও দোষটি পুরামাত্রায় আছে কেননা একটা 'রোদ-পোহান' হাঙ্গর শিকার করার অর্থ তার গা হইতে অন্ততঃ মণ ত্রিশেক তেল পাওয়া। এ লোভ মানুষ কি সাম্‌লাইতে পারে?

সব চাইতে বিটকেল চেহারার হাঙ্গর হইতেছে 'হাতুড়িমুড়ো' (hammer-headed shark)। এদের মাথাগুলি লম্বার চাইতে চওড়ায় তিন গুণ বেশী, দেখিতে ঠিক যেন একটি হাতুড়ি। হাতুড়ির দু' মাথায় দু'টি চোখ, অথচ মুখ অনেক নীচে—যেমন সাধারণ হাঙ্গরের হইয়া থাকে। চেহারার মত স্বভাবটাও বদ্‌খদ্ রকমের হিংস্র, মানুষের প্রতি রাগের অন্ত নাই। তবে মানুষও ছাড়িয়া কথা কয় না, জাপান এবং হাউই দ্বীপের লোকেরা ভাতের সঙ্গে হাতুড়িমুড়োর মাংস সিদ্ধ করিয়া খায়। হাতুড়ি-মুড়োর মতই হিংস্র আর এক জাতের হাঙ্গরকে বলা হয় গ্রীণল্যাণ্ডের হাঙ্গর। এদের আক্রোশটা তিমির উপরই কিছু প্রচণ্ড। তিমির মাংস পাইলে নিতান্ত হ্যাংলার মত এরা এমনই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে যে সে সময় মানুষ অনায়াসে কাছে গিয়া বর্শার খোঁচায় খোঁচায় তাদের হাঙ্গর-লীলা শেষ করিয়া দিতে পারে। এগুলিকে ২৬ ফুট পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা গেছে।

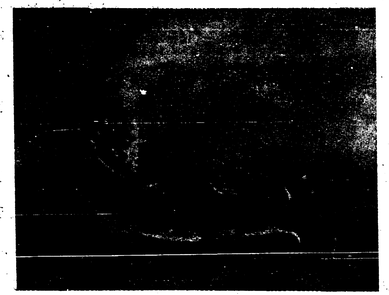

হাতুড়িমুড়ো হাঙ্গর

লেজের বহরের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই নাম করিতে হইবে শিয়াল-হাঙ্গরের (fox shark)। ২৫ ফুট লম্বা জীবটির অর্দ্ধেকই তার লেজ, আর সে লেজ দেখিতে অনেকটা শিয়ালের লেজের মত। ইংরাজীতে এগুলিকে 'থ্রেশার শার্ক'ও বলা হয়। থ্রেশ কথার অর্থ জোরে জোরে বাড়ি মারা—লম্বা লেজ দিয়া ওই কর্ম্ম করিতেই ওরা খুব পটু কি না! অবশ্য লেজের বাড়ি মারার উদ্দেশ্য এক্‌সার-সাইজ্ নয়—ছোট ছোট মাছগুলিকে ভয় খাওয়াইয়া এক জায়গায় জড় করা। তার পর হাঁ করিয়া একটি ডুব, ব্যস্ কত সহজে দিনের আহারটি সম্পন্ন হইল বল দেখি! তবু এ কথা মানিতেই হইবে যে থ্রেশার হাঙ্গরের মেজাজটা মোটের উপর মোলায়েমই এবং দাঁতগুলিও খুব মারাত্মক নয়, ছোট ছোট।

হাঙ্গর সাধারণতঃ গভীর জলই বেশী পছন্দ করে। শ্বেত হাঙ্গরকে কূলের কাছে কচিৎ-কদাচিৎ দেখা যায়, তবে তার জ্ঞাতি-ভাই নীল হাঙ্গর ডাঙ্গার কাছাকাছি আসে বটে এবং মানুষ মুখে তুলিয়া ফলার করিতেও কসুর করে না। সাঁতারুদের কাছে এ জীবটি একটি বিভীষিকা, কেননা লম্বায় ইনিও কম যান না—কুড়ি ফুট কি তারও বেশী হইতে দেখা গেছে। জেলেরা মাছ ধরার জন্য জাল পাতিয়া রাখে, নীল হাঙ্গর নির্ব্বিচারে সেই জালে ঢুকিয়া মৎস্যকুল নিপাত করিয়া দেয়। তার নিজের অবশ্য জালে আট্‌কা পড়িবার কিছুমাত্র ভয় নাই কেননা ক্ষুরের মত ধারালো ও দাঁতের কাছে জাল আর কতক্ষণ?

সব রকম হাঙ্গরের পরিচয় দিতে গেলে 'রামধনু'র এ পাতা ক'খানায় কুলাইবে না, দস্তুরমত পুরু একখানা বই লিখিতে হইবে। তবে একটা কথা এখানে আলোচনা করা দরকার—হাঙ্গরকে কি মাছ বলা চলে? চলে, তবে সে ক্ষেত্রে মাছের সংজ্ঞা (definition) একটু ব্যাপক হওয়া দরকার, কেননা অনেক বিষয়ে মাছের সঙ্গে হাঙ্গরের বেশ একটু পার্থক্য আছে। কোন হাঙ্গরের গায়েই আঁশ নাই, কেবল উপরটা খস্‌খসে মাত্র। মাছের মাথার নীচে একদিকে শুধু একটা করিয়া ফুলকা, হাঙ্গরের ফুলকা প্রত্যেক দিকে পাঁচ-সাতটা করিয়া; সেগুলি আবার মাছের মত ঢাকা নয়, একদম্ খোলা। তার পর মাছের চোয়াল এবং হাঙ্গরের চোয়ালের গড়ন সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। প্রত্যেক মাছের শরীরেই বাতাস-ভরা এক রকম থলি আছে; চল্‌তি কথায় সেগুলিকে আমরা 'পট্‌কা' বলি। হাঙ্গরের কিন্তু পট্‌কা নাই। মাছ ডিম পাড়ে এক সঙ্গে কোটি কোটি (একটা থোকার প্রত্যেকটি দানাই আলাদা আলাদা ডিম) কিন্তু হাঙ্গরের ডিম হয় মাত্র কয়েকটি, সেগুলি আবার থাকে চামড়ার মত একটা খোসায় ঢাকা। বাড়ীতে কুমড়া গাছ পুঁতিলে তা' হইতে যেমন লতান সুতা বাহির হয় হাঙ্গরের ডিমের চার পাশেও ঠিক অম্‌নি ধারা একটা জিনিষ আছে। সমুদ্রের বুকে অগুণতি শ্যাওলা আর আগাছা; সেগুলির সঙ্গে জড়াইয়া যাওয়ায় ডিমগুলি বেশ নিরাপদে থাকে, জলের টানে ভাসিয়া যায় না।

মাছ বলিয়া জানিলেও লোকে কিন্তু হাঙ্গর খাইতে বিশেষ রাজী নয়।

বোধ করি ওই নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মন ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণায় ভরিয়া ওঠে। গত মহা যুদ্ধের সময় বিলাতে খাবারের কমতি পড়ায় 'কুকুর-মাছ' নাম দিয়া এক রকম হাঙ্গরের মাংস বাজারে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু লোকে বলিতে লাগিল, 'থুঃ, একদম অখাদ্য'। দোকানদারেরা কিন্তু বলে নাম গোপন করিয়া বেচিলে কারো সাধ্য নাই উহাকে হাঙ্গরের মাংস বলিয়া চিনিতে পারে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, শ্বেতহাঙ্গরের ডানার ঝোল চীনা ভায়াদের অতি পেয়ারের বস্তু।

খাওয়ার জন্য না হোক্, অন্যান্য কারণে কিন্তু প্রতি বছর বিস্তর হাঙ্গর বধ করা হয়। তার চামড়ায় ভাল ভাল থলি হয়, ছুতোরদের ব্যবহারের জন্য উঁচু দরের 'শিরিষ কাগজ' হয়, ডানায় জিলেটিন নামে যে এক রকমের আঠাল জিনিষ আছে তাও অনেক কাজে লাগে। এই রকম আরো কত কি! শুধু এই জন্যই বছরে অন্ততঃ এক লক্ষ হাঙ্গরকে প্রাণ দিতে হয়। তা' ছাড়া জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়া ছোট্ট ছোট্ট হাঙ্গর তো আখছারই ধরিতেছে। পুরীতে 'মুলিয়া'দের ধরা এই ধরণের বাচ্চা হাঙ্গর আমরাও দেখিয়াছি।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

১৫

কাঞ্চন আলু-কাব্‌লিওয়ালার কাছে যায়—'তোমার এ সব তো বহুৎ রোজের বাসি? নইলে কিন্‌তাম দু' আনার।'

শূন্য পকেটে হাত ভরে দেয় কাঞ্চন। আলু-কাব্‌লিওয়ালা জবাব দেয়—'পহেলে থাকে তব্ দাম দিজিয়ে।' দু' আনার আলু-কাব্‌লি এ পর্য্যন্ত কোন ছেলে কেনে নি তার কাছে—উৎসাহ এবং সন্দেহের চোখে সে কাঞ্চনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু পকেটস্থ হাতকে সে অবজ্ঞা করতে পারে না।

কাঞ্চন বলে—'আরে কিন্‌লে ত দাম দেবই নিশ্চয়। পহেলা থোরা চাখনে তো দাও, দু' আনার কিনে গা।'

আলু-কাব্‌লিওয়ালা কিছুটা শাল-পাতায় ক'রে কাঞ্চনকে দেয়। কাঞ্চন ঠোঙাটা হাতে নিয়ে রোয়াকে ছেলেটির পাশে গিয়ে বসে। কোন কথা বলে না, শাল-পাতাসমেত সমান অর্দ্ধেক ভাগ ক'রে ছেলেটির হাতে দেয়। ছেলেটি একবার তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু কিছুমাত্র আপত্তি না ক'রেই আলু-কাব্‌লির অংশ গ্রহণ করে। নীরবে দু'জনের মুখ চল্‌তে থাকে।

শাল-পাতাটাকে জিভ দিয়ে সুচারুরূপে মার্জ্জিত ক'রে কাঞ্চন ফেলে দিল, বোধ হয় খুব দুঃখের সঙ্গেই। সত্যিই, ভারী চমৎকার খাবার, চেহারা দেখে যেমন সে কল্পনা করেছিল ঠিক তাই।

কাঞ্চন বুঝতে পেরেছিল যে ছেলেটি তার উপরে রেগেছে; এবং তার ধারণায় খাবারই হচ্ছে রাগ ভাঙানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। যে রাগ কথায় পড়তে চায় না, খাদ্যের মধ্যস্থতায় তা সহজেই অনুরাগে পরিণত হয়। কাঞ্চন তার একটা কারণও আবিষ্কার করেছিল, তা হচ্ছে এই—খাদ্যের দ্বারা দু'জনের মধ্যে একটা উদরের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আর হৃদয় জিনিসটা উদরের খুব কাছাকাছিই আছে কি না, তাই হৃদয়ের সম্বন্ধ হ'তেও বেশী দেরী হয় না।

কাঞ্চন মনে মনে পর্য্যালোচনা করতে লাগ্‌ল—নাঃ, উদরকে ঠিক হৃদয় বলা যায় না, সে কথা সত্যি। মেষ-শাবক বাঘের উদরে স্থান পায়, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় কি? নাঃ, উদর আর হৃদয় এক জিনিস নয় তবে উদরকে হৃদয়ের দরজা বলা যেতে পারে। আলু-কাব্‌লির দ্বারা ছেলেটির হৃদয়দ্বারে করাঘাত করতে পেরেছে বলে তার মনে হ'ল। তাই এতক্ষণ বাদে অত্যন্ত সন্তর্পণে সে কথা কইল—'তোমার নামটি কি ভাই?'

'কনক'।

'কনক? কনক ভারী চমৎকার নাম। বল কি, তোমার নাম কনক? এ রকম নাম তো এর আগে আমি শুনি নি! এমন সুন্দর তোমার নাম!'

কাঞ্চনের উচ্ছ্বাস দেখে ছেলেটি বিস্মিত হ'ল। নিজ-নামের গুণগানে কে না খুসী হয়? কাঞ্চনকে তার আবার ভাল লাগ্‌ল; মটরে না চাপুক, নামের মর্য্যাদা সে বোঝে।

কাঞ্চন বল্‌ল—'এ রকম চমৎকার নাম পৃথিবীতে আর একটিও নেই, কিংবা আর একটিই আছে কেবল।'

'কার নাম?' কনক জিজ্ঞাসা কর্‌ল। তার নামের মত চমৎকার নাম আর একটা আছে, সেজন্য সেই অপরিচিত নামধারীর ওপর মনে মনে তার ঈর্ষা হ'ল।

কাঞ্চন ব'লে চল্‌ল—'কনক ? গোল্ড্ মানে কনক, কোল্ড্ মানে ঠাণ্ডা, ওল্ড্ মানে পুরাতন, আর সোল্ড্ মানে বিক্রয় করিয়াছিল।'

ছেলেটার মাথায় ছিট্ আছে নাকি! কনক ভাবে। 'কিন্তু আর একটা নাম আমার মত আছে তুমি বল্‌লে যে?' কনক আবার জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ। সে নামটাও খুব চমৎকার।'

'কার নাম?'

কাঞ্চন বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়—'কেন, আমার! আমার নাম কাঞ্চন। কনকও যা কাঞ্চনও তাই—একই মানে।'

'তোমার নাম বুঝি কাঞ্চন? জান্‌তাম না ত।' কনক একটু ভাবতে থাকে, তার পরে বলে—'যখন এক নাম তখন আমাদের মধ্যে খুব ভাব হবে, না?'

১৬

কাঞ্চন বল্‌ল, 'চল একটু বেড়াই এধারে-ওধারে। বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।'

কনক বল্‌ল, 'আমাদের বাড়ী ত কাছেই, চল না কেন? মা খুব খাওয়াবেন। বাবার সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দেব।'

খাওয়ার কথায় কাঞ্চনের উৎসাহ হ'লেও বাবার কথায় সে দমে গেল, বল্‌ল—'বাবাদের সঙ্গে আমি আলাপ করি না।'

'কেন বাবারা কি খারাপ লোক?'

নিরাসক্ত ভাবে কাঞ্চন জবাব দিল—'সচরাচর।'

বাবাদের ওপর কনকের স্বাভাবিক পক্ষপাত ছিল, কেননা পয়সা-কড়ি বাগাতে হ'লে বাবার মত বস্তু পৃথিবীতে নেই। এই ত' সেদিনই, তাদের বয়েজ্ ক্লাব থেকে যা চাঁদা উঠেছিল তাতে আর ক্রিকেট্-সেট্ কেনা হ'ত না—কিন্তু কনক তার বাবাকে গিয়ে ধরতেই কার্ এণ্ড মহলানবিশ থেকে অমন ভাল ক্রিকেট্-সেট্ চলে এল আর চেক্‌টা বাবাই কেটে দিলেন। কাঞ্চনের কথার প্রতিবাদ কর্‌ল কনক—'বাবাদের কিছু তুমি জান না।'

অভিজ্ঞ ব্যক্তি-সুলভ ঔদাস্য-ভরে কাঞ্চন বল্‌ল—'হাড়ে হাড়ে জানি বাবা।'

'আমার বাবার তুমি কিছু জান না। আমার বাবা তেমন নন।'

'তোমার বাবা তোমাকে ক'দিন অন্তর ঠেঙান?'

'কেন, ঠেঙাবেন কেন?'

'তা না হ'লে ছেলে মানুষ হয় কখনো? চাণক্য বলে গেছে কিনা 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি'—

কি সব সংস্কৃত শ্লোক আমার মনে থাকে না; বাবা আওড়ান। মানে তার মোদ্দা এই, পাঁচ বছরের পর থেকেই ছেলে পিট্‌তে সুরু করবে ষোল বছর পর্য্যন্ত, তবেই সে ছেলে মানুষ হবে।'

কনক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—'তা না হ'লে আর মানুষ হবে না?'

কাঞ্চন মাথা নেড়ে বলে—'কি করে হবে? পিটেই ত সব কিছু হয়—লোহা পিটে হাতুড়ি হয়, সোনা পিটে গহনা হয়, তেমনি ছেলে পিট্‌লেই মানুষ হয়। মানে এটা হচ্ছে গিয়ে বাবার মত, আমি কিন্তু এ কথা বলি না। আমার ছেলের গায়ে আমি মোটেই হাত দেব না, তুমি দেখে নিও।'

'তোমার বাবা তা হ'লে তোমাকে মারেন?'

'তা কি মারতে দিই? ছেলেবেলায় যা মেরে-ধরে নিয়েছেন। তবে এখনো কয়েক বছর সাবধানে থাক্‌তে হবে আমায়।'

'কেন?'

'এখনো আমার ষোল বছর হয় নি কিনা!'

'ও! তার পর আর বাবার ভয় থাক্‌বে না বুঝি?'

'ভয় আমি করি না কাউকেই। তবে একে বাবা, তায় বয়সে বড়, কি করি বল? কিন্তু বাবার চেয়ে চাণক্য শ্লোককেই আমার বেশী ভয়, ওই শাস্তরটা বাবা মানেন কিনা! তা, তোমার বাবাও তো তোমাকে মারেন নিশ্চয়ই?'

'মোটেই না। আদর করবার সময় ছাড়া গায়ে হাতই দেন্ না।'

'বল কি! তোমার বাবা চাণক্যকে মানেন না বুঝি? হায় হায়, তুমি আর মানুষ হবে না!'

'আমার বাবা বলেন, গাধা পিটে ঘোড়া তো হয় ছাই, বরং অনেক ঘোঁড়া পিটুনির চোটে গাধায় গিয়া দাঁড়ায়।'

কাঞ্চন বিজ্ঞতার সঙ্গে বলে—'তোমার বাবার দেখ্‌ছি শাস্তর-টাস্তর পড়া নেই। সমস্কৃত উচ্চারণ করা শক্ত কিনা, সেই ভয়েই পড়েন নি'।

কনক গর্ব্বের সঙ্গে বলে—'আমার বাবা ইয়া মোটা মোটা ইংরেজি বই পড়েন।'

হতাশার সহিত কাঞ্চন উত্তর দেয়—'ম্লেচ্ছ হয়ে গেছেন? আর আশা নেই—তোমারও নেই, তোমার বাবারও নেই।'

'না থাক্ গে, আমার বাবা আমায় কত ভালবাসেন। বায়স্কোপে, ফুটবল্ ম্যাচে নিয়ে যান। আমায় কেমন গল্পের বইয়ের লাইব্রেরী ক'রে দিয়েছেন। সাইকেল্ আছে, ক্যারম্ বোর্ড্

আছে আমার। আমার জন্মদিনে কত উপহার দেন—আমার আস্‌ছে জন্মদিনে একটা ফাউণ্টেন্ পেন দেবেন বলেছেন। পনের—প-নে-র টাকা তার দাম।'

কাঞ্চনের ভারী বিস্ময় লাগে। এ রকম বাবাও পৃথিবীতে আছে নাকি! মোটেই চাণক্য শ্লোকের ধার ধারেন না, তার ওপরে কত প্রাইজ্ দেন্ আবার! আশ্চর্য্য তো! তার তো এতদিন মনে হ'ত যে বাবা নামক মরুভূমিতে মা-ই একমাত্র ওয়েসিস্ (অল্পদিন হ'ল বই পড়ে এই উপমাটা কাঞ্চন আয়ত্ত করেছে)। এ ছাড়া অন্যবিধ বাবার অস্তিত্ব কোনদিন তার কল্পনাতেও আসে নি। বাবা বল্‌তেই তার মনে হয় 'ওরে বাবা'! আর মা? মা বল্‌তেই যেন গা জুড়িয়ে যায়, মনটা মিষ্টি হয়ে ওঠে, ভাব্‌তে কেমন ভাল লাগে! কিন্তু কনকের কথা যদি সত্যি হয় তা হ'লে বল্‌তে হবে পৃথিবীতে মা'র-মত-বাবাও আছে, যাকে নিঃসন্দেহে মা'র মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে।

তবু কনকের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার রুচি হ'ল না। একটা বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে পা ঘামিয়ে? মা হ'লেও বরং কথা ছিল। রাস্তা দিয়ে দু'সারি যত লোক যাচ্ছে তাদের মধ্যে ছেলেরা বাদে প্রায় সবাই তো বাবা—কারুর না কারুর?—সব বাবাই প্রায় সমান; এদের যে কোন একজনকে দেখ্‌লেই বাবা-দর্শনের প্রয়োজন মিটে যায়। তাদের গ্রামের যে-ক'টি বাবার সঙ্গে তার পরিচয় আছে প্রত্যেকেই তাঁরা ছেলে মানুষ করতে বদ্ধপরিকর—নিজেদের ছেলের পিঠেই সেই মহৎ প্রয়াসের বিজ্ঞাপন তাঁরা জাহির করেন। কনক যা বল্‌ছে তা সত্যি হ'লে বুঝতে হবে যে ওর বাবাটিই হচ্ছে সৃষ্টি-ছাড়া। সচরাচর বাবারা ও রকম হন না।

'দেখ দেখ, একটা দড়া নিয়ে ওরা কি করছে'—বল্‌তে বল্‌তে কাঞ্চন লাফিয়ে ওঠে। পাশের খেলার মাঠে কোন য়্যাথ্‌লেটিক ক্লাবের স্পোর্ট্‌স্ চল্‌ছিল, কাঞ্চন সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। 'একটা দড়ি নিয়ে ও রকম কাড়াকাড়ি করছে কেন? খুব দামী জিনিস নাকি?'

'ওদের স্পোর্ট্‌স্ হচ্ছে।'

'সে আবার কি?'

'কেন, তোমাদের গাঁয়ের ইস্কুলে এ সব হয় না?'

'ইস্‌পোর্ট্‌স্? কখনো কানেও শুনি নি।'

'তোমাদের ইস্কুলের ছেলেরা খেলা-ধ্‌লো করে না?'

'আমরা ডাণ্ডাগুলি খেলি।'

'বাবা! কোন্ অজ্ পাড়াগাঁয়ে তুমি থাক?'—এতক্ষণে বাহাদুরি জাহির করবার সুযোগ পেয়ে কনকের মনটা খুসী হয়। স্পোর্ট্‌স্ কাকে বলে জানে না এ ছেলেটা! অদ্ভুত! 'ওরা যা করছে ওর নাম টাগ্ অফ্ ওয়ার্—বুঝলে?'

বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে কাঞ্চন বলে—'অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি। কিন্তু অত টানাটানি করা কেন? দড়ি তো কম নেই, মাঝখান থেকে কেটে দু'ভাগ ক'রে নিলেই হয়।'

লোকগুলোর নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে বিস্ময়ের আতিশয্যে কাঞ্চন এমনই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে কখন অজ্ঞাতসারে সে একজন মেমসাহেবের ক্ষিপ্রগতির সামনে এসে পড়েছে তা দেখ্‌তেই পায় নি। ধাক্কা খেয়ে কাঞ্চনের হুঁস্ হ'ল। তার রাগও হয়ে গেল ভয়ানক। চটে-মটে সে ব'লে উঠ্‌ল—'ডোণ্ট্ মেম্।'

মেম সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে বল্‌লেন—'আই য়্যাম্ সরি'।

কনকের ভারী হাসি পেল, সে বল্‌ল—'তুমি দেখ্‌ছি ইংরিজিও জান না। 'ডোণ্ট্ মেম্' আবার কি হে! মেম-টা কি কোন ভার্ব্, যে ডোণ্ট্ হবে?'

কি! কাঞ্চন ইংরেজি জানে না! এমন কথা বলে—এই পুঁচ্‌কে ছোঁড়াটা তার মুখের ওপর! কাঞ্চন তখনই মেমটির কাছে দৌড়ে গেল। পেছন থেকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—'হিয়ার্ মি, হিয়ার্ মি স্যার!'

মেমসাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন। কনক ভারী হাস্‌তে লাগ্‌ল—মেয়েছেলেকে বল্‌ছে কিনা স্যার্! কাঞ্চন জানে কাউকে সম্মান দেখিয়ে কথা কইতে গেলে স্যার্ বল্‌তে হয়, ইস্কুলের মাষ্টার মশাইদের তাই সে বলে—এতে হাস্‌বার কি আছে? কনকের ব্যবহারে কাঞ্চন অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'ল। মেমটির কাছে গিয়ে গম্ভীর ভাবে সে বল্‌ল—'আই য়্যাম্ নট্ গ্ল্যাড্।'

মেমসাহেব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—'হোয়াট্?'

কাঞ্চন তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়—'ইউ টেল্ ইউ আর সরি, বাট্ আই টেল্ আই য়্যাম্ অল্‌সো নট্ গ্ল্যাড্। ডু ইউ নো?'

মেমটি হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যায়। কাঞ্চন ভুরু কুঁচ্‌কে ফিরে আসে। কনক তখনো হাস্‌ছে। তার মুখের উপর বলে দেয়—'ইউ আর ভেরী ব্যাড্ বয়, আই ডোণ্ট্ টক্ উইথ্ ইউ।' ব'লে সটান্ সে রাস্তা পেরিয়ে সাম্‌নে যে-গলি পড়ে তার মধ্যে ঢুকে হারিয়ে যায়।

কনকের মুখের হাসি মিলিয়ে আসে। একটু আগেই যে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হবার তারা কল্পনা করেছে প্রথম সূত্রপাতেই তা যে এম্‌নি ক'রে হঠাৎ ছিঁড়ে যাবে তা ভাব্‌তে পারা যায় না। যাক্ গে—তার বয়েই গেছে। ভারী গুড্ বয় উনি—অমন একটা মুখ্যুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে বয়েই গেছে তার! বলে কিনা ডোণ্ট্ মেম্!

এ-গলি সে-গলি ঘুরে আবার বড় রাস্তায় পড়ে কাঞ্চন। আন্‌মনে সে চল্‌তে থাকে। ভারী ছোট লোক ওই কনকটা! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছেন ওর বাবা! কোনদিন ও মানুষ হবে না। ইংরেজি ও জান্‌তে পারে—মিনির দাদার মত—কিন্তু মানুষ ও

হবে না কোনদিন, এ কথা কাঞ্চন হলফ্ করে ব'লে দেবে। নিয়মিত প্রহারকে ওর নিত্যকার খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত না ক'রে ওর বাবা ভয়ানক ভুল করছেন। তাতে কাঞ্চনের আর কি এসে যাবে, কনকেরই ক্ষতি। কাঞ্চনের হাত নিস্‌পিস্ করতে থাকে—হঠাৎ তার মনে হয়, একেবারে চলে আস্‌বার আগে কনকের খানিকটা ক্ষতিপূরণ ক'রে দিয়ে এলে মন্দ হ'ত না।

ভঁক্ ভঁক্ ভোঁ—

ধূসর রঙের প্রকাণ্ড একখানা মোটর তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়্ল। ভেতর থেকে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'আর একটু হ'লে চাপা পড়তে যে! নিজেও মরতে, আমাকেও মজিয়ে যেতে। রাস্তা চল্‌বার সময় চোখ-কানগুলো থাকে কোথায়?'

আরোহীর আর্ত্তনাদ কানে না তুলে নিষ্পলকনেত্রে সে গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পরে গম্ভীর ভাবে সার্টিফিকেট্ দেয়—'ভারী চমৎকার এই গাড়ীটা! কলকাতার সব গাড়ীর চেয়ে ভাল।'

তার কথা শুনে ভদ্রলোক ভারী কৌতুক বোধ করলেন। বল্লেন—'তোমার পছন্দ হয়েছে গাড়ীখানা? চাপ্‌বে একটু?'

কাঞ্চনের লোভ হয়, প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে কিনা একবার ভাবে। সন্দেহের চোখে ভদ্রলোককে একবার দেখে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে—'আপনি ডাক্তারি করেন না তো?'

'না। কেন?'

'ডাক্তারদের আমার মোটেই ভাল লাগে না। তাদের গাড়ীতে আমি চাপ্‌তে চাই না।'

'না না—আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ ডাক্তার নেই।'

আশ্বস্ত হৃদয়ে তখন কাঞ্চন গাড়ীতে উঠে বসে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি ডাক্তারদের ভয় কর নাকি?'

'উঁহু, ভয় করি না কাউকে আমি। তবে ভাল লোক নয় ওরা যারা ডাক্তার আর যারা চা বিক্রী করে।'

ভদ্রলোক একটু অবাক্ হন, তার পরে বলেন—'যাক্ গে। ডাক্তারেরা সব জাহান্নমে যাক্, ওই সঙ্গে যত চা-ওয়ালারা। এমন কি চা-বাগানগুলো গেলেও আমার দুঃখ নেই। আমি না হয় কোকো খেয়েই থাক্‌ব। তুমি আমার একটা কাজ কর তো।'

ভদ্রলোক একখানা খবরের কাগজ মেলে কাঞ্চনের সাম্‌নে ধরলেন। গাড়ী চল্‌তে লাগ্‌ল।

'দেখ, এইগুলো পড়ে দেখ। এগুলো সব ঘোড়ার নাম। এর মধ্যে একটা নাম তুমি পছন্দ কর।'

কাঞ্চন ভারী অবাক্ হয়। এতক্ষণ তো সে ঘোড়ার সঙ্গেই যুদ্ধ করেছে—আবার এখানেও

সেই ঘোড়া! কলকাতার লোকগুলোর কি ঘোড়া ঘোড়া ক'রে মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? সে জিজ্ঞাসা করে—'কেন?'

'বল্‌ছি পরে। এই দেখ, দশটা নাম আছে। এর মধ্যে কোন্‌টা তোমার পছন্দ?'

কাঞ্চন মনে মনে ভাবে, ওই ঘোড়াগুলো—যারা তাদের তাড়া করেছিল তারা তা হ'লে নেহাৎ কেউকেটা নয়, ছাপার অক্ষরে ওদের সব নাম বেরিয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধী, সি, আর, দাশের সঙ্গে ওদের নাম ছাপা হয় কাগজে—সামান্য কথা নয়! সবিস্ময় কৌতূহলের সঙ্গে নামজাদা ঘোড়াদের মধ্যে একটাকে পছন্দ করার কাজে সে মনোনিবেশ কর্‌ল। কিন্তু কি অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম! মানে বোঝা দূরে থাক্, বানান্ করাই শক্ত। ভাগ্যিস্ ভদ্রলোক ওগুলো রিডিং পড়তে বলেন নি। অনেক ভেবে চিন্তে সে একটা নাম দেখাল।

"মাই মাদার্'? মাই মাদার্ কি জিত্‌বে? আশা কম। আচ্ছা ধর্‌ব আমি কিছু ওতে। যদি জেতে, যা পাব অর্দ্ধেক তোমার। কেমন?' (ক্রমশঃ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস্ চ্যান্সেলার

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস্ চ্যান্সেলার হইয়াছেন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর নাম নিশ্চয়ই তো মা দে র কারো কাছে অজানা নাই, তিনি বঙ্গ-গৌরব স্যর আশুতোষের পুত্র। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ধরিতে গেলে আ শু তো ষে র নিজের হাতে গড়া। শ্যামাপ্রসাদ বাবু কৃতী, পিতার কৃতী পুত্র, অল্প বয়স হইতেই পিতার ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বি লা ই য়া দিয়াছেন, এবং তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যাপারই তাঁর নখদর্পণে। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর—এত অল্প বয়সে ভাইস্ চ্যান্সেলারের মত দায়িত্বপূর্ণ, গৌরবজনক পদ এ পর্য্যন্ত আর কেউ পান নাই। ইহা হ ই তে ই তাঁর বিরাট্ কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই পদ-প্রাপ্তিতে আজ বাঙ্গালীমাত্রেই আনন্দিত।

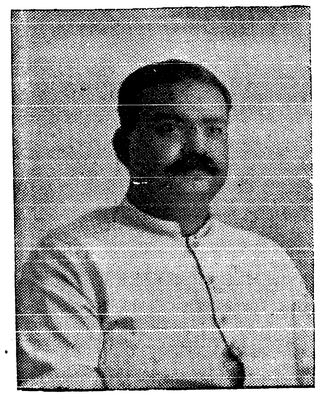

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

খেলাধূলা

(শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

গোলবারে তোমাদের কল্‌কাতার ফুটবল্ লীগ্ সম্বন্ধে কিছু বলেছি, কিন্তু সব টিমের কথা বলা হয় নি, এবার বাকীগুলির কথা বল্‌ব।

লীগে প্রথম হ'ল মহামেডান স্পোর্টিং, তার পর মোহনবাগান ও ডালহৌসী একত্রে, এবং তার পর কে-আর-আর ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে। খানিকটা উন্নতি কে-আর আর দেখিয়েছে বলতেই হবে, কারণ গত বছর তারা সপ্তম হয়েছিল। তাদের ইয়ংই খেলেছে ভাল, সব চেয়ে বেশী গোলও দিয়েছে—১২ খানা। তারা তিন বছর কল্‌কাতায় আছে, মোহনবাগানকে একবারও হারাতে পারে নি; কিন্তু এবার দ্বিতীয় বারে মোহনবাগানকে অতি সহজে ৩-০ এ হারিয়েছে।

তার পর ডারহাম্‌স্। দু' বছর আগেকার ডারহাম্‌সের সঙ্গে আজকের ডারহাম্‌সের কিছুরই মিল নেই—শুধু ওই নামটা ছাড়া। লীগের প্রথম দিকে ডারহাম্‌স্ নাম দিয়ে যারা খেলছিল তারা কালীঘাটের কাছে ৪-০ খেয়ে বস্‌ল। এতে বোধ করি তাদের কর্ত্তৃপক্ষের হুঁস হ'ল; শিলং থেকে ম্যাকেঞ্জী, রিড্‌ল্, গোল্ডস্মিথ্ প্রভৃতিকে তাঁরা নিয়ে এলেন। তারা এসে পর পর তিনটে ম্যাচে জিত্‌ল, সকলে ভাব্‌লে ডারহাম্‌স্ তার লুপ্তপ্রায় সম্মান আবার ফিরিয়ে আন্‌বে, কিন্তু কোথায়? পর পর এরিয়ান্স, মোহনবাগান আর হাওড়ার কাছে পরাজিত হ'য়ে তারা তাদের লীগ্ পাবার আশা নষ্ট করলে।

হাওড়া ইউনিয়ন্ উন্নতি করেছে আশাতীত রকমের। তারা আগের বছর অতি কষ্টে প্রথম বিভাগে রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এবার তারা যা খেলা খেলেছে তাতে সত্যিই আশ্চর্য্য হবার কথা, বিশেষতঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধে। তারা প্রথমার্দ্ধে মোটে সাতটি পয়েণ্ট করেছিল, কিন্তু পরের দিকে করেছে ১৩। তাদের স্পিক আর এ, পাল ভাল খেলেছে। শেষার্দ্ধে তারা মোহনবাগান, ডারহাম্‌স্ প্রভৃতিকে হারিয়েছে। তবু হাওড়ার আসল খেলোয়াড় পদ্ম বাঁড়ুয্যে তখন সাউথ্ আফ্রিকায়।

প্রতিবারের মত এবারও কাস্‌টাম্‌স্ খেলেছে এবং তার বাঁধা নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই এক অদ্ভুত টিম্, সেই তার চির কালের নীল্, জার্ডিন আর সিম্যান, কিন্তু দিব্যি ২০টি খেলে ১৯টি পয়েণ্ট করেছে। সব থেকে আশ্চর্য্য খেলা হ'ল এদের দ্বিতীয় বারে মহামেডান স্পোর্টিংএর বিরুদ্ধে; সারাক্ষণ এক গোলে জিতে এসে, খেলা শেষ হবার ২ মিনিট আগে এক আউট শট্ করতে গিয়ে তাদের অভিজ্ঞ, পুরানো গোলকীপার জার্ডিন বল্ দিল মেরে প্রায় একেবারে রসিদের পায়ে তুলে—আর তার পরই সবাই বল্ দেখ্‌লে গোলের মধ্যে।

ইষ্ট বেঙ্গল আর বছর অল্পের জন্য লীগ্ হারিয়েছে, কিন্তু এবার অতি অল্পের জন্যে নাম্‌তে নাম্‌তে বেঁচে গেছে। কেন তা বলা শক্ত, নামকরা খেলোয়াড় তাদের দলে এগার জনই, কিন্তু তবু ও রকম কেন যে খেল্‌ল—তা আশ্চর্য্য। ইষ্ট বেঙ্গলে দু'টি লোকের নাম করা যায়—নূর মহম্মদ আর তালুকদার। ছোট্ট তালুকদার কবে থেকে যে একই ভাবে প্রাণ দিয়ে ক্লাবকে রক্ষা করে আস্‌ছে—তার ঠিক নেই। আর সব যারা খেল্‌ছে, তাদের নাম আছে কিন্তু খেলা নেই।

ক্যাল্‌কাটার এবার ইষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে সমান পয়েণ্ট হয়েছে। ক্যাল্‌কাটা আর সে ক্যাল্‌কাটা নেই, এখন তার লীগ্ নেওয়ার কথা স্বপ্ন বলে মনে হয়; এখন সে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে দ্বিতীয় বিভাগের হাত থেকে রেহাই পেয়েই খুসী। এ বছর যেমন লীগ্ কে নেবে এই নিয়ে তিন-চারটে দলের মধ্যে খুব প্রতিযোগিতা চল্‌ছিল, তেমনি কে নেমে যাবে তা নিয়েও আরো বেশী প্রতিযোগিতা ছিল। ক্যাল্‌কাটা হচ্ছে তার মধ্যে একজন। গোল্ড এসেই যেন ক্যাল্‌কাটার অবস্থা অনেকটা ঘুরিয়ে দিল; আর তা ছাড়া জল-বৃষ্টিও অনেক সুবিধে ক'রে দিল।

কালীঘাট আর বছর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল—প্রথম বিভাগে উঠেই লীগ্ নেবে বলে, কিন্তু এবার দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাবে বলে চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। তবে খুব বেঁচে গেছে এ যাত্রা, প্রায় কানের পাশ দিয়ে তীর গেছে বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ যে সব চেয়ে নীচে হয়েছে অর্থাৎ এরিয়ান্স, তার সঙ্গে কালীঘাটের মাত্র ২ পয়েণ্টের তফাৎ। কালীঘাটে এবার দু'জন ফিরিঙ্গী খেলেছে—কিং ও জ্যাক্‌সন্। শেষ খেলায়, মহামেডান স্পোর্টিংএর সঙ্গে আর একজন ফিরিঙ্গী খেলে, তার নামও জ্যাকসন্—গোলে খেলেছিল। এই ফিরিঙ্গীদ্বয় কালীঘাটকে নামার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অবশ্য এত ক'রেও এরা গোল খেয়েছে সব থেকে বেশী—৩৫ খানা। নন্দ তাদের একমাত্র নাম করার মত খোলোয়াড়। অবশ্য কালীঘাটের তিন তিনটে আর বছরের প্লেয়ার নেই—অকিল আমেদ, মির্জা আর হীরা দাস।

এরিয়ান্স এবার সব থেকে নীচে হয়েছে—কিন্তু নাম্‌বে কিনা ঠিক নেই; কারণ তারা তাদের তিনটে আসল বড় গুঁড়ি পাঠিয়েছে সাউথ্ আফ্রিকায়—ভারতীয় দলের হ'য়ে খেলবার জন্যে—ছনে মজুমদার, শিশির চক্রবর্ত্তী আর পণ্টু গাঙ্গুলী। যদি একটা টিমের ব্যাক্, সেণ্টার হাফ্ আর সেণ্টার ফরওয়ার্ড্ যায়, তা হ'লে থাকে কি? কিন্তু তা ছাড়াও তারা যে খেলেছে—তা প্রাণহীন—উৎসাহশূন্য। শেষ খেলায় কে-আর-আর-এর বিরুদ্ধে শুধু শুধু ৬-০ খেয়ে বস্‌ল।

ঐ ভাঙ্গা টিমের মধ্যে এস, দে ই ভাল খেলেছে। বেচারী দুখীরাম বাবুর টিমের দশা দেখলে দুঃখ হয়!

আই-এফ্-এ শীল্ড্

এবারকার আই-এফ্-এ শীল্ড্ খেলা হ'ল অসম্পূর্ণ। ডারহাম্‌স্ আর কে-আর-আর—দুই-ই

এখানকার টিম—ফাইনালে উঠেছিল। একদিন খেলাও হয় কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারলে না। তার পরই হঠাৎ শোনা গেল তারা দু'দলই আর খেল্‌বে না—'উইথ্‌ড্র' ক'রে নিল। শীল্ড তাই কেউই পেল না। কিন্তু তাদের না খেলার কারণ কি? প্রথম দিন শীল্ড ফাইনালে রেফারী পঙ্কজ গুপ্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী খেলিয়েছিল তাই তারা এ রকম রেফারীর পরিচালনায় খেলতে নারাজ। কিন্তু আমরা তাদের এ কৈফিয়ৎ ঠিক বলে মান্‌তে পারি না, কারণ রেফারীর অল্পবিস্তর ভুল হ'য়েই থাকে, আজ প্রথম নয়; অনেক রেফারীই অনেক বড় খেলা নষ্ট করেছে। এখন, ফাইনালের কথা রেখে, প্রথম বা দ্বিতীয় রাউণ্ডের কথা বল্‌ব, যেখানে আমাদের পরিচিত ভারতীয় দলের সব শেষ হ'য়ে গেছে।

প্রথম রাউণ্ডে অধিকাংশই বাজে টিম ছিল—শুধু ই, বি, আর ছিল ভাল; তারা দিনাজপুরের ওয়াই-এম্ ইউনিয়ান্‌কে হারায়।

আসল খেলা দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে সুরু হ'ল। প্রথম দিন খেলা হয় এরিয়ান্সের সঙ্গে লয়াল রেজিমেণ্টের। এরিয়ান্স তার এ বছরকার ফর্ম্ম দেখাতে কসুর করলে না—৮ গোল খেয়ে। সেই দিনই খেলা ছিল মহামেডান স্পোর্টিংএর সঙ্গে কে-ও-ওয়াই-এল্‌-আইএর। প্রথম দিন ড্র রেখে মহামেডান স্পোর্টিং দিলে হারিয়ে। সকলেই আশা করতে লাগ্‌ল, এবার তারা শীল্ডেও কিছু ক'রে বস্‌বে। কিন্তু হায়, কোথায়! একেবারে রিক্স চাপা পড়্‌ল—ই, বি, আর-এর কাছে হেরে। ই-বি-আর দিনাজপুরকে হারাবার পর দ্বিতীয় রাউণ্ডে চেসায়ারকে হারায়—এবং তৃতীয় রাউণ্ডে প্রথম বিভাগের লীগ্‌-বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিংকে হারালো—যদিও তারাও এবার লীগ্‌-বিজয়ী হয়েছে—দ্বিতীয় বিভাগের। এদের সেণ্টার ফরওয়ার্ড নিউম্যান্ সব থেকে ভাল খেলেছে এ বছর। সে যে খেলাতে নেমেছে, প্রায় সব খেলাতেই গোল দিয়েছে। ই-বি-আর চতুর্থ রাউণ্ডে লয়াল্‌সের কাছে হার্‌ল। ই-বি-আর-এর খেলা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। তার পর দিন খেলা ছিল মোহনবাগানের—ব্ল্যাক্ ওয়াচের সঙ্গে। গতানুগতিক প্রথা অনুসারে মাঠ বিশেষ খারাপ থাকায় তারা যাচ্ছে-তাই ভাবে হেরে গেল। ব্ল্যাক্‌ওয়াচ্ খেলেছিল মোহনবাগানের থেকে শতগুণে ভাল। তারা নাকি ডারহাম্‌সের জায়গায় কল্‌কাতায় থাক্‌বে। অবশ্য তারা পরের রাউণ্ডেই কিংস্ রেজিমেণ্টের কাছে হেরে গেল। ইষ্ট বেঙ্গলও সেদিন তার বছরকার মত শেষ খেলা খেলে নিল—কে-আর-আর-এর বিরুদ্ধে। বিশেষ পরিচিত টিমের কাছে অমন ক'রে হারা কিছুতেই ঠিক হয় নি। তার পর দিন উয়ারীর সঙ্গে ক্যালকাটার খেলা ছিল। উয়ারী প্রথমে বেশ ভালই খেলছিল, কিন্তু হঠাৎ মিঃ রেন্ (বৃষ্টি) এসে ক্যালকাটাকে বিশেষ সাহায্য করলে। উয়ারী গেল হেরে। ক্যালকাটা উঠেছিল চতুর্থ রাউণ্ড পর্য্যন্ত, তাদের খেলাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ তাদের ফর্ম্ম শীল্ডে অনেক ভাল দেখা গিয়েছে। হাওড়া-

ইউনিয়ান্ সেই দিনই ইষ্ট ইয়র্কের কাছে হেরে গেল। ইষ্ট ইয়র্ক্ অবশ্য অনেক দূর উঠেছিল—সেমি ফাইনাল পর্য্যন্ত।

* * *

শীল্ডে মিলিটারী দলের মধ্যে অনেক ভাল টিমই এসেছিল, অনেকে অনেকের ওপরই আশা করেছিল—শ্রপ্‌শায়ার, ডি-সি-এল-আই, ব্ল্যাক্‌ওয়াচ্, কিন্তু কিছুই হ'ল না, ডারহাম্‌স্ আর কে-আর-আর উঠ্‌ল ফাইনালে!

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

কালিম্পং

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

কোলাহলমুখরিত কলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে যখন পাহাড়ী দেশ কালিম্পংএ এসে নামলাম তখন কবির কল্পনাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে হ'ল। কী সুন্দর দৃশ্য! ষ্টেশনের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা নদী, কী তার স্রোত! নদীর পাশেই রেল লাইন—অজগরের মত লম্বা হয়ে গেছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে তার পাশের মনোহর দৃশ্যের দিকে তাকালে যে কবি নয় তারও কবিতা লিখতে ইচ্ছা হয়। ষ্টেশন থেকে সহর দশ মাইল। শুনেছিলাম এখানকার অরুণোদয় এক অপূর্ব্ব বস্তু, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তা দেখা হয়নি, কেননা প্রায় রোজ-ই ভোরবেলা সমস্ত সহরটা থাকৃত কুয়াসায় ঢাকা।

মুসুরীর নীচে যেমন ডেরাডুন, দার্জ্জিলিংএর নীচে তেমনি শিলিগুড়ী। কালিম্পং যেতে হ'লে এখানেই গাড়ী বদল ক'রে ছোট রেলগাড়ীতে চড়তে হয়। ছোট্ট সহর কালিম্পং, কিন্তু কী চাঞ্চল্যের সাড়া এখানকার বাসিন্দাদের বুকে!

এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের তিনটে জাত—ভুটিয়া, লেপচা আর নেপালী। দু'-এক ঘর বাঙ্গালী, ইংরাজও আছেন অবশ্য, কিন্তু তাঁরা স্থায়ী বাসিন্দা নন। স্ত্রী-পুরুষের প্রধান ব্যবসা সূচীশিল্প। মেয়েদের তৈরী রেশমী শাল দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। এখানকার সকলের আকর্ষণী বস্তু হচ্ছে লামাদের মন্দির। আর একটা মজার জিনিষ "রোপ ওয়ে"—শূন্যে মোটা তারের ওপর দিয়ে এক রকম ট্রলী বিশেষ, মালপত্র বহন করে।

এখানে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। বাজার ক'রে সুখ আছে। তরী-তরকারী খুবই সস্তা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভুট্টা এক পয়সায় দশটা, কমলা লেবু দিয়ে (শুন্‌লে অবাক্ হবে) লামাদের ছেলেরা বল খেলে। একদিন শুনলাম বাজারে ভাল মাছ এসেছে, গেলাম। অনেক খুঁজে দোকানদার দু'টি মাগুর মাছের বাচ্চা বের করে দিল। হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব ভেবে পেলাম না। চাও খুব সস্তা।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সেবার কালিম্পং ত্যাগ কর্‌তে হয়েছিল।

কত তারিখ

(শ্রীশকুন্তলা সেনগুপ্তা)

রাণী—এই উষা, আজ কত তারিখ জানিস্?
উষা—ঠিক জানি না তো; কেন, ঐ খবরের কাগজটায় তারিখ দেওয়া আছে, দেখ না।
রাণী—দূর বোকা, ওটা তো কালকের খবরের কাগজ!

"যেখানে বাঘের ভয়
সেখানেই সন্ধ্যা হয়।"

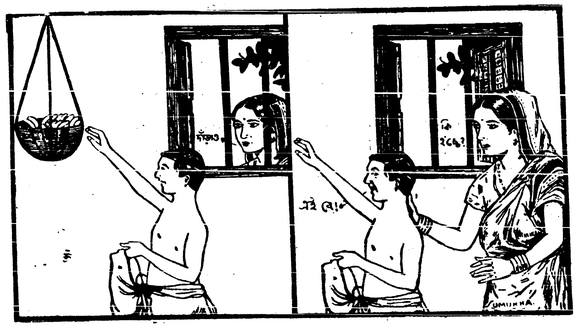

শিল্পী—শ্রীসুমুখনাথ মিত্র (গ্রাঃ নং ১৪২১)

...সন্দেশ

জগদ্বিখ্যাত সন্তরণ-বীর প্রফুল্ল ঘোষের নাম দেখিবার জন্য সেখানকার স্কুল-কলেজ ছুটী তোমরা সবাই শুনিয়াছ। সম্প্রতি ঢাকায় দেওয়া হইয়াছিল।

সন্তরণ-বীর প্রফুল্লচন্দ্র

গিয়া প্রফুল্লচন্দ্র সাঁতারের আর এক কসরৎ দেখাইয়াছেন। হাতে হাতকড়া লাগাইয়া তিনি একাদিক্রমে ৫৭ ঘণ্টা ৩ মিনিট সাঁতার কাটিয়াছেন। তাঁর এই অদ্ভুত বাহাদুরী

* * *

কয়েক মাস আগে তোমাদের খবর দিয়াছিলাম, এসিয়ার এক মহা-বীর—এড্‌মিরাল্ টোগো—সাতাশী বছর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। আর সেদিন ঠিক সাতাশী বছর বয়সেই বর্ত্তমান ইয়োরোপের বীরাগ্রগণ্য, জার্ম্মেনীর প্রে সি ডে ণ্ট্ ফন্ হিণ্ডেনবার্গ্ পৃথিবী হইতে চির-বিদায় নিয়াছেন।

১৯১৪ সনে ইয়োরোপে যুদ্ধের আগুন জলিয়া উঠিয়াছে, জার্ম্মেনীকে তখন দুই হাতে দুই দিকে লড়াই করিতে হইতেছে—পূব দিকে প্রবল পরাক্রান্ত রুষিয়া, পশ্চিমে পৃথিবীর দুই মহাজাত, ইংরাজ আর ফরাসী। রুষিয়া প্রায় জার্ম্মেনীর ঘাড়ে আসিয়া পড়ে পড়ে, জার্ম্মান্ সে না প তি রা সে দি কে মোটেই সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। তখন তলব পড়িল এক সাতষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধের, তাঁর নাম ফন্ হিণ্ডেনবার্গ্। ভদ্রলোক তার অনেক আগেই সৈন্যবিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন—অবশ্য বেশ সুনামের সঙ্গেই। রুষিয়ার বিরুদ্ধে তাঁকে করা হইল সেনাপতি।

তার পর কি হইল? জগৎ দেখিল এক অপূর্ব্ব রণকৌশল, এক অভাবনীয় রণ-প্রতিভা। দেখিতে দেখিতে রুষিয়ার বিপুল-বাহিনী ছিন্নভিন্ন, ছাতুছাতু হইয়া গেল। সমস্ত জার্ম্মেনী হিণ্ডেনবার্গের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি গড়াইয়া 'ফাদার হিণ্ডেনবার্গ্' শব্দে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল।

তার পর হিণ্ডেনবার্গ্ আসিলেন জার্ম্মেনীর প্রধান সেনাপতি হইয়া—পশ্চিমে ইংরাজ, ফরাসী, বেল্‌জিয়ান্ প্রভৃতির বিরুদ্ধে। এ যেন সপ্তরথীর বিরুদ্ধে একা অভিমন্যুর অস্ত্রধারণ। সে কি অসীম ক্ষাত্রতেজ, কি অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্য! শত্রুমিত্র সকলেই ভাবিতে লাগিল এ কি দ্বিতীয় নেপোলিয়নের উদয় হইল নাকি! "হিণ্ডেনবার্গ্-লাইন্" শুধু দুর্ভেদ্য নয়, অভেদ্য। শেষে আমেরিকাও যুদ্ধে নামিলে পর জার্ম্মান্ জাতিকে অর্থের কষ্টে, খাবারের অভাবে সন্ধিভিক্ষা করিতে হইল বটে, কিন্তু লড়াইয়ে হিণ্ডেনবার্গ্ হারেন নাই, সে অটল পাহাড় শেষ পর্য্যন্ত অটলই রহিয়া গিয়াছিল। গত মহাযুদ্ধে এত বড় নাম আর নাই।

যুদ্ধের পর জার্ম্মানীর রাজা কাইজারকে সরিতে হইল, দেশে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল। ১৯২৫ সনে দেশের লোকে ধরিল—তাঁকে প্রেসিডেণ্ট্ হইতে হইবে। দেশের ডাক হিণ্ডেনবার্গ্ কখনো অবহেলা করেন নাই, ৭৮ বছরের বৃদ্ধ রাজ্যশাসনের গুরুভার হাসি-মুখে মাথায় তুলিয়া নিলেন। অত বড় যোদ্ধা, কিন্তু দেশের কর্ত্তা হইয়া তিনি ধরিলেন শান্তির পথ। তিনি বলিতেন, যুদ্ধ কি জিনিষ সে যে জানে সে শান্তির জন্য লালায়িত হইবেই। হিণ্ডেনবার্গের অতি বড় শত্রুও তিনি যে শান্তির পূজারী ছিলেন না, এ কথা বলিতে পারিবে না। এ মহাবীরের জীবন-কাহিনী শীঘ্রই একদিন তোমাদের শুনান হইবে।

* * *

কত রকম রকম খেলাই না নিত্য বাহির হইতেছে! ফুটবল্ তোমরা সকলে পা দিয়াই খেল, কিন্তু সাইকেল চাপিয়া ফুটবল্ খেলার কথা শুনিয়াছ কি? ছবিতে দেখ, একদল আমেরিকান্ সাহেব কেমন সাইকেলে চড়িয়া ফুটবল্ খেলিতেছেন। বল্ এ খেলায় পা দিয়া মারা হয় না, সাইকেলের সম্মুখের চাকা

সাইকেলে চড়িয়া ফুটবল্ খেলা

দিয়া ঠেলিয়া লইয়া গোল দিতে হয়! বলা বাহুল্য এ খেলায় বাহাদুরী দেখাইতে হইলে সাইকেল চালনায় খুব ওস্তাদ্ হওয়া দরকার, নচেৎ পদে পদে আঘাত পাইবার আশঙ্কা আছে।

* * *

বড়লোকের দেশে সবই অদ্ভুত কাণ্ড! প্যারিস্ সহরে কুকুরদের জন্য একটা হোটেল তৈরী করা হইয়াছে। কুকুরের উপযোগী সমস্ত রকম উপাদেয় সামগ্রী এই হোটেলে সর্ব্বদা মজুত থাকে।

* * *

আফ্রিকা মহাদেশ বড় বিচিত্র জায়গা। এখনও সেখানকার বহু অংশ মানুষের অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। যে অংশে মানুষের বসতি সেখানেও এখন নানা রাজার রাজত্ব। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে দেশটাকে হাজার ভাগ করিলে তার ৩৬৬ ভাগ পড়ে ফরাসীদের অধিকারে, ৩৪৮ ভাগ ইংরাজদের অধিকারে, ৮১ ভাগ বেল্‌জিয়াম্-বাসীদের অধিকারে, ৬৯ ভাগ পর্টুগীজ্‌দের অধিকারে, ৩১ ভাগ মিশরীয়দের অধিকারে, ৩১ ভাগ আবিসিনিয়ান্‌দের অধিকারে, আর ১২ ভাগ পড়ে স্পেনীয়দের অধিকারে। তা ছাড়া বাকী অংশগুলিকেও নানা দেশের লোক শাসন করে—সেখানকার স্থানীয় রাজাও অবশ্য তাদের মধ্যে অনেক আছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

একবার প্রথম দিক্ হইতে একটি শব্দ, আর একবার শেষ দিক্ হইতে একটি শব্দ—এমনি ভাবে পড়িয়া গেলেই চিঠিখানা পড়া যাইবে। যথা—

মণ্টু, সমস্ত খবর এই সঙ্গে পাঠাইলাম। খুব চুপে চুপে কাজ সারা চাই, নচেৎ বুঝিব তুমি কোন কর্ম্মেরই নও। সুশীল যেন কিছু জানিতে না পারে, আর ভোলাকেও পূর্ব্বে কিছু জানাইবার প্রয়োজন নাই। কি জানি বাপু, কখন কি ভণ্ডুল বাধাইয়া বসিবে! উহার অসাধ্য কিছুই নাই। তোমার চিঠি পাইলে এখানকার ব্যবস্থা হইবে। ইতি শরৎ।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ); সুনীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর); রথীন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা), সুধীরচন্দ্র দাস (ভবানীপুর); জিতেন্দ্রনাথ দাস (জলপাইগুড়ি); জন, রেম, পিন, কুঙ্কুম, বাদল (মালদহ); নারায়ণ, সোমনাথ, অরুণ (পুরুলিয়া); সমর চৌধুরী (কুমিল্লা); চন্দ্রশেখর, বীণা, রথী, যূঁই, ছায়া, আলো, বেণু প্রভৃতি (জামালপুর); অজয়কুমার দাস, অরুণা দাস, গীতা হাজরা (বালিগঞ্জ); এম্, মোতওয়াল্লী, এম্ আতিয়ার্ (খুলনা);

রমা রায়, রমা নন্দী, ভূপতি কাকা, আশু বাবু, ছোড়দি, বিজু, রঞ্জি প্রভৃতি (সিমলা) ; স্বমুথনাথ মিত্র, রাণী, হরি, বেণু, ভানু (দিনাজপুর) ; মুকুল, সন্তোষ, উমা, শিবু, দীপু, আরতি (কালিঘাট) অরুণকুমার গুপ্ত (রামপুর) ; রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নমিতা (সুন্দরঘাট—মির্জ্জাপুর) ; ছোড়দি, মেজদি, সেজদি, দিদি, আদিত্য, অনন্তকুমার ওহদেদার (কাশীধাম) ; রেণু, অরুণ, মণি, অরুণা, নটু, গোরা, মিনা প্রভৃতি (ভবানীপুর) ; শেফালিকা রায় চৌধুরী (বালিয়াটী) ; গৌরাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র দাস (বজ্রযোগিনী)।

যাঁহারা নিয়ম ধরিতে পারেন নাই কিন্তু প্রায় শুদ্ধ উত্তর দিয়াছেন—

অপর্ণা, অশোক, দীপিকা, অসীম (গিরিডি) ; টুটু, মিনু, শান্তি ঘোষাল (লেকপল্লী) ; রেণু, অরুণ, কালা কামাখ্যা, নটু, গোবরা, পুঁটু (ভবানীপুর) ; নিমুদা, গণশুদা, নানকু, সতু, পুটুকা, নীরেনদা, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রভৃতি (গৌহাটী) ; দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর) ; প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ) ; যামিনীকান্ত মণ্ডল (বাবুঘাট)।

নূতন প্রশ্ন

রমেশের দোকানে ৯টি বাক্স আছে। প্রত্যেক বাক্সের উপর ১, ২, ৩……৯ এই ভাবে নম্বর দেওয়া। সেদিন রমেশের মাথায় খেয়াল চাপিল দোকানটা একটু সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখা উচিত। অনেক ভাবিয়া সে বাক্সগুলিকে এইভাবে ৫ ভাগে সাজাইয়া রাখিল—

৭ ২৮ ১৯৬ ৩৪ ৫

৭ অর্থাৎ ৭নং, ২৮ অর্থাৎ ২ নং ও ৮নং একত্র, ইত্যাদি। এমন সময়ে রমেশের বন্ধু ক্ষিতীশ আসিয়া হাজির। সে দেখিয়া বলিল, "সাজানো মন্দ হয় নি কিন্তু আর একটু কায়দা করা যায়। তুমি যে পাঁচ ভাগ করেছ তার ১ম ভাগকে ২য় ভাগ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় ৩য় ভাগ। কিন্তু ৪র্থ ভাগকে ৫ম ভাগ দিয়ে গুণ করলে তা হয় না। বাক্সগুলিকে উল্টে-পাল্টে এমন কায়দায় সাজাও যে ১ম কে ২য় দিয়ে গুণ করলে যেমন ৩য় হয়, তেমনি ৪র্থকে ৫ম দিয়ে গুণ করলেও ৩য় ভাগ হবে। অবশ্য যেমন ১ম ও ৫ম ভাগে ১টা, ২য় ও ৪র্থ ভাগে ২টো এবং ৩য় ভাগে ৩টে বাক্স রেখেছ তেমনি রাখতে হবে, নইলে মানাবে না।" রমেশ অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না। তোমরা বলিয়া দিবে কি—কি ভাবে বাক্সগুলি সাজাইতে হইবে?

রমা রায়, রমা নন্দী, তৃপ্তি কাকা, আশু বাবু, ছোড়দি, বিজু, রঞ্জি প্রভৃতি (সিমলা); সুমুখনাথ মিত্র, রাণী, হরি, বেণু, ভানু (দিনাজপুর); মুকুল, সন্তোষ, উমা, শিবু, দীপু, আরতি (কালিঘাট) অরুণকুমার গুপ্ত (রামপুর); রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নমিতা (সুন্দরঘাট—মির্জাপুর); ছোড়দি, মেজদি, সেজদি, দিদি, আদিত্য, অনন্তকুমার ওহদেদার (কাশীধাম); রেণু, অরুণ, মণি, অরুণা, নটু, গোরা, মিনা প্রভৃতি (ভবানীপুর); শেফালিকা রায় চৌধুরী (বালিয়াটী); গৌরাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র দাস (বঙ্গযোগিনী)।

যাঁহারা নিয়ম ধরিতে পারেন নাই কিন্তু প্রায় শুদ্ধ উত্তর দিয়াছেন—

অপর্ণা, অশোক, দীপিকা, অসীম (গিরিডি); টুটু, মিনু, শান্তি ঘোষাল (লেকপল্লী); রেণু, অরুণ, কালা কামাখ্যা, নটু, গোবরা, পুঁটু (ভবানীপুর); নিমুদা, গণশুদা, নানকু, সতু, পুটুকা, নীরেনদা, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রভৃতি (গৌহাটী); দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর); প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ); যামিনীকান্ত মণ্ডল (বাবুঘাট)।

নূতন প্রশ্ন

রমেশের দোকানে ৯টি বাক্স আছে। প্রত্যেক বাক্সের উপর ১, ২, ৩.....৯ এই ভাবে নম্বর দেওয়া। সেদিন রমেশের মাথায় খেয়াল চাপিল দোকানটা একটু সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখা উচিত। অনেক ভাবিয়া সে বাক্সগুলিকে এইভাবে ৫ ভাগে সাজাইয়া রাখিল—

৭ ২৮ ১৯৬ ৩৪ ৫

৭ অর্থাৎ ৭নং, ২৮ অর্থাৎ ২ নং ও ৮নং একত্র, ইত্যাদি। এমন সময়ে রমেশের বন্ধু ক্ষিতীশ আসিয়া হাজির। সে দেখিয়া বলিল, "সাজানো মন্দ হয় নি কিন্তু আর একটু কায়দা করা যায়। তুমি যে পাঁচ ভাগ করেছ তার ১ম ভাগকে ২য় ভাগ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় ৩য় ভাগ। কিন্তু ৪র্থ ভাগকে ৫ম ভাগ দিয়ে গুণ করলে তা হয় না। বাক্সগুলিকে উল্টে-পাল্টে এমন কায়দায় সাজাও যে ১ম কে ২য় দিয়ে গুণ করলে যেমন ৩য় হয়, তেমনি ৪র্থকে ৫ম দিয়ে গুণ করলেও ৩য় ভাগ হবে। অবশ্য যেমন ১ম ও ৫ম ভাগে ১টা, ২য় ও ৪র্থ ভাগে ২টো এবং ৩য় ভাগে ৩টে বাক্স রেখেছ তেমনি রাখতে হবে, নইলে মানাবে না।" রমেশ অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না। তোমরা বলিয়া দিবে কি—কি ভাবে বাক্সগুলি সাজাইতে হইবে?

আলো-ছায়া

শিল্পী—শ্রীমান্ অজয়কুমার দাস
(রামধনুর গ্রাহক)

৭ম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪১ { ৯ম সংখ্যা

শারদ-প্রাতে

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

ঘুম ভেঙ্গেছে
শারদ-প্রাতে,
মাঠ পেরিয়ে
যাই বেড়াতে।
পথটি ভেজা
শিশির-জলে,
ভাব্‌ছি আমি
কৌতূহলে—

ঝরলো রে কার
আঁখির ধারা—
টল্‌টলে ঐ
হিমের পারা ?
ঝর্‌লো পাতায়,
লতার জালে,
থল্‌কমলের
পল্‌কা ডালে,

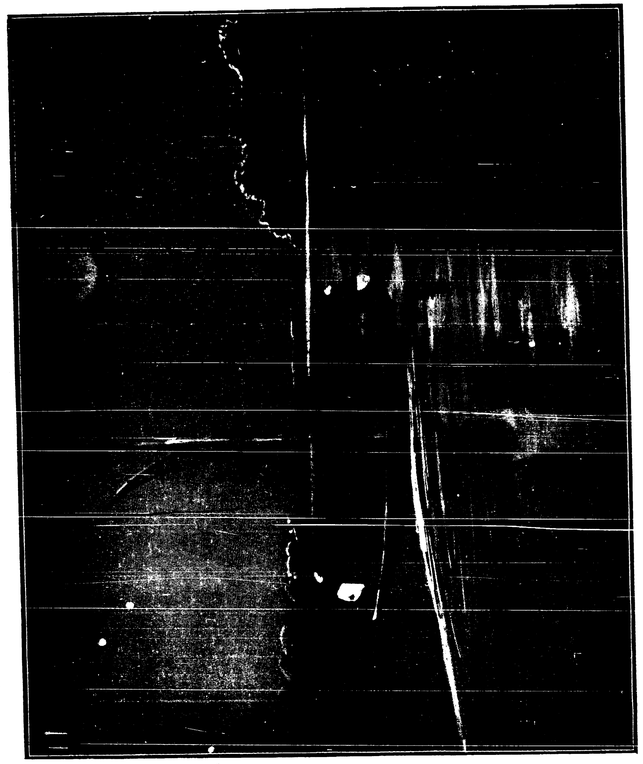

শ্যামল মাঠে
দূর্ব্বাঘাসে,
সবুজ শীষের
রাশে রাশে।
নদীর ধারে
মাঠের দিকে—

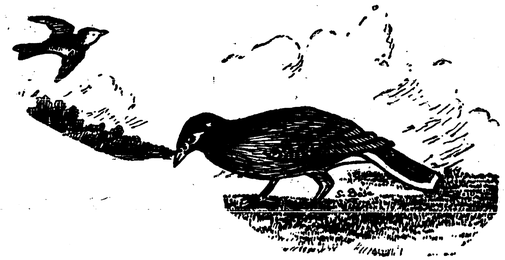

খুঁজ্‌ছে খাবার
গাং-শালিকে।
ভোরের বেলা
মলিন চাঁদা
টুক্‌রো মেঘে
পড়্‌লো বাঁধা ;
দেখ্‌তে পেলাম
বারে বারে—
বাব্‌লা বনের
আড়ে আড়ে।
তাই দেখে ভাই
চম্‌কে আমি
চল্‌তে পথে
থম্‌কে থামি।

অপূর্ব্ব সে
রূপের বাহার—
নাইরে কোথাও
তুলনা তার।
আস্‌লো দেশে
শরৎ রাণী,
হাস্‌লো ধরা
তাই ত' জানি।
মাঠের ধারে
ধানের ক্ষেতে
ভোরের হাওয়া
উঠ্‌ছে মেতে।
কা'দের ছেলে
কা'দের মেয়ে—
অবাক্ হয়ে
দেখ্‌ছে চেয়ে ?
ধানের শীষে
বাজ্‌না বাজে—
সুর বাজে তার
প্রাণের মাঝে।

টাট্‌কা হাওয়া,
টাট্‌কা আলো—
আমার প্রাণে
লাগ্‌ছে ভালো ;
পুব গগনের
প্রান্তটিতে
আঁকছে কে ঐ
রং তুলিতে ?
কাশের বনে,
বাঁশের ঝাড়ে
কোন্ ক্ষ্যাপা আজ
নিশাস্ ছাড়ে ?
সূর্য্য ওঠার
সময় হোলো—
দুয়ার খোলো,
দুয়ার খোলো।
আকাশ, বাতাস
ডাক্‌ছে ওরে—
ঘুমায় কে ভাই
এমন ভোরে।

সুলেখার জন্মদিন

(শ্রীসমর গুপ্ত)

আজ সুলেখার জন্মদিন। সুলেখার জন্ম-উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে অনেক দূর থেকে আত্মীয়েরা এসেছেন। চারিদিকে গোলমাল—হাসি ও গানের শব্দ—বাড়ীটা যেন একটা অফুরন্ত হাসির ঝর্‌ণা। সুলেখা তার ছোট ছোট সাথীদের নিয়ে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে। সুলেখার সাথী নীলিমা বল্‌লে, "সুলেখা, আয় ভাই, আজ আর ছুটোছুটি ক'রে খেলা না ক'রে সবাই এক সঙ্গে বসে গান করি।" সুলেখা তার উত্তরে ছোট্ট একটা হাসি হেসে বল্‌লে, "না ভাই, আমার কিন্তু ছুটোছুটি ক'রে খেলতে খু—ব ভাল লাগে।" অন্যান্য সাথীরাও সুলেখার

মতে মত দিল। তার পর রাণু বল্‌লে, "আচ্ছা, আজ আমরা একটা নতুন খেলা খেল্‌ব।"

সবাই বলে উঠ্‌ল, "কি খেলা ভাই রাণুদি?" রাণু বল্‌লে, "ঐ যে উঁচু জায়গাটা আছে—ঐ জায়গাটা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়তে হবে; যে সব চেয়ে বেশী দূরে পড়তে পারবে সেই ফার্ষ্ট হবে।"

সাথীরা বল্লে, "বাঃ বেশ, নতুন খেলাই বটে।" তার পর তাদের খেলা সুরু হ'ল। সবাই এক এক ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ল কিন্তু কেউই বেশী দূর যেতে পারলে না। এই বার সুলেখার পালা। সে ঐ উঁচু জায়গায় উঠে ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময়—

—মা ডাকলেন, "সুলেখা, এখন আর খেলা করতে হবে না, এস তোমার মাসিমারা তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন। এস, তোমায় ভাল জামা-কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে দি।"

সুলেখা বল্‌ল, "যাই," তার পর তার সাথীদের বল্‌লে, "তোমরা কোন কাজের নও, কেউ বকুলতলা পর্য্যন্ত এগোতে পারলে না, তোমরা দেখ, আমি ঠিক এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে বকুলতলায় পড়্‌ব।"

তার পর 'ওয়ান্', 'টু', 'থ্রি' বলে সুলেখা ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল—কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলে না। সামনে বকুল গাছে খুব জোরে ধাক্কা লেগে মাথার কতকটা জায়গা ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা অজ্ঞান হ'য়ে মাটীতে পড়ে গেল।

সাথীরা সব ছুটে এল। কেউ বা ধরে তুলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল, কেউ বা জল আনতে গেল, আবার কেউ বা ছুটে বাড়ীতে খবর দিতে গেল।

বাড়ীর সবাই ছুটে এল সেখানে। রক্ত তখনও পড়ছিল। রক্ত দেখে সুলেখার মা ও মাসিমারা কাঁদ্‌তে লাগলেন। সুলেখার দাদারা ধরাধরি ক'রে সুলেখাকে ঘরে নিয়ে এল। জন্ম-উৎসব থেমে গেল। বাড়ীর সবাই ব্যস্ত, কি ক'রে সুলেখার জ্ঞান ফিরে আসে,—কেউ বা ডাক্তার ডাক্‌তে ছুট্‌ল—কেউ বা বরফ আনতে গেল।

সারা রাত সুলেখার জ্ঞান ফিরে এল না। কত ডাক্তার এল, কত কবিরাজ এল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মাথার রক্ত পড়া বন্ধ করতে কেউই পার্‌ল না। তার পর ভোরবেলা সব শেষ হয়ে গেল।

সুলেখার সাথীরা এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে মুষ্‌ড়ে পড়্‌ল, কিন্তু তবু তারা কেউ নিয়ে এল ফুল, কেউ নিয়ে এল মালা। রেণু তার গলার সোনার হার খুলে সুলেখার গলায় পরিয়ে দিল।

সুলেখার ছোট বোন সুমনা একটা বড় পুতুল আর 'খোকাখুকু' বইটা নিয়ে দিদির কাছে এল। তার পর বই আর পুতুলটা দিদির মাথার কাছে রেখে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে, "দিদি, তোমার পুতুল আর বই তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও—আমি রাখতে পার্‌ব না। রোজ সকালে ওগুলো দেখ্‌লে আমার কান্না আসবে—আমি কিছুতেই ওগুলো রাখতে পার্‌ব না।"

সুলেখার দাদা সুমনাকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

২

"সুলেখা দি, তুমি কত দিন—কত বছর হ'ল চলে গেছ, কিন্তু কই একবারও আস নাই। তোমার জন্য মা কত কাঁদেন—আমি কত কাঁদি। তোমার বুঝি আমাদের কথা কিছু মনে নাই—না? যাক্, আজ তুমি যখন এসেছ তখন আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাব। সবাই বলে তুমি নাকি স্বর্গে গেছ। হ্যাঁ সুলেখা দি, সত্যি তাই নাকি? কথা কইছ না যে? কিন্তু কেন ভাই, আমি ত' আড়ি দিই নি? সুলেখা দি, বল না সে রাজ্যটা কেমন? বলবে না ত', আচ্ছা বেশ—তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কইব না।"

মা ডাকলেন, "সুমনা, সুমনা, ওঠ। স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?" মায়ের ডাক শুনে সুমনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার পর ব্যস্ত হয়ে মাকে বল্‌লে, "মা, সুলেখা দি এসেছিল, তুমি আমায় ডাক্‌লে কেন? দিদি রাগ করে চলে গেল।"

মা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "না সুমনা, তুমি স্বপ্ন দেখছিলে। তুমি এইখানে আমার কোলের কাছে শোও।"

সুমনা তার মায়ের কোলের কাছে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। মা ভাবেন

সুলেখা হয় ত' সুমনাকে এখনও ভুলতে পারে নি, তাই মাঝে মাঝে স্বপ্নে তাকে দেখ্‌তে আসে।

৩

পূর্ণিমা রাত। চারিদিক্ স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় ভরে গেছে। জগৎ নিস্তব্ধ—শুধু দূরে ঐ ঝাউ গাছটায় কি একটা পাখী বিশ্রী স্বরে ডাক্‌ছে।

ঠিক্ এম্‌নি সময়ে সুমনার ঘুম ভেঙ্গে গেল; তার পর ধীরে ধীরে সে ছাদের দিকে এগিয়ে এল। সবাই ঘুমে অচেতন, শুধু ছোট্ট মেয়ে সুমনা একা ছাদে দাঁড়িয়ে হাত তুলে কা'কে যেন ডাকছে আর বল্‌ছে, "এস, এইবার এস, এখন সবাই ঘুমুচ্ছে—কেউ জান্‌তে পারবে না; দু'জনে সারা রাত এই চাঁদের আলোয় খেলা কর্‌ব।"

মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, সুমনাকে পাশে দেখতে না পেয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তার পর এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে কোথাও তাকে না পেয়ে শেষে ছাদে এলেন। সেখানে এসে দেখলেন সুমনা আপন মনে খেলা করছে আর আস্তে আস্তে কা'কে যেন কি বল্‌ছে!

মা ডাকলেন, "সুমনা, এত রাত্রে একা ছাদে বসে কি কর্‌ছ?"

সুমনা কথা কয় না, আপন মনে খেলা ক'রে যায়। মা জোর ক'রে তাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে এলেন।

সুমনা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমায় ছেড়ে দাও, আমি দিদির সঙ্গে খেলা কর্‌ব।"

পর দিন সকালে সুমনার ঘুম ভাঙ্গতেই মায়ের কাছে সে ছুটে এল, তার পর মাকে বল্‌লে, "মা, কাল রাত্রে সুলেখা দি এসে আমায় বল্লে যে সুমনা, তুমি কেঁদ না, আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। হ্যাঁ মা, সত্যি সত্যি দিদি আসবে নাকি?"

মায়ের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। মা সুমনাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে বল্‌লেন, "হাঁ, তোমার দিদি আবার আস্‌বে।"

তাড়াতাড়ি মায়ের কোল থেকে সুমনা নেমে পড়্‌ল। তার পর সবার কাছে গিয়ে বলতে লাগ্‌ল, "আমার দিদি আবার আসবে।"

সবাই তার দিকে একবার তাকিয়ে আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট "হুঁ" বলে থেমে যায়।

সুমনার কিন্তু তাতে ভাল লাগে না। সে ভাবে 'দিদি কতদিন পরে আস্‌বে—সবাই আমোদ-আহ্লাদ করবে,—তা না চুপ করে বসে কি যেন ভাবে! আর কথা বলতে গেলে সবাই আমার মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে। লোক-গুলো যেন একটা কি—'

সুমনা নিজেই সারাদিন নেচে নেচে বেড়ায় আর বলে, "দিদি আসবে, দিদির সঙ্গে আবার খেলা কর্‌ব"—আবার তখনই ছুটে মায়ের কাছে যায়; তার পর মাকে বলে, "মা, দিদি আস্‌তে আর কত দিন আছে?" মা বলেন, "এই শীগ্‌গিরই আসবে।"

৪

সেদিন সকালে সুমনার ঘুম ভাঙ্গতেই তার দাদা এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বল্‌লে, "সুমনা, কাল রাত্রে তোমার দিদি এসেছেন।"

সুমনা চোখ রগড়াতে রগড়াতে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌ল, "সত্যি, কই, কোথায় আছে?"

দাদা বল্‌লে, "চল, দেখ্‌বে।"

সুমনা বল্‌লে, "হাঁ দাদা, দিদি কাল রাত্রে এসেছে তা' আমায় ডাক নি কেন? তুমি বড় দুষ্টু।"

দাদা বল্‌লে, "তুমি যে ঘুমুচ্ছিলে সুমনা, তাই তোমায় ডাকি নি।"

সুমনা অভিমানের স্বরে বলে, "হুঁ—তাই।"

দূর থেকে মাকে দেখতে পেয়ে সুমনা দাদার কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে মায়ের কাছে গেল, তার পর ব্যস্ত হয়ে মাকে বল্‌লে, "মা, দিদি কই?"

মা শুয়েছিলেন, বল্‌লেন, "সুমনা, আমি সুলেখাকে তোমায় দেখাব, কিন্তু এবার সে তোমায় দিদি বলবে—কেমন রাজী আছ ত'?"

সুমনা বল্‌লে, "হুঁ, তাই আবার হয় নাকি!"

মা বল্‌লেন, "তবে তুমি দেখ্‌বে না বল?"

সুমনা তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল, "দেখ্‌ব—দেখ্‌ব"। মা বল্‌লেন, "তবে তুমি দিদি হ'তে রাজী আছ?"

অনেক দিন পর তার দিদিকে দেখতে পাবে সেই আনন্দে সুমনা তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল, "আচ্ছা তাই হব, দিদির দিদিই হব; এবার দেখাও।"

মা আস্তে সদ্যভূমিষ্ঠা শিশুকন্যার মুখের ঢাকনাটা তুলে দিয়ে বল্‌লেন, "এই দেখ, সুমনা।"

সুমনা তার বোন্‌কে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাকে জড়িয়ে ধর্‌ল।

দক্ষিণ মেরুর খোঁজে

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এস্‌-সি)

আজ হইতে ঠিক তেত্রিশ বছর আগেকার কথা। ঠিক এমনি এক আগষ্ট্‌ মাসের রৌদ্রতপ্ত দিনে একখানি অদ্ভুত ধরণের ছোট কাঠের জাহাজ ইংল্যাণ্ডের উপকূল হইতে রওনা হইল। সেই জাহাজের মধ্যে ছিলেন একদল অসমসাহসিক নাবিক, একদল অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক এবং তাঁদের নেতা একটি তেত্রিশ বছরের যুবক—ক্যাপ্‌টেন্‌ স্কট্‌। আর ছিল নানা রকম যন্ত্রপাতি, নানা রকম আসবাব-পত্র, আর দীর্ঘ দিনের উপযোগী খাবার-দাবার। জাহাজখানির গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল "DISCOVERY" (ডিস্‌কভারি) অর্থাৎ "আবিষ্কার"।

বলা বাহুল্য 'ডিস্‌কভারি' বাহির হইয়াছিল আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু কোন্‌ দেশ আবিষ্কার? এই বিংশ শতাব্দীতেও কি পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে কখনও মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নাই? হাঁ, আছে—অর্থাৎ তখনও ছিল। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তে দুই মেরুর দেশ। দুস্তর সাগর পার হইয়া তার কাছে যাইতে হয়। সেখানে লোক নাই, জন নাই, কোন জীবন্ত প্রাণী নাই—এমন কি একটি গাছও কখনও ভুলিয়া সেখানে জন্মায় না—শুধু যতদূর দৃষ্টি যায় শত শত মাইল্‌ যুড়িয়া ধূ ধূ করিতেছে বরফ আর বরফ। আর আছে, আকাশ-

বাতাস যুড়িয়া এক অনন্ত নিস্তব্ধতা। 'ডিস্‌কভারি' চলিয়াছিল পৃথিবীর সেই দুই মেরুর একটি—দক্ষিণটির খোঁজে।

উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু দুই-ই দিগন্তপ্রসারী বরফের দেশ। কিন্তু তাদের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। উত্তর মেরু হইতেছে এক সৃষ্টিযোড়া বরফের সমুদ্র, কিন্তু দক্ষিণ মেরু আসলে একটি মালভূমি। তার বরফের নীচে রহিয়াছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব পাহাড় আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব আগ্নেয়গিরি। সে আগ্নেয়-গিরিতে অবশ্য এখন আর আগুন নাই—সৃষ্টির কোন্‌ প্রথম যুগে তা নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাদের বিরাট্‌ বিরাট্‌ গহ্বর আর ফাটলগুলি আজও সেই বরফের মধ্যে ডুবিয়া আছে। তা' ছাড়া দক্ষিণ মেরুর চারিধারে—কয়েক শ' মাইল্‌ দূরে তাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে এক প্রকাণ্ড ভাসমান বরফের প্রাচীর। তার নাম "The Great Ice Barrier" অর্থাৎ "বিরাট্‌ তুষার-প্রাচীর"। সে প্রাচীর মানুষের এক রকম অলঙ্ঘ্য বলিলেই চলে। শুধু যখন গ্রীষ্মের তাপে তার এক টু-আ ধ টু অংশ গ লি য়া যায় তখন যদি সেই ফাঁক দিয়া কোন গতিকে তার ভিতরে ঢোকা যায়! কাজেই বুঝি-তেছ কি ভীষণ দেশ আবিষ্কারের আশায় 'ডিস্‌কভারি' চলিয়াছিল। তার আগে আরও অনেক অসমসাহসিক লোক এ চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সফল হন নাই কেউই।

তুষার-প্রাচীর। দূরে ক্যাপ্‌টেন্‌ স্কটের 'ডিস্‌কভারি' জাহাজ।

এই অভিযানের নেতা ক্যাপ্‌টেন্‌ স্কটের একটু পরিচয় এখানে বোধ হয় দেওয়া দরকার। স্কটের বাড়ী ইংল্যাণ্ডে। তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই

জীবনের বেশীর ভাগ কাটাইয়াছিলেন সমুদ্রে। কাজেই ছেলেবেলা হইতেই স্কটের সমুদ্রের প্রতি একটা প্রগাঢ় টান ছিল। একটু বড় হইয়াই তিনি জাহাজের কাজে লাগিয়া গেলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই নিজের প্রতিভা দেখাইয়া খুব উঁচু পদে বহাল হইলেন।

ঠিক সেই সময়ে "রয়াল্ জিওগ্রাফিক্যাল্ সোসাইটি" হইতে দক্ষিণ মেরু অভিযানের জন্য একটা আয়োজন হইতেছিল। এই সমিতির সভাপতি মার্কা-হামের সঙ্গে স্কটের পরিচয় ছিল, তাঁরই মুখে স্কট্ও সে খবরটা পাইলেন। সাগরের ডাক স্কট্কে বিচলিত করিয়া তুলিল। এ প্রচণ্ড 'য়্যাড্ভেঞ্চারের' নেশা তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া, কেমন করিয়া তিনি তা রোধ করেন? তিনি ঠিক করিলেন এ অভিযানে তিনি যোগ দিবেন এবং শুধু যোগ দেওয়া নয়, অভিযানের নেতাও হইবেন তিনিই। সে যোগ্যতা অবশ্য তাঁর ছিল।

তার পর বন্দোবস্ত হইল, রসদ যোগাড় করা হইল, বাছা বাছা লোকও জুটিল; মেরুর প্রচণ্ড শীত আর বরফের চাপ বরদাস্ত করিতে পারে এমন একখানা জাহাজও ঠিক করা হইল। এই জাহাজের (ডিস্কভারি) কথা তোমাদের ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

নীল জলে ঢেউ তুলিয়া ডিস্কভারি ছুটিয়া চলিল—দিনের পর দিন। অদম্য আশা আর উৎসাহ লইয়া ক্যাপ্টেন্ স্কট্ ও তাঁর সঙ্গীরা তার মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জাহাজ আসিয়া সেই তুষার-প্রাচীরের নীচে দাঁড়াইল। তখন প্রচণ্ড শীত। স্কট্ সে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেদ করিবার মত এতটুকু ফাঁক খুঁজিয়া পাইলেন না। অগত্যা তাঁদের খানিকটা হটিয়া আসিয়া বরফ গলিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। যেখানটায় তাঁরা জাহাজ রাখিলেন তার নাম 'কিং এড্ওয়ার্ড' দ্বীপ।

কয়েক মাস সেই দ্বীপে কাটাইয়া স্কট্ ঠিক করিলেন জাহাজ এবং বেশীর ভাগ লোক সেখানে রাখিয়া মাত্র জনা দুই সঙ্গী ও কিছু রসদ লইয়া তিনি স্লেজ্ গাড়ীতে করিয়াই রওনা হইবেন। স্কটের বন্ধু লেফ্টেনাণ্ট্ শ্যাকল্টন্ আর উইল্সন্ হইলেন তাঁর সঙ্গী। স্লেজ্ টানিবার জন্য লওয়া হইল কতকগুলি বলিষ্ঠ শীতপ্রধান দেশের কুকুর।

যাত্রা সুরু হইল। কী বিপদ্-সঙ্কুল সে যাত্রা! পদে পদে বাধা, পদে পদে বিপদ্। কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই রাস্তা যুড়িয়া পড়িয়া আছে, পাশ কাটাইয়া যাইতে হইবে; হঠাৎ কোন রকমে একটু বরফ গলিয়া তার একটা মাথায় পড়িলে একেবারে জীবন্ত সমাধি। কোথাও পায়ের নীচে অদৃশ্য আগ্নেয়-

ক্যাপ্টেন্ স্কট্ লেফ্টেনাণ্ট্ শ্যাকল্টন্

গিরির বিরাট্ মৃত গহ্বর—শত শত ফিট্ গভীর অথচ বরফে ঢাকা; দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু পা ফস্কাইয়া একবার ভিতরে পড়িলে আর রক্ষা নাই। তা ছাড়া প্রচণ্ড শীত, প্রচণ্ড ঝড় আর তুষার-বৃষ্টি তো আছেই! পথে পথে নিশান পুঁতিয়া, তাঁবু গাড়িয়া, সেখানে খাবার রাখিয়া রাখিয়া তাঁরা অগ্রসর হইতে লাগিলেন—ফিরিবার পথে যাহাতে পথ-ভুল না হয় কিংবা খাবারের অভাব না ঘটে।

কিন্তু পথ ক্রমেই দুর্গম হইতে লাগিল। ঝড়-বৃষ্টিও (জলের নয়, তুষারের) তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ক্রমে তাঁবু পোঁতাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, আর খাবার আসিল ফুরাইয়া। সঙ্গের কুকুরগুলির কয়েকটাকে মারিয়া সেই মাংস বাকী কুকুরগুলিকে খাওয়াইতে হইল। তার উপর শ্যাকল্টন্ পড়িলেন অসুখে। অগত্যা স্কট্কে আবার জাহাজের কাছে ফিরিয়া আসিতে হইল।

কিন্তু জাহাজ তাঁরা ফিরাইলেন না। কয়েক মাস বিশ্রাম করিয়া আবার নতুন উদ্যমে স্কট্ রওনা হইলেন। এবার আর শ্যাকল্টন্ যাইতে পারিলেন না—চলিলেন ইভান্‌স্ ও ল্যাস্‌লী। আবার সেই রকম বিপদ্—সেই রকম বাধা স্কট্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কতবার তাঁরা কেবল মাত্র বরাতের জোরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গেলেন। শেষে মেরু হইতে ৪৬৩ মাইল্ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া এবারও স্কট্‌কে ফিরিতে হইল। আর দেরী না করিয়া তিনি সেবারকার মত ইংল্যাণ্ডে চলিয়া আসিলেন। 'ডিস্‌কভারি' আবিষ্কার অনেক কিছুই করিল, কিন্তু আসল মেরু জয় করিতে পারিল না।

এই ঘটনার সাত বছর পরে স্কটের বন্ধু শ্যাকল্টন্ আবার দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারে বাহির হইলেন। এবার অবশ্য স্কট্ সঙ্গে ছিলেন না, শ্যাকল্টন্‌ই হইলেন দলের নায়ক। শ্লেজে তুষার-প্রাচীর পার হইয়া বরফের উপর দিয়া সে এক স্মরণীয় অভিযান। আর মাত্র একশ' মাইল্ যাইতে পারিলেই মেরুতে পৌঁছান যায়! কিন্তু ভগবানের বোধ হয় সেটা ইচ্ছা নয়। শ্যাকল্টন্ দেখিলেন, তাঁরা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে আর এক পা অগ্রসর হইলে জীবিত অবস্থায় ফেরা প্রায় অসম্ভব। তিনি ফিরিলেন।

মেরু-বিজয় হইল না, কিন্তু স্কট্ ও শ্যাকল্টনের এই দুই দুঃসাহসিক অভিযান পৃথিবীর দক্ষিণ কোণ সম্বন্ধে নতুন নতুন ভৌগোলিক তথ্য বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। তাঁদের উদ্দেশ্য তো শুধু মেরুতে হাজির হইয়া সাহসের পরিচয় দেওয়াই নয়, মেরুর আশ-পাশের দেশ সম্বন্ধে সমস্ত রকম বিবরণ, সমস্ত রকম তথ্য সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার বাড়ানো। সে সব তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তাঁরা সঙ্গে নিয়াছিলেন সে কথা তো তোমাদের আগেই বলিয়াছি।

শ্যাকল্টনের বিফলতার খবর স্কটের কাছে পৌঁছিল। আবার আবিষ্কারের নেশা তাঁকে পাগল করিয়া তুলিল—দক্ষিণ সাগর যেন হাত বাড়াইয়া তাঁকে ডাকিতে লাগিল। সে ডাক অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা স্কটের ছিল না। তিনি আবার নতুন অভিযানের আয়োজন করিলেন। এবার সঙ্গীদের অনেকেই ছিলেন বৈজ্ঞানিক—

মেরু প্রদেশের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য যোগাড় করিবার জন্য তাঁরা সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্কট্ সঙ্গে নিলেন উনিশটি সাইবেরিয়ান্ ঘোড়া, ত্রিশটি শিক্ষিত কুকুর আর তিনখানি মোটর-শ্লেজ্। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর নিউজিল্যাণ্ডের পোর্ট্ চামারস্ হইতে স্কটের জাহাজ ছাড়িল। এবার আর ডিস্‌কভারি নয়, এ জাহাজের নাম "টেরা নোভা"।

১৯১১ সনের জানুয়ারীতে তাঁরা সেই তুষার-প্রাচীরের নীচে আসিয়া পৌঁছিলেন। সে জায়গার উত্তাপ তখন শূন্য ডিগ্রীরও ৮২ ডিগ্রী নীচে (শূন্য ডিগ্রীতেই জল জমিয়া বরফ হয়)। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিতে কয়েক মাস গেল, তার পর অক্টোবরের শেষে তাঁদের আসল অভিযান সুরু হইল। এইবার সমস্ত ব্যাপারই যেন তাঁদের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে লাগিল। খানিক দূর গিয়া মোটর-শ্লেজ্ ভাঙ্গিয়া গেল, ঘোড়াগুলির কতক মরিয়া গেল, আবহাওয়াও হইল যত দূর খারাপ হইতে হয়। প্রচণ্ড শীত, প্রচণ্ড ঝড় আর অবিরাম তুষারপাত হইল তাঁদের নিত্যসঙ্গী।

পেঙ্গুইন্ পাখী,—এরাই দক্ষিণ মেরুর সব চেয়ে নিকটতম বাসিন্দা।

কিন্তু স্কট্ এবার স্থিরসঙ্কল্প; এবার তিনি মেরু-বিজয় না করিয়া ফিরিবেন না। ১৯১২ সনের ৩রা জানুয়ারী; তাঁরা সেদিন মেরু হইতে ১৫০ মাইল্ দূরে। স্কট্ তাঁর সমস্ত সঙ্গীদের ফিরিয়া গিয়া জাহাজে অপেক্ষা করিতে বলিলেন; এবার শুধু তিনি নিজে তাঁর চার জন বিশ্বস্ত বন্ধু—ক্যাপ্টেন্ ওট্‌স্, ডাঃ উইল্‌সন্, লেফ্‌টেনাণ্ট্ বাওয়ার্স্ এবং মিঃ ইভান্‌স্‌কে লইয়া অগ্রসর হইলেন।

সঙ্গীর দল ফিরিয়া আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্কট্ কিংবা তাঁর সেই চার বন্ধুর আর দেখা নাই। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস অপেক্ষা করিয়া করিয়া শেষে সকলে এক অজানা আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। অবশেষে তাঁদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ডাঃ য়্যাট্‌কিন্‌সনের নেতৃত্বে এক দল লোক বাহির হইয়া পড়িলেন। স্কটের যাত্রা-পথে যে নিশান, তাঁবু আর চিহ্ন পড়িয়াছিল তাই ধরিয়া ধরিয়া তাঁরা চলিতে লাগিলেন। অবশেষে খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন সেই সীমাহীন বরফের নীচে পাওয়া গেল তিন জন মানুষের কঙ্কাল—আর চামড়ার ব্যাগে ভরা স্কটের একখানা ডায়েরী। সেই কঙ্কালগুলি আর কারও নয়, দুঃসাহসী বীর স্কট্, বাওয়ার্‌স্ এবং উইল্‌সনের।

সেই ডায়েরীর মধ্যে স্কটের জীবনীর বাকী অংশটুকু পাওয়া গেল। মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতেও তিনি এই ডায়েরী লিখিতে ভুলেন নাই। কী মর্ম্মন্তুদ সে কাহিনী! পড়িলে চোখ ফাটিয়া জল আসে। স্কট্ লিখিয়াছেন—১৮ই জানুয়ারী (১৯১২) তাঁরা তাঁদের চির-অভীপ্সিত দক্ষিণ মেরুতে আসিয়া পৌঁছিলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন সে দেশ আর তখন অনাবিষ্কৃত নাই। তাঁরই মত দুঃসাহসী নরওয়ে দেশের আর এক মহাবীর ক্যাপ্‌টেন আমুণ্ড্‌সেন্ অন্য পথে আসিয়া ঠিক এক মাস দু'দিন আগে অর্থাৎ ১৯১১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে দক্ষিণ মেরুতে প্রথম মানুষের পদচিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছেন। নরওয়ের জাতীয় পতাকা সেই তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে খাড়া দাঁড়াইয়া তাঁর সেই বিজয়-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। নরওয়ের পতাকার পার্শে ইংল্যাণ্ডের পতাকা বসানো হইল, কিন্তু মেরু আবিষ্কারের যে গৌরব তা স্কটের হইল না—সে গৌরব আমুণ্ড্‌সেনের। এই বীরের কাহিনী সুবিধা হইলে তোমাদের আর একদিন শুনাইব।

যাই হোক্, মেরু জয় করিয়া স্কট্ ফিরিতে সুরু করিলেন। কিন্তু ফেরা আর হইল না। প্রকৃতি বাঁকিয়া বসিল; তাঁদের পথ আটকাইয়া আসিল দারুণ বরফের ঝড়। কী প্রচণ্ড সে ঝড়ের বেগ, কিন্তু তার মধ্যে হাওয়া টের পাওয়া যায় না—শুধু বরফের কণা! মুখের চামড়া কাটিয়া যায়, চোখ মেলিয়া তাকাইবার

পর্য্যন্ত উপায় নাই। সেই অবিরাম তুষার-পাতে তাঁদের পথ-ঘাট কোথায় হারাইয়া গেল! আসিবার সময় পথে পথে তাঁরা যে তাঁবু আর খাবার রাখিয়া আসিয়াছিলেন বরফের ভিতর কোথায় যে সেগুলি চাপা পড়িয়া আছে তার আর খোঁজ মিলিল না। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন অবস্থায়, অর্দ্ধাশনে তবু তাঁরা চলিতে লাগিলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ইভান্‌স্ পড়িলেন মারা। তার কিছু দিন পরে ক্যাপ্‌টেন্ ওট্‌স্ পড়িলেন অসুখে। ওট্‌স্ দেখিলেন, তাঁকে লইয়া সঙ্গীরা বড় বিপদে পড়িয়াছেন; তাঁকে ফেলিয়া তাঁরা আগাইতেও পারিতেছেন না, এদিকে তাঁদের

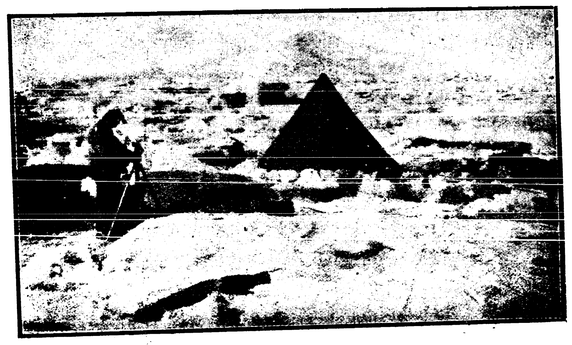

দক্ষিণ মেরুর কাছে চিরতুষারের রাজ্যে অভিযানকারীদের তাঁবু

খাবারও একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে—অপেক্ষা করাই বা যায় কেমন করিয়া? তিনি ঠিক করিলেন বন্ধুদের আর বিব্রত করিবেন না, আটকাইয়া রাখিবেন না। আর, তিনি চলিয়া গেলে অন্ততঃ এক জনের খাবারও তো বাঁচিয়া যাইবে! তিনি কি করিলেন জান? কাহাকেও না জানাইয়া সেই রুগ্ন দেহে তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে একাকী বাহির হইয়া গেলেন—যেদিকে চোখ যায়। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া এত বড় মহানুভবতার কথা কখনও শুনিয়াছ? সেই মেরু-ঝড়ের মধ্যে ওট্‌স্ কোথায় গেলেন আজ পর্য্যন্ত তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই গেল ১৭ই মার্চ্চের কথা। বাকী তিন জন অনাহারে, অনিদ্রায়, ক্লান্ত দেহে

টানিয়া-হিঁচড়াইয়া অবশেষে এমন এক জায়গায় পৌঁছিলেন যেখান হইতে মাত্র ১১ মাইল্ গেলেই তাঁদের পরিচিত তাঁবু পাইবেন। সেখানে পৌঁছিতে পারিলে খাবার মিলিবে, আগুনও মিলিবে। এ যাত্রাও তবে বাঁচিবার আশা আছে!

কিন্তু সে আশা তাঁদের একটু পরেই ধূলিসাৎ হইয়া গেল। হঠাৎ নতুন করিয়া আবার এক প্রচণ্ড ঝড় দেখা দিল। সে ঝড় সমস্ত ছিঁড়িয়া, ভাঙ্গিয়া, উড়াইয়া শেষ করিয়া দিল। তাঁবুর খুঁটি ধরিয়া মুখ গুঁজিয়া তিন বন্ধু পড়িয়া রহিলেন। সেদিন ২৫শে মার্চ্চ্।

এইখানে আসিয়া ডায়েরী শেষ হইয়াছে। তার পরের ঘটনা আর কিছু তা'তে লেখা নাই। লেখার দরকারও আর ছিল না। বরফের নীচে প্রোথিত তাঁদের তিন জনের কঙ্কালেই তা' লেখা হইয়া আছে।

ভেস্তা ভূগোল

(শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেনগুপ্ত)

মৃত্যুকালে নেত্য খুড়ো বল্লে ডেকে মোরে
'সত্যচরণ, একটা কথা বল্‌ব আজি তোরে—
নষ্ট ক'রে ইষ্ট কাজে কষ্ট কঠিন ক'রে
লিখেছি এক ভেস্তা ভূগোল ব্যস্ত ছেলের তরে ;
তুষ্ট হ'ব ছাপ্‌লে এটা।'—খুড়োর খুসীমত
ভূগোল থেকে তারই কথা শোনাই গোটা কত।

* * *

সিন্ধু দেশে বিন্ধ্য পাহাড় আট্‌কে আছে পথ,
ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মদেশের সবার বড় নদ।
বঙ্গে এসে গঙ্গা নদীর সাঙ্গ হল গতি,
ক্যাঙ্গারু চাই ?—হাঙ্গেরীতে দুর্ল্লভ সে অতি ;

রেঙ্গুনে ?—তা পেতেও পার, আম্‌দানী হয় বুঝি—
তার চেয়ে ভাই মঙ্গোলিয়ায় যাও না সোজাসুজি !

হটেন্‌টটের লোকগুলো শঠ, চট্ ক'রে যায় চ'টে,
জোট্ না বেঁধে তাদের কাছে কেউ যেও না মোটে।
ফ্রান্সে নাকি পান্‌সে সবই দ্রাক্ষা-মধু ছাড়া,
ঝান্সী গেলে পান্‌সী নায়ে পড়বে তুমি মারা।
সবাই জানে অষ্ট্রিয়াটা উষ্ট্রপ্রধান দেশ,
অষ্ট্রেলিয়ান্ অরকেষ্ট্রা শুন্‌তে নাকি বেশ।

মাদাগাস্কার আবিষ্কারে লোকলস্কর নিয়ে
মস্কো থেকে রস্কো গেলেন বিস্কে সাগর দিয়ে।
ফ্রেস্কো আঁকার দেশ কোথা গো ?—তাও জান না বুঝি ?
স্কটল্যাণ্ডের পথটা ধ'রে চল্‌বে সোজাসুজি ;
পথের বাঁয়ে আলাস্কা আর মেক্সিকোকে রেখে,
অক্সফোর্ডের সাম্‌নে এসে চল্‌বে এঁকে-বেঁকে ;
শেষ ক'রে সেই পথের সীমা উঠ্‌বে গিয়ে যেথা,
জান্‌বে তুমি ফ্রেস্কো আঁকার জন্ম প্রথম সেথা।

* * *

লাগ্‌লে ভাল পাগ্‌লা খুড়োর খাম্‌খেয়ালী লেখা
ভেস্তা ভূগোল সমস্তটার শীঘ্র পাবে দেখা।

ছেলে—বাবা, তুমি না বলেছিলে খোকনকে মারতে নেই কারণ যে আমার চেয়ে বয়সে ছোট তাকে মারা ভীরুতা।

বাবা—হ্যাঁ, ভীরুতাই তো।

ছেলে—তবে তুমি মাষ্টার মশাইকে একখানা চিঠি লিখে দাও—আমি তাঁর চেয়ে বয়সে কত ছোট তবু তিনি আমায় মারেন !

শ্রীতপেশ হালদার

বাড়ী থেকে পালিয়ে

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

১৭

কাঞ্চন অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে—'ঘোড়া আবার কি জিত্‌বে ?'

'রেস্ কাকে বলে জান না বুঝি ? রেস্ কয় প্রকার ?'

'জানি না ত !'

'দুই প্রকার। হিউম্যান্ রেস্ আর হর্স্ রেস্। আমরা হিউম্যান্ রেসের মধ্যে, কিন্তু হর্স্ রেস্ না হ'লে আমাদের চলে না। বুঝতে পারলে ?'

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বল্‌ল—'না'।

'তার মানে হিউম্যান্ রেস্‌এ আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ কমে আস্‌ছে এবং হর্স্ রেস্‌এ বাড়ছে। মানুষ হ'লেও ঘোড়াকে ফলো করতে আমরা ভালবাসি।'

কাঞ্চন এবার ঘাড় নাড়ে—'বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ কিনা আমরা ঘোড়ার রাজত্বে বাস করছি, এই ত ? একটু আগেই তা টের পেয়েছি, যা ছুটতে হয়েছিল। কিন্তু তখন ত ঘোড়ারাই ফলো করছিল আমাদের ?'

'উঁহু, তা নয়, ঘোড়দৌড় কাকে বলে জান না ? ঘোড়দৌড়ে বাজি জেতে শোন নি ?'

'ও, ঘোড়দৌড় ? হ্যাঁ, শুনেছি। বাবা বলেন, ওতে বাজি ধরে মানুষ ফতুর হয়ে যায়। ও খেলা ভারী খারাপ। আমার দাদামশায়রা খুব বড়লোক ছিলেন কিন্তু ঘোড়দৌড়ে—'

'ফতুর হয়ে গেছেন ? বরাত খারাপ থাক্‌লে অমন হয়। আমার কপাল খুব ভাল, আমি ত প্রায়ই জিতি। এই যে এসে পড়েছি। ওই হচ্ছে রেস্‌কোর্স্। দেখ্‌ছ, কি রকম লোকের ভিড়। আমি ভেতরে চল্লুম, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আস্‌ব। তুমি এই গাড়ীতেই বসে থাক, চলে যেয়ো না যেন। যা দরকার হয় শোফারকে ব'লো।'

চারিদিকে লোক, কেবল লোক। অনেকখানি জায়গা ঘিরে গোল হয়ে

লোকগুলো যেন অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে গেছে ; তখনও কত লোক আস্‌ছে, লোক আসার আর বিরাম নেই। কাঞ্চনের সম্মুখ দিয়ে অনেকগুলো অতিকায় অশ্ব চলে গেল। এইগুলোই বুঝি রেসের ঘোড়া ? শোফারকে তিন-চার বার প্রশ্ন কর্‌ল কিন্তু সে তার একটা কথারও জবাব দিল না। তার দিকে তাকাল না পর্য্যন্ত, যেন তাকে গ্রাহ্যই কর্‌ল না। কাঞ্চনের ভারী রাগ হ'ল, কিন্তু রেগে আর কি করে ? তার ভারী ইচ্ছা হ'ল ভেতরে গিয়ে ঘোড়দৌড় ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে কিন্তু কি নিয়ম-কানুন কিছুই জানে না ত ! তাকে কি যেতে দেবে ? শোফার-ব্যাটা যে একেবারে মৌনব্রত নিয়ে বসেছে !

অনেকক্ষণ বাদে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। হাতে নোটের তাড়া। মোটরে উঠে প্রথমেই একচোট্ খুব হেসে নিলেন।

'আজ একেবারে আপ্‌সেট্। ভারী জিতেছি। তোমার টিপ ভারী ফলে গেছে। তুমি মাকে খুব ভালবাস, না ? তোমার মাতৃভক্তির জোরেই জিতে গেলাম। "মাই মাদার্" জিত্‌বে কেউ ভাবে নি। দশ টাকায় চার শ' সাতায় টাকা—একেবারে রেকর্ড্ পে-মেণ্ট্।'

'আমি বল্লুম ব'লে জিত্‌ল ! তা কি হয় ? এ ত ভারী আশ্চর্য্য !'

'আশ্চর্য্য আবার কি ? ছেলেদের মধ্যে ভগবান্ থাকেন। তাই ছেলেদের কথা ভারী ফলে যায়। তোমার মধ্যে দেবতা আছেন তা জান ? যত দিন ছেলেমানুষ থাক্‌বে তত দিন সেই দেবতা থাক্‌বেন—তার পর যত বড় হবে তত—এই শোফার, বাড়ী—না, বাড়ী নয়, চ্যাঙ্গোয়া।'

'চ্যাঙ্গোয়া কি ?'

'রেস্তোরাঁ। মানে, চীনেদের হোটেল—ভারী চমৎকার সব খাবার দাবার। চপ্—কাট্‌লেট্—ফাউল্-কারি—ফ্রায়েড্ রাইস্—আইস্‌ক্রিম্। তুমি কখনও সে সব খাও নি।'

'মা বলেন চীনেরা সব আর্সোলা খায়। আর নেংটি ইঁদুর—'

'দূর্ দূর্ ! ওসব বাজে কথা, কুসংস্কার। চীনেরা আমাদেরই মত সভ্য জাত। সভ্য লোকে কখনও ওসব খেতে পারে ?'

'চ্যাংগোয়া। নামটা যেন কি রকম!'

'হ্যাঁ, ওদের নামগুলোই খারাপ, আর সব ভাল।'

'আচ্ছা চ্যাংদোলা, এটাও চীনে কথা, নয় কি? আমি তখনি জান্‌তাম। আমি পালিয়ে আসতুম ব'লে পড়ুয়ারা আমাকে ছোটবেলায় চ্যাংদোলা ক'রে পাঠশালে নিয়ে যেত। আমার যা খারাপ লাগ্‌ত। এখন বুঝতে পারছি ওটা চীন দেশের ব্যাপার।'

ভদ্রলোক হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—'ঠিক ধরেছ তুমি। এখন নাম, আমরা এসে পড়েছি।'

সারি সারি কাঠের কাম্‌রা চলে গেছে, পাশ দিয়ে যেতে যেতে পর্দ্দার ফাঁকে কাঞ্চন দেখ্‌তে পেল প্রত্যেক কাম্‌রায় লোক খাচ্ছে। কোনটাতে বাঙালী ভদ্রলোক, বাঙালী মেয়েছেলে—আবার কোনটাতে সাহেব-মেম। কাঞ্চনরা একটা কামরায় গিয়ে বস্‌ল। ভদ্রলোক ডাক্‌লেন—'বয়্'। একজন উর্দ্দী-পরা লোক এল, তাকে খাবারের তালিকা লিখে দিলেন।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা কর্‌ল—'ওই লোকটার নাম কি বয়্? এ রকম নাম কেন? ও কি চীনে? ও তো মনে হ'ল যেন আমাদের—'?

'হোটেলে যারা খাবার পরিবেষণ করে তাদের বয়্ বলে। যে বয়্ মানে বালক ও সে বয়্ নয়, ও হচ্ছে সে বয়ের বাবা।'

ছুরি-কাঁটা দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম খাদ্যও এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক ছুরি-কাঁটা চালাতে লাগ্‌লেন। কাঞ্চন হট্‌বার ছেলে নয়, সেও ছুরি-কাঁটা ধর্‌ল, কিন্তু খানিক বাদেই দেখ্‌ল ও দিয়ে খাবার ধরা যায় না কিন্তু প্লেট্ ওল্‌টাবার পক্ষে ওগুলোই যথেষ্ট। তখন ছুরি-কাঁটা পরিত্যাগ ক'রে হাতকেই এ বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন মনে কর্‌ল।

এক একটা খাবারের এক এক রকম স্বাদ! আর কেমন সব রহস্যময় নাম! আইস্‌ক্রিম্ জিনিসটাই কি চমৎকার! কাঞ্চনের যেন জন্ম সার্থক হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে আহারাদি সমাধা হ'লে পর ভদ্রলোক একতাড়া নোট্ কাঞ্চনের হাতে দিয়ে বল্লেন—'জিত্‌লে তোমাকে অর্দ্ধেক দেব বলেছিলুম।

এগুলো তোমার। চল্লিশখানা একশ' টাকার আর একশ'খানা দশ টাকার নোট্ আছে—মোট পাঁচ হাজার। নাও, ধর। এই হ্যাণ্ড্‌ব্যাগে রাখ—ব্যাগ্‌টাও তোমায় দিলুম।' কাঞ্চন বিস্ময়ে হতবাক্।

'কি ভাব্‌ছ?'

'বর্দ্ধমান লাইনের গাড়ী হাওড়া থেকে কখন ছাড়ে?'

'বাড়ী যাবে? অনেক গাড়ী আছে, তবে শেষ গাড়ী ছাড়ে বোধ হয় রাত এগারোটায়।'

'সেটাতে চাপ্‌লে ভোর বেলায় বাড়ী পৌঁছব। তবে বর্দ্ধমানে গাড়ী বদ্‌লাতে হবে।'

'টাকাগুলো নিয়ে কি করবে?'

'কত কি কিন্‌ব। রিষ্টওয়াচ্, ফাউণ্টেন্ পেন্, সাইকেল। জামা, জুতো কাপড়, পোষাক। মণ্টুর জন্য বল্, ন্যাপ্‌লার জন্য খেল্‌না, মোটার গাড়ী এই সব। আর মা'র জন্য যত বিলাসিতার জিনিস।'

'এ সব কিনেও অনেক টাকা থাক্‌বে। তা দিয়ে কি করবে?'

'মাকে দেব।'

'বেশ বেশ, ভাল কথা। তা তুমি ত দোকানে দোকানে ঘুরে এ সমস্ত কিন্‌তে পারবে না, আমার এক জানা লোক আছে সে অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ করে। চল তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই। সে-ই সমস্ত কিনে, বেঁধে-ছেঁদে ষ্টেশনে গিয়ে বুক্ করে দেবে—তোমাকে টিকিট কেটে গাড়ীতেও তুলে দিয়ে আস্‌বে।'

সেদিন রাত এগারোটার সময় কাঞ্চনকে হাওড়া ষ্টেশনের একটি ফার্ষ্ট ক্লাস্ কাম্‌রায় দেখা গেল। তখন গাড়ী ছাড়বার সামান্য মাত্র দেরী। অর্ডার সাপ্লায়ার লোকটি মালের রসিদ কাঞ্চনকে দিয়ে বল্ল—'সাইকেল্ ইত্যাদি সমস্ত জিনিস এই গাড়ীরই লাগেজ্‌ভ্যানে চল্‌ল, ষ্টেশনে নেমে এই রসিদ দেখিয়ে খালাস ক'রে নেবেন। আর মা'র জন্য কাশ্মীরী শাড়ী, জ্যাকেট্, গন্ধ-তেল, এসেন্স্, নতুন গুড়ের সন্দেশ—ইত্যাদি সব কিছু ওই সুট্‌কেস্‌টায় দিয়েছি, ওটা তো আপনি নিজের

কাছেই রাখ্‌বেন বল্লেন? সাইকেলটার পার্ট্‌স্ আর খুলি নি—কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সাবধানে দিয়েছি। ষ্টেশনে নেমে কুলীদের দিয়ে ফ্রেম্ খুলে ফেলে তখুনি চালানো যাবে—ফুল্ পাম্প করা আছে। আর কি?'

'আর কিছু না। তবে একটা কথা—' কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে কাঞ্চন দু'খানা একশ' টাকার নোট্ বার কর্‌ল।

'আপনার কাছে কিছু চাই না। আমার কমিশন্ আমি দোকানদারদের কাছ থেকে পাব।'

'না, আপনাকে দিচ্ছি না। আচ্ছা, কল্‌কাতা সহরে কতগুলো ভিখিরী আছে বল্‌তে পারেন? দু শ'?'

'বোধ হয় তারো বেশী।'

'পাঁচ শ'?'—কাঞ্চন আরো তিনখানা নোট্ বার কর্‌ল।

'তা হবে। কেন বলুন তো?'

'এই টাকাগুলো রাখুন। আপনি কাল একটা মোটর ভাড়া ক'রে একটু কষ্ট ক'রে সমস্ত কল্‌কাতা ঘুরবেন। আপনার চোখে যেখানে যে ভিখিরী পড়বে একটি ক'রে টাকা তাকে দেবেন।'

'টাকা রেখে দিন। এই বাজে খরচ কেন?'

'বেচারারা পেট ভরে খেতে পায় না, রাস্তার পাত কুড়িয়ে খায়—আমার টাকায় তবু এক দিন ভাল-মন্দ ইচ্ছামত খাবে। চিরদিনের দুঃখ ত আমি ঘোচাতে পারব না।'

'আচ্ছা, দিন তবে। এ অপব্যয় কিন্তু। ছেলেমানুষ আপনি, টাকার মূল্য বোঝেন না। গাড়ী ছেড়ে দিল। নমস্কার! আমার নাম, ঠিকানা ত বলেছি। যখন যা দরকার হয় দয়া ক'রে আমাকে লিখ্‌বেন—খুব সযত্নে পাঠিয়ে দেব।'

'আচ্ছা আচ্ছা। নিশ্চয় লিখ্‌ব। নমস্কার।'

সুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হুস্ হুস্ ক'রে গাড়ী চলেছে—একখানা কাম্‌রায় কাঞ্চন একা। জানালায় মাথা রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে কাঞ্চন

ভাব্‌ছে—মা'র কথা, বাবার কথা, ন্যাপ্‌লা ও মণ্টুর কথা, মিনির কথা, কনকের কথা। কোথায় রইল কনক, কোথায় বা মিনি। তাদের নাম জান্‌ল শুধু, কিন্তু ঠিকানা জানে না। কোনদিন কি এ জীবনে আর দেখা হবে তাদের সঙ্গে?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, টিকিট্-চেকারের ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন ভোর।

'এ কি বর্দ্ধমান? এখানে গাড়ী বদ্‌লাতে হবে?'

'বর্দ্ধমান অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছে। টিকিট্ দেখি? এই ষ্টেশনে নাম্‌তে হবে। একটু পরেই একখানা ডাউন গাড়ী আস্‌বে সেই গাড়ী বর্দ্ধমান যাবে। গার্ড্‌কে তোমার আগে বলে রাখা উচিত ছিল, তা হ'লে বর্দ্ধমানে নামিয়ে দিত, ওভারক্যারেড্ হয়ে তা হ'লে এই অসুবিধা পোহাতে হ'ত না।'

'যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। নরম গদী-আঁটা বিছানায় শুয়ে ভারী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কোথা দিয়ে রাত কেটেছে টের পাই নি। আচ্ছা, এই ডাউন গাড়ীতে চাপ্‌লে আমার বাড়ীর ষ্টেশনে কখন্ পৌঁছব?'

'এই দুপুর নাগাদ। বর্দ্ধমানে নিশ্চয়ই করেস্‌পণ্ডিং ট্রেন্ পাবে, তবে বোধ হয় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে হবে, সেই সময় 'রেষ্টুরাণ্ট্-কারে' খেয়ে-দেয়ে নিতে পার।'

কাঞ্চন যখন তার বাড়ীর ষ্টেশনে পৌঁছল তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। সেদিন গাড়ী একটু 'লেট্' ছিল। রসিদ দেখাতেই ষ্টেশন মাষ্টার বল্লেন—'এ সব মাল তো আজ সকালের গাড়ীতে এসে পড়ে রয়েছে। তুমি বুঝি গাড়ী বদলাবার সময় গাড়ী ধরতে পার নি?'

'প্রায় সেই রকম। দেখুন আমি শুধু আমার সাইকেল্‌টা এখন নেব। বাকী জিনিসপত্র পরে লোক এসে নিয়ে যাবে কিংবা আপনি যদি একটা কুলী দিয়ে পাঠিয়ে দেন—'

'তাই দেব।' বলে ষ্টেশন মাষ্টার তার টিকিট্‌খানি নিয়ে চলে গেলেন।

কাঞ্চন সাইকেল্‌টার প্যাকিং খুলে পিছনের ক্যারিয়ারে সুট্‌কেস্‌টাকে শক্ত

কাছেই রাখ্‌বেন বল্লেন? সাইকেলটার পার্ট্‌স্ আর খুলি নি—কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সাবধানে দিয়েছি। ষ্টেশনে নেমে কুলীদের দিয়ে ফ্রেম্ খুলে ফেলে তখুনি চালানো যাবে—ফুল্ পাম্প করা আছে। আর কি?'

'আর কিছু না। তবে একটা কথা—' কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে কাঞ্চন দু'খানা একশ' টাকার নোট্ বার কর্‌ল।

'আপনার কাছে কিছু চাই না। আমার কমিশন্ আমি দোকানদারদের কাছ থেকে পাব।'

'না, আপনাকে দিচ্ছি না। আচ্ছা, কল্‌কাতা সহরে কতগুলো ভিখিরী আছে বল্‌তে পারেন? দু শ'?'

'বোধ হয় তারো বেশী।'

'পাঁচ শ'?'—কাঞ্চন আরো তিনখানা নোট্ বার কর্‌ল।

'তা হবে। কেন বলুন তো?'

'এই টাকাগুলো রাখুন। আপনি কাল একটা মোটর ভাড়া ক'রে একটু কষ্ট ক'রে সমস্ত কল্‌কাতা ঘুরবেন। আপনার চোখে যেখানে যে ভিখিরী পড়বে একটি ক'রে টাকা তাকে দেবেন।'

'টাকা রেখে দিন। এই বাজে খরচ কেন?'

'বেচারারা পেট ভরে খেতে পায় না, রাস্তার পাত কুড়িয়ে খায়—আমার টাকায় তবু এক দিন ভাল-মন্দ ইচ্ছামত খাবে। চিরদিনের দুঃখ ত আমি ঘোচাতে পারব না!'

'আচ্ছা, দিন তবে। এ অপব্যয় কিন্তু। ছেলেমানুষ আপনি, টাকার মূল্য বোঝেন না। গাড়ী ছেড়ে দিল। নমস্কার! আমার নাম, ঠিকানা ত বলেছি। যখন যা দরকার হয় দয়া ক'রে আমাকে লিখ্‌বেন—খুব সযত্নে পাঠিয়ে দেব।'

'আচ্ছা আচ্ছা। নিশ্চয় লিখ্‌ব। নমস্কার।'

সুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হুস্ হুস্ ক'রে গাড়ী চলেছে—একখানা কাম্‌রায় কাঞ্চন একা। জানালায় মাথা রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে কাঞ্চন

ভাব্‌ছে—মা'র কথা, বাবার কথা, ন্যাপ্‌লা ও মণ্টুর কথা, মিনির কথা, কনকের কথা। কোথায় রইল কনক, কোথায় বা মিনি। তাদের নাম জান্‌ল শুধু, কিন্তু ঠিকানা জানে না। কোনদিন কি এ জীবনে আর দেখা হবে তাদের সঙ্গে?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, টিকিট্-চেকারের ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন ভোর।

'এ কি বর্দ্ধমান? এখানে গাড়ী বদ্‌লাতে হবে?'

'বর্দ্ধমান অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছে। টিকিট্ দেখি? এই ষ্টেশনে নাম্‌তে হবে। একটু পরেই একখানা ডাউন গাড়ী আস্‌বে সেই গাড়ী বর্দ্ধমান যাবে। গার্ড্‌কে তোমার আগে বলে রাখা উচিত ছিল, তা হ'লে বর্দ্ধমানে নামিয়ে দিত, ওভারক্যারেড্ হয়ে তা হ'লে এই অসুবিধা পোহাতে হ'ত না।'

'যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। নরম গদী-আঁটা বিছানায় শুয়ে ভারী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কোথা দিয়ে রাত কেটেছে টের পাই নি। আচ্ছা, এই ডাউন গাড়ীতে চাপ্‌লে আমার বাড়ীর ষ্টেশনে কখন্ পৌঁছব?'

'এই দুপুর নাগাদ। বর্দ্ধমানে নিশ্চয়ই করেস্‌পণ্ডিং ট্রেন্ পাবে, তবে বোধ হয় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে হবে, সেই সময় 'রেষ্ট্‌রাণ্ট্-কারে' খেয়ে-দেয়ে নিতে পার।'

কাঞ্চন যখন তার বাড়ীর ষ্টেশনে পৌঁছল তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। সেদিন গাড়ী একটু 'লেট্' ছিল। রসিদ দেখাতেই ষ্টেশন মাষ্টার বল্লেন—'এ সব মাল তো আজ সকালের গাড়ীতে এসে পড়ে রয়েছে। তুমি বুঝি গাড়ী বদলাবার সময় গাড়ী ধরতে পার নি?'

'প্রায় সেই রকম। দেখুন আমি শুধু আমার সাইকেল্‌টা এখন নেব। বাকী জিনিসপত্র পরে লোক এসে নিয়ে যাবে কিংবা আপনি যদি একটা কুলী দিয়ে পাঠিয়ে দেন—'

'তাই দেব।' বলে ষ্টেশন মাষ্টার তার টিকিট্‌খানি নিয়ে চলে গেলেন।

কাঞ্চন সাইকেল্‌টার প্যাকিং খুলে পিছনের ক্যারিয়ারে স্যুটকেসটাকে শক্ত

ক'রে বাঁধ্‌ল। তার পরে সাইকেলে চেপে কাঞ্চন বোঁ বোঁ ক'রে তার বাড়ীর দিকে পাড়ি দিল।

১৮

বাড়ী পৌঁছে কাঞ্চন এক বার ভাল ক'রে চারিদিক্ চেয়ে দেখ্‌ল। কেউ কোথাও নেই। চাকরটাকেও দেখ্‌তে পেল না। সাইকেল্‌টাকে বাইরে রেখে পা টিপে টিপে ভেতরে গেল। মণ্টু, ন্যাপ্‌লা—এরা গেল কোথায়? হয় ত পাড়ায় কোথাও খেল্‌তে গেছে। মা? ঐ যে মা একটা বই হাতে নিয়ে—ঘুমুচ্ছেন নাকি?—না, জেগেই আছেন যে!

কাঞ্চনকে দেখে মা আনন্দে চেঁচাতে যাবেন, কাঞ্চন তাঁর মুখ চেপে ধর্‌ল। '—মা, চুপ্, বাবা কোথায়?'

'কর্ত্তা? খেয়ে-দেয়ে ঘুমুচ্ছেন।'

'বেঁচেছি তা হ'লে।'

'তোর ওপর ওঁর আর রাগ নেই। তুই চলে যাওয়াতে ওঁর মন খারাপ হয়ে গেছে। এ ক'দিন ভাল ক'রে খেতে পর্য্যন্ত পারেন নি। আমি ত কেঁদে বাঁচি নে। কোথায় ছিলি তুই? তোর জন্য আশ-পাশের গাঁ সব তোলপাড় হয়ে গেছে—তোর ক্লাসের সব ছেলের বাড়ী—'

'আমি বুঝি এখানে ছিলুম? আমি যে কলকাতায় গেছ্‌লুম।'

'কলকাতায়? অবাক্ কল্লি। পয়সা পেলি কোথায়?'

'অম্‌নি। আমার কি কোথাও যেতে পয়সা লাগে? কত টাকা রোজগার ক'রে আন্‌লুম—তোমার জন্য।'

মা'র যেন বিশ্বাস হয় না। অতটুকু ছেলে কাঞ্চন, সে করবে টাকা রোজগার?

'বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ সোনার হাত-ঘড়ি। এই দেখ ফাউণ্টেন্ পেন্—এইটের দামই পনের টাকা। কেমন নতুন ফ্যাসানের জুতো দেখ।'

তাই ত! মা একেবারে অবাক্।

'কিন্তু তোর গায়ে একি মণি? চটের মত জামা-কাপড় পরেছিস্, এ তোকে মানাচ্ছে না।'

'এ বুঝি চট? তুমি হাসালে মা। এ যে খদ্দর! খদ্দর পরলে ভদ্দর হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন। গান্ধী কে জান? খুব মহৎ লোক, বয়সে খুব বড় তবু যেন ছেলেদের মত মন।'

'তা হোক্, তবু এ কাপড় তোর গায়ে সাজে না। তোর জন্য আমি সিল্কের জামা, তাঁতের কাপড় আনিয়ে রেখেছি।'

'বাঃ, আমি যে প্রথমে ওই সবই কিনেছিলুম—কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম ওর চেয়ে খদ্দর ভাল। কনক মোটা খদ্দর পরে, আমিও তাই পরলুম। আমার সে জামা-কাপড়গুলো ট্রাঙ্কে আছে, বিনোদের জন্য এনেছি। ওকেই দিয়ে দেব।'

'কনক কে?'

'আমার বন্ধু। তার কথা তোমায় রাত্রে শুয়ে শুয়ে গল্প কর্‌ব। তার কথা, মিনির কথা, কলকাতার ভোজের কথা—হ্যাঁ, তোমার জন্য আমি চমৎকার সন্দেশ এনেছি, তুমি যে লুচি দিয়ে খেতে ভালবাস; ট্রাঙ্কে আছে, খেয়ে দেখ, গাঙ্গুলির সন্দেশ তার কাছে কোথায় লাগে!'

'আমার জন্য তো সন্দেশ আনলি, তোর বাবার জন্য কি এনেছিস্?'

'বাবার জন্য কি আর আন্‌ব? কেবল একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি। জানি ওটা কোন্ দিন আমার পিঠেই ভাঙ্‌বে, তবু আনলুম।'

'আর মণ্টু, ন্যাপ্‌লা?'

'ওদের জন্য বল্, ব্যাট্, ট্রাইসিকেল্, কত রকম খেল্‌না, পুতুল, মোটর-গাড়ী—কত কি! তোমার জন্য কত গল্পের বই এনেছি। সে সব ট্রাঙ্কে আছে—তিনটে বড় বড় ট্রাঙ্ক্ বোঝাই কত জিনিস! ষ্টেশন মাষ্টার কুলী দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।'

'এত টাকা পেলি কোথায়?'

'সে তোমায় সব রাত্রে বল্‌ব। ধরে নাও না কেন ভগবান আমায় দিয়েছেন। এমন কি হয় না?'

'তা হয়। কলকাতায় কোথায় কোথায়-বেড়ালি? কি দেখ্‌লি? চিড়িয়াখানা, পরেশনাথের মন্দির, শিবপুরের বাগান—এ সব দেখেছিস্?'

'না, সময় পাই নি। তা ছাড়া, কোথায় যে ওগুলো আছে জানতুমও না। এত ত হেঁটেছি, কোন দিন পথের ধারেও পড়ে নি। পড়লে কি আর না দেখে ছাড়তাম? তবে এমন একটা জায়গা দেখে এসেছি যা কলকাতা গিয়েও লোকে দেখ্‌তে পায় না।'

'কি জায়গা রে?'

'রেস্ কোর্স্—সেখানে ঘোড়দৌড় হয়। সে সব তোমাকে রাত্রে বল্‌ব। ভারী মজার গল্প। এখন আমার একটা কথা শুনবে? তোমার পায়ে পড়ি মা।'

ব'লে কাঞ্চন স্যুটকেস্ খুলে শাড়ী, জ্যাকেট্ ইত্যাদি বার করে। 'এইগুলো তোমায় পরতে হবে মা।'

'এখন?'

'হ্যাঁ, এখনই। আমি দেখ্‌ব।'

ছেলের আবদার, কি করেন, মাকে পরতে হ'ল। কাঞ্চন বল্লে—'বাঃ, তোমাকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে মা! সত্যি! এইবার এই জিনিসটা মুখে মাখো দেখি। এটার নাম হিমানী—এক রকম স্নো। এইবার তুমি এই কৌচটায় ব'স। আমি তোমায় পুজো কর্‌ব, অঞ্জলি দেব।'

কাঞ্চন নোটের তাড়া নিয়ে মার দিকে ছুঁড়ে দেয়—বৃষ্টির মত চারিদিকে নোট্‌গুলো ছড়িয়ে পড়ে। মা দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে থাকেন, তাঁর মুখ থেকে কথা বেরয় না।

'কোত্থেকে এত টাকা পেলুম ভাব্‌ছ? সে তোমাকে এক কথায় বোঝাতে পার্‌ব না। আগে বল দেখি রেস্ কয় প্রকার? দুই প্রকার,—কিন্তু সে বোঝাতে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে। বিশু কাকা যেমন লটারীতে অনেক টাকা পেয়েছিল না, আমি এক রকম তাই পেয়েছি। না, না, ওগুলো কুড়িয়ো না, অম্‌নি চারদিকে ছড়িয়ে থাক্। তুমি মাঝখানে বসে থাক মা!'

মা হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন।

'মা, একটা কথা বল্‌ব? তোমার কোলে একটু বস্‌ব? আমি বড় ভারী হয়ে গেছি, তোমার লাগ্‌বে কিন্তু।'

কাঞ্চন গিয়ে মা'র কোলে বসে। মা'র গলা জড়িয়ে ধরে। মা কাঞ্চনের কপালে একটা চুমু খান্। কাঞ্চন মা'র বুকে মুখ লুকায়।

মা'র চোখ দিয়ে জল পড়ে।

—শেষ—

হিন্‌ডেন্‌বার্গ

(শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

আজ তোমাদের যাঁর কথা বল্‌ছি তাঁর নাম হচ্ছে ফিল্ড্ মার্শাল্ ফন্ হিন্‌ডেন্‌বার্গ। কয়েক বছর আগে পৃথিবীব্যাপী যে মহাযুদ্ধ হ'য়ে গেছে তাতেই তিনি জগতে বিখ্যাত হয়েছেন। এই যুদ্ধের আগে তিনি এমন কিছু বিশেষ পরিচিত ছিলেন না।

হিন্‌ডেন্‌বার্গ

হিন্‌ডেন্‌বার্গ ১৮৪৭ সনে পোসেনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই সমরবিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁর বাবাও ছিলেন সৈন্যবিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী। শৈশব কাল থেকেই হিন্‌ডেন্‌বার্গের সেনানায়ক হবার প্রবল ইচ্ছা। ইতিহাসের বীরত্বের কাহিনী তিনি পড়তে ও শুনতে খুব ভাল বাস্‌তেন। তাঁর চরিত্রগঠন ও প্রথম শিক্ষা হয় তাঁর মায়ের হাতে; পিতার কাছে শেখেন দেশকে সেবা করতে, প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালবাস্‌তে। মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি আত্মীয়পরিজনকে ছেড়ে

গেলেন সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করে ফিরলেন। যখন মাত্র ১৭ বছর বয়স, তখন তিনি দেশের হ'য়ে যুদ্ধে গেলেন। KONIGGRATZ (কনিগ্রাৎস্)এ বিশেষ আহত হ'ন। এর পরই তিনি যোগদান করেন ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান্ যুদ্ধে। পরে জীবনের নানা কাজের মধ্যে তাঁকে জার্ম্মানীর সামরিক কলেজে গণিতের অধ্যাপকতা করতে হয়েছে। ৬৫ বছর বয়সে সসম্মানে অবসর গ্রহণ ক'রে তাঁর একান্ত প্রিয় পল্লী-ভূমিতে বসবাস করছিলেন—জীবনের শেষ দিনগুলো শান্তিতে অতিবাহিত করবার জন্য। তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তাঁর জীবন ওইখানে মোটেই শেষ নয়, সবে আরম্ভ—ডাক তাঁর শীগ্‌গির আস্‌ছে দেশের তরফ থেকে—নির্জ্জনে বিশ্রাম চল্‌বে না।

জার্ম্মান্‌দের বিশ্ববিধ্বংসী হাউইট্‌জার কামান

যুদ্ধ বাধ্‌ল—১৯১৪ সনের মাঝামাঝি জার্ম্মানীর অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে উঠ্‌ল। একদিকে পরাক্রান্ত ফরাসী ও ইংরাজ সৈন্য—আর অন্য দিকে রাসিয়ার বিপুলবাহিনী। জার্ম্মানীর কাইজার দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে হিন্‌ডেন্‌বার্গকে ডাক দিলেন। হিন্‌ডেন্‌বার্গ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর দেশের ডাক মাথায় পেতে নিয়ে বল্লেন, "আমি প্রস্তুত"।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমে তারা

ফরাসী সৈন্যকে আক্রমণ করবে, তার পর রাসিয়ার সৈন্যকে। কারণ ফরাসীরা দ্রুততর রাসিয়ান্‌দের চাইতে। কিন্তু সংকল্প পুরোপুরি কাজে এল না; রাসিয়াই অপ্রত্যাশিত দ্রুত আস্‌তে লাগ্‌ল। তাদের বিরুদ্ধে জার্ম্মান্ সেনানীরা তেমন কিছু করে উঠ্‌তে পার্‌লে না—সেইজন্যই বৃদ্ধ হিন্‌ডেন্‌বার্গের তলব পড়্‌ল। তাঁর সহচর হলেন লুডেনডর্ফ্।

হিন্‌ডেন্‌বার্গ রাসিয়ার সৈন্যের চেয়ে অনেক কম সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে গেলেন। যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ তিনি পালাবার ছল ক'রে পিছিয়ে একটা জলাভূমির ওপর চলে এলেন—তাঁর এ সব স্থান বিশেষভাবে পরিচিত। রাসিয়া তার ভারী ভারী কামান নিয়ে জলা-ভূমিতে নেমে একেবারে বসে গেল। এখানে যে যুদ্ধ হয় তা ইতিহাসে 'টেনেনবার্গের' যুদ্ধ বলে বিশেষ পরিচিত। রাসিয়ার সহস্র সৈন্য টেনেনবার্গের যুদ্ধে প্রাণ দিল। পরাজয় সুনিশ্চিত, তাই অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদের সেনাপতি স্যামসোনোফ আত্মহত্যা করলেন। রাসিয়ার বিপুল সৈন্যের সঙ্গে অতুল আশা নষ্ট হ'য়ে গেল—ক্রমে দেশের মধ্যে বিপ্লব দেখা দিল। হিন্‌ডেন্‌বার্গের জয়—তাঁর যশকে জগতে ছড়িয়ে দিলে। তিনি হ'লেন "চীফ্ অফ্ দি ষ্টাফ্" অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি। কিন্তু যুদ্ধ তা ব'লে শেষ হয় নি, এত বড় জয়ের পর তখন জার্ম্মানীর জন্য পরাজয় অপেক্ষা করছে। পশ্চিমে তখন পরাক্রমশালী ফরাসী ও মিত্র সৈন্য। তাই হিন্‌ডেন্‌বার্গ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হ'লেন; তিনি যে পশ্চিম সীমান্তে খাদ

আক্রমণের জন্য প্রস্তুত জার্ম্মান্ পদাতিক সৈন্যদল

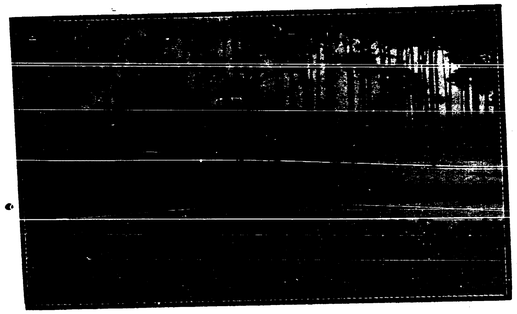

কাটিয়ে ইট দিয়ে পাকা করেন তাই 'হিন্‌ডেন্‌বার্গ' লাইন্ বলে খ্যাত। প্রায় দু' বছর জার্ম্মানীর আধিপত্য ছিল পশ্চিম সীমান্তে ঐ লাইনেরই জন্য। তখন অনেকে ভেবেছিলেন এ লাইন্ আর কেউ ভাঙ্গতে পারবে না। কিন্তু জগতে সবই সম্ভব। জার্ম্মানী নিরপেক্ষ আমেরিকার জাহাজ ডুবিয়ে দিলে। আমেরিকা প্রতিশোধ নেবে বলে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিলে। জার্ম্মানীর ভেতর তখন আবার গোলমালও আরম্ভ হ'য়েছে খুব, কারণ খাদ্যের আর অর্থের অভাব। অনাহারে আর কত দিন চলে? জার্ম্মান্ সৈন্য ক্রমেই এলিয়ে পড়্‌ল, আর সেই সুযোগে ফ্রান্সের মার্শাল ফস্ জার্ম্মানীর হিন্‌ডেন্‌বার্গ লাইন্ ভেঙ্গে জার্ম্মানীকে বসিয়ে দিলে।

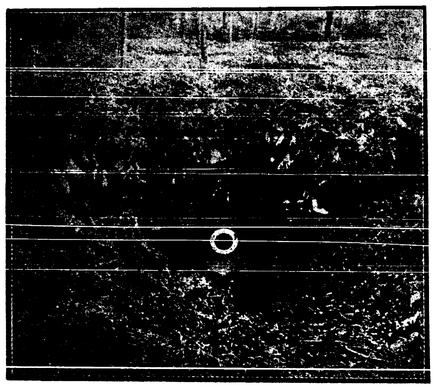

খাদের ভিতর জার্ম্মানদের লুকান' কামান

দেশের এই ভীষণ শোচনীয় দিনে একা হিন্‌ডেন্‌বার্গ অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১৯১৯ সনে শান্তি স্থাপিত হ'ল। কিন্তু তখন জার্ম্মানী একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে গেছে—তার আর কিছুই আপনার বল্‌তে নেই—যুদ্ধ নামে ভীষণ রাক্ষসের মুখ থেকে। বিজয়ীরা কতিপয় বিশিষ্ট লোক আর স্বয়ং কাইজারকে দোষী নির্ণয় ক'রে বিচার করবে বল্লে। হিন্‌ডেন্‌বার্গ বলে পাঠালেন, "যদি বিচার করতে হয় ত আমারই বিচার কর—"।

শান্তিস্থাপনের পর হিন্‌ডেন্‌বার্গ আবার তাঁর শান্তিময় পল্লীজীবনে ফিরে গেলেন। কিন্তু দেশ আবার তাঁকে ডাক্‌ল—১৯২৫ সনে—গণতন্ত্রে তাঁকে প্রেসিডেন্ট্ হবার জন্য। জার্ম্মানীর তো একেই দারুণ অর্থকষ্ট, তার ওপর ফরাসীরা রুঢ়ের

খনি দখল ক'রে বসেছিল। হিন্‌ডেন্‌বার্গ প্রেসিডেন্ট্ হবার পর জার্ম্মানী আবার তা ফিরে পেল। এই প্রেসিডেন্টের পদে তিনি দশ বছর ছিলেন। তিনি যখন তাঁর প্রাণাপেক্ষা দেশকে দশের হাতে রেখে চিরবিশ্রামে মগ্ন হ'লেন—২রা আগষ্ট ১৯৩৪ সালে—তখনও তিনিই প্রেসিডেন্ট্। এই দশ বছর কাল তাঁর চরিত্রের সকল গুণকে রূপ দিয়েছে—তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আশ্চর্য্য কার্য্যকুশলতা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি যখন প্রথম প্রেসিডেন্ট্ হ'ন তখন জার্ম্মানী অর্থকষ্টে, লাঞ্ছনায়, অপমানে প্রপীড়িত। হিন্‌ডেন্‌বার্গ সেই শোচনীয় অবস্থা থেকে জার্ম্মানীকে অনেক তুলেছেন। আজকের নবীন জার্ম্মানীর প্রধান পুরোহিত ছিলেন চিরনবীন হিন্‌ডেন্‌বার্গ। হিন্‌ডেন্‌বার্গ যেদিন বুঝলেন, হের হিটলারকেও দেশ চাইছে—সেইদিন তিনি নিজেও হের হিটলারের কাছে তাঁর চিরউন্নত মাথা নোয়ালেন, কেননা দেশ যাকে চাইছে তিনিও তাকে চান। পিতৃভূমির (Fatherland) সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই—দেশের চাওয়াই হচ্ছে তাঁরও চাওয়া। তাঁর জীবনের ব্রতই ছিল দেশের সেবা—দেশের পূজা।

শুদ্ধি-পত্র

(শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-টি)

"বিলাত যাত্রা"—কলিকাতা বাহুড়বাগান ষ্ট্রীটস্থ সিদ্ধার্থ প্রেসের সুযোগ্য সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ মল্লিক প্রেস ও প্রুফ্ সম্পর্কে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালী আয়ত্ত করিবার জন্য "ভিক্টোরিয়া" নামক জাহাজে সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ বাবু স্বাবলম্বী, উদ্যোগী পুরুষ; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার যাত্রার সাফল্য কামনা করি।"

হঠাৎ খবরটা পড়িয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলাম। সি—দ্ধা—র্থ!

সি—দ্ধা—র্থ—ম—ল্লি—ক। বিস্মৃতির যবনিকা ছিঁড়িয়া গিয়া সুদূর বাল্যকালের একটি দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, গোঁয়ার-গোবিন্দ টাইপ্-এর মূর্ত্তি মনের পটে ফুটিয়া উঠিল।

ভাবিয়াছিলাম বলিব না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, সিধু দা' আর সে সিধু দা' নাই। বর্ত্তমানের সিদ্ধার্থ মল্লিকের সহিত চুঁচুড়ার স্কুলের সেই সিধু দা'র হয় ত নাম মাত্র সাদৃশ্য আছে। তা ছাড়া, এখন সিধু দা'র ছাত্র-জীবনের একটা অবজ্ঞাত অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইলেও তাহার নিজের হয়ত কোন আপত্তি হইবে না, বরং তাহার জীবন-নাট্যের এই অদ্ভুত বিপর্য্যয়ের চিত্র অনেক হতাশ মনে আশার সঞ্চার করিবে।

সে আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আমরা তখন চুঁচুড়ার স্কুলে পড়ি। আমাদের যেবার ফোর্থ ক্লাশ, সেইবার সিদ্ধার্থ মল্লিক সেকেণ্ড ক্লাশে ভর্ত্তি হয়। বয়স আন্দাজে সিদ্ধার্থ ছিল যেমনি লম্বা তেমনি জোয়ান্। স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই অল্প কালের মধ্যেই সিদ্ধার্থ হইয়া উঠিল আমাদের সিধু দা'। ওরই দৌলতে আমাদের স্কুলের টিম্‌টিমে 'টিম্' রাতারাতি হইয়া উঠিল দুর্দ্ধর্ষ—পর পর তিনটা চ্যালেঞ্জ্ শীল্ড্ জয় করিয়া আমরা তো আনন্দে আত্মহারা। চারিদিকে জাগিয়া উঠিল সিদ্ধার্থের—জয় জয়কার। ছেলেদের সবার মুখে 'সিধু-দা', মাষ্টার মশাইদের সবার মুখে 'সিদ্ধার্থ', জনসাধারণের মুখে মুখে 'মাষ্টার মল্লিক'।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই লেখাপড়ায় সিধু দা'র গুণপনা প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। স্কুলের নিম্নতম শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী অবধি পাঁচ শত ছাত্রের মধ্যে সিদ্ধার্থ মল্লিক ছিল—অনন্যসাধারণ। হ্যাঁ, অনন্যসাধারণই বটে; কারণ মে মাসের স্পোর্ট্‌স্-এর সবগুলি ইভেণ্টে ওর রেকর্ড্ যেমনি হইল 'চ্যাম্পিয়ন্', ডিসেম্বর মাসের য়্যানুয়াল্-এর সবগুলি নম্বর মিলিয়া ওর টোটাল্‌ও তেমনি হইল চল্লিশ! হ্যাঁ চল্লিশ—সাত শ'র মধ্যে সবশুদ্ধ চল্লিশ!

আমরা অবাক্ হইলাম, মাষ্টার মশাইরা ত' হতবাক্! ব্যাপারটায় সিধুদা'ও রীতিমত আঘাত পাইল—পাইবারই কথা। আঘাত পাইল কিন্তু হতাশ হইল না। কারণ ওর ছিল—যাকে ব'লে প্রকৃত 'স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান্-লাইক্ স্পিরিট্'। কিছুতে হতাশ হইয়া পড়িবার মত ছেলে সিদ্ধার্থ মল্লিক নয়। জানুয়ারী মাসের পুরস্কার

বিতরণী সভায়, ফেব্রুয়ারী মাসের সরস্বতী পূজার উৎসবে সিধু দা' যা পরিশ্রম করিল, তার সত্যই তুলনা হয় না।

কিন্তু মা সরস্বতীর বিচার নির্ম্মম, নিরপেক্ষ। পরের বারেও বার্ষিক পরীক্ষায় সিধু দা'র সমস্ত পূজা, প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়া গেল। প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য নম্বর তাহার জুটিল না।

সেইবার বরাত গুণে আমরা সিধু দা'র সহপাঠী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। দুই-দুইবার ফেল্ করিয়াও সিধু দা' পুনর্ব্বার রীতিমত স্কুল করিতে লাগিল। আমাদের সমপাঠী হওয়াতে সিধু দা'র যত বা হইয়াছিল ক্ষোভ এবং দুঃখ, আমাদের কিন্তু তার চাইতেও বেশী হইয়াছিল গৌরব এবং সম্মানবোধ। ফুট্‌বলে, সাঁতারে, কুস্তীতে—সর্ব্ববিধ স্পোর্ট্‌স্-এ চ্যাম্পিয়ন্ সিদ্ধার্থ মল্লিক স্বয়ং আমাদের ক্লাশ-ফ্রেণ্ড্! এর চেয়ে বড় আর কোন অধিকারের কথা ঐ বয়সে আমাদের সত্যিই ভাবিবার অবসর ছিল না। যা' হোক্, দুই চারি দিনেই সিধু দা' সাম্‌লাইয়া উঠিল। আবার ফি বছরের মত চারিদিকে তোড়জোড় সুরু হইল। স্কুলের কাপ্তানী—সে তো ওর একচেটিয়া। কিন্তু দুইবার ফেল্ করিয়া সিধু দা' সহসা পড়াশুনার প্রতি ভয়ানক ভক্তিমান হইয়া উঠিল। দেখিতে না দেখিতে 'ফার্ষ্ট্ বয়' হইয়াও আমিই হইয়া উঠিলাম 'লাষ্ট্ বয়' সিধু দা'র পরম অন্তরঙ্গ দরদী বন্ধু।

সিধু দা'র সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতেই টের পাইলাম, পড়াশুনায় ভাল হওয়ার জন্য ওর কী প্রাণপাত চেষ্টা ও আগ্রহ! অবস্থা ওর ভীষণ খারাপ—মা-বাপ নাই। মামার খরচে অতি কষ্টে পড়া চলে। দু'বার ফেল্ করিয়াও নিতান্ত হাতে-পায়ে ধরিয়াই মামাকে আর একবার খরচ চালাইতে রাজী করাইয়াছে। প্রাইভেট্ মাষ্টার রাখা তো দূরের কথা, রোজ বাজার করিয়া, খুঁটিনাটি কাজ করিয়া পড়াশুনার সময় ওর খুব কমই হইত। তবু রোজ রাত জাগিয়া সিধু দা'র পড়া আয়ত্ত করিবার সেই প্রয়াস আমাকে সত্যই অভিভূত করিল। অথচ কী আশ্চর্য্য! ক্লাশের টাস্‌ক্ করিয়া এ যাবৎ কোনদিন সিধু দা' একটু ভাল রিমার্ক্ পাইল না। "ট্রান্‌স্লেশন্ করা আর ক্যারি করা ঠিক এক কাজ নয় সিধু! ফুট্‌বলের কিক্ মাঠে যেমন শোভা পায় পরীক্ষার খাতায় তেমন নয়—"

ইত্যাদি রূপ শ্লেষবাক্য তাহাকে প্রায়ই নীরবে সহ্য করিতে হইত। মাষ্টার মশাইরা (হয়ত অনেক ছাত্রও) ধারণা করিতেন—সিদ্ধার্থ মল্লিক একটা মূর্ত্তিমান্ গুণ্ডা-বিশেষ! কিন্তু আমি জানিতাম ওর চরিত্রের প্রকৃত রহস্য, জানিতাম সিধু দা'তে আর গুণ্ডাতে কি পর্ব্বত-প্রমাণ প্রভেদ! কতদিন ও বাসায় টিঁকিতে না পারিয়া আমাদের বাড়ী খাইয়া-দাইয়া, বৈঠকখানা ঘরে থাকিয়া রাত জাগিয়া পড়া করিয়াছে! আমি ছাড়া ক'জন সে খোঁজ রাখিত?

প্রাণপণে আমি সিধু দা'র পড়াশুনায় সাহায্য করিতাম, নিজের পড়ার ক্ষতি করিয়াও আমি ওর জন্য সময়ক্ষেপ করিতে ত্রুটী করিতাম না। সিধু দা'ও উৎসাহ পাইয়া আপ্রাণ পরিশ্রম করিতে লাগিল। কিন্তু করিলে কি হইবে? বার্ষিক পরীক্ষার ফল সেই এক।

হেড্‌মাষ্টার মশাই-এর পায়ে ধরিয়া…

এবার ওর মামা ওকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইবার জন্য হেড্‌মাষ্টার মশায়কে চিঠি দিলেন। বলিতে কি, ক্লাশের আন্দাজে বয়স ওর ঢের বেশী, তা'তে বারবার তিনবার একই ক্লাশে ফেল্ হওয়াতে হেড্‌মাষ্টার মশাইও ওকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমি বাধা দিলাম। ওর আগ্রহ ও উদ্যম আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সকলকে চম্‌কাইয়া দিয়া সিধু দা'—স্কুলের ক্যাপ্‌টেন্ সেই দুর্দ্ধর্ষ সিদ্ধার্থ মল্লিক—সেদিন স্কুলশুদ্ধ ছেলের সাম্‌নে হেড্‌মাষ্টার মশাইএর পায়ে ধরিয়া আরো একটী বছরের সুযোগ প্রার্থনা করিল। অনেক অনুরোধ-উপরোধে পড়িয়া

হেড্‌মাষ্টার মশাই তাহাকে এক বৎসরের জন্য 'ফ্রি' ছাত্র করিয়া লইলেন। এদিকে মামীর হাতে-পায়ে ধরিয়া সিধু দা' একটী বছরের গ্রাসাচ্ছাদনের অনুমতি আদায় করিয়া লইল। এই ভাবে সিদ্ধার্থ মল্লিকের ৪র্থ বৎসরের সেকেণ্ড্ ক্লাশের পড়াশুনা সুরু হইল।

(২)

আমি ফার্ষ্ট্ ক্লাশে উঠিয়াও কিন্তু সিধু দা'র বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত হই নাই। তখনও প্রায় প্রতিদিনই আমাকেই করিতে হইত ওর প্রাইভেট্ ট্যুশনি। হেড্‌মাষ্টার মশাইকে অনুরোধ করিয়া সিধু দা' সেবার স্কুলের ক্যাপ্তানগিরি হইতে রেহাই পাইল। ম্যাট্রিক্ ক্লাশে সে উঠিবেই এবং রীতিমত পাশ করিয়া—প্রমোশন পাইয়াই উঠিবে।

দেখিতে দেখিতে আবার ডিসেম্বর মাস আসিয়া পড়িল। একজামিনের প্রোগ্রাম দেওয়া হইয়াছে, ছোটদের 'ওরাল্' পরীক্ষা সুরু হইয়া গেছে। আজ ক'দিন ধরিয়া সিধু দা'র সঙ্গে দেখা নাই—ও-ও ব্যস্ত, আমিও।

সিধু দা'র মামার ছিল একটা ছোট্ট প্রিন্টিং প্রেস্। সিধু দা' ওর মামার গল্প আমার কাছে অনেক দিনই করিয়াছে, কিন্তু ওদের বাসায় বা ওর মামার সেই প্রেসে কোনদিন যাওয়ার সুযোগ আমার ঘটিয়া উঠে নাই। সিধু দা' নিজেই যেন সে রকম কোন সুযোগ বরাবর এড়াইয়া চলিত। অনেকদিন সিধু দা'কে উদাসীন সুরে বলিতে শুনিয়াছি—"এবার পাশ না কর্‌তে পারলে মামার ঐ প্রেসেই কম্পোজিটার হয়ে ঢুক্‌তে হবে। আমি আশ্চর্য্য হইলে সিধু দা' তেম্‌নি নির্ব্বিকার গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিত—"তা মন্দ কি রে! বেশ তো মজা আছে ওতে! আমি প্রায়ই ব'সে ব'সে দেখি।" প্রেসের কাজে ঢুকিতে যে সিধু দা'র বিশেষ কোন আপত্তি ছিল তা সত্যি নয়; কিন্তু ঐ যে কোন কিছু পাশ করিতে না পারিয়া অগত্যা ঐ কাজ করিতে হইবে, এই অপবাদ মাথা পাতিয়া লইতেই ওর যত আপত্তি।

সিধু দা'র সঙ্গে দেখা একেবারে পরীক্ষার 'হলে'। ইসারা করিতেই সিধু দা' আমার কাছে আগাইয়া আসিল। বলিলাম, "এবার কেমন হ'ল সিধু দা?"

"ভালই হবে বলে তো ভাব্‌ছি। উৎরে যেতেও পারি।"

"আপনিও যেমন, একটু এদিক্-ওদিক্ তাকালেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায়?"

কোন জবাব না দিয়া সিধু দা' হাসে। মৃদু, করুণ, উদাসীন সে হাসি। সত্যি, আমারই যেন ওর জন্য দারুণ ব্যথা মনে জাগে। আমার জেদ্ জমিয়া গেল—যে করিয়া হউক্ সিধু দা'র পাশের ব্যবস্থা করিবই করিব।

অঙ্কের পরীক্ষার দিন—প্রশ্ন তেমন কিছু কঠিন হয় নাই। সিধু দা'র সীট্ পড়িয়াছে আমার নাগালেই। দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল—আঁক কষিয়া আর জিওমেট্রি লিখিয়া সিধু দা' দেড় ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় সমস্ত খাতা ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছে। তবে কি সত্যি এবার ওর সাধনা সফল হইতে চলিল! তাই হোক্, আহা, তাই হোক্।

তথাপি কেমন কৌতূহল হইল—ক্লার্শ নাইন্-এর একটা 'কোশ্চেন্ পেপার' ফন্দী করিয়া আদায় করিলাম। নিজের 'আন্‌সার' সম্পূর্ণ না হইলেও খেয়ালের ঝোঁকেই আমি সিধু দা'দের অঙ্কগুলি চট্‌পট্ করিয়া ফেলিলাম। তার পর কী বুদ্ধি হইল—এক টুক্‌রা কাগজে আন্‌সারগুলি টুকিয়া সোজা সিধু দা'র সীটে চালান করিয়া দিলাম। জীবনে এই প্রথম আমি পরোপকার-প্রবৃত্তির অজুহাতে একটা স্বভাব-বিরুদ্ধ অন্যায় করিয়া বসিলাম। হ্যাঁ, অন্যায়! সিধু দা' আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেই আমি তাকে বিনা দ্বিধায় উত্তরগুলি অন্ততঃ মিলাইয়া লইতে ইসারা করিলাম।

আর মোটে আধ ঘণ্টা দেরী। তাড়াতাড়ি নিজের বাকী আন্‌সার-এ মন দিলাম। একবার আড়চোখে তাকাইয়া দেখি,—হ্যাঁ, কথাটা সিধু দা'র মনে ধরিয়াছে। কাগজের টুক্‌রাটুকু হইতে অতি সন্তর্পণে কি যেন সে টুকিয়া লইতেছে।

সেই দিনই সন্ধ্যা'র সময়ে কে যেন আমাকে অঙ্কের মাষ্টার মশায়ের বাড়ী চালাইয়া লইয়া গেলন পর দিন ইংরেজীর পরীক্ষা, কিন্তু পড়ার তাড়ার চেয়েও কৌতূহলের তাড়া আমাকে পাইয়া বসিল বেশী। সটান মাষ্টার মশায়ের কাছে উপস্থিত হইয়া কথাটা পাড়িলাম—

"স্যার, সিদ্ধার্থ মল্লিকের খাতাটা একবারটি দেখুন না স্যার!"

তা' ভাল ছেলে বলিয়া আমার একটু খাতির ছিল বৈ কি! অন্ততঃ মাষ্টার মশাই সেদিন আমার অনুরোধটা রাখিতে আপত্তি করিলেন না। সিদ্ধার্থের আন্‌সার পেপারটাই খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। রুদ্ধনিঃশ্বাসে একটু দূরে একটা বেঞ্চির উপর আমি উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছি। কিন্তু এ কি! প্রথম থেকে পর পর যত পাতা উল্টাইয়া যান, একটি পাতাতেও যদি একটী অঙ্ক বেচারার 'শুদ্ধ' হইয়া থাকে! ব্যাপার কি? কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া আমি ব্যস্তভাবে মাষ্টার মশায়ের সামনে আগাইয়া গেলাম। গিয়া অবাক্ হইয়া দেখি, অঙ্ক সিধু দা' একটার পর একটা সবগুলিই করিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটারই উত্তর শুদ্ধ হয় নাই!

পেন্সিল হাতে মাষ্টার মশাই মুচ্‌কি হাসিতেছিলেন; ভাবটা যেন—সিদ্ধার্থের খাতার এ পরিণাম তাঁর পূর্ব্বাবধিই জানা।

"আরে, এ কি!" হঠাৎ মাষ্টার মশায়ের বিস্ময়সূচক ধ্বনিতে আমার চিন্তার খেই হারাইয়া গেল। সামনেকার খোলা পাতাটার উপর চোখ পড়িতেই দেখি—

ওহ্ হরি! ওর মামার প্রেসের প্রভাব পরিপূর্ণ ভাবেই ওর পরীক্ষার খাতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। ওর খাতার একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় একটি দিব্যি পরিপাটি "শুদ্ধি-পত্র" প্রস্তুত হইয়াছে! বলা বাহুল্য আমি যে ব্লটিং পেপার-এ উত্তরগুলি টুকিয়া দিয়াছিলাম—তার সাথে ওর নিজের উত্তর একটিও মিলে নাই। অথচ তখন মোটে আধ ঘণ্টা সময় হাতে, অত তাড়াতাড়ি অঙ্কগুলি শুদ্ধ করিয়া করিবার মত সময় এবং সাহস কোনটাই সিধু দা'র হয়ত হয় নাই। তাই সে সংক্ষেপে এই সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। মামার প্রেসের ছাপানো বইতে এ রকম শুদ্ধি-পত্র সিধু দা'র অনেক দিন নজরে পড়িয়াছে; বুঝিলাম এ কীর্ত্তি তারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া!

"In page no. 1, answer no. 3, please read 324 in place of 70150."—ইত্যাদিরূপে পর পর আটটি অঙ্কের আটটি অশুদ্ধি সংশোধন করা হইয়াছে।

মাষ্টার মশাই 'হাঃ হাঃ' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"নকল করবার অনেক রকম আর্ট এ যাবৎ দেখেছি বটে, কিন্তু এ একেবারে অপরূপ—অদ্ভুত! সিদ্ধার্থ মল্লিকেরই উপযুক্ত বটে!"

হ্যাঁ, কথাটা আমাকে সুতীব্র কশাঘাতের মত বিঁধিল। মাষ্টার মশায়ের এই হাসিতে আমি তাই প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারিলাম না। সিধু দা'র এ অপদস্থতার আড়ালে যে করুণ বুদ্ধিহীনতার পরিচয় উঁকি মারিতেছিল, তাহা কেন জানি না, আমার মনে কৌতুকের চেয়ে ব্যথার ভারই বাড়াইয়া তুলিল। হয়ত ওর এই দুর্ব্বুদ্ধির জন্য অংশতঃ আমিও দায়ী।

* * * *

তার পর আজ বিশ বৎসর কালের কোলে মিলাইয়া গিয়াছে। সেই রাত্রে যে সিধু দা' তার মামার ভিটা ত্যাগ করিয়া উধাও হইয়াছিল, তার পর বন্ধুকে (?) আর এ পর্য্যন্ত ঠিকানাটুকু দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করে নাই। সংসারের বিচিত্র কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে আমিও তাহাকে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আজ দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে হঠাৎ খবরটা পড়িয়া টের পাইলাম, শত কাজের চাপেও বাল্য-বন্ধু সিধু দা'র সেই মূর্ত্তিটি ভুলিতে পারি নাই! এক নিমেষে বিশ বৎসরের গণ্ডী পার হইয়া সিধু দা'র স্মৃতিটি মনের পটে ফুটিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, বিশ বৎসর পরে মনের খাতায় সিধু দা'র সম্পর্কে আমার আবাল্য-পোষিত ধারণাটিরও একটি 'শুদ্ধি-পত্র' প্রস্তুত করিতে হইল।

নাতি—দাদু, তোমার চুলগুলো সাদা কেন?

দাদু—ও চুলগুলো পেকে গেছে।

নাতি—পেকে গেছে তো খাও না কেন দাদু? আর দু'দিন বাদেই যে পচে যাবে!

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র

কল্কে-পুরাণ

(নিতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়)

দিন কতকের জন্য দাদা মশায় এসেছিলেন বেড়াতে। আমার মধ্যে তিনি কি চীজ্ দেখ্লেন জানি না, রোজই তামাক সাজবার ফরমাস্ কর্তেন। সেদিন সন্ধ্যের পরই কেমন ঘুম-ঘুম ঠেকছিল, কোনমতে দাদা মশায়ের ছিলিম সেজে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমের ঘোরে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন—সেইটেই তোমাদের বল্ছি।

* * * *

গ্রীষ্ম কাল। দেবাদিদেব মহাদেবের সখের কলম-বাগানে এবার আর তেমন আমের ফলন হয় নি। যা দু'-চারটে আমড়াভোগ, চাল্তাখাস, দুধ-সাগর হয়েছিল, তা'রও আবার অর্দ্ধেকের বেশী বাঁদর আর বাদুড়েই দফা সেরে দিচ্ছে; নন্দী আর তাড়িয়ে তাড়িয়ে পেরে উঠছে না। একা মানুষ আর কাঁহাতক্ পারে?

ভৃঙ্গী দাদা যে মধ্যেমিশেলে একটু-আধটু সাহায্য ক'রবে সে উপায়ও নেই, সিদ্ধি ঘুঁটতে ঘুঁটতেই সে হয়রাণ। দৈনিক পাঁচ মণ সিদ্ধি ঘোঁটা বড় সহজ কথা নয়! তবুও একদিন নন্দী চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ভৃঙ্গীকে ডাকতে গিয়েছিল; গিয়ে যা শুন্ল, তা'তে আর সেখানে বাগান ছেড়ে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে সাহস হ'ল না। সিদ্ধি আর তেমন যুৎ-সই হচ্ছে না, তাই শিব ত্রিশূল উঁচিয়ে দাদাকে নাকি তাড়া করেছিলেন!—নেহাৎ ভোলানাথ তাই বাঁচোয়া, নইলে আর দাদাকে কৈলাস-মুখো হ'তে হ'ত না।

ঠিক জামাইষষ্ঠীর আগের দিন। হিমালয় থেকে মেনকার ষষ্ঠীবাটার নেমন্তন্ন চিঠি নিয়ে এক দূত এসে হাজির হ'ল;—চিঠিতে মেনকা জামাইকে বিশেষ ক'রে যেতে লিখেছেন, আর না গেলে যে তিনি বিশেষ দুঃখিত হবেন তাও জানিয়েছেন।

শিব কিন্তু যাবেন না ব'লে বেঁকে বসলেন। সেখানে মোটেই ভাঙ্-এর

সুবিধে নেই—আর তা হয়ও না; শেষে হরপার্ব্বতীতে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। সতীনের দুরবস্থা দেখে গঙ্গাদেবী জটার মধ্যে থেকে কুলকুল ক'রে হেসে গড়িয়ে প'ড়তে লাগলেন।

যাক্, শেষকালে পার্ব্বতীর কান্নার চোটে মহাদেবেরই হার হ'ল;—যাবেন ব'লে তাঁকে স্বীকার ক'রতেই হ'লো। পার্ব্বতীও বাগে পেয়ে সহজে ছাড়লেন না; শুধু হাতে সেখানে যাওয়া ভাল দেখায় না ব'লে বাগানের এক টুক্‌রি আমও নিয়ে যাবার জন্যে জেদ ক'রতে লাগলেন। শিব আর কি করেন, পার্ব্বতীর তাড়া খেয়ে কার্ত্তিক-গণেশের হাত ধ'রে ঠিক দুপুর বেলা বাগানে আম পাড়তে বেরুলেন।

কৈলাসের ভৌতিক ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ক'রে পাঁচটা বেজে গেল। নন্দীর আর কামাই নেই, সে তখনও গাছের খুব সরু সরু ডাল থেকে জাল্‌তি ক'রে আম পেড়ে টুক্‌রিটা বোঝাই ক'র্‌ছে। জ্যৈষ্ঠের ঠিকে-রোদে দারুণ পরিশ্রমে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝ'র্‌ছে। দৈবাৎ এক-আধটা আম ফস্‌কে যেটা মাটীতে প'ড়ে যাচ্ছে, শিব স্বয়ং ছুরি দিয়ে চাক্‌লা কেটে কার্ত্তিক আর গণেশকে খাওয়াচ্ছেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, টুকরিটাও প্রায় ভ'রে উঠেছে। সিদ্ধিপানের সময় বয়ে যায় দেখে শিব নন্দীকে তাড়াতাড়ি হাত চালাবার জন্য তাড়া দিচ্ছিলেন, এমন সময় বাগানের কচার বেড়ার আগড়টা ঠেলে স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা ও তাঁর পিছন পিছন নারায়ণ বাগানে ঢুক্‌লেন। শিব ব্যস্ত হ'য়ে তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রতে এগিয়ে যেতেই পিতামহ শিবের হাত জড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন—"সর্ব্বনাশ ক'রেছি আশুতোষ, সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেছি! এক ব্যাটা অসুরকে সাংঘাতিক একটা বর দিয়ে ফেলেছি! সে পাষণ্ড এখন তা'রই জোরে স্বর্গ আক্রমণ ক'রতে আস্‌ছে। রক্ষা কর আশুতোষ, তুমি না রক্ষা ক'রলে আর কোন উপায় নেই....." পিতামহের গলাটা যেন শেষের দিক্‌টা একটু ধরে গেল।

এত বড় একটা বিপদ্, কিন্তু নারায়ণের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বাগানে ঢুকেই কার্ত্তিক আর গণেশকে জুটিয়ে নিয়ে সারা বাগান দৌড়াদৌড়ি, হুটোপাটী

ক'রে বেড়াতে লাগলেন। যে গাছে বেশ পাকা টুক্‌টুকে আম দেখছেন সুদর্শন চক্র দিয়ে তখনই পেড়ে আঠা সমেত কার্ত্তিক-গণেশকে খেতে দিচ্ছেন। নিজেও খাচ্ছেন মাঝে মাঝে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে এক পেট আম খেয়ে পিতামহেরা যেখানে বসে পরামর্শ ক'রছিলেন সেখানে নারায়ণ এসে পা ছড়িয়ে বসে প'ড়লেন।

ব্রহ্মা একবার আড়চোখে তাঁর দিকে চেয়ে একটু অনুযোগ দিলেন—ভাবটা 'ওহে নারায়ণ, দেবতাদের সমূহ বিপদ্, এই কি তোমার স্ফূর্ত্তির সময় হ'ল?'

নারায়ণ কোন কথা গায়েই মাখলেন না, বল্‌লেন, "কি হ'ল আপনাদের?" তার পর মহাদেবের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "কেমন, রাজী তো? আমাদের রণ-সজ্জা সব প্রস্তুত কিন্তু।"

ব্রহ্মা বল্‌লেন, "ওঁর আপত্তি নেই—আর করার কথাও নয়। তবে আশুতোষ ব'লছেন যে, সিদ্ধির সরবৎ খেতে আর তেমন ইয়ে হচ্ছে না,—তাই শরীরেরও যুৎ নেই। ভাল রকম একটা মৌতাতের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার্‌লে ওঁর শরীরটা চাঙ্গা হয় আর ওঁর রাজী হ'তেও কোন বাধা থাকে না। তোমার তো এদিকে মাথা-টাথা বেশ খেলে নারায়ণ, দাও না একটা ব্যবস্থা ক'রে।"

নারায়ণ একটু মাথা চুল্‌কে বল্‌লেন—"তা যখন ঘোঁটা সিদ্ধিতে তেমন ওঁর সুবিধে হচ্ছে না তখন সেজে খেলেই পারেন।"

এক মুখ হেসে ব্রহ্মা বল্‌লেন, "নারায়ণ বলেছে বেশ! বাবাজী?"

"...সেজে খাব কি ক'রে? সে রকম তো কোন যন্ত্র আমার জানা নেই!" আশুতোষ নারায়ণের মুখের দিকে উৎসুকভাবে তাকালেন।

"সে ব্যবস্থা আমি ক'রছি"—ব'লে নারায়ণ ইঞ্জিনীয়ার বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ ক'রলেন।

তখনই বিশ্বকর্ম্মা এসে তিন জনকে প্রণাম ক'রে হাতযোড় ক'রে দাঁড়ালেন।

নারায়ণ বল্‌লেন, "আশুতোষকে সিদ্ধি সেজে খাবার একটা যন্ত্র তৈরী ক'রে দাও বিশ্বকর্ম্মা। চট্‌পট্, বড় তাড়াতাড়ি।"

"যে আজ্ঞে, এই দিই"—ব'লে বিশ্বকর্ম্মা একবার এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে

পাশেই শিবের ডম্বরুটা পড়ে থাকতে দেখলেন। তখনই সেটা তুলে নিয়ে নিমেষে নিজের থলি থেকে একটা অস্ত্র বা'র ক'রে এক ঘায়ে সেটাকে দু'-খণ্ড ক'রে ফেল্‌লেন।

"ক'র্‌লে কি! ক'র্‌লে কি!" ব'লে মহাদেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নারায়ণ হাত ধ'রে তাঁকে বসিয়ে স্থির হ'তে বল্‌লেন।

খানিক ঘষা-মাজার পর বিশ্বকর্ম্মা একটী চমৎকার ক'ল্‌কে তৈরী ক'রে মহাদেবের হাতে দিলেন। দেবাদিদেব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক'ল্‌কেটা খানিক দেখে বল্‌লেন—"তার পর"?

বিশ্বকর্ম্মা এক ছুটে ভৃঙ্গীর কাছ থেকে একমুঠো সিদ্ধি এনে ক'ল্‌কের মধ্যে দিলেন। তার পর আগুন ধরিয়ে মহাদেবের হাতে দিয়ে বল্‌লেন—"দু'হাতে ধরে বুড়ো আঙুলের ফাঁকে মুখ লাগিয়ে টান দেন এবার"।

বিশ্বকর্ম্মার কথামত মহাদেব টানের পর টান দিতে লাগলেন। সমস্ত বাগানটা গন্ধে ভ'রে গেল। এ গন্ধ পিতামহের মোটেই সয় না, তাঁর পেটের ভেতর পর্য্যন্ত পাক দিয়ে উঠ্‌ল। কোন রকমে নাক বন্ধ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"বাবাজী, হচ্ছে তো"?

"তেমন সুবিধে নয়"। মুখে বল্‌লেন বটে, তবু টানের আর বিরাম নাই।

হঠাৎ নারায়ণ বল্‌লেন—"এক কাজ কর বিশ্বকর্ম্মা; আমার বাঁশীটার ফুটো ক'টা বন্ধ ক'রে কল্কেটা তা'র ওপর বসিয়ে দাও দেখি;—শেষের ফুটোটা বন্ধ ক'রো না যেন..."

বিশ্বকর্ম্মা নারায়ণের কথামত বাঁশীটার মাথায় কল্‌কেটা বসিয়ে দিলেন।

মহাদেব এবার বাঁশীর যে ফুটোটা খোলা ছিল সেইটাতে মুখ লাগিয়ে টানতে লাগলেন।

খানিক বাদে নারায়ণ বল্‌লেন—"কেমন?"

"এবার যেন একটু যুৎ হ'য়েছে"। মহাদেবের এখন আর কথা বলার অবকাশ নেই। এক একটা টান মারেন আর কল্‌কের মাথায় দপ্ দপ্ ক'রে আগুন জ্বলে ওঠে।

পিতামহ এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে বসেছিলেন; এক-আধবার যা নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন তা'রই গন্ধে তাঁর মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ ক'রছিল। মনে মনে ভাবলেন—আর নয় বাবা! মানস-সরোবরে স্নান ক'রে তবে বাড়ী যেতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"তা' হ'লে আশুতোষ, কাল সকাল সকালই যেও আমি চল্‌লাম"।

নারায়ণের চোখে একটু দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌ল। তিনি একটু চোখ মট্‌কে বল্‌লেন—"আর এক কাজ কর দেখি বিশ্বকর্ম্মা। পিতামহের কমণ্ডলুটার মধ্যে বাঁশীটা বসিয়ে একটা চাক্‌তি দিয়ে মুখটা এঁটে দাও দেখি"।

যেই বলা, সেই কাজ। পিতামহ কট্‌মট্ ক'রে নারায়ণের দিকে তাকালেন—মুখে কিছু বল্‌লেন না। হায় হায়! শেষে এত কালের কমণ্ডলুটার দফা শেষ হ'ল! পিতামহ মুখখানা গোঁজ ক'রে চলে গেলেন।

নারায়ণ বল্‌লেন—"এবার কেমন হ'য়েছে আশুতোষ? উঁহু!—কমণ্ডলুটার নলে মুখ লাগিয়ে টানুন।"

মহেশ্বর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোন্‌খান দিয়ে টান দেবেন তাই দেখছিলেন, নারায়ণের কথা শুনে নলে মুখ লাগিয়ে প্রচণ্ড গোটা কতক টান দিয়ে শিব-নেত্রে নারায়ণের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"বেঁচে থাক নারায়ণ! তবে, ধোঁয়াটা একটু গলায় লাগছে এই যা, নইলে খাসা জিনিষ হ'য়েছে"।

"তা'র আর ভাবনা কি? এই যে আমি রয়েছি"—বলে গঙ্গাদেবী শিবের জটা থেকে কমণ্ডলুর মধ্যে ঢুকলেন।

ভুড়ুৎ, ভুড়ুৎ ক'রে কমণ্ডলু ডেকে ডেকে উঠতে লাগ্‌ল। সকল ভুলে ভোলানাথ টান্‌তে টান্‌তে সেইখানেই বসে প'ড়লেন। সে যাত্রা আর না গেলেন ষষ্ঠীবাটার নেমন্তন্ন রাখতে, না গেলেন যুদ্ধে।

এদিকে মহা মুস্কিল! সেনাপতি হয় কে? নারায়ণ এসে কার্ত্তিককে সেনাপতি ক'রলেন। পার্ব্বতী কিন্তু কিছুতেই কার্ত্তিককে ছাড়তে চান না; বলেন—"ও দুধের ছেলে, ও যুদ্ধের কি জানে?" নারায়ণও ছাঁড়বার পাত্র নন্। অনেক

কষ্টে বুঝিয়ে কার্ত্তিককে যুদ্ধে নিয়ে চলে গেলেন; সেই থেকেই তো কার্ত্তিক দেব-সেনাপতি।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকার্দের লেখা

শরতে বাদল

(কুমারী সুজাতা গুপ্তা)

ভোরের বেলা বিছ্না ছেড়ে
দেখ্নু চাহিয়া,
রিমি ঝিমি বাদল ঝরে
গগন বাহিয়া।
ভাস্া ভাসা মেঘের রাশি
দিল দেখা হেথায় আসি,
শাপ্লা-তলে দাদুরী ওই
উঠ্ল নড়িয়া,
বন-কদমের পরাগ বুঝি
প্ড়্ল ঝরিয়া!

সূয্যি মামার মতন মোদের
আজকে ছুটি রে,
ছাতিম-তলে ভিজ্ছে বসি
শালিখ দু'টি রে।
অদূরে ঐ বাঁশ-বনেতে
বাদ্লা বাতাস উঠ্ল মেতে,
পথে-ঘাটে জল জমেছে,
আজকে মজা রে;
দাওয়ায় ব'সে তালে তালে
মাদল বাজা রে।

তাল-তলাতে ভিজ্ছে রাখাল
আপন কাজে রে,
ঝিরি ঝিরি ইল্সেগুঁড়ি
ঝর্ছে আজি রে।

পানকৌড়ি পুকুর-ধারে
চুপটি ক'রে ডুব যে মারে,
কেয়া-ঝনে বাদলা মেয়ের
ঘুঙুর বাজে রে,
বাদল এল, বাদল এল
আকাশ ছেয়ে রে!

ফুল-কলি

(শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

ওলো ফুল কলিদের দল,
কিসের সুখে গাছের বুকে ঘুমিয়ে আছিস্ বল্?
ওলো ফুল-কলিদের দল!

ভোম্রাগুলো বারে বারে আস্ছে ছুটে চারি ধারে
দখিন-বায়ু তোরই তরে আজি যে চঞ্চল।
ওলো ফুল-কলিদের দল!

ভাঙ্বে তোদের এ ঘুম কবে, বাতাস তখন পাগল হবে,
নানান্ রঙ্-এ রঙীন যবে কর্বি ধরাতল।
ওলো ফুল-কলিদের দল!

বায়ুর স্রোতে হেলে-দুলে, সকল কথা ভুলে ভুলে,
পাতার মাঝে, লতার কোলে দুলিস্ অবিরল।
ওলো ফুল-কলিদের দল!

ওলো ফুল-কলিদের দল,
ঘোম্টা কবে হারিয়ে যাবে আজ্কে মোরে বল;
ওলো ফুল-কলিদের দল!

চিঠি-পত্র

"শ্রাবণ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় (হাসির কবিতা) রামধনুর ১৪৫৫ নং গ্রাহক শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র ও কনকেন্দ্রনাথ সিংহ পুরস্কার পাইয়াছেন। তাহা ব্যতীত একটি অতিরিক্ত পুরস্কারও দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পুরস্কারে নিম্নলিখিত বইগুলি দেওয়া হইয়াছে—
আরব্যোপন্যাস—৫৲, যখের ধন—১৲, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৶০।

"গত ফাল্গুনের রামধনুতে 'চন্দনগড় বনাম নন্দনগড়' নামে একটি সুন্দর গল্প বাহির হইয়াছিল। উহার নীচে 'বিদেশী গল্প হইতে' বলিয়া লেখা ছিল। ১৩৩৯, অগ্রহায়ণ মাসের 'সন্দেশে' ঐ গল্পটিই 'মিছে রাগ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে বিদেশী গল্পের কোন উল্লেখ ছিল না। মাঠব্য মহাশয় কি সেইটিই নকল করিয়া 'বিদেশী গল্প হইতে' লিখিয়া দিয়াছেন?" —শ্রীঅধীররঞ্জন দে, গ্রাঃ ১৪১৪।

(মাঠব্য মহাশয়ের জবাব:—গল্পের নীচে 'বিদেশী গল্প হইতে' লেখা থাকা সত্ত্বেও এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন অত্যন্ত আপত্তিজনক। গল্পটি আমি একটি ইংরাজী গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলাম, সম্ভবতঃ সন্দেশের লেখকও সেই একই গল্প অনুবাদ করিয়াছিলেন। সন্দেশে প্রকাশিত গল্পের কথা আমি জানিতাম না। সন্দেশের লেখক যদি তাঁর গল্পটি বিদেশী গল্প বলিয়া স্বীকার না করেন তবে সেজন্য আমাকে দায়ী করা চলে না। আশা করি আপনাদের 'অধীররঞ্জন' এতটা অধীর না হইয়া তাঁহার মন্তব্য প্রত্যাহার করিবেন।
—শ্রীমাঠব্য)

"ভারতের বাহিরে কি রামধনুর কোন গ্রাহক আছেন?"—শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাঃ ১৩০৩); শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাঃ ১১৭০)

(অনেক আছেন। ইংল্যাণ্ডে, মালয়ে কিছু কিছু এবং ব্রহ্মদেশে বহু আছেন। বাংলার বাহিরে অবাঙ্গালী গ্রাহকও অনেক আছেন। তাঁহাদের তালিকা দিতে গেলে এত জায়গা লাগিবে যে তা সম্ভব নয়। —রাঃ সঃ)

"আমি গ্রাহকদের সহিত ডাকটিকেট পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক। এলাহাবাদ Imperial Stamp Co. ছাড়া কোনও Stamp কোম্পানীর নাম জানা থাকিলে জানাইবেন।" —শ্রীরবীন্দ্র পালিত, সব্‌জী-বাগ, পাটনা।

"আমি পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় কি বই পেয়েছিলাম অনেকেই জানতে চাচ্ছেন। সেগুলি এই——(১) হুলস্থুল (২) হ য ব র ল (৩) বিজ্ঞান-বুড়ো (৪) মহাভারতের গল্প-গচ্ছ (৫) দিগ্বিজয়ী বীর (৬) গল্প-সল্প।"
—জ্যোৎস্না নাহা

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ চিঠিতে অপর গ্রাহকদের সহিত পরিচিত হইতে খুব আগ্রহ দেখাইয়াছেন——

কালিদাস বসু {C/o শ্রীত্রিগুণেশ্বর বসু, Detective Inspector, খড়্গপুর (মেদিনীপুর)}; চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে {C/o শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দে, জামালপুর, (ময়মনসিংহ)}; গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য {C/o শ্রীশান্তনাথ ভট্টাচার্য্য, রামপুরহাট (বীরভূম)}; সমীরেশচন্দ্র দে {C/o. S. C. De Esq., "Girish Dham", Tilebhandeswar Lane, Benares city}; গৌরাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় {পুরোহিতপাড়া, রঙ্গযোগিনী (ঢাকা)}।

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

একটি মজার ধাঁধা তৈরী করিয়া নাম, ঠিকানা ও রামধনুর গ্রাহক নং সহ ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ধাঁধার সঙ্গে উত্তর থাকা চাই। পুরস্কার দেওয়া হইবে ধাঁধার বই।
—শ্রীঅধীররঞ্জন দে, C/o শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন দে
B. C. S. A. S. O & S. D. C. বীরহাটা, বর্দ্ধমান।

সন্দেশ

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ প্রবাসী কবি ও সঙ্গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন আর ইহলোকে নাই। ৬৩ বছর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে তিনি তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র লক্ষ্ণৌ সহরে পরলোক গমন করিয়াছেন।

অতুলপ্রসাদের নামের সঙ্গে তোমরা সকলেই বোধ হয় পরিচিত, তাঁর বহু গানও বোধ হয় তোমাদের অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে। সেই বিখ্যাত "বল বল বল সবে", কিংবা "হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর", কিংবা "মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা" অথবা "যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল" প্রভৃতি বিখ্যাত গানগুলির কথাই আমি বলিতেছি। এই গানগুলি সবই অতুলপ্রসাদের লেখা।

অতুলপ্রসাদের বাড়ী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর, তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌ সহরের খুব নাম-করা ব্যারিষ্টার। ও অঞ্চলে তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি ছিল, অনেক বড় বড় সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, অনেক বড় বড় সমিতির—যেমন ধর "আউধ বার এসোসিয়েসনে"র তিনি সভাপতি ছিলেন, এমন কি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরের পদ লইবার জন্যও তাঁকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। অথচ ঐ কর্ম্মময় জীবনের মধ্যেও তাঁর মন সর্ব্বদা পড়িয়া থাকিত বঙ্গবাণীর নিভৃত কুঞ্জে—নানা দিক্ দিয়া তিনি বাংলা ভাষার সেবা করিতেন। প্রবাসী বাংলা পত্রিকা "উত্তরার" তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনেরও তিনিই ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা। তাঁর লেখা 'কাকলি', 'গীতমঞ্জরী', 'কয়েকটি গান' প্রভৃতি বইগুলিও বাংলা ভাষার অমর সম্পদ্। তাঁর আসন সহজে পূর্ণ হইবার নয়।

* * *

শ্রীমান্ দুর্গাচরণ দাস নামে একটি তেরো বছরের ছেলে এ বছর সাঁতারে অদ্ভুত বাহাদুরী

দেখাইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এক মাইল্ সাঁতারের প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত এন্, সি, মালিকের এবং সিকি মাইল সাঁতারের প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষেরই ছিল রেকর্ড্। এবার এই ছোট্ট ছেলেটি ওই দু'টি রেকর্ড্ই ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁদের চাইতে আরো কম সময়ে ঐ দূরত্ব উত্তীর্ণ হইয়াছে।

* * *

ইংল্যাণ্ড্ ও অষ্ট্রেলিয়ার ৫ম বা শেষ ক্রিকেট্ টেষ্ট্ ম্যাচ্ শেষ হইয়াছে। এবার অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ড্কে বেশ ভাল ভাবেই পরাজিত করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার রান্ হইয়াছিল ১ম ইনিংস্এ ৭০১ ও দ্বিতীয় ইনিংস্এ ৩২৭। আর ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস্এ ৩২১ ও দ্বিতীয় ইনিংস্এ ১৪৫। অষ্ট্রেলিয়ার ব্র্যাড্ম্যান্ ও পন্স্ফোর্ড্ এবারেও অদ্ভুত খেলা দেখাইয়াছেন। সবগুলি টেষ্টের সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা আগামীবারে বাহির করিব।

* * *

মধ্যপ্রদেশের কাটনীর কাছে সেদিন মাটীর তলায় এক বিরাট্ কঙ্কাল বাহির হইয়াছে। কঙ্কালটি দেখিতে ঠিক মানুষের কঙ্কালের মত কিন্তু লম্বায় সেটি ৩১ ফুট—এক-একটা ঠ্যাংই দশ ফুট্ করিয়া। এই অদ্ভুত অধুনালুপ্ত জীবটি পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা এখনও এর সঠিক পরিচয় বাহির করেন নাই, তবে শীঘ্রই করিবেন আশা করা যায়। মাস দুই আগে তোমরা যে 'কিং কং'এর গল্প পড়িয়াছ এ কি তারই জ্ঞাতভাই?

* * *

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় ষ্টেশন্ নিউ-ইয়র্কের গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাল্। এখানে ৭৪টি প্লাট্ফর্ম্ আছে।

* * *

বিলাতের এক বৈজ্ঞানিক দাবী করিতেছেন যে তিনি অদ্ভুত একটি রবট্ বা কলের মানুষ তৈরী করিয়াছেন। তার মাথার ভিতর নাকি এমনই সব কারিকুরি আছে যা'তে সে নিজেই বুদ্ধি খাটাইয়া সোজা সোজা কথাবার্ত্তার উত্তর দিতে পারে—যেমন, বাড়ীর কর্ত্তা বাড়ী আছেন কিনা, তিনি কখন আসিবেন ইত্যাদি।

কার্ত্তিকের রামধনু (পূজা সংখ্যা) ১৮ই আশ্বিন বাহির হইবে। গল্প, কবিতা ও অন্যান্য দিক্ দিয়া এই সংখ্যা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় আমরা তাহার জন্য নানা আয়োজন করিতেছি। এই সংখ্যায় পাতাও অনেক বাড়ানো হইবে। গ্রাহকদের মধ্যে কেহ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইলে অনুগ্রহ করিয়া ৮ই আশ্বিনের মধ্যে আমাদের জানাইবেন।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

গত মাসের প্রাপ্তির উত্তর

বাক্সগুলিকে এই ভাবে সাজাইতে হইবে—

২	৭৮	১৫৬	৩৯	৪
৬	২৯	১৭৪	৫৮	৩

কিংবা

উত্তরদাতাদের নাম

সুধীরচন্দ্র দাস (ভবানীপুর); রথীন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা); ডলি, তুলতুল, দিদিমা, দাদাবাবু, নেছা, অন্তকণা, হরিঠাকুর (ভবানীপুর); স্বদেশ, মিলি, নূপুর (ফরিদপুর); দীপক গুহ, ব্যাঙাচি, বাবুই, রূপক, ললিতা, হাসিদি, অহনা (কলিকাতা); সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর); সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রীচি রোড্); টুটু, মিনু, কানু, বিনু, করুণা ঘোষাল (লেক্পল্লী); কুমার দিবাকর সেনরায় (ঢাকা); ব্যোমকেশ রাহা (চট্টগ্রাম); মণ্ট্, ফড়িং, দ্বিজু, চড়িং, কান্তি দা, মাষ্টার (কালিগাঁও); জন, রেম, পিন, কুক্কুম, বাদল (মালদহ); নবকুমার কুণ্ডু, বিনু, তারাপদ, বিষ্ণু, গোপাল, অবনী, কণা প্রভৃতি (কানন—বর্দ্ধমান); জ্ঞানশঙ্কর, কমল, তারাশঙ্কর, গিরিজা, চণ্ডী, পণ্ট্, গুরুদেব (বাঁকুড়া); তৃপ্তি মুখার্জ্জি (হাসি), কমলেশ, দিলু, দীপা, বাচ্চু (কাতরাসগড়); রাধাশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় (আদরা); রামপ্রসাদ, বলাই, সুধীর, রজনী, কাটু, দেবপ্রসাদ, তারা প্রভৃতি (বেহালা); চন্দ্রশেখর, বীণা, রথী, যূঁই, লীলা, কানু, আলো প্রভৃতি (জামালপুর); ভাট্টা উত্তরটোলা লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ (ভাট্টা—পূর্ণিয়া); মোছাম্মাৎ রমিছা খাতুন (শুনকা—হুগলি); ধ্রুব, কৃপা, রেণু, অনিল, মণি (সিমলা); রণজিৎ বেলা ও ইন্দ্রজিৎ সরকার (সুপোল); অধীররঞ্জন দে, ভোলা, ভানু, ননী, মণ্ট্, বলাই, চঞ্চল প্রভৃতি (বর্দ্ধমান); পূর্ণিমা, প্রতিমা, অনিমা, সুষমা, সুভাষ, শৈলেশকুমার বসু (কলিকাতা); জিতেন্দ্রনাথ দাস (জলপাইগুড়ি); তপেশ, রমা, রেণু, জুনু, বিজয়া দেবী (কলিকাতা); মণিদা, রাধাশ্যাম দা, কালো, মাণিক, ন্যাপলা, ডোডো, নবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি (তেলিনীপাড়া); পিনু, প্রমীলা, অপর্ণা (পালং); প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ); দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর—হাওড়া); রামেন্দু দাশগুপ্ত (ভবানীপুর); মণিদাস (উত্তর লক্ষ্মীমপুর); শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি (ভাস্তারা); জগদানন্দ সরকার (হবিগঞ্জ—ঘাটিয়া); জ্যোৎস্না, চিনু, রাঙ্গা বৌদি, ছোট বৌদি. তপেশদা, সুনীল, ননী প্রভৃতি (রাজাপুর—চট্টগ্রাম); ঊষারাণী, সন্তোষকুমার, পরিতোষকুমার ঘোষাল (গাজিপুর); মাখনচন্দ্র বাগছি, অজয়, ভাবেন, অতেন, রবি, অবনী, তারাকান্ত প্রভৃতি (লক্ষ্মণপুর); গোড়গ্রাম পি, সি, এম্, ই স্কুলের সাহিত্য-সভার সভ্যবৃন্দ (রংপুর); কিশোর লাইব্রেরীর পরিচালিকা ও গ্রাহকবৃন্দ, রমা, মায়া, ইন্দু, গোপাল,

শিবু প্রভৃতি (শ্রীরামপুর) ; জ্যোতির্ম্ময় বসু (শিবপুর) ; নারাণ, হাঁসু ও সত্যাশ্রয় (নডিহা, পুরুলিয়া) ; অমল, খোকন, কালিদাস, পাঁচু, প্রতুল গুপ্ত (মালদহ) ; কামাখ্যা, ভানু, রবি, খুকু, মুকু, গীতা (ময়নাগুড়ি) ; ফটিকদা ও অশোকরঞ্জন গুপ্ত (সিংরেল) ; অজয়কুমার দাস, অরুণা দাস, গীতা হাজরা (বালিগঞ্জ), তুলু, কালু, হরিশ, মণি, টেঁপু, রাজু, মণ্টু, প্রভৃতি (কলিকাতা) ; অমিয়কুমার রায় (আসানসোল) ; কমলা, পুষ্প, অম্বুজ, বিজলী, চিনি, নীলিমা, ঈশানী প্রভৃতি (ছবিরন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়—মাথাভাঙ্গা) ; নগেন, যতীন, অনিল, উপেন, বঙ্কিম, অমূল্য, বিনয়দা (বাসুদেবপাড়া) ; তিলকচাঁদ পটানী (চিলমারী) ; নৃপেন্দ্র, পশুপতি, কমলকৃষ্ণ (যতীন্দ্র পাঠাগার—শ্রীরামপুর) ; মাধুরী দেবী (বালিগঞ্জ) ; ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন্ ক্লাবের সভ্যগণ, শশাঙ্কশেখর বসু (বেহালা) ; সুধীর, অমরেন্দ্র, কানু প্রভৃতি (ফেণী) ; ফচু, ভক্কু, মা, দাদা, বৌদি (জামসেদপুর) ; মনু, সনু, খুসী, মোহন (কলিকাতা) ; টুনু, রেণু, যোশী, হেলো, বেণ্ট, বুড়ু, কল্যাণী দাস প্রভৃতি (গৌহাটী) ; চুণী দাশগুপ্ত (যশোহর) ; ক্ষেত্রমোহন সাহা (মোহাম্মদপুর) ; গোরা, অরুণ, নটু, কালা, চৌধুরী (ভবানীপুর) ; সুধীর কুণ্ডু, ছোটমামা, মামিমা, দিদি, কানাই, শোভা, বেলা প্রভৃতি (বসিরহাট) ; শোভারাণী ও সত্যপ্রসাদ (জামসেদপুর) ; রবীন্দ্রনাথ পালিত (পাটনা) ; সুধাংশু, বিনয়, বিলাস দত্ত (শ্রীরামপুর) ; পঙ্কজকুমার ভৌমিক (উত্তরপাড়া) ; 'লাউতা তরুণসঙ্ঘ'—শিশু-বিভাগের সভ্যবৃন্দ (লাউতা—শ্রীহট্ট) ; মহম্মদ, আজিজ ও সন্তোষ দাস (বীরভূম—নলহাটী) ; কৃষ্ণবরণ, অম্বর, প্রতিভা, সুললিত, অমিয়া (বাণীমন্দির, মুড়াগাছা) ; প্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত, আরতি, অনিল, অরুণ, অজিত, প্রীতি, বীণা প্রভৃতি (কলিকাতা)।

নুতন প্রাপ্রা

[পদবীর খেলা]

(শ্রীপরিমলকুমার রায়)

(১) কোন্ পদবী খেলার মাঠে থাকে ?
(২) কোন্ পদবী মোকর্দ্দমায় থাকে ?
(৩) কোন্ পদবী আকাশে থাকে ?
(৪) কোন্ পদবী ছোটলোক নয় ?
(৫) কোন্ পদবী সপ্তাহে একবার দেখা দেয় ?
(৬) কোন্ পদবী বই নিয়েই পড়ে থাকে ?
(৭) কোন্ পদবী দেখ্লে লোকে ভয় পায় ?

জননী

[শিল্পী—শ্রীচিন্তামণি কর]

৭ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪১ | ১০ম সংখ্যা

পূজার দিনে

(কাদের নওয়াজ, বি-এ, বি-টি)

গরুর গাড়ী চল্‌ল রে,
গরুর গাড়ী চল্‌ল রে,
রুক্ষ চাকার শব্দে ঐ
মাঠের মাটী টল্‌ল রে।
তেপান্তরের মাঠ জুড়ে
ছাগল চরে, চিল্ উড়ে,
দুপুর রোদে দূর বনে
আগুন-শিখা জ্বল্‌ল রে।

আইল্-পথে কার মেয়ে
করুণ-গীতি যায় গেয়ে,
আকুল-করা সেই সুরে
পাষাণ গিরি গল্‌ল রে।
ঐ যে পূজার বোধন আজ,
কিসের রোদন, কিসের লাজ?
দেখ্‌রে কিশোর, দেখ্ নবীন,
সাজ্‌ছে ধরা, বাজ্‌ছে বীণ্;

আজ্‌কে মোরা মুক্ত ভাই,
নাইক' বেদন, কাঁদন নাই;
বাঁধন-হারা ছুট্‌ব সব,
দৈন্য ও দুখ আজ নীরব;
রং-বাতি আর পট্‌কা কই
"শঙ্কর"দা' দাঁড়িয়ে ওই—
তার কাছেতে পয়সা নাও,
ঝুম্‌ঝুমি আর বংশীটাও

আজ ভুল না কিন্‌তে কেউ;
উঠ্‌ছে হৃদে খুসীর ঢেউ।
ছন্দ-দোলায় আজ মোরা
নাচ্‌ছি—চেয়ে দেখ্ তোরা।
হর্ষে বাজাও খুসীর বীণ্
আজকে যে ভাই পূজার দিন।

কল্‌কাতার হাল্‌চাল্

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

হর্ষবর্দ্ধন আর গোবর্দ্ধন বাবু দুই ভাই, কাঠের কারবারে বড় মানুষ। কর্ম্ম-সূত্রে আসামের জঙ্গলেই চিরটা কাল কাটিয়ে এসেছেন; এবার ওঁদের সখ হ'ল কলকাতা সহরটা দেখ্‌বার। টাকা তো কামানো কম হয় নি, এবার কিছু কমানো দরকার। তা ছাড়া, তাঁরা কিছু ফেরারী আসামী নন্ যে সারা জন্মটা আসামেই কাটাতে হবে।

কল্‌কাতা সহরটা চোখে না দেখ্‌লেও কানে যে শোনেন নি তা নয়। অনেক কিছুই শুনেছেন—অনেক দিন থেকে এবং অনেক দিক্ থেকে। মোটর-

গাড়ীর কথা শুনেছেন, বড় বড় বাড়ীর কথা শুনেছেন, বায়স্কোপের কথা শুনেছেন, এমন কি ছবিতে আজ-কাল কথা কইছে এমন কথাও ওঁদের কানে গেছে।

কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে কল্‌কাতার লোকেরা নাকি মিশুক নয়—পাশের বাড়ীর খবর রাখে না, পাড়ার লোককে চিন্‌তে পারে না। রাস্তায় বেরুলে কেবল মানুষ আর মানুষ—কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কেউ কারু সঙ্গে কথা কয় না, উপরন্তু গায়ে পড়ে ভাব করতে গেলে বিরক্ত হয়। এমন কি অচেনা কেউ যদি তোমার গায়ে এসে পড়ে, পর মুহূর্ত্তেই দেখ্‌বে তোমার পকেট বেশ হাল্‌কা হয়ে গেছে। আলাপ না করলেও বিলাপ—কোন দিকেই রক্ষা নেই।

বাস্তবিক, তাঁদের কল্‌কাতা ব্র্যাঞ্চের কর্ম্মচারী দীর্ঘছন্দে চিঠি লিখে সহরের যা হাল্‌চাল্ জানিয়েছে তাতে ভয়ের কথাই বটে। সব চেয়ে ভাবনার কথা ভাব না করার কথায়—তাঁরা দুই ভাইই ভাব করতে মজবুত, চেনা, অচেনা, অর্দ্ধ-চেনার সঙ্গে আড্ডা জমাতে তাঁদের জোড়া নেই—সকালে, বিকালে, দুপুরে এবং অনেক সময়ে গভীর রাত্রে অনর্গল কথা না বল্‌লে তাঁদের ভাত হজম হয় না। গল্প করতে তাঁদের ভারী ভাল লাগে—সেজন্য কাজ পণ্ড করতেও তাঁদের দ্বিধা নেই। কথা বল্‌বার জন্য আহার-নিদ্রা ভুল্‌তে প্রস্তুত, অপরকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে প্রস্তুত, এমন কি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। কিন্তু কল্‌কাতার লোকেরা মিশুক নয় এ খবরে তাঁরা ভারী দমে গেছেন।

কিন্তু দুই ভাই 'মরিয়া' হয়ে উঠেছেন—সহরটা একবার ঘুরে আস্‌বেনই, যা থাকে কপালে!

বড় ভাই বলেছেন, "যদি কল্‌কাতাই না দেখ্‌লাম, তবে এসে করলাম কি? কেবল কাঠ—কাঠ আর কাঠ, কাঠ কি সঙ্গে যাবে?"

কাঠের প্রতি নেহাৎ অবিচার হচ্ছে দেখে ছোট ভাই মৃদু আপত্তি জানিয়েছেন, "না দাদা, কাঠ সঙ্গে না গেলেও অন্তিমে কাজে লাগ্‌বে।"

বড় ভাই প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়েছেন,—"আমি না হয় কবরেই যাব তবু কল্‌কাতাকে একবার দেখে নেব।"

এর পর আর কথা চলে না, কিংবা কথা চল্‌লেও, কথা বাড়ানোর চেয়ে

কল্‌কাতা বেড়ানোর ইচ্ছা ছোট ভাইয়ের মনে তীব্রতর ছিল ব'লে এ ক্ষেত্রে তিনি চেপে যান। অতএব একদা অতি প্রত্যূষে আসামের বিখ্যাত বর্দ্ধন এণ্ড বর্দ্ধন কোম্পানীর দুই বড় কর্ত্তাকে শিয়ালদা' ষ্টেশনে এসে অবতীর্ণ হ'তে দেখা যায়।

সমস্ত প্লাটফর্ম্মটা এ ধার থেকে ও ধার দু' দুবার টহল দিলেন, কিন্তু নাঃ, কর্ম্মচারীটার দেখা নেই। কাল দু' দুটো জরুরি তার ক'রে জানানো হয়েছে তবু হতভাগা—

গোবর্দ্ধন বল্‌লেন, "এমন তো হতে পারে সমস্ত রাত জেগে বেচারাকে হিসেব মেলাতে হয়েছে, ভোর বেলার দিক্‌টায় তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা যে নিতান্তই এসে পড়্‌ব এজন্য হয় ত সে প্রস্তুত ছিল না—"

হর্ষবর্দ্ধন বল্‌লেন—"উঁহু"।

গোবর্দ্ধন ভুরু কুঁচ্‌কে, যেন গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছেন এই ভাবে, সব চেয়ে শোকাবহ দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দিলেন—"কিংবা এমনও হতে পারে যে ব্যাটা কিছুতেই তবিল না মেলাতে পেরে অবশেষে বাকি যা ছিল মেরে নিয়ে আমরা যখন শিয়ালদা'য় নাম্‌ছি তখন হাওড়া দিয়ে সট্‌কে পড়্‌ল?"

হর্ষবর্দ্ধন তথাপি নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দেন—"উঁ হুঁহুঁ"।

বড় বড় গবেষণা এই ভাবে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হওয়ায় মনে মনে চটে গিয়ে গোবর্দ্ধন বল্লেন, "তবে তুমি কি ভাব্‌ছ?"

হর্ষবর্দ্ধন ভাইয়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করেন—"কিছু না, কল্‌কাতার হাল্‌চাল্‌ই এই। লোকটা নেহাৎ মিছে কথা লেখে নি।"

গোবর্দ্ধন বলেন, "স্বীকার করি লোকটা কল্‌কাতার, কিন্তু তা ব'লে নিজের মনিবের সঙ্গে মিশ্‌বে না—এ কখনও হতে পারে?"

হর্ষবর্দ্ধন ভাইয়ের বোকামি দেখে অবাক্ হন—"কেন, স্পষ্টই তো লোকটাকে এখানে দেখা যাচ্ছে না! সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লোকটার কথা সত্যি! এ তো হাতে-হাতেই প্রমাণ। চল, বেরিয়ে একটা মোটর ভাড়া করি।"

দাদার লজিকের বহর দেখে ভাইও কম অবাক্ হন্ না, কিন্তু নির্ব্বাক্ হবার

কথা তাঁর না হলেও, কথা কাটাকাটিতে না কাটিয়ে সময়টা মোটরে কাটালে কাজ দেবে ভেবে আপাততঃ তিনি নিজেকে দমন করে ফেলেন।

হর্ষবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করেন, "চিঠিখানা কাছে আছে ত? বাড়ীর ঠিকানা আছে তাতে।"

গোবর্দ্ধন ঘাড় নেড়ে জানান—"চিঠি নেই তবে মনে হচ্ছে ১৩।১২ রসা রোড্‌, ভবানীপুর।"

হর্ষবর্দ্ধন অত্যন্ত ভাবিত হন—"কেমন বাড়ী ভাড়া করেছে কে জানে! লোকটা নিজে তো নিশুক নয়ই, হয়ত এমন পাড়ায় বাড়ী দেখেছে যেখানে কথা কইতে গেলে লোকে তেড়ে মারতে আসে।"

গোবর্দ্ধন সায় দেন—"কিংবা মেশ্‌বার ভয়ে তাও আসে না।"

"সেইটাই তো আরো ভাবনার কথা—" কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের ভাবনায় বাধা পড়ে, একজন ট্যাক্সীওয়ালা গাড়ী নিয়ে এগিয়ে আসে—"ট্যাক্‌সী চাই বাবু, ট্যাক্‌সী?"

"যদি মোটরেই চাপি তা হ'লে তোমার ওই পুঁচ্‌কে গাড়ীতে যাব কেন হে? গোব্‌রা, ওই যে ভারী গাড়ীখানা খুব ধুমধাড়াক্কা ক'রে আস্‌ছে ওইটাকে দাঁড় করা।" হর্ষবর্দ্ধন এক বৃহদাকার ওম্‌নিবাসের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করেন, "বড় গাড়ীতে বেশী ভাড়া লাগ্‌বে, এই ত? কলকাতায় স্ফূর্ত্তি কর্‌তে আসা, টাকার মায়া করলে চল্‌বে কেন!"

শীতের প্রত্যূষের জনবিরল পথে যাত্রীহীন বাস্‌খানা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুট্‌ছিল, গোবর্দ্ধনের সঙ্কেত মাত্র দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। হর্ষবর্দ্ধন উঠেই হুকুম করলেন—"চালাও তেরোর বারো রসা রোড্‌। কোথায় জানা আছে তো?"

কণ্ডাক্টার জবাব দেয়, "আমাদের তিন নম্বর বাস্ ওই পথেই তো যায়।"

মণি-ব্যাগ্‌ থেকে একখানা দশ টাকার নোট্ বের ক'রে হর্ষবর্দ্ধন তার হাতে দেন। কণ্ডাক্টার জানায়, "কিন্তু এর চেঞ্জ্‌ তো নেই।"

হর্ষবর্দ্ধন বলেন, "দরকার নেই চেঞ্জ্‌ দেবার; সমস্তটাই ওর ভাড়া ধ'রে নাও। চিরকাল মোটর গাড়ীর গল্প শুনে আস্‌ছি, আজ সুযোগ হয়েছে, সখ মিটিয়ে চাপ্‌ব। যত টাকাই লাগুক্, কেয়ার করি না আমরা।"

এতক্ষণে গোবর্দ্ধন কথা বল্‌বার ফুরসৎ পান। "দিব্যি গাড়ী দাদা! দেখ্‌ছ কতগুলো সীট্, তার ওপরে গদীমোড়া! আবার হাওয়া খেল্‌বার জন্য এতগুলো জান্‌লা! একটা আয়নাও আছে! এমনি একটা মোটর দেশে নিয়ে যাব, কি বল দাদা? মোটর-গাড়ী আর মোটর-বাড়ী এক সঙ্গে!"

"আলবৎ! দেশে নিয়ে যেতে হবে বই কি! যদি চেনা লোকের চোখেই না পড়লাম তবে মোটরে চেপে লাভ কি!"

"এখন যে ক'দিন কলকাতায় আছি এই গাড়ীখানায় চাপা যাবে, কি বল দাদা?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়—সে কথা বল্‌তে। সাত দিনের জন্য এটাকে ভাড়া ক'রে ফেল্‌ছি।"

হঠাৎ বাস্ দাঁড়াল এবং একটী তরুণী ভদ্র মহিলা উঠ্‌লেন; হর্ষবর্দ্ধন একবার তাকিয়ে দেখ্‌লেন, তার পরে ফিস্ ফিস্ করে গোবর্দ্ধনকে বল্‌লেন—"উঠেছে উঠুক, কিছু ব'ল না যেন। যদি খানিক মোটরে হাওয়া খেতে চায়, থাক্ না, ক্ষতি কি! জায়গা যথেষ্টই আছে।"

মেয়েটি একটি সিকি বের ক'রে কণ্ডাক্টারের হাতে দিতে গেল। হর্ষবর্দ্ধন বাধা দিলেন—"পয়সা কিসের?"

"খিদিরপুরের ভাড়া।"

"আপনার সিকি আপনি নিজের কাছে রেখে দিন, ওটি আমরা হ'তে দিচ্ছি না। আপনি আমাদের গাড়ীতে উঠেছেন আমাদের সৌভাগ্য, সেজন্য কোন পয়সা নিতে আমরা অক্ষম।" ব'লে হর্ষবর্দ্ধন গম্ভীর ভাবে গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে নিলেন।

মেয়েটির বিস্ময় কম্‌তে না কম্‌তেই আবার বাস্ দাঁড়াল এবং একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি উঠ্‌লেন। যেমনি না তিনি মণি-ব্যাগের মুখ খুলেছেন অমনি গোবর্দ্ধন গিয়ে করযোড়ে নিবেদন করল—"মাপ্ করবেন, পয়সা নিতে আমরা পারব না। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন, আরামে হাওয়া খান্—কিন্তু তার জন্য ভাড়া দিতে দেব না আপনাকে। মনে করুন এটা আপনার নিজের গাড়ী।"

গোবর্দ্ধনের নিজের গোঁফ ছিল না, চাড়া দেবার জন্য দাদার গোঁফ ধার নেবে কিনা সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

দু' মিনিটের মধ্যে আরো তিন জন ভদ্রলোক, দু'টি অত্যন্ত মোটা মেয়েছেলে এবং আধ ডজন ফচ্‌কে চ্যাংড়া গাড়ীতে প্রবেশ কর্‌ল। এবার হর্ষবর্দ্ধনের কপালে রেখা দেখা দিল এবং গোবর্দ্ধনের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল; বড় ভাই ছোট ভাইকে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন—"কে বল্‌ছিল হে কলকাতার লোকেরা মিশুক নয়?"

কিছুক্ষণেই বাস্ বোঝাই হয়ে গেল, হর্ষবর্দ্ধন প্রত্যেক অভ্যাগতকেই সমাদরে অভ্যর্থনা করছিলেন এবং তাদের ভাড়া দিতে নিরস্ত করতে তাঁর কম পরিশ্রম হচ্ছিল না। লোকগুলোর অপব্যয়-প্রবৃত্তি দেখে গোবর্দ্ধন আর বিস্ময় দমন করতে না পেরে দাদাকে তাঁর অভিমত জানালেন—"কল্‌কাতার লোকগুলো ভারী খরুচে কিন্তু!"

"চলে আসুন, চলে আসুন! যথেষ্টই জায়গা রয়েছে! আরামে হাওয়া খান। একটি পয়সা দিতে হবে না কাউকে! আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আস্‌ছেন!" হর্ষবর্দ্ধন থাম্‌বার ফুরসৎ পান্ না।

আরও প্যাসেঞ্জার উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বাসের দু' ধারের সীট্ ভর্ত্তি হয়ে গেল, এমন কি মাঝ-পথে দু' থাক্ লোক গাদাগাদি দাঁড়িয়ে গেল,—দরজা, ফুটবোর্ড্ পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হবার দাখিল! অবশেষে একজন চীনাম্যান্ ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়তেই গোবর্দ্ধন সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"দাদা, দাদা, দেখ একজন চীনাম্যান্!"

দাদা অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং ইতিহাসবিশ্রুত হুয়েনসাং-ফাহিয়ানের বংশধরটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন—"হুঁ, ওদের দাড়ি হয় না বটে! কামাবার হাঙ্গামা নেই—ওরাই সুখী পৃথিবীতে।"

এমন সময়ে কণ্ডাক্টার জানাল যে রসা রোড্ এসে পড়েছে। দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে ঠেলেঠুলে কোন রকমে নেমে পড়লেন, নামবার আগে ঘোষণা করলেন—"ওহে, যতক্ষণ এঁরা চাপ্‌তে চান চাপুন, যেখানে এঁরা যেতে চান এঁদের নিয়ে যাও। আরও যে টাকা লাগে আমাদের ঠিকানায় এসে নিয়ে যেয়ো—তেরোর বারো রসা রোড্, বুঝলে? আর আপনারা, বন্ধুগণ, বিদায়! আরামে ঘুরুন

সমস্ত দিন, যত খুসী, যতক্ষণ খুসী, যেখানে খুসী। কারুর একটি পাই পয়সা লাগ্‌বে না!"

বাস্ থেকে নেমেই গোবর্দ্ধন প্রশ্ন কর্‌লেন, "কল্‌কাতার হাল্‌চাল কি রকম বুঝ্‌লে দাদা?"

"হুঃ! কে বলে কল্‌কাতার লোকেরা মিশুক নয়? একেবারে মিথ্যে কথা, বাজে কথা, ভুয়ো কথা! মেশার ধাক্কায় আমার দম আট্‌কে যাবার যোগাড় হয়েছিল। শেষ কালে একটা চীনাম্যান্ পর্য্যন্ত—! আর কিছুক্ষণ থাক্‌লে হয় ত সাহেব-সুবোরাও এসে উঠ্‌ত! বাপ্ রে বাপ্! এ রকম গায়ে পড়া মিশুক্ লোক আমি দুনিয়ায় দেখি নি! কিন্তু একটা সর্ব্বনাশ হয়েছে—"

গোবর্দ্ধন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, "কি কি? পকেট মেরেছে নাকি?"

"উহু। আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে ফেলেছি ওদের। তারা মুস্কিল করেছি। খপ্ ক'রে বাড়ী ঢুকেই খিল্ এঁটে দিতে হবে, আর যদি সম্ভব হয় বাড়ীর চার ধারে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে দেওয়া ভাল। তাতে অনেকটা নিরাপদ্। কলকাতার লোক যে রকম মিশুক দেখ্‌ছি, বাড়ী চড়াও হয়ে আমাদের সঙ্গে খেতে-শুতে না চেয়ে বসে, কি জানি।"

একটি মিউজিয়ামের কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

তোমাদের মধ্যে যারা পাড়াগাঁয়ে কিংবা ছোটখাট সহরে থাক তাদের অনেকেই হয়ত পূজার ছুটীতে একবার কলিকাতা বেড়াইতে আসিবে। তার পর এক দিন দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া হয়ত চিড়িয়াখানা দেখিতে যাইবে এবং ফিরিবার পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হল্ এবং মিউজিয়াম্ দেখিয়া লইয়া বিকালবেলা বাড়ী ফিরিবে। আমার পরিচিত অনেক লোককে এমনি ভাবে ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে মিউজিয়াম্ দেখা সারিয়া লইতে দেখিয়াছি।

কিন্তু বাস্তবিক তোমরা কখনও ভাল করিয়া মিউজিয়াম্ দেখিয়াছ কি? কত জিনিষ সেখানে দেখিবার আছে, কত কি সেখানে শিখিবার আছে—কয়েক ঘণ্টা তো দূরের কথা, কয়েক দিন ধরিয়া ভাল করিয়া না দেখিলে তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব—কত কিছুর নমুনা সেখানে সাজানো আছে! শিক্ষা ও আমোদের এত বড় একত্র সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়।

কিন্তু আমাদের কলিকাতার মিউজিয়াম্‌টিও আকারে এমন কিছু বড় নয়—বিশেষতঃ বিলাতের বড় বড় মিউজিয়াম্‌গুলির তুলনায়। যেমন ধর, বৃটীশ মিউজিয়াম্—পৃথিবীর মধ্যে অমন একটা মিউজিয়াম্ কমই আছে। কিন্তু আজ তোমাদের যে মিউজিয়াম্‌টির কথা শুনাইব সেটি একটু অন্য রকমের। এটির নাম "আমেরিকান্ মিউজিয়াম্ অব্ ন্যাচারাল্ হিষ্ট্রী" ("American Museum of Natural History")—অর্থাৎ এই মিউজিয়ামে যে সব সংগ্রহ আছে সেগুলি শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংগ্রহ; সাধারণ মিউজিয়ামে যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

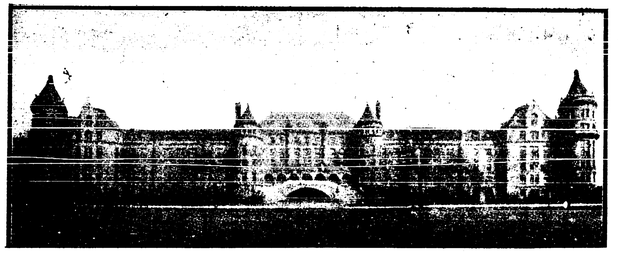

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মিউজিয়াম্—নিউইয়র্ক্

সংগ্রহও থাকে আবার তা' ছাড়া অন্য অনেক কিছুও থাকে, এটিতে তা' নাই। কিন্তু যেটুকু আছে তার বহর শুনিলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইবে।

আধুনিক জগতের আজব সহর নিউইয়র্ক্—সেই নিউইয়র্কের বুকের উপর এই মিউজিয়ামের বিরাট্ অট্টালিকা। বিরাট্ বলিয়া বিরাট্! ভাল করিয়া দেখিতে গেলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেও তা' শেষ

করা যায় না। প্রতি দিন অসংখ্য নরনারী, বালক-বালিকা এই মিউজিয়াম্ দেখিতে আসে।

এই মিউজিয়ামের একটা মস্ত বিশেষত্ব এই, যে, এর ভিতরকার জিনিষগুলি যত দূর সম্ভব স্বাভাবিক ভাবে সাজানো হইয়াছে। এক ভদ্রলোক এই মিউজিয়াম্ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"মিউজিয়ামের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে যাইতে আমার মনে হইল, আমি যেন একখানা চমৎকার ছবির বই-এর পাতার মধ্য দিয়া যাইতেছি আর সেই ছবিগুলি সব হঠাৎ যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে"।

একটা উদাহরণ দিই। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে অনেক দুষ্প্রাপ্য জানোয়ার ঘুরিয়া বেড়ায়। তাদের কোন কোনটার ছবি তোমরা দেখিয়াছ, চিড়িয়াখানায়ও হয়ত কারো কারো সঙ্গে তোমাদের মোলাকাৎ হইয়াছে, কিন্তু সে সব জানোয়ারের আসল রূপটি—কি ভাবে তারা জঙ্গলের মধ্যে বাস করে—সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনই ধারণা নাই। এই মিউজিয়ামের মধ্যে দেখিবে, সেই সব জানোয়ারগুলিকে একেবারে জ্যান্ত মূর্ত্তিতে—যে ভাবে তারা জঙ্গলের মধ্যে থাকে ঠিক সেই ভাবে এবং ঠিক সেই ধরণের জঙ্গলের মধ্যে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এ জঙ্গল অবশ্য কৃত্রিম, কিন্তু তার প্রত্যেকটি গাছ—প্রত্যেকটি পাতা হুবহু আসল জঙ্গলের মত। কেমন করিয়া এ সব করা হইয়াছে তোমরা ভাবিলে অবাক্ হইবে। এর জন্য বৈজ্ঞানিকেরা দল বাঁধিয়া প্রাণ হাতে করিয়া আফ্রিকার সেই জঙ্গলে গিয়াছেন; সেখানে শুধু জানোয়ারই সংগ্রহ করেন

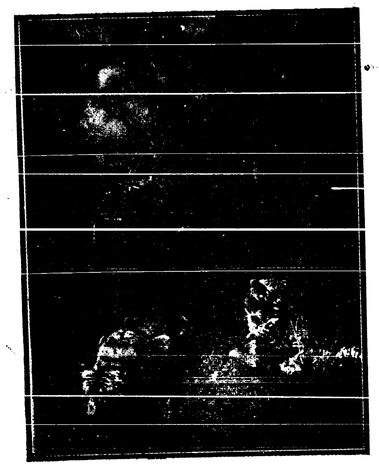

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-মিউজিয়ামের ভিতরকার একটি দৃশ্য—যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করা হইয়াছে।

নাই, দিনের পর দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া জানোয়ারদের চাল-চলন, হাব-ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, আর সেই সব জঙ্গলের হুবহু রঙ্গিন ছবি আঁকিয়া লইয়াছেন। তার পর সেই ছবির সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া মিউজিয়ামের মধ্যে সেই রকম কৃত্রিম জঙ্গল তৈরী করা হইয়াছে। তার পর তাঁরা মরা জানোয়ারগুলির (যা তাঁরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন) শরীরের যে সব অংশ পচিয়া যাইতে পারে—সেগুলি ফেলিয়া দিয়া তার জায়গায় অন্যান্য মাল-মশলা ঢুকাইয়া সেগুলিকে একেবারে জ্যান্ত চেহারায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। জঙ্গলের মধ্যে নানা ভঙ্গীতে সাজানো সে জানোয়ার হঠাৎ দেখিয়া কারো সাধ্য নাই তাকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করে।

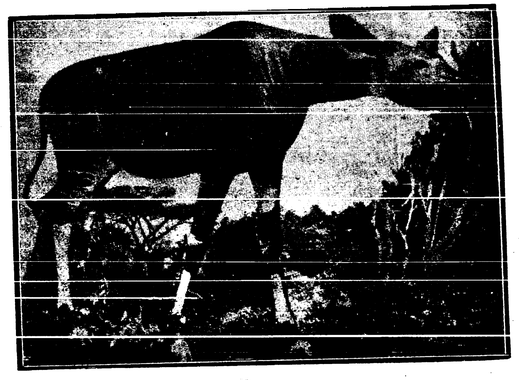

পৃথিবীর একটি প্রায়-লুপ্ত দুষ্প্রাপ্য জীব 'ওকাপি'
(এটিও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-মিউজিয়ামে সংগ্রহ করা আছে)

শুধু আফ্রিকার দুষ্প্রাপ্য জানোয়ার নয়, পৃথিবীর যেখানে যত ছোট-বড়, সুপ্রাপ্য এবং দুষ্প্রাপ্য জানোয়ার আছে—সব তাঁরা যোগাড় করিয়াছেন এবং সেগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া সাজাইয়াছেন। কত রকম পাখী, কত রকম সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী, সামুদ্রিক জীব যে সেখানে আছে তার আর তুলনা নাই—এবং এর প্রায় প্রত্যেকটিকে রাখা হইয়াছে ঠিক তারা যে ভাবে—যে আবহাওয়ার ভিতর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে সেই রকম করিয়া। যে সব জানোয়ার পৃথিবী হইতে প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে, সারা দুনিয়া খুঁজিয়া মাত্র দু'টি-একটি পাওয়া যায়—যেমন ধর 'ওকাপি'—তা'ও এই মিউজিয়ামে সংগ্রহ করা আছে।

মিউজিয়ামের এক জায়গায় দেখিবে পৃথিবী হইতে লোপ-পাওয়া সেকালকার সেই অতিকায় জানোয়ারদের কঙ্কাল। সেই ব্রণ্টোসরস্—আশী হাত নব্বই হাত লম্বা শরীর লইয়া যারা এক সময়ে জলাভূমির মধ্যে মনের আনন্দে বিচরণ করিত; সেই মাংসখোর, হিংস্র, বিরাট্‌দেহী সরীসৃপ টিরানোসরস্—যারা চিতার মত ছুটিতে পারিত আবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঙ্গারুর মত লাফাইতে পারিত; সেই বুদ্ধিহীন, সারা গায়ে খড়্গের মত বড় বড় আঁশ-বসান' ষ্টিগোসরস্, সেই উড়ুক্কু সরীসৃপ টেরোড্যাক্‌টাইল্—যারা সব মানুষ জন্মিবার বহু আগে পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিয়া গিয়াছে; সেই হাতীর মত দাঁত বাহির-করা সেকালকার বাঘ, সেই ঠাণ্ডার দেশের অতিকায় লোমশ হাতী ম্যাষ্টোডন্, দক্ষিণ আমেরিকার সেই বিশালকায় স্লথ্, অষ্ট্রেলিয়ার চৌদ্দ-পনের ফিট্ উঁচু মোয়া পাখী—সকলকার কঙ্কাল সেখানে সাজানো রহিয়াছে। এই সব কঙ্কাল মাটী খুঁড়িয়া বাহির করিতে, মাথা ঘামাইয়া এদের সঠিক পরিচয় যোগাড় করিতে এবং টুক্‌রা টুক্‌রা হাড় যোড়া লাগাইয়া সম্পূর্ণ কঙ্কালটি সাজাইতে কত মহা মহা পণ্ডিতকে যে বছরের পর বছর প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তার ঠিক নাই।

অধুনা-লুপ্ত সেকালকার অতিকায় সরীসৃপ 'ব্রণ্টোসরস্'
(এর কঙ্কাল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-মিউজিয়ামে সাজানো আছে)

শুধু জীবজন্তু নয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আরও কত কি এই মিউজিয়ামে দেখিতে পাইবে। নানা দেশের নানা রকম গাছ—তাদের খুঁটিনাটী বৈশিষ্ট্য, তাদের জন্মমৃত্যু, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী একেবারে জীবন্ত করিয়া দেখান হইয়াছে।

ভূতত্ত্ব-বিভাগে গেলে দেখিবে পৃথিবীর বুকের ভিতরকার কত রহস্য সেখানে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। জল কেমন করিয়া পাহাড়ের গায়ে ঢুঁ মারিয়া মারিয়া কিনাট্ বিরাট্ গহ্বরের সৃষ্টি করে, বৃষ্টির জল পৃথিবীর গায়ে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটায়, পৃথিবীর ভিতরকার আগুন, গরম ধাতু যখন মাটী চিরিয়া বাহির হয় তখন সে কি কাণ্ড বাধাইয়া বসে, "খনির তিমির গর্ভে" কেমন করিয়া ধাতু জন্মায়, কয়লা জন্মায়, হীরা জন্মায়—সে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার অদ্ভুত ভাবে তোমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে।

পৃথিবীতে কত দেশ! সেখানে কত রকম জাত, কত রকম তাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার! কত বিভিন্ন তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী! মিউজিয়ামের এক জায়গায় দেখিবে—এই সব নানা দেশের নরনারীর জীবন্ত মূর্ত্তি গড়িয়া কৃত্রিম আবেষ্টনীর মধ্যে নানা ভাবে তাদের জীবনযাত্রা দেখান হইয়াছে। কোথাও চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে বরফ—সারা গায়ে-মাথায় ভালুকের লোমের পোষাক আঁটিয়া এস্কিমোর দল সীল শিকারে ব্যস্ত। কাছেই তাদের বরফের তৈরী বাড়ী-ঘর দেখা যাইতেছে। কোথাও দেখিবে মাথায় পালক-পরা রেড্ ইণ্ডিয়ান্ দল আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া গল্প করিতেছে,—একটু দূরেই সবুজ মাঠে মহিষের দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সব দৃশ্যের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটী আসলের সঙ্গে মিলাইয়া করা। আফ্রিকার জংলী জাত—বুনো গরুর সঙ্গে পাশাপাশি যারা বাস করে—মানুষ মারিয়া তার মাংস খাইতেও দ্বিধা বোধ করে না—তাদেরও হুবহু রূপটি এই মিউজিয়ামের মধ্যে পাওয়া যাইবে। প্রাচীন মিশরের সভ্যতা, গ্রীসের সভ্যতা, আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক মায়া-সভ্যতা—তাদের অদ্ভুত ভাস্কর্য্য, শিল্পচাতুর্য্য,—আরও আগেকার সেই আদ্যিকালের গুহা-মানুষদের জীবনযাত্রা-প্রণালী, গুহার গায়ে পাথর দিয়া ক্ষুদিয়া, লাল রং দিয়া, ভূষা কালি দিয়া আঁকা সেই সব প্রথম সভ্য মানুষের প্রথম ছবি—সে সবও বাদ যায় নাই; কি সুন্দর ভাবে সেগুলি দেখান হইয়াছে!

এই সব কাজ হাসিল করিতে কি অসম্ভব পরিশ্রম, কি বিপুল অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে ভাবিতে পার? প্রাণ হাতে করিয়া আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের মধ্যে

দুরন্ত জানোয়ার আর বিষাক্ত ব্যাধির ভিতর মাসের পর মাস কাটাইতে হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার, অষ্ট্রেলিয়ার প্রান্তরের মধ্যে পথ তৈরী করিয়া হাজার হাজার মাইল্ ঘুরিতে হইয়াছে। বিশাল মরুভূমির মধ্যে গিয়া, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের উপর উঠিয়া, গভীর সমুদ্রের ভিতর, গভীর খনির ভিতর নামিয়া তাদের ভিতরকার রহস্য টানিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। দেশ-বিদেশের হালচাল জানিবার জন্য পৃথিবীর কত জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছে, কত জাতের সঙ্গে মিশিতে হইয়াছে! এ সবই কিন্তু করা হইয়াছে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বাড়াইবার জন্য।

গুহা-মানুষদের আঁকা ছবি

এই মিউজিয়ামে একবার ভাল করিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারিলে দেখিবে, পৃথিবীতে কত কি জানিবার আছে, আর তার কতটুকুই বা আমরা জানি! হাজার বই পড়িয়া যা না হয় এই সব মিউজিয়ামে তার চেয়ে কাজ হয় বেশী।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যও এই মিউজিয়ামে নানা রকম ব্যবস্থা আছে। তাদের দেখাইবার জন্য, বুঝাইয়া দিবার জন্য শিক্ষকেরা আছেন। গল্প বলিয়া, ছবি দেখাইয়া, আবার সময় সময় দস্তুরমত ক্লাস্ করিয়াও তাঁরা ছেলেমেয়েদের সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দেন। এমন কি অন্ধ, বোবা, কালা ছেলেমেয়েরাও বাদ যায় না—তাদের বুঝাইবার জন্যও তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত সব ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

শিক্ষক—তোমরা কখনো প্রতিশোধ নেবে না, কেউ এক কান মলে দিলে তার দিকে অপর কান ফিরিয়ে দেবে।

ছাত্র—(চিন্তিত ভাবে) আর যদি কেউ নাক মলে দেয় স্যর?

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

শয়তানের এরোপ্লেন

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

হেমন্তের অপরাহ্ণ। বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ সায়েন্সের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক, প্রোফেসার হৃষিকেশ আচার্য্য আপনার মনে ল্যাবোরেটারীতে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। এই প্রবীণ বয়সেও ডক্টর আচার্য্যের অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি, অদম্য অধ্যবসায়।

অন্যান্য দিনের চাইতে অনেকটা আগেই আজ প্রোফেসার আচার্য্য তাঁর কাজকর্ম্ম বন্ধ করিলেন, কেননা এক গার্ডেন-পার্টিতে নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবার কথা আছে। ঘরের এক পাশে হাত ধোয়ার বেসিন, ধীরে ধীরে তিনি সেদিকে আগাইয়া গিয়া খোলা জানালার পথে একবার অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বাহিরের পানে তাকাইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন—একখানা এরোপ্লেন ঠিক তাঁর ল্যাবোরেটারীর উপরে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। এরোপ্লেন খানা একটু অদ্ভুত ধরণের, অর্থাৎ সাধারণতঃ যে সব এরোপ্লেন দেখা যায় সেগুলির সঙ্গে এখানার কোথাও কোথাও যেন একটু পার্থক্য আছে। একটু পরেই এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখা গেল, প্রোফেসার আচার্য্য একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন—এরোপ্লেন খানা উড়িতে উড়িতে ল্যাবোরেটারীর কিছু দূরে প্রকাণ্ড উঁচু একটা পাকুড় গাছের মাথার উপর বসিয়া পড়িল। কোন এরোপ্লেন যে গাছের উপর নামিতে পারে অত বড় বৈজ্ঞানিকের কল্পনাতেও ইতিপূর্ব্বে তা কখনো আসে নাই।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রোফেসার আচার্য্য এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, হঠাৎ এক ঝলক তীব্র নীলাভ আলো তাঁর মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন, চারিদিকে চকিত দৃষ্টি হানিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, তাঁকেই উদ্দেশ করিয়া এরোপ্লেন হইতে এই আলোর রশ্মি ফেলা হইতেছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি একটা আইগ্ল্যাস্ চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিলেন। পর মুহূর্ত্তেই তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মাতালের মত টলিতে টলিতে কোন মতে খানিক দূর গিয়া তিনি একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। সেই হেমন্তের অপরাহ্ণেও তখন তাঁর সমস্ত শরীর ঘামিয়া উঠিয়াছে।

মিনিট কয়েক অথর্ব্বের মত চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকার পর আবার তিনি জানালার দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া গেলেন। আলোর যে রশ্মিটা একটু আগেই জানালার উপর আসিয়া

পড়িতেছিল সেটি তখন বন্ধ হইয়া গেছে বটে কিন্তু এরোপ্লেনটি তখনও ঠায় সেই পাকুড় গাছের উপরেই বসিয়া। প্রোফেসার আচার্য্য জানালার সাম্‌নে উপস্থিত হইতেই আবার সেই তীব্র রশ্মি তাঁর মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়াই অধ্যাপক একটি বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিয়া ধরিলেন, এবং তার অল্প একটু পরেই সুস্থ, সবল এক যুবক সেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল। যুবকটি ডক্টর আচার্য্যের প্রধান সহকারী, নাম জগদিন্দ্রনাথ বসু।

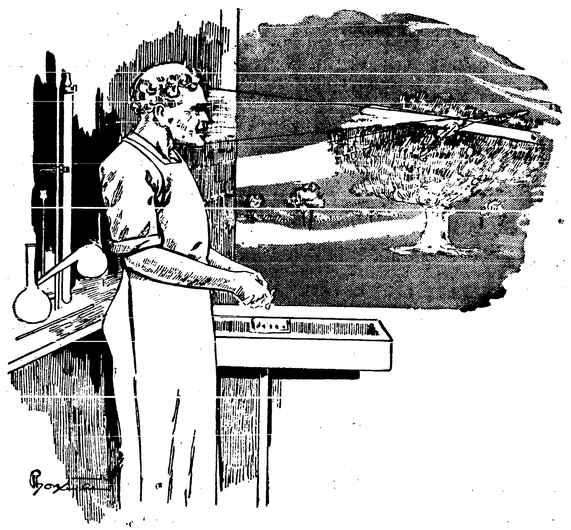

এক ঝলক তীব্র নীলাভ আলো তাঁর মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

ঘরে ঢুকিয়াই জগদিন্দ্রনাথ আচার্য্যের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "একি স্যর, আপনি কি অসুস্থ?"

কিন্তু প্রোফেসার আচার্য্য তখন যেন এ পৃথিবীতেই নাই, যেন স্বপ্নলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; কেমন যেন খাপছাড়া ভাবে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, কি বল্‌ছ, অসুস্থ কিনা?.....আচ্ছা জগদিন্দ্র, অবিনাশের কথা তোমার মনে পড়ে?"

"কে? অবিনাশ রায়? নাইনটিন টুয়েন্টিসেভেনের রেল্‌ওয়ে য়্যাক্‌সিডেণ্টে যে মারা পড়ে তার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ; কি মাস ছিল সেটা মনে আছে?"

"যত দূর মনে পড়্‌ছে এপ্রিলের মাঝামাঝি। অত দিনকার কথা এত বিস্তারিত ভাবে

মনে বোধ করি থাক্‌ত না যদি তাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে দেবার তারিখটা পয়লা এপ্রিল না হত। ও ঘটনার অনেক দিন আগে হ'তেই তার মাথা খারাপ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল্‌। পয়লা এপ্রিলের সে সব কথা জীবনে ভোল্‌বার নয়, আপনি আর আমি তার ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কি সব অদ্ভুত কাণ্ডই না প্রত্যক্ষ কর্‌ছিলাম! মনে হলে দুঃখুও হয়, আবার হাসিও আসে। পয়লা এপ্রিল এখান থেকে বিতাড়িত হবার কিছু দিন বাদেই রেলওয়ে য়্যাক্‌সিডেণ্ট্‌টা ঘটে, তাই বল্‌ছিলাম, এপ্রিলের মাঝামাঝি।

অধ্যাপক নিজের মনে মনে কি একটু ভাবিলেন, তার পর আবার কহিলেন, "আচ্ছা জগদিন্দ্র, আমাকেই ওর দুর্দ্দশার মূল ভেবে নিয়ে অবিনাশ আমায় একটু শিক্ষা দিতে চাইবে—এ কথা মনে ভাবা কি খুব অস্বাভাবিক?"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জগদিন্দ্রনাথ ডক্টর আচার্য্যের মুখের দিকে তাকাইল। "মরা মানুষ আপনাকে শিক্ষা দেবে? সে কি স্যর, ভূত হয়ে, নাকি শয়তানের চেলা হয়ে?"

কথা গুলি প্রোফেসার আচার্য্যের কানে গেছে বলিয়া বোধ হইল না—আবার যেন তিনি স্বপ্নলোকে ফিরিয়া গেছেন। খানিক পরে একটা জোর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি কহিলেন, "স্যর জ্ঞানশঙ্কর ঘোষের গার্ডেন পার্টিতে তুমি নিশ্চয়ই যাচ্ছ জগদিন্দ্র, আমার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ব'ল যে বিশেষ কোন কারণে তাঁর নেমন্তন্ন রক্ষা করা আমার পক্ষে কিছুতেই আজ সম্ভব হল না। আর দেখ, নীচে যাবার বেলা ড্রাইভারকে গাড়ীটা বার কর্‌তে বলে যেও, আমি এক্ষুণি একটু বেরুব—না না, জগদিন্দ্র এখন আমায় আর কোন অনাবশ্যক প্রশ্ন ক'র না, সন্দেহের দোলায় আমার মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

সন্ধ্যার কিছু পরে ডক্টর আচার্য্য যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁকে যেন আর চেনা যায় না। এই শান্ত, সৌম্য, জ্ঞান-গম্ভীর বৃদ্ধকে জীবনে বিচলিত হইতে খুব কমই দেখা গিয়াছে, কিন্তু আজ তাঁর প্রত্যেকটি কাজই যেন স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। ল্যাবোরেটারীতে ঢুকিয়াই প্রথমে তিনি একখানা বড় ব্ল্যাক্‌বোর্ড্‌ টানিয়া বাহির করিলেন, তার পর তার উপর খুব বড় বড় গোটা অক্ষরে ইংরাজীতে লিখিলেন ABINASH; লেখার নীচে একটা গোলাকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকিলেন, তার মধ্যে কতগুলি গাছের পাতা আছে, বোঝা গেল। সব শেষে রহিল নিজের নামের আদ্যক্ষর H. A., অর্থাৎ হৃষিকেশ আচার্য্য।

পর দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবোরেটারীর ছাদের উপর মিস্ত্রির সাহায্যে এক খণ্ড লম্বা বাঁশের সঙ্গে ব্ল্যাক্‌বোর্ড্‌খানা টানাইয়া দেওয়া হইল আর তার দু'পাশে রহিল দু'খানি সাদা কাগজের নিশান।

এই অভাবনীয় ব্যাপারে শুধু জগদিন্দ্রনাথ নয়, ল্যাবোরেটারীর প্রত্যেকটি প্রাণীই

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িল। যিনি বিজ্ঞানের সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, জীবন-সন্ধ্যায় সেই জ্ঞানবৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের এ কি নিতান্ত কুসংস্কারাপন্নের মত ব্যবহার? ভূত-তর্পণের জন্য, ভূতের পূজার জন্য দেশে অনেক লোক আছে—প্রোফেসার হৃষিকেশ আচার্য্য নয়!

বেলা কিছু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কলিকাতায় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, কাতারে কাতারে লোক দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া গড়ের মাঠের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। যত দূর আন্দাজ করা যায়, শেষরাত্রের দিকে একখানা অদ্ভুত এরোপ্লেন ইডেন গার্ডেনের ভিতর নামিয়াছিল। তার পর এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইডেন গার্ডেন যেন এক শ্মশানে পরিণত হইবার জো হইয়াছে। সেখানকার সমস্ত ফুলের বাগান নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে, আর তা ছাড়া ছোট বড় বহু গাছও কে যেন ভাঙ্গিয়া তছ্‌নছ্ করিয়া দিয়াছে। এ যেন মূর্ত্ত শয়তানের ধ্বংসলীলা। ভোর হওয়ার পর এ দৃশ্য জনা দুই পুলিশ সার্জ্জেণ্টের চোখে পড়ে। তারা তোড়জোর করিয়া ছুটিয়া যাইতেই এরোপ্লেনখানা কোন রকম আড়ম্বর না করিয়াই অবলীলাক্রমেই যেন হাইকোর্টের ছাতের উপর গিয়া বসে। তার পর সেখান হইতে মনুমেণ্টের চূড়ার উপর উড়িয়া আসিয়াছে। বহু লোক হলফ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত যে, টিক্‌টিকি যে ভাবে দেওয়ালের গা বাহিয়া ওঠে, এই অতি আশ্চর্য্য এরোপ্লেনখানিও মনুমেণ্টের চূড়ায় ওঠার সময় নাকি অবিকল সেই ভাবে উঠিয়াছিল।

লালবাজার পুলিশ-অফিসে ইতিপূর্ব্বেই খবর গিয়া পৌঁছিয়াছিল, দলে দলে লাল-পাগ্‌ড়ী, সার্জ্জেণ্ট, অফিসার প্রভৃতি ময়দানে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। একজন অফিসার খানিকটা অগ্রসর হইয়া এরোপ্লেনখানাকে বার বার নামিতে ইঙ্গিত করিতেছেন এমন সময় দেখা গেল বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ সায়েন্সের বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক ডক্টর হৃষিকেশ আচার্য্য ঊর্দ্ধশ্বাসে সকলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁর এ ব্যবহারে সকলেই অবাক্ হইয়া গেল, কেননা সকলেই জানিত তিনি সর্ব্বদা তাঁর ল্যাবোরেটারীর মধ্যেই নিজের সাধনায় মগ্ন আছেন, বাহিরের শত কৌতূহলও তাঁর মনের উপর এতটুকু আঁচড় কাটিতে পারে না।

কিন্তু এর পরেই যে দৃশ্য সকলে দেখিল তা বুঝি আরও বিস্ময়কর। এরোপ্লেনখানা এতক্ষণ মনুমেণ্টের উপর নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিল ডক্টর আচার্য্য আসামাত্র এক ঝলক তীব্র আলো কেবল তাঁরই একার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তার পরই সেখানা নিঃশব্দে উড়িয়া মুহূর্ত্তে বহু দূরে মিলাইয়া গেল।

পর দিন কলিকাতার ছোট বড় প্রায় সমস্ত খবরের কাগজ গুলিতেই দু' কলম্ জুড়িয়া

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হরফে নিম্নলিখিত ধরণের হেডিং বাহির হইল—

শয়তানের এরোপ্লেন

কলিকাতায় আজব কাণ্ড!

চব্বিশ পরগণা ও হাওড়া জেলার বহু স্থানে নির্ম্মম ধ্বংস-লীলা!

হেডিংএর নীচে গতকল্যকার আজব কাণ্ডের একটা বিশদ বিবরণ দিয়া খবরের কাগজ লিখিতেছে "এই অদ্ভুত এরোপ্লেন এবং তার অদৃশ্য আরোহী গভীর রহস্যজালে আবৃত। এই আরোহীর কী যে অভিসন্ধি তাও আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের কাছেই অজ্ঞাত, তবে কোন একটা অজানা উদ্দেশ্য লইয়া সে যে প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে সেটা বোঝা যাইতেছে। তার এই উৎপাতে চব্বিশ পরগণা ও হাওড়া জেলার বহু চাষীর মনে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে! যেরূপ অবিশ্বাস্য রকমের অল্প সময়ের মধ্যে অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ক্ষেত হইতে সে শস্য উঠাইয়া লইতেছে তা'তে কেবল শয়তানেরই কার্য্যকলাপ স্মরণ করাইয়া দেয়। নর-হত্যায়ও এ শয়তানের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। এই রকমেই আক্রান্ত একটি ক্ষেতের মধ্যে এক কৃষকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে—তার বুকের পাঁজরগুলি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ।..."

চোখ বুলাইয়া যাইতেছিলেন

ডক্টর আচার্য্য খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেছিলেন, তাঁর মুখ তখন পাণ্ডুর, বিবর্ণ। হঠাৎ তিনি

আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন. "শাসনের বাইরে চলে গেছে—নিজের খুসীমত যা ইচ্ছে তাই করতে সুরু করে দিয়েছে। এই রকমই একটা আশঙ্কা যে কেবলই আমার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল। এখন উপায় ?"

সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল জগদিন্দ্রনাথ, সে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডক্টর আচার্য্য সমস্ত ঘরময় অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তার পর হঠাৎ এক সময় থামিয়া, দু' হাতে জগদিন্দ্রনাথের হাত দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবা জগদিন্দ্র, অবিনাশকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে—যে করেই হোক্ তাকে বাঁচাতেই হবে।"

এইবার জগদিন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম প্রোফেসার আচার্য্যের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইল। পূরা এক মিনিট তাঁর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া শেষে সে কহিল, "আপনি কি বলছেন স্যর, অবিনাশকে বাঁচাব কি ? সে যে আজ ছ' বছরের ওপর হ'ল মারা গেছে !"

"না, মারা যায় নি, আমাদের সকলের ধারণাই ভুল," দৃঢ়স্বরে ডক্টর আচার্য্য কহিলেন; "রেল্ওয়ে য়্যাক্সিডেণ্ট্টা কি মাসে ঘটেছিল তোমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে কাল অত তাড়াতাড়ি মোটরে আমি কোথায় বেরিয়ে পড়্লাম তুমি মনে কর ? 'পত্রিকা'-অফিসে। সেখানে পৌঁছেই ১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় হপ্তার সবগুলি কাগজ দেখ্তে চাইলাম। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ১৩ই তারিখের কাগজেই য়্যাক্সিডেণ্টের কথা রয়েছে দেখ্তে পেলাম। সেই য়্যাক্সিডেণ্টে যারা যারা মারা পড়েছিল তাদের নাম-ধামও ওদিনকার কাগজেই পাওয়া গেল—লিষ্টের ভেতর একটা নাম দেখ্লাম অবিনাশ রায়, ব্র্যাকেটের ভেতর, ডক্টর হৃষিকেশ আচার্য্যের সহকারী। তার পর ১৭ই তারিখের কাগজ উল্টে দেখি, রেল্ওয়ে কোম্পানী মৃত ব্যক্তিদের একটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে—ছোট ছোট হরফে সেটা ছাপা। অবিনাশ রায় সম্বন্ধে তাতে লিখেছে—বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, গায়ের রং কালো, মাথায় টাক্ আছে। অথচ অবিনাশের বয়স তখন সবে আটাশ বছর; তার ওপর সে দিব্যি গৌরবর্ণ, আর মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কাজেই এর থেকে বুঝ্লাম ও-গাড়ীখানায় নিশ্চয়ই অবিনাশের পরিচিত কোন লোক চেপেছিল, আর তার পকেটে ছিল অবিনাশেরই নামের কার্ড্ অথবা তার কাছে অপরের লেখা কোন চিঠি। য়্যাক্সিডেণ্টে সেই লোকটাই মারা গেছে, আর তার পকেটের কাগজপত্র পরীক্ষা করে রেল্ওয়ে কোম্পানী স্বভাবতঃই মনে করেছে তার নাম অবিনাশ রায়। মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় অবিনাশের নাম যাওয়ার এই একমাত্র কারণ।"

জগদিন্দ্রনাথ বিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু অবিনাশ এর প্রতিবাদ করলে না কেন ?"

"আমাদের মত অতি-বিজ্ঞদের সম্পূর্ণ চোখের আড়ালে থাক্তে চাইছিল বলে। বাস্তবিক, আমাদের কুসংস্কারের অন্ত আছে কি ? বাইরে আমরা নিজেদেরকে বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক বলে পরিচয় দিই, আসলে কিন্তু বিজ্ঞানের অনন্ত শক্তির ওপর আমাদের এতটুকু আস্থা নেই। যা আমাদের ধ্যান-ধারণার বাইরে, সে রকম নতুন একটা কিছু শুনলেই সেটাকে আমরা নিছক পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতেই চিরটা কাল অভ্যস্ত। নইলে, অবিনাশ যখন আমারই ল্যাবোরেটারীতে বসে অত বড় একটা আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখ্ছিল তখন আমি আমার নিতান্ত সঙ্কীর্ণ জ্ঞান নিয়ে অনায়াসে তাকে 'পাগল' অপবাদ দিয়ে এখান থেকে বিদায় করে দিলাম ! অবশ্য ভগবান্ জানেন, আমার অভিপ্রায় মন্দ ছিল না, ওরই মঙ্গলের জন্যে আমি এ কঠোর ব্যবহার করেছিলাম।.....তার পর এই ছ' বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অবিনাশ যে অপূর্ব্ব, অভাবনীয় আবিষ্কার করেছে তাতে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে—বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে ওর নাম লেখা থাকবার কথা !...কিন্তু সবই বুঝি বিফলে গেল জগদিন্দ্র, ওর 'সৃষ্টি'কে ও বুঝি আর বাগে আন্তে পারছে না—সে বুঝি বেঁকে বসেছে !"

"কে বেঁকে বসেছে ? কার কথা বলছেন আপনি ?"

"ওই ফড়িংটার।"

দুইবার ঢোঁক গিলিয়া তবে জগদিন্দ্রনাথ কথা বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইল, বলিল, "য়্যাঁ, য়্যাঁ, কি বলছেন ?"

"বল্ছি, খবরের কাগজগুলো যে 'শয়তানের এরোপ্লেন', 'শয়তানের এরোপ্লেন' বলে মিথ্যে মিথ্যি চীৎকার করে মরছে, আসলে ও জিনিষটা কি ? অবিনাশেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল—একটা বিশাল, অতিকায় ফড়িং। ফড়িং অতিকায় হলে যে ঠিক এরোপ্লেনের মতই দেখ্তে হবে তা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে—শুধু নীচের ডানাখানা নেই। এদানিকে ফড়িংই ছিল ওর গবেষণার বিষয়; ফড়িংএর ছোট্ট শরীরের ভেতর কি কি কোষ আছে, তাই নিয়ে সে পরীক্ষা করছিল—কত দিন কত রকমের আলো সে যে ফেলেছে নিশ্চয়ই তা তুমি ভুলে যাও নি। এক দিন সে আমায় বল্লে, ফড়িংয়ের আকার চেষ্টা করলে বোধ করি বড় করে তোলা চলে। নিছক ছেলেমানুষি বলে কথাটাকে আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। তার পর কিছু দিন বাদে অবিনাশ আবার এক দিন বল্লে, মানুষ এরোপ্লেন-জেপেলিন চালাতে কত অজস্র টাকা বৃষ্টি করছে; সেগুলির জন্যে এরোড্রোম্ চাই, ভাল পাইলট্ চাই, কত কি'র প্রয়োজন। অথচ এ সত্ত্বেও বিপদের অন্ত নেই—আজ গাছের ওপর পড়্ছে, কাল আগুন ধরে যাচ্ছে ! বিজ্ঞানের বলে যদি ছোট্ট ফড়িংটিকে ক্রমে ক্রমে বড় করে শেষটায় এরোপ্লেন বা তার চাইতেও বড় আকার দেওয়া যায়, তবে মানুষের নানান্ দিক্ থেকেই সুবিধে। হাতীকে যেমন পোষ মানিয়ে মাহুত কেবল মাত্র হুকুমের

জোরে কাজ করায় অতিকায় ফড়িংকেও হয় তো ঠিক তেম্‌নি বাগ মানিয়ে খাটিয়ে নেওয়া অসম্ভব হবে না।

"এ আজগুবি কল্পনার পেছনে অনর্থক সময় নষ্ট কর্‌তে আমি তাকে বিশেষ করে বারণ কর্‌লাম, কিন্তু আমার নিষেধে তার রোখ যেন আরো বেশী চেপে গেল। ভাব্‌লাম, ল্যাবোরেটারী থেকে ছাড়িয়ে কিছু দিন অন্য কোথাও পাঠালে এই বাতিকগ্রস্ত ছেলেটার মাথার ছিট্ বোধ হয় কিছু কম্‌বে। এর ঠিক কিছু দিন পরই রেলওয়ে য়্যাক্‌সিডেণ্টে ভুল খবর বার হওয়াটা ওর পক্ষে একটা সুবিধারই কারণ হল—লোকালয়ের বাইরে, এত দিন ধরে সাধনার পর সবে কিছু দিন হল ও সিদ্ধিলাভ করেছে। কাল বিকেলে ও তার অতিকায় ফড়িংএ চড়ে দূরের ওই পাকুড় গাছটার ওপর থেকে আমার মুখের ওপর নীল আলো ফেল্‌ছিল। মহাভারতের অর্জ্জুন যেমন বাণ মেরে দ্রোণাচার্য্যের পাদবন্দনা করেছিলেন, ওর আলো ফেলার মানেও অনেকটা তাই—অর্থাৎ বিজয়ী হয়ে আমাকে সম্ভাষণ করা। অবশ্য একটু প্রচ্ছন্ন অনুযোগ অথবা শিক্ষাও বোধ হয় ওর ভেতর ছিল, ভাবটা যেন এই—কেমন, আপনার চোখে আমি উন্মাদ, না? খানিকটা বাদেই আমি ব্ল্যাক্‌বোর্ডের ইঙ্গিতে তাকে জানাতে চেষ্টা কর্‌লাম যে বিজ্ঞানের 'লরেল' সে-ই পেয়েছে—পাতায় তৈরী লরেল-মুকুটই গ্রীস্‌দেশের সব চেয়ে বড় সম্মান ছিল কিনা—সাহেবরা ওই থেকেই আইডিয়াটা নিয়েছে। আমার সে ইঙ্গিত অবিনাশ বোধ করি টের পায়নি, কেননা দ্বিতীয়বার সে তো আর ল্যাবোরেটারী-মুখো হয়নি কিনা। ইডেন গার্ডেনের বাগান অনেকখানি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় দেশশুদ্ধ লোক অবাক্ হয়ে গেছে, আমি কিন্তু হইনি; তার কারণ, আমি জানি অমন পরিপাটি বাগানটি দেখে অতিকায় ফড়িংএর ক্ষিধে পাওয়া স্বাভাবিকই। কিন্তু আজ খবরের কাগজে যা বার হয়েছে তাতে আমি বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছি, জগদিন্দ্র, আমার বুকটা কেন জানি না. দুরু দুরু কর্‌ছে, মনে হচ্ছে ওই রাক্ষসাকারের জীবটা অবিনাশের হুকুম আর তামিল কর্‌তে রাজী হচ্ছে না। পোষা হাতীও তো মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়, ওটা যে বিগ্‌ড়োবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? নইলে, ধান খেয়ে খেয়ে ক্ষেতের পর ক্ষেত উজাড় করে দিচ্ছে, গায়ের ধাক্কায় নিরীহ চাষীর পাঁজর গুঁড়ো করে ফেল্‌ছে, অবিনাশ কিছু আর এ সবের প্রশ্রয় দিচ্ছে না। অথচ সে নিরুপায়, এ অবস্থায় জানোয়ারটাকে একলা ছেড়ে দিয়ে সে নেমেও পড়্‌তে পার্‌ছে না, তাকে সাম্‌লে নেওয়ারই চেষ্টা কর্‌ছে নিশ্চয়। আজ দিনের শেষে কি সংবাদ শুন্‌তে হবে ভগবান্‌ই জানেন।……তুমি জামা কাপড় পরে নাও, এক্ষুণি আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে লালবাজারে যেতে হবে।"

অদূরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ডক্টর আচার্য্য ধীরে ধীরে রিসিভারটা কানে তুলিয়া স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যালো, কোত্থেকে কথা কইছেন?" পরমুহূর্ত্তেই

দারুণ উৎকণ্ঠায় তাঁর কণ্ঠ-স্বর একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল, তিনি যেন হাঁফাইতে হাঁফাইতে ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মেডিকেল কলেজ থেকে? ব্যাপার কি? য়্যাঁ, বলেন কি! 'শয়তানের' এরোপ্লেনটাকে গুলি করে নামান হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফড়িং তা জানি, কিন্তু আরোহীটির খবর কি? সিরিয়াস্‌লি ইন্‌জিওর্ড্? আমায় দেখতে চাইছে? আমি এক্ষুণি রওনা হচ্ছি. এক্ষুণি, এক্ষুণি। কিন্তু ডক্টর বোস্, বাঁচ্‌বে তো? আরোহীটি বাঁচ্‌বে তো? কি বল্‌লেন, হোপ্‌লেস্? হা ভগবান্!" অধ্যাপকের স্বর যেন কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। কম্পিতহস্তে রিসিভারটি তিনি নামাইয়া রাখিলেন।

মিনিট্ পনেরো পরে জগদিন্দ্রের কাঁধের উপর ভর রাখিয়া বিবশ-প্রায় ডক্টর আচার্য্য কোন মতে মেডিকেল কলেজের ফটকে গাড়ী হইতে নামিলেন।*

পল্লীবাসী

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

আমাদিকে ভাবিস্ না ভাই সত্য এতই তুচ্ছ,
স্বর্ণ না থাক্, দেখ্‌না মোদের স্বর্ণ ধানের গুচ্ছ।
নাইক' ভাল গাড়ী-ঘোড়া, নাইক' ভাল পথ রে,
তবুও এই পথ দিয়ে যায় জগন্নাথের রথ রে।
কত সাধুর পায়ের চিনে দাগ রেখে যায় নিত্য,
এম্‌নি করেই গ্রামের মাটী হয়রে মোদের তীর্থ।
বাড়ী বাড়ী দেবের সেবা, হ'তেছে ভোগ রান্না,
অন্ন এমন প্রসাদ হবার সুযোগ কোথাও পান্ না।
রন্ধনে হায় পুণ্য হোমের, পূজন গৃহ কর্ম্ম,
হেথায় মোদের এক হয়েছে জীবন এবং ধর্ম্ম।

---

* ঠিক এই রকম না হইলেও, এই ধরণের ব্যাপার ভবিষ্যতে হয় তো অসম্ভব হইবে না, এইরূপ কল্পনা করিয়া কোন কোন লেখক আজকাল গল্প লিখিতেছেন। সেই কল্পনার সামান্য আশ্রয় লইয়া নূতন সম্ভাবনাপূর্ণ, সম্পূর্ণ নূতন আকারের এই গল্পটি লেখা হইল।

সহর পারে ইচ্ছা হ'লে পল্লী শতেক গড়তে,
রাজার সাথে সাজার কথা তুলনা নাই করতে।
দুঃখী মোরা, দীন যে মোরা, রাজা মোদের মন যে,
তোমরা যারে বন ভাব তা' মোদের তপোবন যে।
পর করেছে আমাদিকে রৌপ্য এবং স্বর্ণয়,
পরশে যার পরশমণি সে ত' মোদের পর নয়!

একটা পরীর গল্প

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

বল্‌লে হয় তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু লিলি সত্যি-সত্যি পরী দেখেছে। সত্যিকারের পরী। তোমারও হয় তো—জ্যোছনা যখন বাগান ভ'রে রেশমী ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে, কোন কোন রাত্রে তোমারও হয় তো মনে হয়েছে যে তুমি পরীদের দেখছো—নীল রাত্রি ভ'রে তারা নাচছে আর হাসছে, আর ঠাট্টা করছে তোমাকে, জানলার ধারে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। কিন্তু একটু পরেই তুমি বুঝতে পেরেছ যে পরীরা মোটেও সত্যি নয়, তোমার কানে লেগেছিল হাওয়ার আর পাখীর শব্দ; জ্যোছনায় রেশমী-রুপালি তোমাদের সবুজ বাগানে কোন পরী কখনো আসবে না। আর মাস গেছে, বছর গেছে, কোন পরী তোমার কখনো চোখে পড়েনি। তাই, লিলি যে সত্যি-সত্যি পরী দেখেছে এ কথা শুনলে একটু অবাকই লাগবে।

কিন্তু সত্যি-সত্যি তা-ই। এতটুকু সন্দেহ নেই। কাল রাত্রে—তখন ভোর হ'য়ে এসেছে বুঝি—লিলি বিছানায় শুয়ে হঠাৎ তার চোখ মেল্‌ল, আর দেখতে পেল—ঐ, ঠিক তার সামনে, জানলার বাইরে মস্ত একটা চাঁদ, আর তার ম্লান আলোয় ঘরের মধ্যে যেন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত পৃথিবী চুপ—একেবারে চুপ। আর তার পর কে যেন ঘরের মধ্যে কথা ক'য়ে উঠ্‌ল—এত নরম, মিষ্টি সুর, কানে-কানে কথা বলছে যেন। কান পেতে শুন্‌ল লিলি, আর সেই স্বর যেন গান করে উঠ্‌ল—এত মধুর সে গান, লিলির ইচ্ছে হ'ল কাঁদে। অবাক্ হ'য়ে সে ভাবলে, কে এমন ক'রে গান করছে এমন সময়! ঐ তো তার খাটের পায়ের দিকে ছোট্ট, সাদা পরী—সত্যি-সত্যি পরী! লিলি চোখ রগড়ে আবার তাকালো—ঐ তো সে দাঁড়িয়ে, ছোট্ট পরী,

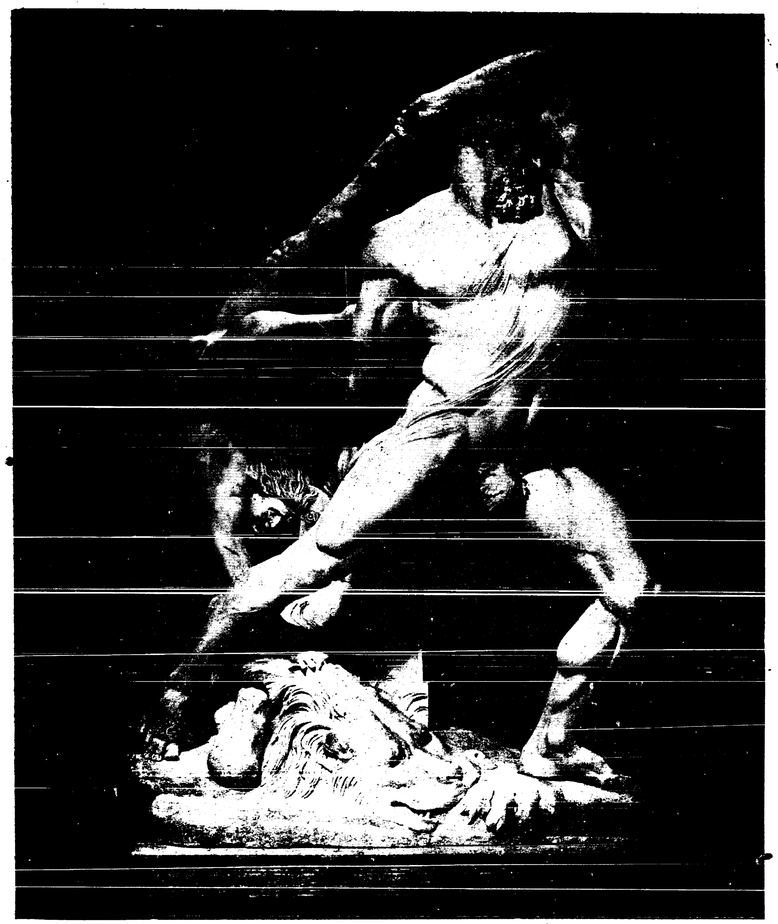

শক্তি

আর কী সুন্দর। নিজের গানের তালে-তালে দুলছে সে, আর তার হালকা পাখা ওঠা-নামা করছে, এক জোড়া জাপানী পাখা যেন। লিলি রইলো তাকিয়ে—আর একটু পরে পরী হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে জানলা দিয়ে বাইরে উড়ে চললো, মস্ত চাঁদের দিকে। আর তার গান একটু-একটু ক'রে মৃদু হ'য়ে আসতে আসতে গেলো হাওয়ায় মিলিয়ে।

'ঐ যাঃ! দেখলুম তো পরী', লিলি মনে-মনে বললে।

'পরী! পরী!' সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল। 'উঃ! কী মজা!' আর এমন খুসীতে তার মন ভ'রে উঠল যে বাকী রাতটুকু সে ঘুমোতে পারলে না—আর একটু পরেই ভোর হ'য়ে গেল।

সকালবেলা তার মনে হ'ল যে কাউকে এক্ষুণি কথাটা বলতে না পারলে সে ফেটে যাবে। তার ছিল এক ভাই, আর এক বোন, দু' জনেই ইস্কুলে পড়ছে। কত কিছু যে তারা জানতো, কত রকম কথা যে তারা বলতো, অন্ত নেই তার। লিলিকে আমলের মধ্যেই আনতো না তারা—কেননা সে নেহাৎ ছেলেমানুষ—সে যে সব বই পড়ে তাতে অনেক ছবির ফাঁকে ফাঁকে রঙ-বেরঙের বর্ণমালা বসানো—তার বেশী কিছু নয়।

'জানো', লিলি গম্ভীরমুখে বললে, 'কাল রাত্রে আমি একটা পরী দেখেছি।'

এ কথা শুনে হেসে উঠল তারা, তার ইস্কুল-পড়ুয়া ভাই আর বোন—কেননা তারা তো জানে যে আসলে পরী ব'লে কিছু নেই।

'কী বোকা তুই', তার বোন ব'লে উঠল। 'তুই বুঝি ভাবিস সত্যি-সত্যি পরী ব'লে কিছু আছে?'

'তুই একটা আস্ত বোকা', তার ভাই এমন ভাবে কথাটা বললে যে তার পরে আর কিছু বলা যায় না।

লিলির মনে মনে একটু রাগ হ'ল। সে তো সত্যি-সত্যি পরী দেখেছে—আর এরা বলে কিনা পরী ব'লে কিছু নেই। ইস্কুলে, সে ভাবলে, কী ছাইভস্ম সব শেখায়। তার চোখ থেকে আলো নিবে গেল, আর একটি কথা না ব'লে সে চ'লে গেল পাশের ঘরে। সেখানে তার ছোট্ট খোকা-ভাই শুয়ে আছে দোলনায়, জোরে পা ছুঁড়ছে, আর একদৃষ্টিতে হাতের বুড়ো আঙুলটার দিকে তাকিয়ে আছে। এত সুন্দর খোকা আর কি কোথাও আছে—লিলি তাকে কী ভালোই বাসে।

'খোকামণি', দোলনার ধারে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটা পরী দেখেছি কাল রাত্রে।'

খোকামণি তার আশ্চর্য্য নীল চোখ বড় ক'রে খুল্‌ল; তার পর বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ করলে।

'খোকামণি, তুমি বলো—আমি একটা পরী দেখেছিলাম—দেখিনি?'

মণি মাথা নাড়লে, খুসীর একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুলো তার গলা দিয়ে। আর লিলির চোখে ফিরে এল আলো।

যা-ই হোক্, এর পর থেকে কাউকে আর এ কথা বলবে না সে। এ তার গোপন-কথা। কাউকে সে বলবে না। ম'রে গেলেও না। আর এই যে তার নিজের একটা গোপন কথা—কী গর্ব্ব এতে, কী আনন্দ।

২

আর পরীরা আসে।

রোজ রাত্রে, সে যখন বিছানায় শুয়ে, লিলি পরীদের দেখে, শোনে তাদের গান, টের পায় তাদের চলাফেরা। দল বেঁধে আসে তারা, তাদের ছোট, সাদা শরীরে হাতীর দাঁতের আভা, যেন গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল বসন্তের হাওয়ায় দুলছে। ঘর ভ'রে যায় ছায়ায় আর গুঞ্জনে; পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে তারা নাচে—এত তাড়াতাড়ি যে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে লিলির নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে। আর বাতাস ভারী হ'য়ে ওঠে তাদের চুলের গন্ধে, আর রাত্রি কেঁপে-কেঁপে ওঠে তাদের গানের আর হাসির শব্দে। 'যদি ওদের সঙ্গে ছুটতে পারতুম আমি!' লিলি মনে মনে ভাবে, কিন্তু তবু সে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে, একেবারে চুপ, যেন একটু নড়াচড়া করলেই এই যাদু যাবে ভেঙ্গে। বড় বড় চোখে সে তাকিয়ে থাকে পরীদের দিকে, স্বপ্নের মধ্যে যেন; তার মনের মধ্যে উথলে ওঠে এই কথা—কেন সে তাদের একজন হ'তে পারল না! আর পরীরা আসে, রাত্রির পর রাত্রি।

লিলির সঙ্গে যদি ভোনার দেখা হ'ত দিনের বেলায়, তা হ'লে মোটেও তার গোপন-কথা আঁচ করতে পারতে না। এমন মনে হ'ত না যে তার মধ্যে বিশেষ কিছু আছে। ফুটফুটে, ছোট্ট একটি মেয়ে, তার বেশী কিছু নয়। তার দাদা-দিদির কাছে তাও মনে হ'ত না, এমন কি। পরীদের নিয়ে তারা তাকে ঠাট্টা করত না পর্য্যন্ত। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলত সূর্য্যগ্রহণ আর মেরুর রাত্রি আর এমনি সব ভীষণ জিনিস নিয়ে। লিলি রইত আলাদা, তার গোপন-কথা নিয়ে একা। ব'য়ে গেছে, সে ভাবত, চাঁদের ছায়াই সূর্য্যের উপর পড়ুক, কি সূর্য্যের ছায়া পৃথিবীর উপর, ভারী ব'য়ে গেছে তাতে, পরীরা তো আছে। পরীরা তার, তার একলার। আর হাসিতে তার দুই চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, যেন নিজেরাই তারা সূর্য্য আর চাঁদ। তেমন কেউ কাছাকাছি থাকলে হয় তো তাকে ধ'রে ফেলতো, কিন্তু তার দাদা আর দিদি মোটেও কিছু লক্ষ্য করলে না—মস্ত বড় বড় ভাবনা নিয়ে তারা ব্যস্ত।

রোজ রাত্রে পরীরা এসে নাচে আর গান করে—এমনি করতে করতে একদিন লিলির ইস্কুলে যাবার সময় হ'ল। তার ছোট ছোট আঙুলে লাগলো কালির ছোপ, বিস্কুের টুকরোতে

ছোট মাথাটি তার ভ'রে উঠতে লাগলো। যথা সময়ে সে জানলে কেন এমন মনে হয় যে চাঁদ বাড়ে আর কমে (কেননা স ত্যি স ত্যি তো আর চাঁদ বাড়ে-কমে না); তাকে প্র মা ণ ক'রে বুঝিয়ে দেয়া হ'ল যে একটা মাঠের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়ার চাইতে মাঠটা ঘুরে গেলে বেশী হাঁটতে হবে; সে জানলে যে পেরুর রাজধানী লিমা, আর $a^2-b^2=(a+b)\times(a-b)$ যার মানে, $৫=(৩+২)\times(৩-২)$ যার মানে ৫=৫, যে কথা বোধ হয় না বললেও চলে। এমনি অনেক সব জিনিস শিখতে শিখতে ক্লাশ থেকে ক্লাশে সে উঠতে লাগলো; তার পর এমন সময় এলো যখন তার মনে হ'ল সে নিশ্চয়ই এতদিনে বড় হ'য়ে উঠেছে। এরই মধ্যে সে সাড়ী পরতে আরম্ভ করেছে, আর খোঁপা বাঁধতে। সত্যি, মস্ত বড় সে হ'য়ে উঠেছে। কত জিনিস নিয়ে সে ব্যস্ত—প্রায়ই যায় সিনেমায়, এত বেশী আইস-ক্রীম খায় যে মাঝে মাঝে পেট ব্যথা করে। গ্রিটা গার্বোর নাম বলতে সে পাগল; দু' মাসে একবার তাকে চিঠি লেখে একখানা সই-করা ফটো-গ্রাফের জন্যে। এমনি ছ' বার চিঠি লেখার পর একদিন সত্যি-সত্যি ছবি এলো। সেই রাত্রে সে ঘুমোতে পারলে না, এত আনন্দ তার মনে।

পরীরা আর আসে না। কোথায় হারিয়ে গেলো তারা, গেলো মিলিয়ে, লিলি টেরও পেলো না। যেন তারা কখনো ছিলো না। আর লিলির তাদের কথা একবার মনেও পড়লো না—সে ব্যস্ত সিনেমা নিয়ে, আর সে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে কি জুনিয়র কেম্ব্রিজ দেবে, এই ভাবনা নিয়ে।

এদিকে লিলির সেই খোকা-ভাই দস্তুর মত খোকাবাবু হ'য়ে উঠেছে—গোলাপী তার গাল, আর ঠিক লিলির মত তার চোখ। তাকে আর কেউ খোকামণি বলে না, শুধু মণি বলে। লিলি আর ওর সঙ্গে অত মাখামাখি করে না—কেননা ও তো নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর সে দস্তুর মত ভদ্রমহিলা। অবিশ্যি মাঝে মাঝে যখন ঝোঁক আসে, সে আদর করে ওকে নিয়ে, লক্ষ্মী-সোনা বলে, গল্প বলে বই থেকে। কিন্তু সে খুব বেশী নয়। মণিরও যেন একা থাকতেই বেশী ভালো লাগে। ঠাণ্ডা ছেলে, সে এক কোণে ব'সে চুপচাপ তার ছবির' বই নিয়ে খেলা করে, যখন খুসী পাতা ছেঁড়ে; একটা মস্ত, ভোঁতা পেন্সিল কোথায় যেন কুড়িয়ে পেয়েছিলো—হিজিবিজি আঁকে তা-ই দিয়ে। ঘরের মধ্যে যে অন্য-কেউ আছে, সে খেয়ালই নেই তার। মাঝে মাঝে নিজের মনেই সে কথা বলে। কেমন একটু অদ্ভুত ছেলে, এই মণি।

এক দিন সকালে মণির নীল চোখে একটা আলো জ্বলে উঠলো; লিলি যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে, ও এলো কাছে, লিলির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

'কি রে, মণি?' লিলি বললে, একটু তীক্ষ্ণস্বরে। সময় নেই, ইস্কুলের বাস্ এসে পড়লো ব'লে।

'ছোড়-দি', একটু ভয়ে ভয়ে মণি বললে, 'আমি একটা পরী দেখেছি কাল রাত্রে।'

'পরী!'

'পরী', মণি আবার বললে।

'এখন রাখ্ ও-সব বাজে কথা। ছাখ্ তো খুঁজে, আমার চুলের কাঁটাটা পাস্ কিনা। চুলের কাঁটা, ও চুলের কাঁটা, তুমি কোথায় লুকোলে? এক দিন এই কাঁটাগুলোর জ্বালায় আমি পাগল হ'য়ে যাবো। যাঃ—ঐ তো বাস্ এসে পড়লো।'

লিলি ছুটে বেরিয়ে গেলো, মণির দিকে একবার তাকালোও না। আর মণির নীল চোখ থেকে হঠাৎ যেন আলো ম'রে গেলো।

কিন্তু সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে লিলির মনে তা ফিরে এলো। মণি পরী দেখেছে, তা-ই তো বললে। সে, সে-ও তো এক দিন, এক সময়···টন্‌টন্ ক'রে উঠলো তার বুক, অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে রইলো, কী ভাবলে নিজেই বুঝতে পারলে না। আকাশে চাঁদ, ঘরের মধ্যে অন্ধকার হালকা। লিলি তাকিয়ে রইলো—তাকিয়ে রইলো। কী যেন নড়ে উঠলো, লাফিয়ে উঠলো তার বুক। বুঝি—? না—চোখ টান ক'রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখে জল এসে পড়লো—কিছু না। চাঁদ ঠিক তার জানলার বাইরে এসে দাঁড়ালো, সমস্ত ঘর আধো-আলোয় এলোমেলো। লিলি তাকিয়ে রইলো, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস—কই, কিছু না। কিছু না। আর আসে না পরীরা।

আর ভোরের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনে লিলি বালিসের উপর মুখ চেপে ধরলো। হঠাৎ তার বুক ভেঙে নামলো কান্না; ভাঙা-ভাঙা গলায় সে ব'লে উঠলো, 'কেন, কেন, কেন তোমরা আমায় ছেড়ে গেলে?'

টেষ্ট্ ম্যাচ্

(শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

ইংল্যাণ্ডের আর অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় খেলা হ'চ্ছে ক্রীকেট। এক বছর অন্তর তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে খেলে। গত বছর ইংল্যাণ্ড গিয়ে হারিয়ে দিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়াকে। ঐ বছর অষ্ট্রেলিয়া এসেছিল নব উদ্যমে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। পর পর পাঁচ বার টেষ্ট্ খেলা হ'ল। প্রথম বার জয়ী হ'ল অষ্ট্রেলিয়া, দ্বিতীয় বার ইংল্যাণ্ড; তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্ট (ইংল্যাণ্ডের বরাত জোরে) হ'ল ড্র। শেষ ম্যাচে আবার অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডকে দিল হারিয়ে।

প্রথম টেষ্ট্

প্রথম টেষ্ট্ খেলা সুরু হ'ল ৮ই জুন তারিখে। অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন্ উড্‌ফুল 'টসে' জয়ী হ'য়ে, প্রথমে ব্যাট্ করাই স্থির করলেন। অষ্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নাম্‌ল প্রথা অনুযায়ী খুব সাবধানে, ধীরে সুস্থে—দেখে। তাদের খেলা ভালই হচ্ছিল; পন্সফোর্ড্ করলেন ৫৩। লাঞ্চের সময় জল এল, বৃষ্টি হয়ে যাওয়াতে ইংল্যাণ্ডের বোলারদের বিশেষ সুবিধে হ'য়ে গেল। তারা ঝপাঝপ্ চার্ চারটে বিশেষ দরকারী ব্যাট্‌কে নিয়ে নিলে ৭০ রানের মধ্যে—ব্রাউন, ব্র্যাডম্যান্, পন্সফোর্ড আর উড্‌ফুল্। দর্শকেরা 'দমে' গেল তাদের ব্র্যাডম্যান্‌কে ২৯ রানে আউট হ'য়ে যেতে দেখে। এখন অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থা বিশেষ খারাপ—৫টা উইকেট্ গেছে মাত্র ১৩৪ রানে। কিন্তু হঠাৎ চিপার-ফিল্ড আর ম্যাকেব দাঁড়িয়ে গেলেন। ম্যাকেব করলেন ৬৫ আর চিপারফিল্ড ৯৯। বেচারা চিপারফিল্ড, মাত্র এক রানের জন্যে 'সেনচুরি' টা ফস্‌কে গেল! চিপারফিল্ড আর ম্যাকেব দু'জনই আউট হ'লেন ফারন্স-এর বলে। অষ্ট্রেলিয়ার সকলে মিলে করলে ৩৭৪।

১ম টেষ্টে ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্‌টেন্ ওয়াল্‌টাস্

ইংল্যাণ্ড ব্যাট করতে নাম্‌ল। প্রথমে বেশ খেল্‌ছিল, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার 'কুহকী' বোলার গ্রিমেট আউট্ ক'রে দিলেন সার্টক্লিফকে ৬২ রানে। তার পর আউট হ'লেন ওয়াল্‌টারস্, হ্যামণ্ড আর লেল্যাণ্ড—ঐ গ্রিমেটেরই বলে। সেদিনকার ফল ইংল্যাণ্ডের ১২৮ রান্, আর চারটে উইকেট্ ঘাল। পরের দিন আরম্ভ করলেন পাটাউডির নবাব আর হেন্‌ড্রেন্; কিন্তু বিশেষ সুবিধে হ'ল না; ২৬৮ রানে সকলেই শেষ হ'য়ে গেলেন। একমাত্র শুধু হেন্‌ড্রেন্ করলেন—৭৯, আর পাটাউডি, মাত্র ১২ রান্ কোরে ভবিষ্যতের আশা খানিকটা নষ্ট করলেন। অষ্ট্রেলিয়ার ওরিলি আর গ্রিমেট্ই শেষ করলেন ইংল্যাণ্ডকে বল্ দিয়ে।

অষ্ট্রেলিয়া আবার নব উদ্যমে, বেপরোয়া ভাবে দ্বিতীয় ইনিংস্ আরম্ভ করল। ব্রাউন করলেন ৭৩ আর ম্যাকেব—৮৮। ২৭৩ রানে আট জন আউট্ হবার পর অষ্ট্রেলিয়া ডিক্লেয়ার করে দিল।

ইংল্যাণ্ড নাম্‌ল একবার শেষ চেষ্টা করতে। কিন্তু চেষ্টা সব ব্যর্থ হ'ল ১৪১ রানে সকলে

আউট হ'য়ে গিয়ে। এবারও দুর্দ্দান্ত ওরিলি তাদের বসিয়ে দিলেন। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম টেষ্টে জয়ী হ'ল।

দ্বিতীয় টেষ্ট্

দ্বিতীয় টেষ্ট্ আরম্ভ হ'ল ২৫শে জুন তারিখে—লর্ড্সে। ইংল্যাণ্ড ব্যাট করতে আরম্ভ করলে। পরাজয় এবার তাদের জাগিয়ে তুলেছে সুপ্ত সঞ্চিত শক্তি। ওয়ালটার্স্ করলেন ৮২, লেল্যাণ্ড ১০৯ আর এমিস্ ক'রলেন ১২০। সকলে মিলে করলে ৪৪০। এবার আর তাদের দেখে কে? কিন্তু সেই দিনই অষ্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নেমে তাদের জবাব দিলে ১৯২ ক'রে দু'জন আউট হ'য়ে, তার মধ্যে ব্রাউনের একার অঙ্কই ১০৫। পরের দিন খেলা আরম্ভ হবার আগেই ভীষণ জল হ'য়ে গেল। ব্যস্, ইংল্যাণ্ডের যাদুকর বোলার ভেরিটির পোয়া বারো—তিনি একাই ২৮৪ রানে ৭টা উইকেট্ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াকে নামিয়ে দিলেন। এবারও এই দারুণ বলের সামনে ব্র্যাড্ম্যান্ ৩৫ এর বেশী করতে পারলেন না। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে খেল্তে এল, কিন্তু অবস্থা আগের চেয়ে হ'ল খারাপই—সেই ভেরিটিরই বলে। সবাই মিলে ১১৮ করে দ্বিতীয় টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরে গেল।

ভেরিটি (ইংল্যাণ্ড)

এখন তারা সমানে সমানে চলেছে—পরস্পর পরস্পরকে একবার করে হারিয়েছে।

তৃতীয় টেষ্ট্

তৃতীয় টেষ্ট্ আরম্ভ হ'ল ম্যান্চেষ্টারে, বিশেষ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে। ইংল্যাণ্ড তার প্রাণপণ চেষ্টা সুরু করলে—জয়ী হবার জন্যে। চেষ্টা তাদের সফল হ'ল কেননা সবাই মিলে তারা তুল্লে ৬২৭ রান্। তার মধ্যে হেনড্রেন্ করলেন ১৩২ রান্, আর লেল্যাণ্ড ১৫৩; তা ছাড়া প্রত্যেকেই বেশ কৃতিত্ব দেখালেন—এক ওয়্যাট্ হামণ্ড্ আর হোপহুড্ ছাড়া।

অষ্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে এল। এক জন আউট্ হ'য়েছে যখন ১৩৬ রান্; অষ্ট্রেলিয়াকে এখন যে করেই হ'ক্ 'ফলো অন্' থেকে বাঁচতে হবে। তাদের ভাগ্য ভাল; ম্যাকেব, উড্ফুল্

আর ব্রাউন্ টিঁকে গেলেন। ম্যাকেব করলেন ১৩৭, উড্ফুল্ ৭৩ আর, ব্রাউন্ ৭২; সবাই মিলে ৪৯১। যাক্, অষ্ট্রেলিয়া এ যাত্রা খুব বেঁচে গেল 'ফলো অন্' থেকে। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড করলে ১২৩ কেউ আউট না হয়ে, আর অষ্ট্রেলিয়া এক জন আউট হয়ে ৬৬ রান্ ক'রে ড্র দিয়ে দিলে।

চতুর্থ টেষ্ট্

চতুর্থ টেষ্ট্ সুরু হ'ল লিড্সে। ইংল্যাণ্ড ব্যাট করতে সুরু করলে। আরম্ভ তাদের বেশ ভালই হ'ল; ২ জন আউট হয়ে করেছে ১৩৫ এমন সময় হঠাৎ খেলার মুখ গেল ঘুরে—অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ধরণের বলে ইংল্যাণ্ড সবাই মিলে ২০০ রানে শেষ হয়ে গেল। অষ্ট্রেলিয়া খুসী মনে ব্যাট করতে নাম্ল। এবার আর তাদের চিন্তা কি? কিন্তু চিন্তা বিশেষ দেখা দিল, অবস্থা বেশ ঘনিয়ে এল যখন তিন জনে আউট হয়ে মাত্র ৩৯ রান্ করলে। তাঁবু থেকে বেরোলেন ব্র্যাডম্যান্—অন্যদিকে তাঁর যুড়িদার পন্সফোর্ড্। যাদু-মন্ত্রে যেন খেলা গেল ঘুরে। ব্র্যাডম্যান্ এর আগের টেষ্টে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি বলে অনেকে অনুমান করেছিলেন সে ব্র্যাডম্যান্ বুঝি আর নেই, কিন্তু সেদিন যখন ব্র্যাডম্যান্—ভূতুড়ে ব্র্যাডম্যান্—একটাও 'চান্স্' না দিয়ে একাই দু'দিন ধরে ভীষণ পিটে ৩০৪ রান্ তুল্লেন, তখন সকলেরই আসা এবং আশা সার্থক হ'ল। বাস্তবিক, ক্রিকেটের ইতিহাস এত বড় উঁচুদরের খোলোয়াড় আর হয় নি। তিনি আর একবার টেষ্ট ম্যাচে ৩২৪ করেছিলেন। সেই-টাই বোধ হয় রেকর্ড। পন্স্ফোর্ডও প্রথম শ্রেণীর খেলা দেখিয়ে ১৮১ রান্ করলেন। ব্র্যাডম্যান্ ইচ্ছা করে আউট হয়েছেন এবার অনেকের মতে; কারণ জেতা খেলা তিনি খেলা বলেই নিয়েছিলেন, বিশেষ যত্ন তাঁর ছিল শেষের দিকে। ইংল্যাণ্ডের বোলাররা আপ্রাণ চেষ্টা করেও অষ্ট্রেলিয়াকে ৫৮৪ রানের কমে নামাতে পারলে না।

পৃথিবীর-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্স্ম্যান্ ব্র্যাড্ম্যান্ (অষ্ট্রেলিয়া)

ইংল্যাণ্ড তার দ্বিতীয় ইনিংস খেল্তে এল। এবার তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত—মানুষের বাঁচান অসম্ভব। ৬ জন ভাল ব্যাট্স্-ম্যান্ আউট হয়েছে মাত্র ২২৯ রানে আর ওদিকে পর্ব্বত-প্রমাণ অষ্ট্রেলিয়ার রান্। কিন্তু হঠাৎ ভগবান্ সহায় হ'লেন পরাজিত-প্রায় ইংল্যাণ্ডের। মিষ্টার রেন্ (বৃষ্টি) খেলার মাঠে বেপরোয়া হয়ে নেমে এলেন। অসম্ভব বলে খেলা বন্ধ হ'য়ে গেল, অষ্ট্রেলিয়ার জেতা খেলা নষ্ট হ'য়ে গেল, ড্র হ'য়ে গিয়ে। বৃষ্টি শুধু দেখছি মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল প্রভৃতিকেই পথে বসায় না—অষ্ট্রেলিয়াকেও বসায়।

পঞ্চম টেষ্ট্

১৮ই আগষ্ট। ওভালের মাঠ লোকসমুদ্রে ভর্ত্তি। সকলে উন্মুখ হ'য়ে খেলার আশায় রয়েছে। ব্রাউন্ আর পন্স্ফোর্ড্ এলেন অষ্ট্রেলিয়ার হ'য়ে ব্যাট করতে। কিন্তু ব্রাউনের ভাগ্যে বিশেষ কিছু আর করা হ'ল না; মাত্র ১০ রানেই আউট হ'য়ে গেলেন। ব্রাডম্যান্ যোগ দিলেন পন্স্ফোর্ডের সঙ্গে। ইংল্যাণ্ডের বুক কাঁপিয়ে আবার ব্রাড্ম্যান্-পন্স্ফোর্ডের খেলা সুরু হ'ল। পন্স্-ফোর্ডের পর পর ৫টা ক্যাচ্ উঠে গেল। কিন্তু তা'তে দমে যাবার ছেলে পন্স্ফোর্ড নন। ব্রাডম্যান্ এমন সহজ ভাবে সাঁটাতে লাগলেন যেন পাড়ার ছোট ছেলেটার সঙ্গে এলেবেলে-হোয়ে খেল্ছেন—পাড়ার ছেলেটার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বোলার বাওসের কোন তফাৎই যেন নেই ব্রাডম্যানের কাছে—এমনি তাঁর খেলার ধরণ। কিন্তু সে দিন কার মত খেলা শেষ হওয়ার কিছু আগে ওই বাওসের বলেই ব্রাডম্যান ২৪৪ রান করে আউট হ'য়ে গেলেন। পন্স্ফোর্ড কিন্তু গেলেন-গেলেন ক'রেও সেদিনকার মত রয়েই গেলেন। ম্যাকেব্ এসে যোগ দিলেন কিন্তু স্থায়ী হ'তে পার্লেন না। পন্স্ফোর্ড পরের দিন ২৬৬ রানে আউট হ'লেন। তার পরু এক ওল্ড্ ফিল্ড্ আর উডফুল্ ছাড়া সবাই অল্পেই কাবার হ'য়ে গেলেন। যদিও উডফুল্ ৪৯ আর ওল্ড্ফিল্ড্—৪২ রান্ করলেন, কিন্তু ব্রাডম্যান-পন্স্ফোর্ডের খেলার পর সে খেলা আর খেলাই মনে হ'ল না। ৭০১ রানে অষ্ট্রেলিয়ার সকলে আউট হ'ল। সেদিনকার মত খেলা শেষ হওয়ার কিছু আগে ইংল্যাণ্ড এল ব্যাট্ ক'রতে, ধীরে সুস্থে। সেদিন ইংল্যাণ্ডের কেউ না আউট হ'য়েই ৯০ রান করলে বটে কিন্তু পরের দিন ইংল্যাণ্ড একেবারেই ভেঙ্গে পড়্ল অষ্ট্রেলিয়ার ভীষণ বলের চোটে। সকলে মিলে করলে মাত্র ৩২১, তার মধ্যে একা লেল্যাণ্ডের দানই ১১০। আর তা ছাড়া সেদিন ইংলণ্ডের ভাগ্যও ছিল মন্দ—তাদের এমিস্ ৩৩ রানেই আহত হয়ে চলে গেলেন, আর বাওসের হ'ল অসুখ। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে এল ব্যাট করতে—মনের আনন্দে—

ওরিলি (অষ্ট্রেলিয়া)

এখন আর তাদের চিন্তা কি—তাদের হাতে ত আছেই ৫৬৬ রান আর তার ওপর একবার ক'রে খেলাই বাকী। সকলে দুদ্দার করে মেরে ৩২১ রান্ করলে। তাই যথেষ্ট। অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হ'ল ৫৬২ রাঁনে।

অষ্ট্রেলিয়া তার গত বারের হারান সম্মান এবার ফিরে পেলে দ্বিগুণ গৌরব আর সম্মানের ভেতর দিয়ে—আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই।

মামা-ভাগ্নে

(শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এস্-সি)

নিশুর মামা—ভীষণ, ভয়ঙ্কর মামা। চেহারা ভয়ঙ্কর নয়—লোকটী ভয়ঙ্কর। মোটা-সোটা, বেঁটে খাটো লোকটি—মাথায় টাক, মুখে প্রকাণ্ড দাড়ি এবং গোঁফ। তাঁকে ভয় করে না এমন প্রাণী নিশুদের বাড়ীতে একটীও নেই—নিশুর মামী থেকে বাড়ীর কুকুরটী পর্য্যন্ত তাঁকে ভয় করে। আর ভয় করবেই বা না কেন? তাঁর কাছে যে সংসারে ভাল কেউ নেই। তাঁর ধারণা সবাই সব সময় তাঁর অসাক্ষাতে একটা না একটা অন্যায় কাজ নিশ্চয়ই করছে। কোথায় যে তিনি কখন আছেন তার কিছু ঠিক নেই। এই হয় ত তেতালায় ছেলেদের পড়ার ঘরের পিছনে লুকিয়ে বসে আছেন, ছেলেরা পড়্তে পড়্তে গল্প করছে কি না শুনছেন—পরক্ষণেই হয় ত একেবারে নীচে রান্না ঘরের জানালার ফুটোয় চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুর চুরি করে কিছু খাচ্ছে কি না দেখ্ছেন; আবার পরের মুহূর্ত্তেই হয় ত স্নানের ঘরের কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে—কেউ স্নানের ঘরে স্নান কর্তে কর্তে গান করছে কি না শুনবার জন্য। দিন রাতের মধ্যে তাঁর ঐ খাওয়া আর শোয়ার সময়টুকু ছাড়া তিনি সব সময়ে বাড়ীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পাছে কোনও সময় কেউ অন্যায় করে ফেলে। শব্দ হবে বলে চামড়ার জুতো পায় দেন না, রবারের চটী পরে বেড়ান। কেউ একটু কোনও

দোষ করেছে কি অমনি তার ভীষণ শাস্তি—শুধু ভীষণ শাস্তি নয়—অদ্ভুত শাস্তি। একেই তিনি কথা খুব কম কন, তার উপর শাস্তির সময় আরও কম কথা। তাঁর মুখ থেকে শুধু বন্দুকের গোলার মত ছিট্‌কে বার হয়ে আসে—শাস্তির অর্ডার। কারো 'না' বলবার জো নেই, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল কর্ত্তে হ'বে।

কখনও বল্লেন হয় ত—'এক পা এক কান', অর্থাৎ এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক কান ধরে থাক্‌তে হবে; কখনও বল্লেন হয় ত—'চেয়ার', অমনি চেয়ারের মত হয়ে আধা বসা, আধা দাঁড়ান অবস্থায় থাক্‌তে হ'বে; কখনও হয় ত আদেশ হ'ল—'দুবেলা বন্ধ'—অর্থাৎ দু'বেলা না খেয়ে থাক্‌তে হ'বে। এমন কি যদি বলেন 'ব্যাঙ'—অমনি পায়ের উপর ভর করে দুই হাঁটুর মধ্যে দিয়ে হাত দিয়ে দুটী কান ধরে উচু হ'য়ে বসে থাক্‌তে হ'বে; এমনি অদ্ভুত অদ্ভুত আরও কত কি—

এ সব শাস্তি যে শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তা নয়—নিশুর মামীমা থেকে বাড়ীর ঠাকুর চাকর সকলকেই এ সব শাস্তি গ্রহণ কর্‌তে হয়। এই ত সেদিন নিশুর মামা তামাক খাবেন বলে কল্‌কেটীতে তামাক সেজে মাটীর উপর রেখে দিয়েছিলেন। নিশুর মামীমা কি একটা কাজে সেখান দিয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখ্‌তে না পাওয়ায় পায়ে লেগে কলকেটা উল্টে যায়। মামীমা ভয়েতে চোখে সরষের ফুল দেখ্‌লেন; গুরুগম্ভীর একটী শব্দ কানে এল—'ব্যাঙ'—ব্যস্, মামীমা,—বাড়ীর গিন্নি,—বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—তবুও তক্ষুণি আর একটী কথা না বলে ব্যাঙ হয়ে বসে পড়্‌লেন। চারিদিকে ছেলে-পিলে নাতি-নাত্‌নী, ঠাকুর-চাকর, তার মাঝে 'ব্যাঙ'! লজ্জার আর শেষ নেই। ঠাকুরটা সেদিন মাছের ঝোলে বুঝি একটু নুন বেশী দিয়েছিল, তাকে দু'ঘণ্টা ব্যাঙ, এক ঘণ্টা চেয়ার হয়ে থাক্‌তে হয়েছিল। এ রকম ত হচ্ছেই দিনরাত। এক এক দিন বাড়ীতে একটা দেখবার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যেদিন হয় ত অনেকের দোষ এক সঙ্গে ধরা পড়ে সেদিন বাড়ীময়—কেউ চেয়ার, কেউ ব্যাঙ, কেউ এক পা এক কান—ছেলে-মেয়ে—ছোট-বড়—ঠাকুর-চাকর, সকলে—সে একটা দৃশ্য!

এ হেন যে নিশুর মামার বাড়ী, সেই মামার বাড়ীতে সব জেনে-শুনে পূজার

ছুটীতে বেড়াতে এল নিশু। সকলে শুনে বল্‌বে হয় ত যে আশ্চর্য্য সাহস ত এই নিশুর। কিন্তু নিশু নিজেও ত বড় একটা কেউ কেটা ছেলে নয়! ধড়িবাজ, ফাঁকিবাজ, ভীষণ ভণ্ড—এক কথায় বিচ্ছু ছেলে। প্রত্যেকটী বৎসর প্রোমোশন পেয়ে পেয়ে ফার্ষ্টক্লাশ পর্য্যন্ত উঠেছে অথচ কখনও বইএর পাতা খোলে নি বাড়ীতে—শুধু টুকে পাশ করেছে। ওদের স্কুলের য়্যাসিষ্টাণ্ট হেড্ মাষ্টার অতুল বাবু রবার্ট ব্লেকের বাবা, তাঁর চোখ বাঁচিয়ে টোকে এমন ছেলে বিরল; কেউ তেতালায় টুক্‌লে একতালা থেকে তাঁর টনক নড়ে। সেই অতুল বাবু শত চেষ্টাতেও তাকে

সে এক দৃশ্য!

কখনও ধর্‌তে পারলেন না। সে প্রত্যহ কল্‌কাতায় ট্রামে-বাসে ঘুরে বেড়ায়, পকেটে অথচ কাণা কড়িও থাকে না—থাকলেও কখনও ভাড়া দেয় না। খুব বেশী দিন যদি কেউ তাকে না দেখে তা হলে ভাব্‌বে এমন ছেলে আর হয় না—মুখে নবু ঝরে। যাই হোক্, পূজার ছুটীতে নিশু এল তার মামার বাড়ী মধুপুরে বেড়াতে।

বাড়ীতে ঢুকেই মামাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত, পায়ের উপর থেকে আর উঠ্‌তেই

চায় না। তার মামা বল্লেন, "হয়েছে, হয়েছে, ওঠো"। নিশু উঠে দাঁড়াল ; উঠ্‌বার সময় তার মামা দেখ্‌তে না পান এমনি ভাবে নিজের কোটের পকেটে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিল—সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা বই বার হয়ে মাটীতে পড়ে গেল। সে যেন মহা লজ্জিত এবং ভীত, এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি বইখানি তুলে লুকাতে গেল—অমনি তার মামা জলদ-গম্ভীর স্বরে বল্লেন, "কি বই ওটা ? দেখি"।

নিশু বল্লে—"না, না, ও এমনি একটা বই—"

এবার বেশ কড়া সুরেই মামা বল্লেন—"দাও, শীঘ্রি, নিশ্চয় কোনও নভেল বা গল্পের বই।"

নিশু ভয়ে ভয়ে বইটা এগিয়ে দিল তাঁর হাতে। তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন, বল্লেন—"এ কি, এ যে গীতা! পকেটে গীতা কেন ?"

নিশু যেন মহা লজ্জিত, বল্লে—"আজ্ঞে, বাবা বল্‌তেন আমাদের ছেলেদের গীতার উপদেশ অনুসারে চলা উচিত—আর সব ছেলেরই মাঝে মাঝে গীতা পড়া উচিত। আমি তাই প্রায়ই গীতা পড়ি। ট্রেনে আস্‌তে আস্‌তে গীতা পড়ছিলাম—পকেটেই রয়ে গেছে।"

মামা খুসী, ভারী খুসী। ভাবলেন, "চমৎকার ছেলে ত! আমাদের বাড়ীর ছেলেগুলো পড়ার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই, নভেল পড়ে—আমি বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও এবং এত শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও! আর এ ছেলে ট্রেনে—যেখানে গল্পের বই বা উপন্যাস পড়লে দেখবার কেউ নেই সেখানে—গীতা পড়তে পড়তে এসেছে!! আর শুধু তাই নয়, ওর বাবা—যিনি আজ তিন চার বৎসর মারা গেছেন—তিনি কবে কি উপদেশ দিয়েছেন তাই সে আজও এমনি ভাবে মেনে চলেছে!!!" ভারী খুসী, ভারী খুসী হলেন মনে মনে, মুখে বল্লেন—"বেশ, বেশ, এই সবই ত ছেলেদের পড়া উচিত—আজে বাজে বই না পড়ে।" যাও, তোমার মামীমার কাছে যাও, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাওগে।"

নিশু মনে মনে খুব একচোট হেসে নিল—ভাব্‌লে, মামাকে কি রকম খুসী করেই দেওয়া গেছে। গীতা, গীতা ত কত পড়ি—প্রথম পাতাটাই কখনও

ওল্‌টাই নি। মামা ত আর কাপড়ের ট্রাঙ্ক খুলে দেখছেন না যে কাপড়-চোপড়ের নীচে কতগুলি ডিটেক্‌টিভ নভেল রয়েছে।

মামার সঙ্গে ত এই রকম চাল চেলে নিশু ভিতরে গেল। বাকী সকলকে খুসী করে ফেল্‌লে কয়েক মিনিটের মধ্যে শুধু তার মধুমাখা কথা দিয়ে।

নিশুর উপর সকলেই খুসী। তবে মামা যে সেদিন খুসী হয়েছিলেন বলে নিশুর উপর নজর রাখেন নি, তা নয়। সে পাত্রই তিনি ন'ন। তবে এ পর্য্যন্ত নিশুর কোন দোষই ধরতে পারেন নি। নিশু টুকে-পাশ-করা ছেলে—সে মামার নজরের ওপর নজর রাখে। মামা বেড়ান ডালে ডালে ত সে বেড়ায় পাতায় পাতায়। মামা যতই রবারের জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটুন, আর যতই পা টিপে টিপে চলুন, নিশু ঠিক আগে থাক্‌তে জান্‌তে পারে। ওর শ্রবণশক্তি হরিণ কিংবা খরগোসের শ্রবণশক্তির চেয়েও যেন তীক্ষ্ণ।

দু চার দিন গেছে, নিশু চলেছে স্নানের ঘরে। যখন দালানের উপর দিয়ে স্নানের ঘরে যাচ্ছে তখন সে পাশের একটা ঘরের দরজার পাশ থেকে নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল। বুঝ্‌ল, মামাবাবু ওৎ পেতে আছেন, সে স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করলেই অমনি দরজায় কান পাতবেন। একবার ভাবলে, আজ স্নানের ঘরে গিয়ে ভুলেও গানটান করা হবে না, খুব সাবধান থাক্‌তে হ'বে। আবার ভাবলে, না, আজ আর এক চাল ছাড়তে হ'বে। ভেবে যেন নিজের মনে মনেই একটু চেঁচিয়ে বল্লে (যাতে মামার কানে যায়)—"ওঃ যা, দাঁতের মাজনটা আনতে ভুলে গেলাম"—বলে উপরে চলে গেল। উপরে গিয়ে মামীমার পূজার ঘর থেকে স্তবের পাতলা বইটা নিয়ে তোয়ালের ভিতর জড়িয়ে নীচে চলে এল। নীচে এসে কান পেতে শুন্‌ল, তখনও দরজার পাশ থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ আস্‌ছে ; ভাবলে—মামা বাবু সেই থেকে এখনও পর্য্যন্ত ওৎ পেতে আছেন। ধৈর্য্য বটে! স্নানের ঘরে গিয়েই সে দরজা বন্ধ করে দিল। তার পর একটু পরেই বুঝতে পারলে যে মামা বাবুর কান দরজায় ঠেকেছে এই বার। প্রথমে সে একটু গুণ গুণ করে সুর ভাঁজতে লাগ্‌ল স্নান করতে করতে। মামা বাবু কান খাড়া করে আছেন, ভাবছেন এইবার গান ধরবে নিশ্চয়। কোন্ শাস্তিটা দেবেন ঠিক করতে লাগলেন মনে মনে। এত দিন পরে

সে ধরা পড়েছে ভাবলেন। হঠাৎ তাঁর কানে এল নিশু কি একটা গাইছে—কিন্তু ও কি, ও যে সুর করে স্তোত্র গাইছে দুর্গার! দুর্গা-স্তোত্র শেষ হয়ে গেল—এবার শিব-স্তোত্র; তার পর সূর্য্যের স্তব।

মামা বাবু মোহিত হয়ে গেলেন। আহা এমন ছেলে—স্তোত্রের পর স্তোত্র মুখস্থ বলে চলেছে। স্নানের ঘরে বাড়ীর অন্য ছেলেরা গায় থিয়েটারের গান আর এ গাইছে স্তোত্র। তাঁর দুঃখ হ'ল এমন ছেলে যদি তাঁর হ'ত। আস্তে আস্তে দরজার কাছ থেকে তিনি সরে গেলেন। নিশুও অমনি স্তবের বইটী তোয়ালেতে মুড়িয়ে বার হয়ে পড়্ল।

নিশুর উপর দিনের পর দিন উঁচু ধারণা হ'তে লাগ্ল মামা বাবুর।

আর একদিন বৈকালে বাড়ীর ছোট বড় পাঁচ সাত জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে বসে নিশু খুব গল্প জমিয়েছে। যত সব ওর বাহাদুরীর গল্প—কি করে ধুতির সঙ্গে বইএর পাতা এঁটে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষায় টুকেছিল—একটা মাত্র অচল দু'য়ানি পকেটে নিয়ে কি করে সমানে এক মাস বাসে-ট্রামে ঘুরেছিল, কিংবা কি করে তার ছোট কাকার খাবার জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে তাকে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত করে দিয়ে সারারাত থিয়েটার দেখেছিল—এমনি কত কি। কিন্তু গল্প যতই করুক চোখ কান তার ঠিক পড়ে আছে সিঁড়ির দিকে। গল্প যখন খুব জমে উঠেছে তখন নিশুর চোখে পড়ল সিঁড়ির ঘরের জানলার কাঁচের উপর একটা ছায়া পড়েছে। নিশু বুঝ্ল যে এসেছেন মামা বাবু। একটুখানির জন্য সে চুপ কর্ল। ছেলেদের মধ্যে থেকে একেবারে তিন চার জন এক সঙ্গে বলে উঠ্ল—"তার পর, তার পর?"

নিশু বুঝ্ল এতক্ষণে মামা বাবু কান পেতে শুন্ছেন। সে খুব আস্তে বল্ল—"মামা বাবু এসেছেন, চুপ"—বলেই বেশ জোর গলায় বল্তে লাগ্ল—যাতে সিঁড়ির ঘর থেকে শোনা যায়—"তার পর? তার পর সেই ভিখারীটাকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে একজনের বারান্দায় শোয়ালাম; মা স্কুলে খাবার জন্য চারটে পয়সা দিয়েছিলেন, সেই পয়সা নিয়ে বরফ কিনে এনে তার মাথায় দিলাম। অনেকক্ষণ পরে সে সুস্থ হ'লে তাকে আমি আর একটী ছেলে ধরাধরি করে তার বাড়ী পৌঁছে দিলাম—ভিখারীর বুড়ো মা কি আশীর্ব্বাদই কর্লে আমাদের—"

সিঁড়ির ঘর থেকে মামাবাবু ভাবলেন—কর্বে না আশীর্ব্বাদ? এমন দয়ালু, পরোপকারী ছেলে!—

এদিকে ছেলেরা কিছুই বুঝছে না গল্পের মাথামুণ্ডু। তবু চুপ করে আছে কারণ ওদিকে একেবারে বাঘ যে স্বয়ং।

নিশু তার পর আরও রং চড়িয়ে গল্প ধর্ল—কি করে তার বন্ধু নীতীশ একজন অন্ধ লোককে আগুন লাগা ঘরের মধ্যে থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের একটী চোখ হারিয়েছিল...

মামাবাবু শুন্ছেন আর আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে ভাবছেন—ধন্যি ছেলে, যেমনি নিজে, তেমনি সব বন্ধু।

নিশু তখন বল্ছে—"এমনি করে পরের জন্য প্রাণ দিতে হয়, বুঝলে তোমরা? আমরা বাঁচ্‌ব শুধু পরের জন্য—এই হওয়া উচিত আমাদের আদর্শ।—"

মামাবাবু এবার একেবারে গলে গেলেন, ভাবলেন, এই সব ছেলে বাড়ীতে থাক্‌লে বাকী ছেলে গুলোরও উন্নতি হয়—গল্পচ্ছলে কি সুন্দর উপদেশ দিচ্ছে—কত বড় আদর্শ সম্মুখে ধর্ছে ছেলেদের—বাঃ বাঃ, চমৎকার। আস্তে আস্তে নেমে গেলেন তিনি।

নিশু দেখ্‌ল ছায়া সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে সুর বদ্‌লে হেসে বল্‌লে—"তার পর"—বলে আবার সেই আগের গল্প সুরু কর্ল—"ছোট কাকা ত অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, আমি কাপড়ে কাপড়ে গিঁট দিয়ে বারান্দার রেলিংএর সঙ্গে বেঁধে নেমে পড়লাম"—

ছেলেরা সব আবার কান খাড়া করে শুন্তে লাগ্‌ল।

নিশুর আর কোনও বিপদ্ রৈল না—মামাবাবু তার উপর নজর রাখা বন্ধ কর্লেন—এমন কি অন্য ছেলেরাও তার সঙ্গে থাক্‌লে অনেক সময় তিনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তেন।

রোজ খুব ভোর বেলা উঠে নিশু ছেলেপিলেদের নিয়ে বেড়াতে যায়। মামার অনুমতি নিয়েছে আগেই; বলেছিল—"বাবা বল্‌তেন প্রাতর্ভ্রমণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে, আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও বেড়ে যায়—তা

আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে রোজ ভোরবেলা একটু বেড়িয়ে আসি"—

মামাবাবু বল্লেন—"হ্যাঁ, নিশ্চয়। ঐ ছেলে গুলোকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যেও"।

নিশু ভোরবেলা উঠে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে, আর গায়ের কাপড়ের মধ্যে একখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লুকিয়ে নিয়ে বার হয়ে পড়ে। অনেক দূরে মাঠের মধ্যে গিয়ে একটা গাছতলায় বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে, আর সবাই শোনে। একটু বেলা হলে আবার বইখানি লুকিয়ে নিয়ে বাড়ী ফেরে।

নিশুদার অধীনে থেকে এবং পরামর্শে চলে ছেলেদের আজকাল অনেক শাস্তি কমে গেছে। নিশু ওদের কাছে একটা কেষ্ট বিষ্টু গোছের হয়ে উঠেছে।

এমনি ভাবে ত দিন চলেছে। একদিন শম্ভু বলে একটী ছেলে এল নিশুর মামার বাড়ী। দু চারদিন থাক্‌তে থাক্‌তেই বেচারা মরেছে একদিন—সন্ধ্যার পর দু ঘণ্টা ব্যাঙ। নস্য নিয়ে ধরা পড়েছিল নাকি। শম্ভুর অবস্থা দেখে নিশুর সেদিন ভারী মায়া হ'ল। সে শম্ভুর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল—"কাল সকালে—ভোরে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেও, কি করে মামার হাত থেকে বাঁচতে হয় তা সব শিখিয়ে দেব।"

পরদিন ভোরবেলা। নিশু শম্ভুর ঘরে এসে দেখে শম্ভু তখনও লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। সে বল্লে, "এই শম্ভু, ওঠো, চল, দেরী হয়ে গেলে মামাবাবু উঠে পড়বেন—তখন মুস্কিল হ'বে। শীঘ্রি ওঠ, আজ একখানা নতুন বই আরম্ভ হবে—রবার্ট ব্লেকের।"

লেপটা একটু নড়্‌ল—শম্ভু ওঠে না।

নিশু বল্লে—"আরে, ভয় কাকে? মামাকে ত? কোনও ভয় নেই। যতক্ষণ এই নিশু মুখুয্যে আছে ততক্ষণ কোনও ভয় নেই। কত বড় বোম্বেটে ছেলে এই নিশুচন্দ্র তা'ত তাঁর জানা নেই!"

লেপটা আরও বেশী করে জড়িয়ে নিল শম্ভু এবার। নিতান্তই কুঁড়ে ছেলেটা!

নিশু এবার লেপটা ধরে টান্‌লে—লেপ কিন্তু শম্ভুর মাথা থেকে বা গা থেকে খুল্‌ল না—

নিশু বল্‌ল—"মামাকে অত ভয় কর্‌বার কিছু নেই যতক্ষণ আমি আছি। প্রথমতঃ গীতার চাল, দ্বিতীয়তঃ স্তোত্রের চালে মামাকে ঘাল করেছি—চল না মাঠে, সব বল্‌ব—কি করে আগে থাক্‌তে পকেটে গীতা রেখে—কি করে আগে থাক্‌তে মামা লুকিয়ে আছেন জেনে স্তবের বই নিয়ে গিয়ে স্নানের ঘরে বই থেকে স্তব পড়ে মামাকে বোকা বানিইছি—সব বল্‌ব, চল না। এই ত রোজ মাঠে বেড়াতে যাই, মামা জানেন, প্রাতর্ভ্রমণ করি অথচ এদিকে একুশখানা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস যে শেষ হয়ে গেল মামা কি তার খোঁজ রাখেন নাকি?"

লেপটা এবার খুব নড়ছে।

নিশু বল্‌লে—"চল, চল, আমাকে ধরে এমন লোক জন্মায় নি; বাবা, কল্‌কাতার টাট্টু মার্কা ছেলে আমি—" নিশুর কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, ও যেন ভূত দেখেছে। দরজার পাশ থেকে শম্ভু যে ইসারা কর্‌ছে! তবে, তবে এ লেপের ভেতর কে—

শম্ভু দরজার কাছ থেকে প্রাণপণে ইসারা কর্‌ছে—"মা-মা-বাবু, মা-মা-বা-বু ও লেপের ভিতর—"

নিশুর মাথাটা একবার ঘুরে গেল—তারপরের মুহূর্ত্তেই এক লাফে বাইরে।

শম্ভু বল্‌লে—"কাল রাত বারোটার ট্রেনে মামাবাবুর এক কাকা এসেছেন। তাঁকে মামাবাবুর বিছানায় শুতে দিয়ে মামাবাবু আমার বিছানায় এসে শুয়েছেন কাল। আমি সিধুদা'র সঙ্গে একসঙ্গে শুয়েছিলাম।" আর শুয়েছিলাম—নিশু ততক্ষণ তার বাক্স-বিছানা সব কিছু ফেলে বাড়ী থেকে ছুট্—

মামাবাবু ততক্ষণে উঠে পড়েছেন—তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বরে বাঁড়ী কাঁপতে লাগ্‌ল—"নিশু, নিশু"! কোথায় নিশু—সারা বাড়ীময় খুঁজে নিশুকে পাওয়া গেল না।

চাকরটা বল্‌ল—"নিশু বাবু ইষ্টিশানের দিকে ছুটছেন দেখলাম—"

মামাবাবুও ছুটলেন ষ্টেশনের দিকে—রাগে থর থর করে কাঁপছে তাঁর সারা শরীর। উঃ, এত বড় পাজি শয়তান! কি ধাপ্পাটাই দিয়েছে এতদিন! একবার পেলে হয় ওকে। ষ্টেশনে এসে শুন্‌লেন তখন কোনও ট্রেন নেই। তবে গেল কোথায়?

যাই হোক, মধুপুরের মধ্যেই আছে, যাবে কোথায়? কিন্তু ওকি! ঐ যে মালগাড়ীটা যাচ্ছে—ওর উপর—হ্যাঁ, নিশুই ত! একটা গাড়ীতে কয়লার উপর বসে রয়েছে। সত্যিই, নিশু তখন প্রাণের দায়ে চলন্ত মালগাড়ীর উপরেই চড়ে বসেছে—বুকটা তখন তার ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌ছে।

মামাবাবু রাগে, দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাড়ী ফির্‌লেন। সেদিন নাকি বাড়ীর সকলকে দোষে এবং বিনা দোষে ব্যাঙ আর চেয়ার হ'তে হয়েছিল।

আর নিশু?

এর পর নিশু মধুপুরে যাওয়া দূরে থাকুক কোনও দিন নাকি মধুপুরের ও লাইন দিয়েও কোথাও যায় নি।

কঙ্গো-যাত্রা

(শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্-এ, বি-টি)

একদা ছিল যে কলিঙ্গদেশে "জবর-জঙ্গ" বীর,—
পঙ্গু সে নয় বেঙ্গলী-সম, অতীব তুঙ্গ-শির।
সাঙ্গোপাঙ্গো সঙ্গে লইয়া রঙ্গ-ভঙ্গে চলে,
পিঙ্গল জটা লটপট করে, চোখে অঙ্গার জ্বলে।
সহসা তাহার মর্জ্জি হইল কুরঙ্গ ধরিবারে
কঙ্গোদেশের জঙ্গলে গিয়া—সুদূর সিন্ধু-পারে।
পঙ্খীরাজ সে তুরঙ্গে চড়ি' যাত্রা করিল তবে,—
মঙ্গল-ধ্বনি করিল শঙ্খে মাঙ্গলিক্য সবে।
পুরাঙ্গনারা প্রাঙ্গণে জুটি' দিল সঙ্গীত জুড়ি',
গঙ্গোদকের ছিটা নিয়া শিরে ইঙ্গিতে গেল উড়ি'।

নিম্নে ফেনিল নীল তরঙ্গে ব্যঙ্গ করিয়া ছুটে;
লঙ্কা-দ্বীপের শৈল-শৃঙ্গ পশ্চাতে মাথা কুটে।

আফ্রিকা দেশে যেম্‌নি নামিল 'জবরজঙ্গ' বীর,—
টাঙ্গানিকার কাফ্রীরা এল লইয়া ধনুক-তীর।
পঙ্গপালের মত দঙ্গল ঘেরিল নিমেষ মাঝে,
বাধে হাঙ্গামা—দাঙ্গা বুঝি বা, ডঙ্কা-দামামা বাজে।
মহা শঙ্কায় সহসা 'জঙ্গ' সংজ্ঞা হারায়ে লোটে,
মগজে তাহার তখন কেবলি ভৃঙ্গ গুঞ্জি' ওঠে।
জ্ঞান হ'ল যবে, প্রভাত-বায়ুতে চাঙ্গা যখন দেহ,
'জঙ্গ' চাহিয়া হেরে সঙ্গীরা কোথাও নাহিক কেহ;
পালঙ্কে শুয়ে আছে নিরাপদে, অঙ্গে বেদনা নাই,
স্বপ্ন কি তবে কঙ্গো-যাত্রা? 'জঙ্গ' ভাবিছে তাই।

লটারি

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ)

ভগেলু ধোপা দেশে যাবে। শুনেছি নাকি আর ফির্‌বে না। টাকা-পয়সা যেখানে যা পাওনা ছিল আদায় হ'য়ে গেছে; জিনিষপত্তর পোঁটলাপুঁটলিও বাঁধা-ছাঁদা শেষ। গোল বেধেছে তার গাধাটাকে নিয়ে। ইষ্টেশনের মালবাবু বলেছেন, ওটাকে নিয়ে যেতে হ'লে তের টাকা সাড়ে পাঁচ আনা লাগবে। কাজেই বিক্রী ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কিনবে কে?

পাঁচকড়ি পাঠকের সেজ ছেলেটা এই বয়সেই একটু অতিরিক্ত চালাক হ'য়ে পড়েছে। তার বাপ আর তাকে বাগ মানাতে পার্‌ছে না। কবিরাজ মশাই

ব্যবস্থা করেছেন—রোজ আধসের করে গাধার দুধ। ভগেলু তাই শুনে পাঁচকড়ির বাড়ীতে হাঁটাহাটি করছিল। কিন্তু ছেলেটা জান্‌তে পেরে তাকে লাঠি নিয়ে এমন তাড়া করেছে যে সেখানে আর যাওয়া চলে না।

কাজেই ভগেলু শেষটায় নগেশ বাবুর কাছে গিয়ে ধরে পড়্‌ল। নগেশ বাবু মানে ওপাড়ার নগেশদা'। পাকা লোক। এই তিন বছর ফার্ষ্ট্‌ ক্লাসে আছেন। মড়া পোড়াতে, খোল বাজাতে, লাঠি মার্‌তে আর পরীক্ষায় ফেল কর্‌তে তাঁর জোড়া নেই। ভগেলুর বিপদ্‌ শুনে বললেন, "কুছ পরোয়া নেই। কাল আসিস্‌। আমি কিন্‌ব গাধা।"

পরদিন তিন টাকা চার আনায় নগেশ দা' গাধাটা কিনে নিল। সবাই বল্‌লে, "নগেশের মতলবটা কি?" সেটা পরদিনই বোঝা গেল। সকালে উঠেই দেখলাম—ইস্কুলে, কালীবাড়ীতে, কাছারীতে, বাজারে বড় বড় বিজ্ঞাপন—

লটারি! লটারি! লটারি!
একটি চমৎকার গাধা!
টিকিট এক আনা মাত্র!

ইস্কুলে নগেশদা'র বেজায় প্রতাপ। সবাইকেই টিকিট কিন্‌তে হ'ল। এমন কি দারোগা বাবুর ছেলে অজয়ও বাদ পড়্‌ল না। অজয় অবশ্য গোড়াতে রাজী হয়নি। সে যে-সে ছেলে নয়। সারা বছর ক্লাশে একটি কথা বলে না। সেই জন্য গুড্‌ কণ্ডাক্টের প্রাইজ তার একচেটে। কিন্তু নগেশদা'র পাল্লায় পড়ে সেও একটা কিন্‌ল।

লটারি হ'ল দিন তিনেক পরে। খেলার মাঠে থার্ড্‌ মাষ্টার জগৎ বাবু একটা বড় টিনের কৌটোয় টিকিটগুলো পুরে খুব খানিকটা ঝেঁকে নিলেন। তারপর তাঁর তিন বছরের ছেলে মিণ্টুকে বল্‌লেন, "একখানা কাগজ তোল।" মিণ্টু তুল্‌ল। সবারই বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ কর্‌ছে—কার নাম ওঠে। জগৎ বাবু হেঁকে বল্‌লেন—"অজয় সেন।"

অজয় বাড়ীতে বসে আঁক কষছিল। ছেলের দল গিয়ে খবর দিতেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্‌ল। কিন্তু কাঁদলে ছাড়ে কে? সবাই মিলে ধরে এনে তাকে সেই গাধার পিঠে চড়িয়ে দিলে। তারপর আরম্ভ হ'ল প্রসেশন। সে কি

প্রসেশন। রাজা গজেন মল্লিকের ছেলের বিয়েতে তেমনটা দেখি নি। গাধার গলায় একটা দেড়শ' হাত দড়ি; দু'শ ছেলে তাই ধরে টান্‌ছে, এ ছাড়া আশে-পাশে এবং পিছনে আরো শ' দু'য়েক। বাদ্য হরেক রকমের। স্বয়ং নগেশদা'র কাঁধে খোল। এ ছাড়া গোটা চারেক ক্যানাস্তারা, একটা ধামা, গোটা পাঁচেক কুলো, একটা প্রকাণ্ড শিঙে। সবগুলোর সঙ্গে গাধাটার আনন্দ-ধ্বনিটা বেশ খাপ্‌ খেয়ে গেল। কিন্তু অজয়ের "ভেউ ভেউটা আর শোনা যাচ্ছিল না।

সন্ধ্যার সময় থানার কাছে এসে শোভা-যাত্রা থাম্‌ল। গাধার দড়িটা অজয়ের হাতে দিয়ে নগেশদা' থিয়েটারি কায়দায় বল্‌লেন—"নাও ভাই, নাম মাত্র মূল্যে যে অমূল্য বস্তু লাভ করলে প্রাণপণে তাকে রক্ষা ক'রো।"

অজয় তিন হাত ছিটকে গিয়ে হাত পা ছুঁড়ে বল্‌লে, "কক্ষণো না, আমি নেব না। সব জোচ্চুরি, আমি বাবাকে বলে দেব, সব জোচ্চোর!" নগেশদা' অত্যন্ত ঠাণ্ডা ভাবে বল্‌লেন—"তা ব'লো, কিন্তু ঐটা তোমার জিনিষ। বেঁধে না রাখলে পরের ক্ষেতে গিয়ে লাগবে। তারা নিয়ে যাবে খোঁয়াড়ে। ছাড়াতে পয়সা লাগবে। সেটা বুঝে দেখো।"

থানার একটা সিপাই বুদ্ধি করে গাধাটাকে রাতের মত হাজত-ঘরে বন্ধ করে রেখে দিল। হাজতে কোন আসামী ছিল না।

অজয়ের বাবা মফঃস্বলে গিয়েছিলেন, অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলেন; এবং ভোর না হতেই পুলিশ সাহেবের লঞ্চ্‌ এসে থানার ঘাটে ভিড়্‌ল। সিপাই এবং বাবুদের মহলে হুলস্থুল পড়ে গেল। গাধাটার কথা কারুর খেয়ালই রইল না।

বেলা তখন গোটা দশেক। পুলিশ সাহেব অফিসে বসে কাগজ-পত্র দেখছিলেন। হঠাৎ পাশের ঘরে বেজায় জোরে গর্দ্দভের মিষ্টিকণ্ঠ হেঁকে উঠ্‌ল। ব্যাপার কি? সাহেব উঠে গিয়ে একটু মুচ্‌কি হেসে দারোগা বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি মোকর্দ্দমার আসামী?" দারোগা বাবু তো আকাশ থেকে পড়েছিলেন। চট্‌ করে নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌লেন, "আজ্ঞে, চুরি এবং ট্রেস্‌পাস্‌; একজনের জমিতে ঢুকে পাকা ধান খেয়েছে। তদন্তটা শেষ করেই ৩৭৯ এবং ৪৫৪তে চালান দেব।"

সাহেব বল্‌লেন, "ওঃ!"

পুলিশ সাহেবের লঞ্চ্ ছেড়ে যেতেই দারোগা বাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল—"এই, ইধার আও কিষ্‌কিন্ধ্যা সিং, গন্ধমাদন পাঁড়ে। কোন্ বেয়াকুফ্‌কা কাম হ্যায়?" জানা গেল 'বেয়াকুফ্' আর কেউ নয়, তাঁরি শ্রীনন্দন অজয়কুমার। অজয়ের ডাক পড়্‌ল। দারোগা বাবু তেড়ে উঠলেন, "ব্যাটা উজবুক্, চাকরিটা খেয়েছিলি আর কি! ভাগ্যিস্ ফস্ করে বুদ্ধিটা জোগাল। কোথায় পেলি ওটাকে, বল্ শীগ্‌গির?"

অজয় সমস্ত ইতিহাস বলে গেল। নগেশদা'র নামে একটু বেশী করে বল্‌ল। দারোগা বাবু রুখে উঠলেন, "বটে, আমার সঙ্গে চালাকি! সব ব্যাটাকে ৩৯৫ ধারায় চালান কর্‌ব। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি? আভ্‌ভি নিকাল দাও গন্ধমাদন পাঁড়ে, পিঠমে ডাণ্ডা মারকে নিকাল দাও।"

হুকুম পেয়ে সিপাই জোর ডাণ্ডা মেরে গাধাটাকে বিদায় করে দিলে।

দিন সাতেক পরে। দারোগা বাবু মফঃস্বল যাবার জন্যে ঘোড়ায় উঠতে যাবেন, এমন সময় ইউনিয়ন্ বোর্ডের এক চাপরাশী সেই গাধাটা নিয়ে উপস্থিত। এক গাল হেসে সেলাম করে বল্‌লে, "দিন পাঁচেক হ'ল হালদাররা খোঁয়াড়ে দিয়েছিল। হুজুরের জিনিষ জানতে পেরে নিজেই নিয়ে এসেছি"—বলে একখানা কাগজ হাতে দিল। দারোগা বাবু দেখলেন, সাত টাকা সাড়ে এগার আনার একটা বিল। দারোগা বাবু গর্জ্জে উঠলেন, "নেহি লেগা। উ গাধা হামারা নেই হ্যায়। ভাগো হিঁয়াসে।"

চাপরাশী বল্‌ল, "আজ্ঞে, আপনার ছেলের মানেই আপনার। খোকাবাবুর কপালের জোর আছে। চার পয়সায় এমন একটা জলজ্যান্ত গাধা—"। দারোগা বাবু ঘোড়ার গদিটা তুলে নিয়ে চাপরাশীকে তাড়া করলেন। কিন্তু টাকাটা শেষ পর্য্যন্ত দিতে হ'ল। সরকারী খোঁয়াড়। না দিয়ে উপায় কি?

আবার অজয়ের ডাক পড়্‌ল। দারোগা বাবু তিনটি আঙুল দেখিয়ে বললেন, "এক—দুই—তিন, তিন দিন সময় দিলাম। চার দিনের দিন যদি ওই আপদ্ কোথাও দেখতে পাই, তোমার হাড় আর মাংস এক জায়গায় থাকবে না। জেনে রেখে দাও।"

অজয় সে কথা জান্‌ত। কিন্তু তিন দিন তো দূরের কথা, তিন বচ্ছরেও এই গাধার হাত থেকে রেহাই পাবার কোন রাস্তা তার চোখে পড়্‌ল না। আরও বিপদ্। গাধাটা কিষ্‌কিন্ধ্যা সিং আর গন্ধমাদন পাঁড়ের হাতে ক্রমাগতঃ ডাণ্ডা খেয়ে অজয়ের ভয়ানক বাধ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। এক দণ্ড তাকে না দেখলেই গলা ছেড়ে এমন বিলাপ সুরু করে যে আশ-পাশের সকলের মাথায় রীতিমত খুন চেপে যায়।

অজয়ের চোখে আর ঘুম নেই। দু'দিন চলে গেছে। তিন দিন যায় যায়। রাতে শোবার ঘরে বসে বসে ভাবছিল কি করা যায়। থানার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল। অজয়ের মাথায় তখন এক ফন্দি এসেছে। গাধাটা মাঠে বাঁধা ছিল। চুপি চুপি বেরিয়ে দড়িটা ধরে অজয় অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়্‌ল।

পুরো চার মাইল রাস্তা হেঁটে কৃষ্ণপুর। সেখানে একটা ধোপার আড্ডা আছে, তাদের কয়েকটা গাধাও আছে। বাইরেই চরে বেড়াচ্ছিল। অজয় আস্তে আস্তে তাদের কাছে গিয়ে তার গাধাটাকে ছেড়ে দিলে। তখনও একটু রাত ছিল, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে সরে পড়্‌ল।

এত দিন পরে সমস্যা মিট্‌ল এই ভেবে অজয়ের মন খুসীতে ভরে উঠেছিল। খানিকটা পথ যেতেই শুনতে পেল, তার গর্দ্দভ চণ্ডীপাড়া মাথায় করে গান ধরেছে। অজয় জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলে। আরো কিছু দূর যেতেই দেখ্‌ল সে প্রাণপণে ছুটে আসছে। এদিকে ধোপাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তারা চট্ করে বুঝে ফেল্‌ল, কেউ নিশ্চয়ই তাদের গাধা চুরি করতে আসছে। একটা লোকের পিছনে একটা গাধাকে ছুটতে দেখে তাদের সন্দেহ বেড়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা লাঠি-সোটা নিয়ে তাড়া কর্‌ল। অজয় তখন প্রাণপণে ছুটছে। কিন্তু কতক্ষণ? ধোপারা এসে ধরে ফেল্‌ল, এবং কিছু বলবার আগেই দু'-চারটে চড়-চাপড় বসিয়ে দিল। অজয় অনেক করে বল্‌ল, সে চুরি করতে যায়নি, বরং একটা গাধা তাদের দান করতে গিয়েছিল। সকলে হেসেই খুন। কত বড় দয়ালু! রাত দুপুরে ইনি গাধা দান করতে এসেছেন!

যাক্, ছেলেমানুষ বলে অজয়কে আর বিশেষ কিছু উত্তম-মধ্যম সইতে হ'ল

না। তবে এ রকম চোট্টার উচিত সাজা হওয়া দরকার, এই মনে করে ধোপারা চোরাই মাল শুদ্ধু তাকে থানায় নিয়ে চল্‌ল।

তখন বেলা হ'য়েছে। থানার বারান্দায় বসে দারোগা বাবু রিপোর্ট লিখছিলেন। অজয়কে তাঁর সামনে এনে হাজির করা হ'ল—হাতে কোমরে দড়ি বাঁধা, আগে পিছে তিন চার জন ধোপা। দারোগা বাবু হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন; চেয়ারটা উল্টে পড়ে গেল, টেবিলটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়্‌ল উঠানে একটা কুকুরের গায়ে, সেটা ঘেউ ঘেউ করে ছুট্‌ল। দারোগা বাবু হুকুম দিলেন, "নিকাল দেও, নিকাল দেও, কিষ্‌কিন্ধ্যা সিং, গন্ধমাদন পাঁড়ে।"

ধোপারা হাত জোড় করে বল্‌ল, "দোহাই হুজুর, আমরা কোন অপরাধ করি নি। এই 'চোট্টা' আমাদের গাধা চুরি করে পালাচ্ছিল; মাল শুদ্ধু ধরে এনেছি। বিশ্বাস না হয়, এই দেখুন"—বলে সেই গাধাটাকে হাজির কর্‌ল।

ব্যাপার দেখে দারোগা বাবুর মাথার সমস্ত মগজটাই ঘুলিয়ে গেল। অজয় সব কথা বুঝিয়ে বলতেই তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পর আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "আচ্ছা, তোমাদের গাধা নিয়ে যাও। চোর আমার জিম্মায় রইল।" কিষ্‌কিন্ধ্যা সিংকে ডেকে বল্‌লেন, "খোকাবাবুকো এক রূপেয়াকা রস্‌গুল্লা, আউর দোঠো লেমনেড্‌ খিলায় দেও।"

—গাধার সমস্যাটা এত সহজে মিটবে, তিনি আশা করেন নি।

তার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘট্‌ল। গাধাটাকে যতই তারা টানাটনি করে সে কিছুতেই নড়ে না। গন্ধমাদন পাঁড়ে জোর ডাণ্ডা লাগিয়ে দিল, তবু যেতে চায় না। তখন তিন-চার জনে মিলে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। সকলে ব্যাপার দেখে হতভম্ব। কিন্তু সব চেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড কর্‌ল অজয়। গাধাটা সবে বাজারের পথ পর্য্যন্ত গেছে, হঠাৎ কি মনে করে সে "ছোড় দেও, ছোড় দেও" ব'লে পিছন পিছন ছুট্‌ল। ধোপার দল তাকিয়ে দেখ্‌ল, পেছনে গন্ধমাদন পাঁড়ে—হাতে ডাণ্ডা। তারা কিছুই বুঝ্‌ল না, শুধু এটুকু বুঝ্‌ল যে গাধা আর প্রাণ এ দু'টো নিয়ে এখান থেকে যাওয়া অসম্ভব। কাজেই গাধা ছেড়ে প্রাণ নিয়েই সরে পড়্‌ল।

অজয় সেই থেকে গাধাটাকে নিজে হাতে মানুষ করে। তার পিঠে চড়ে

ইস্কুলের পথে গট্‌গট্‌ ক'রে চলে যায়। ছেলের দল হাততালি দেয়, সে গ্রাহ্যও করে না।

ছোটদের চিত্রশালা

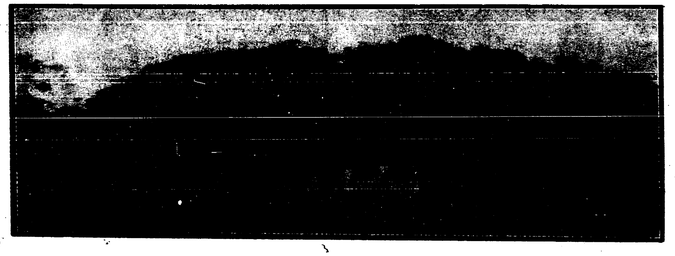

শিবপুর বোটানিক্যাল্‌ গার্ডেনের বিশাল বটগাছ—এটির বয়স প্রায় দেড়শ' বছর।

আলোকচিত্র-গ্রহীতা—শ্রীরামপ্রসাদ সিং (গ্রাঃ নং ১৩৬৯)

চাল দামী, কলা দামী,
জানি মহাশয়,

প্রাণের দামের কাছে
কোনটাই নয়।

শিল্পী—শ্রীসুমুখনাথ মিত্র (গ্রাঃ নং ১৪২১)

দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দির
আলোকচিত্র-গ্রহীতা—শ্রীবরুণকুমার ভট্টাচার্য্য (গ্রাঃ নং ১০৫৮)

অঞ্জলি
শিল্পী—শ্রীজগদানন্দ সরকার
(গ্রাঃ নং ১৫১৮)

ছোট্ট সে নীল পাখী

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ)

ছোট্ট সে নীল পাখী—
জানো তায় ?
সারা নিশি ভরি' হায়
অস্ত চাঁদের পানে
চেয়ে চেয়ে গান গায়, গান গায় !

তার পরে মিশে যায়, আকাশের সীমানায়—
জ্যোৎস্নায় !

ছোট্ট সে নীল পাখী—
মিঠে সুর,
রচিবে সে সুর-পুর—
সন্ধ্যা-মেঘের গানে
প্রভাত-আলোর গানে সুমধুর !
সুরের আগুনে জ্বলি' মিশে যা'বে বহু দূর—
বহু দূর !

ছোট্ট সে নীল পাখী—
নাই ঘর !
দিকে দিকে ডানা তা'র
ক্লান্ত করুণ মেঘে
খুঁজে ফিরে বুঝি চির-নির্ভর !
সারা দুনিয়ায় তা'র নাই ঘর, নাই ঘর,—
নাই ঘর !

ছোট্ট সে নীল পাখী—
দেখা পায় !
ঘন দূর বেণুবনে
যেখানে জ্বলিছে তারা,
সুনীল বরণী রাতি শিহরায় !
সুরের স্বপন সাথে নীল পাখী দেখা পায়—
দেখা পায় !

মনে তা'র পড়ে কি গো
সেই দেশ ?
যেখানে ছেলেরা ব'সে
শোনে শুধু রূপকথা
গোড়া যা'র আছে, তবু নাই শেষ।
ছোট ছোট মুখগুলি, চোখে নাই ঘুমলেশ—
সেই দেশ !

শোনে সে কি ঝাউবনে
শন্ শন্ ?
দিবারাতি কা'রা ডাকে
বাতাসের ইসারায়
পৃথিবীর পথিকেরে—'শোন্ শোন্' !
মরণের দেশ হ'তে উঠে ঘন গুঞ্জন—
'শোন্ শোন্।'

যেখানে মানুষ নাই,
শুধু জল !
সূর্য্য-চাঁদের সনে
কা'রা সেথা দিবানিশি
করে শুধু ছল-ছল কোলাহল !
সেথা সে কি গাহে গান সারারাতি অবিরল—
ছল-ছল্ !

ছোট্ট সে নীল পাখী—
জানি তায় !

কত জ্যোৎস্নার রাতে
দেখা হ'ল তা'র সনে
নারিকেল-বন পারে নিরালায় !
সহরে বন্দী মন খোঁজে তা'রে বেদনায়—
জানি তায় !

এবার পুজোয় কি খেল্‌বে

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

এবার পুজোর ছুটীতে খেলবার জন্য তোমাদের কয়েকটা নতুন ধরণের খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি।

অদৃশ্য বল্—

সকলে গোল হ'য়ে বস্‌বে। এবারে দলপতি দু'হাত দিয়ে যেন একটা বল্ ছুঁড়ছে এ রকম ভান ক'রে একজনের দিকে দু'হাত ছুঁড়বে। যার দিকে ছুঁড়্‌ল সে তক্ষুণি তার দু'কানে দু'হাত দেবে। তার বাঁদিকের ছেলে দেবে নিজের বাঁ কানে হাত, ডান দিকের জন, নিজের ডান দিকে হাত। যে ভুল কর্‌বে তাকেই শুয়ে পড়্‌তে হবে। যে ধর্‌তে পার্‌ল (তিনজনে ঠিক কর্‌লেই কেবল ধরা যায়) সে আবার অন্য আর একজনের দিকে ছুঁড়্‌বে। এমনি ভাবে খেলা চল্‌বে। যে শেষ অবধি থাক্‌বে তারই জিৎ।

গোলমাল—

আগেই ছোট ছোট টুক্‌রো কাগজে সাধারণ পাখী বা পশুর নাম লিখে রাখ্‌তে হবে। প্রত্যেক ছেলের জন্য একটা। প্রত্যেকে একটা ক'রে কাগজ টেনে নেবে, তার পর 'গাও' বল্‌লে কাগজে লেখা পাখী বা পশুর ডাক সুরু করবে। 'থাম' বল্‌লেই সকলকে থাম্‌তে হবে। এবারে প্রত্যেকে একটা ক'রে কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখ্‌তে বস কে ক'টা জন্তুর ডাক শুন্‌লে। যে বেশী লিখ্‌তে পার্‌বে সেই জিতবে। ভুল লিখ্‌লে কিন্তু উল্টে নম্বর কাটা যাবে।

ডাক পিয়ন—

ছেলেরা ঘরের যেখানে খুসী বসে থাক্‌বে। প্রত্যেকেরই একটা ক'রে জায়গার নাম নিতে হবে, যেমন—ক'লকাতা, ঢাকা, কাশী, ইত্যাদি। ঘরের অন্য দিকে খড়ি দিয়ে চারটে চৌকো ঘর কাট্‌তে হবে, এগুলি হ'ল ডাক-বাক্স। এখন, ছেলেদের একজন হবে পিয়ন, তার হাতে থাক্‌বে খবরের কাগজ জড়িয়ে করা একটা লম্বা ডাণ্ডার মত জিনিষ। পিয়ন বলবে, 'চিঠি আছে'। সকলে বল্‌বে, 'কোন্ জায়গার?' পিয়ন যে সহরের খুসী নাম (যেমন ধর ক'লকাতা) বল্‌বে, সেই সহরের নাম-ওয়ালা ছেলে তক্ষুণি ছুটে বেরিয়ে এসে পিয়নকে ধাওয়া কর্‌বে। পিয়ন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে হঠাৎ একটা ডাক-বাক্সে তার হাতের ডাণ্ডা রেখে ছুটে ক'লকাতার জায়গায় চলে যাবে। ক'লকাতা যদি পিয়ন তার জায়গায় পৌঁছুবার আগে ডাণ্ডাটা তুলে পিয়নকে ছুঁয়ে দিতে পারে তা হ'লে পিয়নের চাকুরী যাবে। ক'লকাতা হবে নতুন পিয়ন আর পিয়ন হবে ক'লকাতা।

আজব খবর

তোমরা বোধ হয় শুনে অবাক্ হবে যে এ বছর আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে মাটী এমন সময় গরম হয়েছিল যে বাগানের অনেক তরমুজ ফেটে সিদ্ধ হয়ে গেছে।

* * *

তোমরা জান, ঘোড়ার ক্ষুরে লোহার নাল পরালে খুব শক্ত ও মজবুত হয়। কিন্তু তোমরা এটা জান কি যে তার চেয়েও শক্ত এবং মজবুত জিনিষ হচ্ছে রবার। প্রাগ সহরে গত বছর এর আবিষ্কার হয়েছে। এতে নাকি ঘোড়া মোটেই পিছলিয়ে পড়ে না।

* * *

'স্কুরা' নামে এক জাতীয় পাখী স্কট্‌ল্যাণ্ডে ভয়ানক অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। তারা সমুদ্রের 'গাল'দের মেরে ফেল্‌ছে। শুধু তাই নয়, এরা নাকি মেষ-শাবকদেরকেও জীবন্ত ঠুকরে খেয়ে ফেলে।

* * *

"বই-এ ছাপার ভুল থাকবেই"—এ রকম একটা প্রবাদই আছে। কিন্তু এবার অক্স্‌ফোর্ড্ প্রেস থেকে যে বাইবেলের নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে নাকি এক বিন্দুও ভুল নেই।

* * *

কোপেনহেগেন সহরের নাম তোমরা অনেকেই জান। সেখানে একটা হোটেল আছে, সে হোটেলে প্রত্যহ ১৫৭ রকম স্যাণ্ড্‌উইচ্ তৈরী করা হয়। আবার আমেরিকার একটা হোটেলে প্রত্যহ ১৪৫ রকম আইস্‌ক্রীম তৈরী হচ্ছে। অবাক্ কাণ্ড!

* * *

আমরা যে রকম রাত্রিবেলায় চোরের ভয়ে কুকুর রাখি জাপান দেশের অনেকে নাকি তেমনি ধারা রাত্রে খাঁচায় অসংখ্য ঝিঁঝিঁপোকা ধরে রাখে। কোনও অচেনা লোক এলে তারা বিকট স্বরে গান জুড়ে গৃহস্থের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়।

* * *

গত বৎসর মার্কিন দেশে প্রায় আড়াই লক্ষ মোটর চুরি হয়েছে। এ গুলি নাকি চুরি ক'রেই চেহারা ও নম্বর এক মিনিটের মধ্যে অদ্ভুত ভাবে বদ্‌লিয়ে চীন, পারস্য প্রভৃতি রাজ্যে চালান করা হয়।

শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

আগামী অক্টোবর মাসে পারস্যে মহাকবি ফিরদৌসীর সহস্র বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। তাতে যোগ দেবার জন্য দেশ-বিদেশের বড় বড় লোকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

* * *

মাকড়যার জাল অত সরু, অত সূক্ষ্ম, কিন্তু শক্তি তার অদ্ভুত! ঠিক ঐ আকারের ইস্পাতের সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যায়। অতি প্রচণ্ড ঝড়ও নাকি মাকড়যার জালের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

* * *

আমরা যে সব খাদ্য খাই তার মধ্যে অনেক-খানিই জল। ডিমের প্রায় চৌদ্দ আনাই জল, মাছেও প্রায় তাই। রুটি, লুচি প্রভৃতিতেও অন্ততঃ পাঁচ আনা জল। কোন কোন তরকারিতে শতকরা ৯০।৯৫ ভাগ জলও থাকে। খাবার সময় কখনও মনে হয় কি?

* * *

মানুষে অনেক জিনিষই খায় শুনেছি কিন্তু কা'কেও কখনও কেঁচোর মত কাদা খেতে শুনেছ? ওরিনোকো নদীর কাদা নাকি এমন সুস্বাদু যে সে অঞ্চলের লোকেরা ভোজ-টোজ ব্যাপারে হরদমই তা খাচ্ছে।

* * *

একজন বড় হিসার-বিদ্ পণ্ডিত বলেছেন যে বড় বড় সহরে যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বাড়ছে তাতে আর কুড়ি বছর পরে টোকিওর লোকসংখ্যা হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ, নিউইয়র্কের ১ কোটি এবং সাংহাই-এর ৯০ লক্ষ। লণ্ডন নাকি তখন জনসংখ্যায় প্রায় ৬ষ্ঠ স্থানে গিয়ে ঠেকবে।

শ্রীমনোরমা দেবী

আমাদের লাউতা গ্রামের নিকটে গত ১৪ই ভাদ্র একটী গাভী অদ্ভুত এক বাছুর প্রসব করিয়াছে। বাছুরটির দুইটী মাথা। পিঠের মাঝখান হইতে মেরুদণ্ডটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কাঁধের কাছে গিয়া দুইটি পৃথক্ গলায় বিভক্ত হইয়াছে। পিছনের দিক্ সম্পূর্ণ এক। নবজাত বৎসটীর শরীরের কোন অংশই অপূর্ণ নহে, সমস্ত শরীর লোমে ঢাকা। প্রসবের সময় বাছুরটী প্রাণ হারাইয়াছে। যদি জীবিত থাকিত ত কি তামাসাই না হইত!

সভ্যবৃন্দ—লাউতা তরুণসঙ্ঘ

লুচি-তত্ত্ব

["সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু"র লালিকা]

(শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস—গ্রাঃ নং ১১৮৬)

ক্ষুধিত হইয়া এ লুচি ভাজিনু,
বিড়ালে লইয়া গেল ;
ভাজিতে ভাজিতে হাতও পুড়িল,
মেজাজ গরম ভেল।
লুচি রে ! কি মোর পেটেতে রাখি,
খাইব বলিয়া ও ময়দা মাখিনু,
(হায়) ঠোঁটেও গেল না দেখি !

সস্তা বলিয়া তেলই কিনিনু,
কাজ তো হ'ল না তেলে—
কড়ায় ঢালিতে ধোঁয়ায় বেঢ়ল,
চোখ ভ'রে আসে জলে।
জলটি ঢালিয়া পাতাটি পাড়িনু,
নজর পড়িয়া গেল—
কহে ভুক্তভোগী লুচিতে অসুখী,
শুধু ডালভাতই ভাল।

গত মাসের প্রশ্ন

গত মাসের ধাঁধার উত্তর অনেকেই দিয়াছেন। অন্যান্য রচনায় বেশী জায়গা দিবার জন্য আমরা আর তাঁদের নাম পূজা-সংখ্যায় ছাপাইলাম না। আগামী বারে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম একত্র বাহির হইবে।

নূতন প্রশ্ন

(১) এমনিতে কিছুতেই মুখ দেখাতে চায় না, কিন্তু মাথা কাটলেই মুখ বার করে। কে সে ?

(২) জ্যান্ত অবস্থায় কথা কয় না, কিন্তু মরার পর তার আওয়াজে বাড়ী কাঁপতে থাকে। কে সে ?

(৩) এমনিতে একেবারে বোবা, কিন্তু আঁচড় খেয়ে একেবারে কথার জাহাজ। কে সে ?

প্রাপ্তিস্বীকার—এ বছরের বার্ষিক শিশুসাথী সমালোচনার জন্য আমরা পাইয়াছি, আগামী বারে উহার সমালোচনা প্রকাশ করিব।

ভাবের অভিব্যক্তি

কথক ঠাকুর

মাড়োয়ারী

সাহেব

মা

ভূমিকায়—কুমারী সীতা দেবী (বয়স পাঁচ বছর)
আলোকচিত্র-গ্রহীত্রী—শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ

৭ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ { ১১শ সংখ্যা

উপকথার দেশে

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

জ্যোৎস্নাতে ফিনিক ফোটে শরৎ কালের রাত,
হঠাৎ দেখা তেপান্তরের রাজপুত্তুর সাথ।
তালপত্রের খড়্গ হাতে পঙ্খীরাজের পর
যেতেছিল, যাবার পথেই পড়্লো আমার ঘর।
হাসলে মৃদু, ঝরলো শুধু মাণিক এবং মুঁই,
বল্লে, 'খোকা, চিন্‌তে পারিস, কেমন আছিস তুই ?'
বুঝতে নারি, আমি নাতির ঠাকুরদাদা যে,
খোকা বলে আদর করে ডাকছে আমায় কে ?

বল্‌লে, 'মনে নাই কি রে তোর দিদিমায়ের কোল,
নেই কি মনে মধুর সাঁঝে ঘুমপাড়ানি বোল ?
আঁখি তোমার ঢুলতো যখন তন্দ্রালসে ভাই,
চতুর্দ্দিকে ঘুরেছি যে আজ কি মনে নাই ?
আমরা কিছুই ভুলিনাক', তোরাই ভুলে যাস্,
আজকে যাহা সত্য তাহা কালকে উপন্যাস।'
রাজপুত্তুর কাঁধে আমার হাতটী দিলে তার,
খোকাই আমি হয়ে গেলাম যেন পুনর্ব্বার।

উল্লাসেতে পূর্ণ হৃদি কোথায় গেল ভয়,
রাজপুত্তুর সঙ্গে চলি করতে দিগ্বিজয়।
বহুদিনের পরে আবার দেখতে পেলাম বেশ
শৈশবেরি উপকথার সেই সে পরীদেশ।
রূপ ঝলমল, সোনার কমল, সুরভি নিঃশ্বাস
জন্মান্তরের স্মৃতির মত দেখ্‌ছি চারিপাশ।
দেখতে পেলাম পরিচিত 'মন পবনের না'
কুঁচের বরণ কন্যা ঘাটে মাজ্‌তেছিল গা।

দেখতে পেলাম চম্পা ভাই আর সেই সে পারুল বোন,
এখনো হায় যাদের লাগি মন করে কেমন।
দেখা হ'ল বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী সাথ,
বিচিত্র সে কাঁকুড়—যাহার বীজটী তের হাত!
হস্তমালার দেশ দেখিলাম, জুজুবুড়ীর ঘর,
'হাঁকামানা' 'হুতুম থুমো' আজও লাগায় ডর।
দেখতে পেলাম কানকাটাকে—হস্তে নুনের ভাঁড়,
রামশিয়ালও বাদ পড়ে নি, তাকায় বারম্বার।

উড়ন্ত সব গাছের সারি, চলন্ত সব ঢাক,
সেই সে অটল হিজল তরু করলে রে অবাক্।
বহু দিনের সঙ্গীরা সব করছে আলাপন,
নৌকা হ'তে চিনলে আমায় কঙ্কাবতী বোন।
চলছি আমি রাজপুত্রের হাতেই দিয়ে হাত,
বাড়ীর কথা আমার মনে পড়লো অকস্মাৎ।
বল্‌লাম আমি 'অভিযানের চাই ত' অভিজ্ঞান—
পদ্মীরাজের শাবকটীরে আমায় কর দান।'

বল্‌লে কুমার, 'ঝুমঝুমি লও কিংবা হোথায় থাকো,
এটী তোমার নাতির ঘোড়া, তোমায় দেব নাকো।'
ভাব্‌লাম আমি লবের মত লবই তুরঙ্গম
বাধ্‌লো লড়াই, বাজ্‌লো রণের বাজ্‌লো রে ঝম্‌ঝম্।
* * *
খাপ্ থেকে যেই তরবারি খুলতে যাব ভাই,
দেখছি আমার হয়ে গেলাম যাহা ছিলাম তাই।

প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি

(শ্রীহেমলতা দেবী)

আমার বড় মেয়েটির সেদিন একটু অসুখ হইয়াছিল, তাই ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া খানিকক্ষণ পরীক্ষা করার পর পকেটে হাত দিলেন—ভাবিলাম এইবার একটা বিদ্‌ঘুটে তিতো ওষুধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন। আমাদের ছেলেবেলায় অসুখ হইলেই ঢক্ ঢক্ করিয়া তিতো ওষুধ গিলিতে হইত।

কিন্তু ডাক্তার বাবু বাহির করিলেন এক যন্ত্র, তার পর করিলেন এক ইন্‌জেক্‌শন্। ওষুধ-টোষুধ আর খাওয়ান হইল না।

ইন্‌জেক্‌শনের উপর আজকালকার ডাক্তারদের অগাধ বিশ্বাস; কথায় কথায় তাঁহারা রোগীর গায়ে ইন্‌জেক্‌শন্ করেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সরু সূচের সাহায্যে হাত কিংবা পা ছেঁদা করিয়া সেই সূচের গায়ে লাগানো সিরিঞ্জ দিয়া শরীরের মধ্যে ওষুধ ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। ওষুধ খাওয়ান'র চাইতে এই ভাবে দিলে অনেক সময় নাকি তাড়াতাড়ি কাজ হয় এবং ফলও পাওয়া যায় অনেক ভাল। বছর পঞ্চাশেক আগেকার ডাক্তারেরা কিন্তু এই ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়ার প্রথা জানিতেন না—'ইন্‌জেক্‌শন্' আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটা বড় রকম আবিষ্কার।

কিন্তু ডাক্তারেরা না জানিলেও পঞ্চাশ বছর কেন, তাহারও বহু—বহু পূর্ব্ব হইতে এই ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়ার প্রথা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। দেয় কাহারা জান? গোখুরা সাপ, মৌমাছি, বোলতা, মশা—এই সব প্রাণীরা। নিজেরা বুদ্ধি করিয়া নয়, প্রকৃতিই ইহাদের শরীরে ইন্‌জেক্‌শনের যন্ত্র বসাইয়া দিয়াছেন। গোখুরা সাপের দাঁত, বোলতা-মৌমাছির হুল—এগুলি আসলে আর কিছুই নয়, ঠিক ইন্‌জেকশনের সূচের মত ছোট্ট ছোট্ট দাঁত-ওয়ালা সূচ। ইহাদের অনুকরণ করিয়াই ডাক্তারদের ইন্‌জেক্‌শনের সূচ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শত্রুকে আক্রমণ করিয়া ইহারা তাহাদের শরীরে ঐ সূচ ঢুকাইয়া দেয়; ডাক্তারদের ইন্‌জেক্‌শনের যন্ত্রে যেমন সূচের সঙ্গে থাকে সিরিঞ্জে ভরা ওষুধ, ইহাদের সূচের সঙ্গেও তেমনি থাকে সিরিঞ্জের মত থলি ভরা—ওষুধ নয় বিষ। সূচ ঢুকাইয়া ইহারা তাহার মধ্যে বিষ ইন্‌জেক্‌শন্ করিয়া দেয়। সে বিষ অবস্থাবিশেষে কি রকম তীব্র হয় তা' গোখুরা সাপের বিষ হইতেই জানা যায়। মৌমাছি-বোলতার বিষ মানুষের পক্ষে তেমন মারাত্মক না হইলেও অনেক পোকা-মাকড়ের পক্ষে সাংঘাতিক জিনিষ। ছবিতে দেখ একটা বোলতা কেমন শুঁয়োপোকার শরীরে ইন্‌জেক্‌শন্ করিয়া তাহাকে প্রায় ঘায়েল করিয়া আনিয়াছে।

প্রকৃতির রাজ্যে এমনিধারা আরও অনেক ব্যাপার দেখা যায় যা মানুষ বহু দিনের পরিশ্রমে বহু মাথা ঘামাইয়া তবে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহারের কথা তোমরা সকলেই বোধ হয় শুনিয়াছ। মারাত্মক মারাত্মক গ্যাস—যার কণামাত্র নাকে গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য তাহাই তৈয়ারী করিয়া শত্রু-শিবিরের কাছে ছাড়িয়া দেওয়া হইত—যাহারা ছাড়িত তাহারা অবশ্য নানা রকম মুখোস আঁটিয়া নিজেদের রক্ষা করিত কিন্তু যাহাদের কাছে ছাড়িত তাহাদের একটি লোকও আর বাঁচিত না। এই ধরণের যুদ্ধকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ—গত মহাযুদ্ধেই এই ধরণের বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ প্রথম সুরু হয়। কিন্তু তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে পোকা-মাকড়দের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। এক রকম পোকা আছে তাহাদের ইংরাজীতে বলে 'বম্বার্ডিয়ার বীট্‌ল্'। তাহারা শত্রু কাছে আসিলেই শরীরের পিছন দিক্ দিয়া এক রাশ বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়া দিয়া পালাইয়া যায়—আর শত্রু বেচারার, আক্রমণ করা দূরে থাক্, প্রাণ লইয়া পালানই দায় হইয়া পড়ে। অনেক সামুদ্রিক জানোয়ারের শরীরেও অনেকটা এই ধরণের গ্যাসের মত কালির থলি আছে। শত্রু কাছে আসিলেই তাহারা শত্রুর মুখের কাছে এক রাশ কালি ঢালিয়া দিয়া পলায়ন করে। কালির অন্ধকারে শত্রু শুধু খানিকক্ষণের জন্য দৃষ্টিই হারায় না, বিপদেও পড়ে।

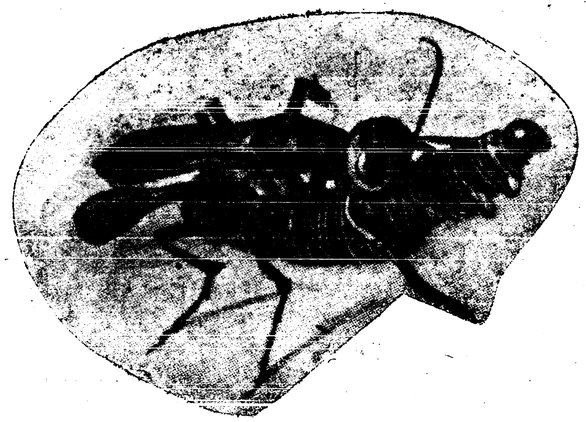

বোলতা একটি পোকার শরীরে ইন্‌জেক্‌শন্ করিতেছে।

ল্যাসো দিয়া জন্তু ধরার গল্প তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, বায়স্কোপে দেখিয়াছও

হয়ত। আমেরিকার নানা জায়গায় ইহার খুব চলন। ব্যাপারটি এই—একটা লম্বা দড়ির আগায় ফাঁস তৈয়ারী করা থাকে! ঘোড়ায় চড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে খানিকটা দূর হইতে বুনো মহিষ, হরিণ প্রভৃতির দলের ভিতর এই ল্যাসো ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়—দড়ির একটা দিক্ অবশ্য আরোহীর হাতে থাকে। ল্যাসোর ফাঁস যে জানোয়ারের গলায় পড়ে সে জানোয়ারের বন্দী না হইয়া উপায় নাই। এই ল্যাসো দিয়া শিকার ধরার প্রথা প্রাণি-জগতেও বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

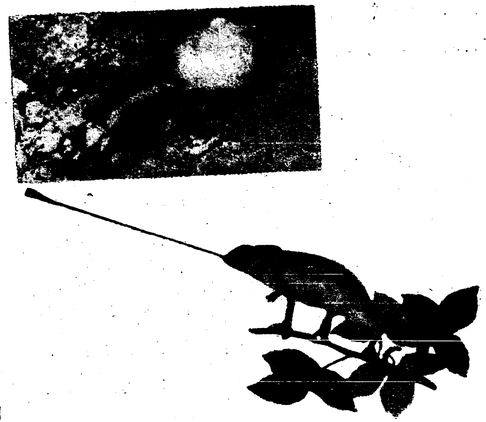

উপরে—'বম্বার্ডিয়ার বীট্‌ল্' বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়া পালাইতেছে।
নীচে—গিরগিটির জাতভাই তাহার 'ল্যাসো' ছুঁড়িতেছে।

উপরে যে গিরগিটির জাতভাইটির ছবি দেখিতেছ ইনি এই রকম শিকারে বেশ ওস্তাদ্। ইহার ল্যাসো হইতেছে ইহার জিভ। অদ্ভুত জিভই বটে! লম্বা সরু ডাণ্ডার আগাটা চ্যাটাল এবং আঠাল—অনেকটা ল্যাসোর মতই। এই জিভের সাহায্যে ইহারা ঠিক ল্যাসোর মতই বিদ্যুৎবেগে দূর হইতে শিকারকে বন্দী করে।

মানুষ যেমন তীর-ধনুক দিয়া যুদ্ধ করে কোন কোন জানোয়ারও তেমনি করে। আমাদের ভারতবর্ষেই এই ধরণের এক রকম মাছ আছে। যে সব পোকা এই মাছের খাদ্য তাহারা সাধারণতঃ জলের ধারে ধারে জলজ উদ্ভিদের উপরে থাকে। মাছেরা তো আর লাফাইয়া গাছের উপর উঠিতে পারে না (যদিও ২।১ জাতের মাছ নাকি তাহাও পারে) কাজেই তাহাদের শিকার সংগ্রহের জন্য অন্য পথ দেখিতে

হয়। ইহারা শরীরের ভিতর জল টানিয়া লয়, তার পর মুখ সঙ্কুচিত করিয়া পিচকারির মত তীব্র বেগে সেই জল ছিটাইয়া দেয়। সেই জলের তোড়ে শিকার বাবাজীকেও সঙ্গে সঙ্গে 'ধরাশায়ী' নয়—'জলশায়ী' হইতে হয়।

জাঁতিকল তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। ইঁদুর মারিবার জন্য অনেকে এই কল ব্যবহার করে। কলের দু' ধারে করাতের মত দাঁতওয়ালা দু'খানা পাত শোয়ান থাকে, আর এমন ব্যবস্থা থাকে যে সেই পাতের ভিতরে কিছু একটা ঢুকিলেই শোয়ান পাত দু'টি স্প্রিংএর দরজার মত ছুটিয়া আসিয়া একত্র লাগিয়া যায়,

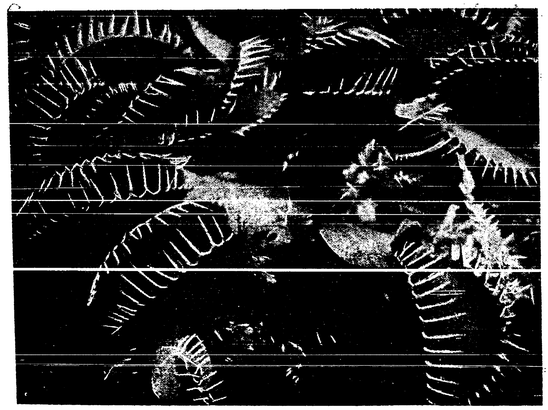

প্রকৃতির জাঁতিকল—'ভিনাস্ ফ্লাইট্র্যাপ্'

ভিতরে যে পড়ে তার আর সে মারাত্মক ফাঁস হইতে রক্ষা নাই। প্রকৃতির রাজ্যে এই জাঁতিকলেরও দেখা মিলে। উপরের ছবিটা দেখ। যে নিরীহ গাছটিকে দেখিতেছ ইহার নাম 'ভিনাস্ ফ্লাইট্র্যাপ্'। গাছ বটে, কিন্তু এ গাছ রাক্ষসের বাবা। সাধারণ গাছের মত মাটি আর বাতাসের খাবারে ইহাদের পোষায় না, ইহারা জ্যান্ত পোকা-মাকড় ধরিয়া ধরিয়া খায়। ইহাদের পাতাগুলি অবিকল জাঁতিকলের মত; দেখিতেও তেমনিধারা—করাতের মত দাঁত বসান। সাধারণ অবস্থায় এই পাতাগুলি

ছড়ান' থাকে, কিন্তু ভিতরে কোন পোকা-মাকড় আসিলেই সেগুলি জাঁতিকলের মত বন্ধ হইয়া যায় আর বন্দী পোকারও ভবলীলা শেষ।

শুধু এই ক'টিই নয়; মানুষ সভ্য হইবার পর যত সব যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিয়াছে এবং ব্যবহার করিতেছে তাহার অনেক কিছুই খোঁজ করিলে ক্ষুদ্র আকারে প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া যাইবে। গর্ত্ত খুঁড়িবার জন্য স্ক্রুর মত প্যাঁচ দেওয়া যন্ত্র (Drilling machine), বাষ্পীয় কোদালের (Steam Shovel —যাহা দিয়া অসম্ভব রকম তাড়াতাড়ি মাটী তোলা যায়) অনুরূপ যন্ত্র, সেলাইএর কলের সূচের মত যন্ত্র —এ সমস্তই পোকা-মাকড়ের কাছে দেখা যায়। ঠিক মানুষের গড়া যন্ত্রের রীতি অনুযায়ী সেগুলি তৈয়ারী এবং ঠিক তেমনি ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

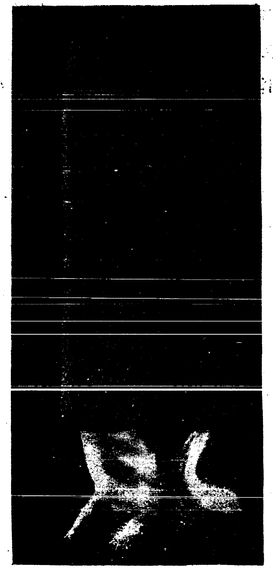

'ইট-নির্ম্মাতা'র তৈয়ারী ইটে গড়া মিনার

আর একটি জীবের কথা বলিয়া আজ শেষ করিব। ইহারা এক রকম জলজ কীট—অত্যন্ত ছোট, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয়। ইহাদের শরীরে এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে যে তাহা দিয়া ইহারা জল হইতে নানা জিনিষ সংগ্রহ করিয়া ইটের মত চাকৃতি বানাইতে পারে এবং শুধু ইট বানানো নয়, সে ইট সিমেণ্টের মত আঠার সাহায্যে গাঁথিয়া গাঁথিয়া একেবারে দেয়াল গড়িয়া তুলিতে পারে। ঠিক আমরা যেমন করিয়া মাটী দিয়া ইট তৈয়ারী করি এবং সেই ইট গাঁথিয়া বড় বড় চিমনী কিংবা মিনার গড়ি এও ঠিক সেই রকম। এই অদ্ভুত জীবের নাম "ইট-নির্ম্মাতা" (Brick-maker)। ইহাদের তৈয়ারী ইটে গড়া একটা মিনারের (যাহার মধ্যে ইহারা দরকার হইলে আশ্রয় নিতে পারে) ছবি এখানে দেওয়া গেল।

তপনকুমারের দ্বিতীয় রাত্রি

(শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ)

বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তপনকুমার সেই যে এক রাত্রি ঘন বনের মধ্যে কামিনী ফুলগাছের নীচে দীঘির শান্ত কালো জলের ধারে কাটাইয়া আসিল, তাহার পর হইতে তাহার মন যেন আর কিছুতেই বসে না। সমস্ত পড়াশুনা আর বাঁধাধরা নিয়ম-কানুনের ফাঁকে তাহার মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া বসে; চোখের সম্মুখে ভূগোলে-পড়া সমস্ত বিখ্যাত দেশের মন-গড়া ছবি জাগিয়া উঠে,—কোথায় তুষার দেশে এস্কিমোরা ভালুকের চামড়ার পোষাক পরিয়া বরফের ঘরের মধ্য দিন কাটাইতেছে, কোথায় আফ্রিকার ঘন বনের মধ্যে জ্বলজ্বলে চোখ, হিংস্র জানোয়ারের দল অন্ধকার রাত্রিতে খস্-খস্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যে বনের মধ্যে না শোনা যায় একটি পাখীর ডাক, না দেখা যায় আলো—শুধু অসংখ্য জন্তুর নিঃশ্বাস-পাতের শব্দ! কোথায় বোর্ণিয়ো দ্বীপের অসভ্য মানুষ রৌদ্রদগ্ধ প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে বর্শা হাতে করিয়া হরিণ শিকার করিয়া বেড়াইতেছে,—এই সব কাল্পনিক ছবি তাহার মনের মধ্যে এত বেশী বার জাগিয়া উঠে যে, সে ক্লাসের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টায় মাষ্টার মশায়ের ধমক খায়।

তোমরা তপনকুমারের কথা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাও নাই, সে এখন বড় হইয়াছে। যে ছেলেটি সুন্দর চাঁদের আলোর মধ্যে কামিনী ফুলগুলিকে শ্বেতপরী মনে করিয়াছিল, এমন কি তাহাদের গান পর্য্যন্ত শুনিয়াছিল, সে তপনকুমার আর নাই—এখন সে সত্যই বড় হইয়াছে। তাহার বই-এর মলাটের উপর এখন আর পাৎলা কাগজ নাই, বাঁধানো ভালো বই, দেখিলে মন হঠাৎ খুসী হইয়া উঠে। কিন্তু শুধু বই লইয়া তপনের দিন চলা ভার; এই সেদিন মাষ্টার মহাশয় বলিতেছিলেন, 'বাঙ্গালী ছেলেরা চেনে শুধু বই আর বই, শুধু বই লইয়া থাকিলে মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, জোরে চলাফেরা যায় না, স্বভাবটা হয় মিন্‌মিনে, অলস। সংসারের সমস্ত

বস্তুতে যে ছেলের সমান অধিকার, সেই ছেলে হয় মানুষ।' তপনকুমার সেদিন ভাবিয়াছিল, মাষ্টার মহাশয় এতদিন পরে বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন—হল্ এণ্ড ষ্টিভেন্স্-এর জিওমেট্রি ছাড়াও এমন কথা জগতে থাকিতে পারে!

তপনকুমার সেইদিন হইতে বই-এর দিকে আর বড় ঘেঁষে না। বাড়ীতে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, বলে, 'বই নিয়ে শুধু শুধু ব'সে থাক্‌তে ভালো লাগে না। তোমাদের পাশ করা নিয়ে কথা, আমি ঠিক ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ কর্‌ব, দেখে নিও।' সেইদিন হইতে তপনকুমার প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়া বলে, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া হাঁটে, দেখিলে মনে হয় ছেলে যেন যুদ্ধ-জয়ে চলিয়াছে।

দেখাদেখি ক্লাসের আরও চার-পাঁচ জন ছেলে তপনকে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। তামাসা তাহারা করিতে চায় না, শক্ত বলিষ্ঠ হইয়া বাঁচিতে হইবে, এই কথাটি তাহারা যেন কেমন করিয়া শিখিয়া লইয়াছিল। তপনকুমার হইল তাহার ছোট দলটির 'লিডার' (নেতা)।

আপাততঃ আফ্রিকা বা এস্কিমোদের দেশে যাওয়া হইতে পারে না। তপন হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, তাহাতে অনেক পয়সার প্রয়োজন। দেশের খবর আগে লওয়া দরকার, তাহার পর বিদেশের। হীরেনের সঙ্গে দেখা হইতেই তপন তাহাকে বলিল, 'তৈরী হ'য়ে নে, আমরা পরশু দিন বেরুবো।'

'ইস্কুল কামাই ক'রে বেরুবে তপন দা'? পরশু কি ছুটি আছে?'—হীরেন জিজ্ঞাসা করিল।

'পরশু থেকে তিন দিন ছুটি, এই তিন দিনে আমরা অনেক দূর ঘুরে আস্‌তে পার্‌ব।' দলপতির আদেশ। হীরেন তা'র আরও তিন জন সঙ্গীকে ডাকিয়া খবর জানাইয়া দিল। রমেশ, অনিল আর সুধীন তাহাদের নাম। অনিল হীরেনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তপন এবার কোথায় যাবে জানিস্?'

'না ভাই, সে খবর পাই নি। বোধ হয় বেশী দূর নয়।'

'কি, হেঁটেই যেতে হ'বে নাকি?'

'পাঁচখানা সাইকেল র'য়েছে কি জন্যে?'

সাইকেলে তিন দিনের মত বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইবে। তপন বলিয়া দিয়াছে, বাড়ীতে যেন কেহ জানিতে না পারে। খাবারের ব্যবস্থা পথেই করিতে হইবে। খাবার সঙ্গে লইয়া যাওয়ার মধ্যে নূতনত্ব নাই। তবে, প্রত্যেকেরই সঙ্গে কিছু কিছু পয়সা থাকার প্রয়োজন, খাবারের সন্ধান তাহাতেই হইবে। সঙ্গে থাকিবে টর্চ্চ, জল রাখিবার ফ্লাস্ক্ আর আত্মরক্ষার জন্য ছোট ছোট লাঠি। ভোর হইতে না হইতে প্রত্যেকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইবে এবং খেলার মাঠে প্রকাণ্ড দেবদারু গাছের তলায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পাঁচজনে আসিয়া একত্র হইবে; তাহার পর সেখান হইতে একসঙ্গে যাত্রা আরম্ভ হইবে। পথের লোকদের জানাইয়া দিতে হইবে যে, তাহারা সাইকেল রেস্ দিতেছে।

যে কথা সেই কাজ। ভোর হইতে না হইতে তপন বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। অত সকালে বাড়ীতে কেহ উঠে না। দরজা খোলার শব্দে তাহার দাদা একবার জাগিয়া উঠিল, ঘুমের ঘোরে বলিল, 'কে'?

তপন কোনো উত্তর না দিয়া খুব সাবধানে বাইক্ বাহির করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল, তাহার পর এক নিমিষে পাখীর মত রাস্তার পর রাস্তা যেন উড়িয়া পার হইয়া গেল। দূরে মাঠের মধ্যে দেবদারু গাছ দেখা যাইতেছে!

পূর্ব্ব আকাশে সূর্য্যের তখনও দেখা নাই। অন্ধকার গাছপালার মাথায় সামান্য একটু আলো দেখা দিয়াছে মাত্র—অন্ধকার জলের উপর যেন একটি শ্বেতপদ্ম এই ফুটিল বলিয়া! তপন আকাশের দিকে তাকাইয়া একবার সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, বলিল, 'চল, এইবার যাত্রা সুরু করা যাক্।'

বলিতে না বলিতে পাঁচখানি বাইক্ খেলার মাঠ নিঃশব্দে পার হইয়া সদর রাস্তায় উঠিল। লাইট্-পোষ্টের নীচে পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমাইতেছিল। বাইকের শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া বলিল, 'কোন্ হ্যায়'?

বাইক্‌গুলি ততক্ষণে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে তপন চীৎকার করিয়া বলিল, 'মুসাফির হ্যায়!' পাহারাওয়ালা বোধ হয় তাহা শুনিতে পাইল না।

সহরের রাস্তা ছাড়াইয়া মেঠো পথ। এ পথে বাইক্ চালানো ভয়ানক অসুবিধা। কিন্তু ততক্ষণে রৌদ্র উঠিয়াছে। মেঠো পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের একটি বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। সেই বাগান লক্ষ্য করিয়া তপনকুমারের বাইক্ আগে আগে চলিতে লাগিল। পিছনে নির্ব্বাক্ অনুসরণকারীর দল। প্রকাণ্ড মাঠ—কাছাকাছি কোনো বাড়ীঘর চোখে পড়ে না। প্রভাতের নির্ম্মল আলোয় ঘাসের ছোট্ট পাতাটি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মাঠের শ্যামল শস্যভার যেন থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। তপনের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। উচ্চ কণ্ঠে সে বলিল, 'কেমন ভাই, তোমাদের কেমন লাগ্‌ছে?'

'বেশ লাগ্‌ছে ভাই তপন, ছুটি কাটাতে হ'লে এমনি ক'রেই কাটাতে হয়।'

বাইক্‌গুলি ক্রমশঃ বাগানের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। দূর হইতে একখানি ছোট্ট কুঁড়েঘর চোখে পড়ে। সূর্য্য ক্রমশঃ আকাশের উপরের দিকে উঠিতেছে। তপনকুমারের মনে হইল, এখন একটু আশ্রয়ের দরকার।' এইবার খাবারের প্রয়োজন। তাহার পর যে কি, তপনের আর সেদিকে খেয়াল নাই। বাগান এবং কুঁড়েঘরই ত শেষ নয়। এখনো দু'টি দিন ছুটির বাকী আছে। ঐ বাগানের পাশ দিয়া সমস্ত দিন বাইক্ চালাইয়া গেলে হরিশপুরের কালীতলায় রাত্রে পৌঁছানো যাইতে পারে। রাত্রের মত সেখানে বিশ্রাম মিলিবে। তপন হরিশপুরের কালীতলার কথা শুনিয়াছে। সে বড় ভয়ানক স্থান। সেখানে বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বে জীবন্ত নরবলি হইত। যাহা হউক, তপন কিন্তু এ সব কথা বলিলে তাহার সঙ্গে কেহ আসিতে চাহিত না। না বলিয়া তপন ভালই করিয়াছে।

'কি আছে কত্তা, তোমার হাঁড়ীতে?'—হীরেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল।

'আজ্ঞে, দুধ আছে মশায়, আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছ?'—একটি লোক এক হাঁড়ী দুধ মাথায় লইয়া বাজারের দিকে চলিয়াছে।

'ওহো, দুধ নাকি? নামাও ত দেখি, কেমন দুধ!'—তপন আনন্দে বলিয়া উঠিল। তার পর গাছের ছায়ায় বসিয়া পাঁচজনে গয়লার ভাঁড়ে করিয়া দুধ খাইতে লাগিল। লোকটি পয়সার জন্য বসিয়া আছে, তপন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কত্তা, বল্‌তে পারো, কাছাকাছি কা'রো বাড়ীতে দুপুরটা কাটানো যায় কি না?'

'আজ্ঞে, তা' আর পার্‌ব না? ছই যে খোড়ো ঘর দেখ্‌ছ বাগানের পাশে, ওখানে বাবুদের লোকজন আছে, আপনারা যদি যাও, ত ওঁরা খুব যত্ন কর্‌বেন আপনাদের।' গয়লার পয়সা মিটাইয়া দিয়া পাঁচজনে আবার নূতন উৎসাহে চলিতে আরম্ভ করিল।

পাকা ঘর, উপরে খড়ের চাল দিয়া ছাওয়া। গেটের দু'পাশে অসংখ্য সন্ধ্যামণি আর রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়া আছে। ছোট্ট গেটের কাছে পাঁচজনে বাইক্ হইতে নামিয়া কপালের ঘাম মুছিতেছে। পাশেই প্রকাণ্ড বাগান— দীর্ঘ আমগাছের শ্রেণী, তাহার শেষ সীমা পর্য্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছাইতে চায় না।

'আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছেন?'—নীল চশমা-পরা একজন দীর্ঘাকৃতি লোক বারান্দা হইতে গলা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

'আজ্ঞে, আমরা বাইক্-রেস্ দিচ্ছি, রেস্ দিতে দিতে এতদূর এসে পড়েছি। আজ দুপুরের মত আপনাদের এখানে আশ্রয় চাচ্ছি।'—তপন বলিল।

নীল চশমা-পরা লোকটি একটু কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন, 'আজকাল সবাই রেস্ দেয়। কা'র মনে কি আছে কে জানে? আচ্ছা, দুপুরে আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু রাত্রের ব্যবস্থা আপনারা নিজেরা করবেন।'

হীরেন একটু হাসিয়া বলিল, 'দুপুরের ব্যবস্থা হ'লেই আমরা খুসী হ'ব।'

উপর হইতে অমনি হুকুম আসিল, 'এই তেওয়ারী, বৈঠকখানা ঘর খুলে দে। বাবুদের স্নান করবার জলের ব্যবস্থা ক'রে দে। আর ঠাকুরকে ওঁদের খাওয়ার কথা ব'লে দে।' প্রকাণ্ড দৈত্যের মত একটি পালোয়ান কোথা হইতে লাফাইয়া আসিয়া গেট খুলিয়া দিল, পাঁচজনের দিকে একবার শ্যেনদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'আপনারা আসুন ভিতরে।' তপনকুমার একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্, বাঁচা গেল। দুপুরের মত নিশ্চিন্ত। পরের কথা পরে ভাবা যা'বে।'

বৈঠকখানা ঘরের বাহিরে বাইক্ কয়খানি রাখিয়া দিয়া সকলে জামা-জুতা খুলিয়া ফেলিয়া পরম আরামে তক্তপোষের উপর বসিয়া টানা পাখার হাওয়া খাইতে লাগিল। বৈঠকখানা ঘরের একপার্শ্বে প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুক। তাহারই

মাথার উপরে বড় একটি রাইফেল বন্দুক ঝুলিতেছে। তপনকুমার সেই দিকে তাকাইয়া বলিল, 'জমিদারের কাছারী-বাড়ী এটা, বুঝ্‌তে পেরেছ ত সুধীন?'

সুধীন বলিল, 'খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে রওনা দিতে পারলেই সুবিধে। নীল চশমা-পরা লোকটিকে বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

তেওয়ারী একবার বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে আসিয়া অকারণে ঘুরিয়া গেল। তপন হাসিয়া অনিলকে বলিল, 'অনিল, ওরা আমাদের উপর দৃষ্টি রাখ্‌ছে। মানে মানে স'রে পড়্‌তে পার্‌লে বাঁচি!'

এই সময়ে হঠাৎ উপর হইতে নীল চশমা-পরা ভদ্রলোকটি নীচে নামিয়া আসিলেন, একেবারে বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে আসিয়া চৌকী টানিয়া লইয়া বসিলেন। তপনের দিকে চশমা জোড়া স্থিরনিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'তখন রেস্ দেবার কথা ব'লেছিলাম আপনাদের, আশা করি কিছু মনে করেন নি। গত বৎসর এই সময়ে ঠিক আপনাদেরই মত পাঁচজন ছোকরা-বয়সী আমাদের এখানে বাইক্ ক'রে এসেছিলেন। যা'বার সময় তাঁরা আমাদের যে উপকার ক'রে গিয়েছেন তা' বোধ হয় খবরের কাগজে প'ড়েছেন। কি বল্‌লেন? পড়েন নি! ডাকাতী, বুঝ্‌লেন মশায়, একেবারে রাহাজানি। সেই থেকে আর সমীহ ক'রে ছোকরা-বয়সীদের সঙ্গে কথা বল্‌তে পারি নে। অপরাধ নেবেন না, ওরে তেওয়ারী, বাবুদের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দে।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বিশ্রাম লইতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। তপনকুমার এবং তা'র সঙ্গীদল আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া তিনটার পরই বাহির হইয়া পড়িল। অজানা দেশ, অজানা পথঘাট, সম্মুখে রাত্রি। তপনকুমার সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছে। রাস্তার দু'ধারে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ, মাঝে মাঝে রাস্তায় দু'-একজন লোক দেখা যায়। দুই একখানি গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে আসিতেছে, যাইতেছে। গরুর গলায় ঘণ্টার টুং-টুং আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। তপনদের সাইকেলের যেন বিশ্রাম নাই, হু-হু শব্দে বাতাসের স্তর ভেদ করিয়া তাহারা যেন নিরুদ্দেশ যাত্রার দিকে উড়িয়া চলিয়াছে।

রাস্তার দু'ধারে এখন আর অশ্বত্থ গাছ দেখা যায় না—বন, ঘন নিবিড় বন

ক্রমশঃ গম্ভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। হীরেনের কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া সে বলিল, 'একটু আস্তে চল ভাই তপন, এ বনের যে শেষ দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।'

তপনকুমার স্পীড্ কমাইয়া দিয়া বলিল, 'খুব সাবধানে এস ভাই, আমার সন্দেহ হচ্ছে—এ বোধ হয় হরিশপুরের বিখ্যাত বন, আর বেশী দেরী নেই। শীগ্‌গিরই বোধ হয় আমরা কালীতলায় পৌঁছে যা'ব।'

কিছু দূর আসিয়া তপনকুমার এবং তাহার সঙ্গীরা আর বাইক্ চালাইতে পারিল না। বাঁধা রাস্তাটি বনের ঠিক মাঝখানে আসিয়া ছোট ছোট পায়ে-চলা পথে শেষ হইয়াছে। তপনকুমার বাইক্ হইতে নামিয়া সঙ্গীদের বলিল, 'এই বোধ হয় হরিশপুরের বন, কারণ আমরা এতক্ষণ যে রাস্তা দিয়ে এলাম, সেটাই হরিশপুর আসার রাস্তা। আর, সেই রাস্তার যদি এখানেই শেষ হয় তা' হ'লে কাছাকাছি কোথাও হরিশপুরের বিখ্যাত কালীতলা আছে।'

সঙ্গীরা তাহাদের নেতার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। এই নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া তাহারা যেন অসহায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বনের মধ্যে একটা আসন্ন অন্ধকার সূর্য্যাস্তের পর হইতেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কোথাও জন-মানবের মুখ দেখা যায় না—ভয় হইবার কথাই বটে।

হীরেন এই স্তব্ধতা ভাঙিয়া উত্তর করিল, 'এখন, এই বাইক্‌গুলো কি ঘাড়ে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে হ'বে নাকি হে লীডার?'

'কেন, বাইক্ ঘাড়ে ক'রে বইবে কেন? টর্চ্চ্ জ্বালো এইবার, জ্বেলে এস কোথায় কালীতলা সন্ধান করা যাক্।'—তপন বলিল।

টর্চ্চ্ জ্বালিয়া সরু পায়ে-চলা পথ দিয়া দুঃসাহসী যাত্রীর দল কালীতলার সন্ধানে যাত্রা করিল। অনিল বলিতে বলিতে চলিল, 'ভালো জায়গায় নিয়ে এলে তপন, সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয় যা'কে বলে।'

তপন বলিল, 'য়্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়েছ, এখন ও-কথা বল্‌লে চল্‌বে কেন?'

চলিতে চলিতে অনেক দূরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে সামান্য একটু আলোর রেখা

দেখা গেল। তপন চীৎকার করিয়া বলিল, 'আলো দেখা গিয়েছে ভাই সব, ডান দিকে যে পথ ঘুরে গিয়েছে, সেই পথ দিয়ে এস।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা এমন একটি জায়গায় আসিয়া পড়িল যেখানে গাছপালা মোটেই নাই। অনেকটা জায়গা ফাঁকা, তাহারই একপাশে একটি ছোট মন্দির তারার আলোয় তাহার অন্ধকার মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের খোলা দরজার মধ্য হইতে আলো আসিতেছে। সেই আলোয় একটি বিরাট্ কালী-মূর্ত্তি তপনদের চোখে পড়িল।

মন্দিরের চত্বরের পাশে বাইক্‌গুলি রাখিয়া দিয়া পাঁচ জনে জুতা খুলিয়া ফেলিয়া কালীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। আশ্চর্য্য, মন্দিরের মধ্যে কোনো লোকজন নাই। ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিলে মনে হয় যেন এই মুহূর্ত্তে কোন লোক ছিল, ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে, প্রদীপ জ্বলিতেছে, মূর্ত্তির সম্মুখে থালায় নৈবেদ্য সাজানো রহিয়াছে, যে ছিল, সে যেন এ সমস্ত সাজাইয়া রাখিয়া এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া গিয়াছে।

তপনকুমার হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল, 'জয় মা কালী'। সঙ্গে সঙ্গে আরও চারজন এক সঙ্গে একই শব্দ করিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তপনকুমার অগ্রসর হইল, থালার প্রসাদ লইয়া সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল, নিজেও লইল। প্রসাদ খাইতে খাইতে তপন বলিল, 'ভগবান্ এক জায়গায় না এক জায়গায় ঠিক খাবারটা মিলিয়ে দেবেন-ই, বুঝ্‌লে ভাই অনিল?'

'তা ত বুঝ্‌ছি, কিন্তু কি রকম অন্ধকার দেখেছ?'—অনিল বলিল।

'অন্ধকারকে গ্রাহ্য করি নে, সব চেয়ে মজার কথা, মন্দিরে সমস্ত আয়োজন র'য়েছে, অথচ লোক নেই। এই ব্যাপারটাই আশ্চর্য্য।'—হীরেন বলিল।

'আশ্চর্য্য হ'বার কি আছে? পুরুত ঠাকুর হয়ত কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে থাকেন, সকাল সকাল মন্দিরের কাজ শেষ ক'রে স'রে পড়েছেন, এই দারুণ বনে একা কে আর থাকে বল?'—তপন বলিল।

সকলেই সে কথা স্বীকার করিল। তপনের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে সব দিক্ দিয়াই তা'র ছোট দলটির লিডার।

সকলে প্রসাদ খাইয়া মন্দিরের চত্বরে বসিয়া আছে। রাত্রি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। পশ্চিম আকাশে ঘন বনের মাথায় ছোট এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছে আর সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ বনভূমির মধ্যে করুণ কান্নার মত কে যেন মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিতেছে। 'বোধ হয় পাখী'—তপন বলিল, 'মোটেই ভয়ের কারণ নেই, এক রকম পাখী এদিকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গভীর রাতে ওরা ডাকে, কান্নার মত শোনায় সে ডাক।'

বাকী সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। হরিশপুরের কালীতলার কথা কে না জানে,—পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত; হয়ত দূরের ঐ গাছের নীচে মানুষের রক্ত জমাট হইয়া আছে এখনও, বিকৃত ভীষণ নরদেহ হয়ত নিদারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। তপন বলিয়া চলিল, সকলে ভয়ে তখন কাঁপিতেছে।

হঠাৎ দূরে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া বার কতক বন্দুকের আওয়াজ হইল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই শব্দ। তপন সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাকী সকলে দেখাদেখি উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই বন্দুকের শব্দ—এবারে যেন অনেকটা কাছে। তপন বলিল, 'এখানে ব'সে থাকা মোটেই নিরাপদ নয় হীরেন, বন্দুকের শব্দ এদিকে আগিয়ে আস্‌ছে মনে হচ্ছে। উঠে পড়, অন্ধকার গাছের উপরে লুকিয়ে থাকা যাক্।'

হীরেন বলিল, 'বাইক্‌গুলো?'

'বাইক্‌গুলোও গাছের উপর টেনে তোলা যাক্।'

যে কথা সেই কাজ। বাইক্‌গুলিকে টানিয়া তোলা সহজ নয়। তপন সর্ব্বাগ্রে দৌড়াইয়া গিয়া গাছে উঠিল। উপর হইতে হুকুম হইল, 'বাইক্‌গুলো নিয়ে তোমরা এস।' তাহার পর এক-একখানি করিয়া পাঁচখানি বাইক্ তপন কাপড় দিয়া বাঁধিয়া উপরে তুলিয়া লইতে লাগিল। বড় মোটা একটি ডালের উপর দাঁড়াইয়া তপন কাপড়ে গিঁট দিয়া দিয়া বাইক্‌গুলিকে বাঁধিতে আরম্ভ করিল, হীরেন উপরে উঠিয়া গিয়া তপনকে সাহায্য করিতে লাগিল। তাহাদের মাথার উপরে একটি শক্ত মোটা ডাল—শাখায় পত্রে সমাচ্ছন্ন। বাইক্‌গুলিকে বাঁধিয়া লইয়া দুইজনে মিলিয়া বহু কষ্টে সেই ডালে তাহাদের ঝুলাইয়া দিল। বাইকের

ভারে ডালটি একটু নত হইয়া পড়িল। তাহার পর পাঁচ জনে গাছের উপর এক-এক ডালে এক-একজন পাতার আড়ালে বসিয়া রহিল। শুধু তপনকুমার বাইক্-গুলির কাছাকাছি পাহারায় থাকিল।

মন্দিরের প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল তাহার স্থানে জ্বলিয়া উঠিয়াছে অসংখ্য মশাল। কালো কালো দশ-বারো জন জোয়ান্ মশাল, লাঠি, সোঁটা লইয়া মন্দিরের সম্মুখে সমবেত হইয়াছে, মশালের আলোয় তাহাদের সড়কির ফলা ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তপন ফিস্ ফিস্ করিয়া সঙ্গীদের বলিল, 'সাইলেণ্ট্।'

'জয় মা কালী' বলিয়া তাহারা মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিল এবং তাহার পর নিমেষ মধ্যে মশাল নিভাইয়া দিয়া তপন-রা যে গাছে আছে, তাহারই দিকে আসিতে লাগিল। গাছের নীচে তাহারা আসিয়া বসিয়া পড়িল। একজন একটা বড় পুঁটুলির মত জিনিষ ধপ্ করিয়া মাটিতে নামাইয়া দিয়া বলিল—'নীল চশমা বড় ভোগান্ ভুগিয়েছে রে ভাই, কিন্তু বাছাধনকে এক লাঠিতেই ঘায়েল করেছি।'

'শেয়াল বাঁ-হাতি ক'রে বেরিয়েছ বাবা, আজ যা' হ'ল, এ অনেক দিনের খোরাক!'—আর একজন বলিল।

'বেশী কথাবার্ত্তা বলিস্ নে, ওরা এগিয়ে আস্‌ছে, শীগ্‌গির এখান থেকে স'রে পড়তে হ'বে আবার।'

হঠাৎ জোরে একটা বাতাস দিল, এবং চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে বাইক্-ঝোলানো ডালখানি চড় চড় চড়াৎ করিয়া পাঁচখানি বাইক্ এবং তপনকে লইয়া হুড়-মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িল।

তাহার পরই একটা ভীষণ শব্দ—'বাবা গো, মা গো, গিয়েছি রে—অপদেবতার গাছ রে' প্রভৃতি চীৎকার; সঙ্গে সঙ্গে হীরেনের ইঙ্গিতে বাকী তিনজন ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া গাছ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িল। তাহারা লাফাইয়া নীচে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িল। উপরে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে এবং বাতাস ঝড়ে পরিণত হইয়া প্রবল বেগে সোঁ সোঁ করিয়া বনের মধ্যে গোলমাল বাধাইয়া তুলিয়াছে। হীরেন-রা নীচে লাফাইয়া পড়িয়া দেখিল কেহ নাই—অপদেবতার ভয়ে ডাকাতেরা যে যেদিকে পারে সরিয়া পড়িয়াছে, আকস্মিক

ডাল-ভাঙার বিপ্লবে তাহারা তাহাদের পুঁটুলি এবং লাঠি-সড়কি ফেলিয়া গিয়াছে। হীরেন টর্চ্চ্ জ্বালিয়া তপনকে খুঁজিতেছিল। আশ্চর্য্য, তপনকে কোথাও পাওয়া গেল না। বেশী চীৎকার করিয়া ডাকাও সম্ভব নয়, প্রবল বেগে বনের মধ্যে ঝড় চলিতেছে। রমেশ, অনিল আর সুধীন বার কতক 'তপন, তপন' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও সাড়া মিলিল না। কি করা যায়, কোথায় তপনকে পাওয়া যাইবে,—সকলেই যখন এইরূপ ভাবিতেছে, তখন হঠাৎ মন্দিরে বেশ বড় একটা সার্চ্চ্ লাইট্ আসিয়া পড়িল। সার্চ্চ্ লাইট্ ঘুরিয়া আসিয়া গাছ-তলায় পড়িল। সেখান হইতে আলো আর সরিয়া গেল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে পাঁচ-ছয় জন পুলিশ, আরও দু'-তিনজন লোক আগাইয়া আসিল। পুলিশদের কাঁধে বন্দুক। হীরেনের যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল,—চাহিয়া দেখিল, মাথায় পটি-বাঁধা কাছারী বাড়ীর সেই নীল চশমা তাহার দিকে চাহিয়া আছে। পরক্ষণেই সে অট্টহাস্য করিয়া বলিল, 'যা'বে কোথায় বাছারা? দারোগা বাবু, লাগান হাতকড়ি ওর হাতে, পেছনে আরও তিনজন আছে। লাগান হাতকড়ি তা'দের হাতে।'

পুঁটুলি এবং সড়কি পাশেই পড়িয়া আছে। একেবারে বামাল শুদ্ধ চোরদের হাতে হাতকড়ি পড়িয়া গেল। হীরেন কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া ভাল করিয়া স্বর বাহির হইল না। রমেশ আর সুধীন মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দারোগা বাবু তখনও সার্চ্চ্ লাইট্ নিভাইয়া দেন নাই। নীলু চশমা থামিয়া থামিয়া অট্টহাস্য করিতেছে, কিন্তু বহুদূরে কে যেন হীরেনের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে মনে হইল। হীরেন চীৎকার করিয়া বলিল, 'খুলে দেন হাতকড়ি আমার দারোগা বাবু, তপন ডাক্‌ছে।'

'—কে তপন?' দারোগা বাবু তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা হীরেনের কাছে শুনিলেন, ওদিকে তপনের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। দারোগা বাবু তখনই ছেলেদের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে আদেশ দিয়া পুলিশদের পাঠাইলেন তপনের সন্ধানে।

পুলিশরা কিছু দূর আগাইয়া গিয়া দেখিল একটি ছেলে একখানি বাইকের

উপর শুইয়া পড়িয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। তাহারা আলো লইয়া কাছাকাছি গিয়া দেখে ভীষণ ব্যাপার, ছেলেটির হাত-পা কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে। আর, সে প্রাণপণ বলে বাইক্‌খানি চাপিয়া রহিয়াছে। পুলিশরা গিয়া তাহাকে জোর করিয়া উঠাইতেই দেখিল, বাইক্‌খানি নড়িতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একজন প্রকাণ্ড জোয়ান্ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বাইকের চেনের সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। সেই অবস্থাতেও সে পালাইবার চেষ্টা করিতেছে। পুলিশরা মহাখুসী। বাইক্-বন্দী লোকটিকে দু'-তিনজন ধরাধরি করিয়া লইয়া গেল; আর তপনকুমারকে কাঁধে লইয়া একজন পুলিশ মহা উল্লাসে ছুটিয়া চলিল।

তপনের তখন অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থা। হীরেন মন্দিরের দিকে জল আনিবার জন্য ছুটিল। আর নীল চশমা ত দেখিয়া অবাক্। জোয়ান্ লোকটির হাতে হাতকড়া পড়িয়া গেল। দারোগা বাবু তপনের মাথা কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। দু'জন পুলিশ কোথা হইতে পাগড়ী ভিজাইয়া আনিয়া তাহার মুখে-চোখে জল দিতেছে।

ভোরের দিকে একখানি গরুর গাড়ী জমিদারের কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়াছে দেখা গেল। তাহার পিছনে পাঁচখানি বাইক্ বাঁধা রহিয়াছে। ভিতরের খবর আমরা জানি না। তপনকুমার ছাড়া আর সকলেই হাঁটিয়া যাইতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার সময় দারোগা বাবু স্বয়ং ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় তপনকে তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তপন আর শীঘ্র য়্যাড্‌ভেঞ্চারে বাহির হইবে না, তাহার মা'র কাছে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আমরা জানি।

জেনে রাখ

সপ্তাহে অন্ততঃ একবার লেবুর রস দিয়া দাঁত পরিষ্কার করিলে দাঁত অনেক দিন শক্ত থাকে।

শিলঙের চিঠি

(কুমারী প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র)

কল্যাণীয়াসু,

এ যাত্রা তোমাদের শিলং আসা সম্ভব হ'ল না ব'লে আস্‌বার সময় তুমি আমাকে শিলংএর এমন একখানা লিপি-চিত্র (Pen picture) পাঠাতে অনুরোধ করেছিলে যাতে কবিরাজী মতে 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' এর কাজ করে। গুড় যে বাস্তবিকই কখনো সত্যিকার মধু হয় না তা তুমি ভালমতেই জান, কাজেই লিপি-চিত্রে বাস্তবের অনুপম সৌন্দর্য্য আশা ক'র না।

শেয়ালদ' থেকে বড় রেলে পার্ব্বতীপুর এবং তার পর মিটার গেজে আমিন-গাঁও পর্য্যন্ত পাড়ি দেওয়ার অনাবশ্যক বর্ণনায় তোমাকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুল্‌তে চাই না, কেননা এ পথের অনেকখানিই তোমার জানা আছে। আমিনগাঁও থেকে ষ্টিমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে এধারের পাণ্ডুঘাট ষ্টেশনে পৌঁছুতে হয়, তারপর মেলটর যোগে শিলং। বার বার গাড়ী বদলের বিরক্তি একটু অস্বস্তিকর বৈকি।

দু'ধারে পাহাড় থাকায় আমিনগাঁয়ের ব্রহ্মপুত্র চওড়ায় ততটা বাড়্‌তে পারে নি যতটা পেরেছে আরও দক্ষিণে এসে অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি পাবার পর। তবে কল্‌কাতার গঙ্গার চাইতে অনেকটা চওড়া বটে। সরু খাদের ভেতর দিয়ে অনেক খানি জলকে যেতে হ'লে স্রোত যে তার খুবই বেশী হবে তা বোধ করি বুঝ্‌তে পার্‌ছ; এই জন্যেই এখানে ব্রহ্মপুত্রের টান এত বেশী।

ষ্টিমারে ওঠ্‌বার আগেই কামাখ্যা মন্দিরের পাণ্ডারা দলে দলে এসে তোমাকে গ্রেপ্তার কর্‌তে চাইবে। তাদের পুঁজি সেই সনাতন খাতা—যার দর্শন প্রত্যেক তীর্থক্ষেত্রেই পেয়েছ। একেবারে চিত্রগুপ্তের খাতা বল্‌লেই হয়,—তোমার বংশের যদি কেউ কখনো কামাখ্যায় এসে থাকে তো চিরদিনের জন্য কারো-না-কারো খাতায় তার ছাপ পড়ে গেছেই, হাজার ইরেজার ঘষেও তাকে তুল্‌বার উপায় নেই। যে পাণ্ডা ঠাকুরের খাতায় নামটি ধরা পড়্‌বে তিনি তখন হয়তো একটু প্রসন্ন হাসি হেসে অপর সবাইকার দিকে চাইবেন; সে চাউনির মানে এই—'বাপু সব, ভেগে পড়,

খাতা বল্‌ছে এ দল আমারই সম্পত্তি।' পাণ্ডা আইন অনুযায়ী এর ওপর আর কোন আপীল আদালত নাই। অপর পাণ্ডারা নতশিরে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অন্য শিকার সন্ধানে ব্যাপৃত হবে। 'শিকার' কথাটা ব্যবহার করা আমার বোধ করি উচিত হ'ল না, কেননা কথাটা শুন্‌তে খারাপ, ওতে একটু অত্যাচার-উপদ্রবের আভাস আছে। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' মনে পড়ে কি—

'লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত'?

কামাখ্যার পাণ্ডা সম্বন্ধে এ অপবাদ কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কারো মুখে শুনি নি। এমন বিনয়ী, শান্ত, ভদ্র পাণ্ডা ভারতের যে কোন জায়গাতেই দুর্ল্লভ। নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে যাত্রীদের এরা যা আদর-আপ্যায়ন করে তার নাকি তুলনা হয় না। অথচ পাওনা নেবার বেলায় এতটুকু জুলুম নেই, তুমি খুসী হয়ে যা দাও তাইতেই সন্তুষ্ট, তাইতেই মুখে হাসি।

আগেই বলেছি পাণ্ডুঘাট থেকে শিলং যেতে হয় মোটরে—প্রায় ৬৬ মাইল্। খানিকটা সমতলভূমির উপর দিয়ে গিয়ে রাস্তা পরে এঁকেবেঁকে পাহাড় বেয়ে উঠেছে। শুনে খুসী হবে এখানকার মোটর সার্ভিসের সত্ত্বাধিকারী এক বাঙ্গালী কোম্পানী; এঁরা ছাড়া এ পথে আর কারো যাত্রী বইবার অধিকার নাই, ডাকঘরের চিঠিপত্র পৌঁছে দেবার ভারও এঁদেরই ওপর। রেলওয়ের মত এখানেও ফার্ষ্ট্, সেকেণ্ড্, ইণ্টার এবং থার্ড্ ক্লাশ রয়েছে; ফার্ষ্ট্ ক্লাশের যাত্রীরা যান ট্যাক্‌সিতে, বাকী সবাই বিভিন্ন বাসে। ভাড়ার হারটা বেশ কিছু বেশী, 'কম্‌পিটিশন্' থাক্‌লে আরও কম হ'ত নিশ্চয়ই।

পাণ্ডুঘাট থেকে অল্প কিছু গেলে পরেই কামখ্যা-মন্দির, তার পর দু'মাইল্ বাদে গৌহাটী সহর। গৌহাটীর কাছে বড় একটা দেখ্‌বার জিনিষ উমানন্দ-মন্দির। ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে ছোট্ট একটু দ্বীপ, তারই ওপর মন্দিরটি। নৌকায় চড়ে যেতে হয়। বছর কয়েক আগে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় এই মন্দির দেখ্‌তে গিয়ে কি ভাবে সপরিবারে সলিল-সমাধি লাভ করেন তার করুণ কাহিনী বোধ করি তোমার জানা আছে।

দার্জ্জিলিংএ ওঠার রাস্তার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, শিলংএর রাস্তা কিন্তু

অতটা চওড়া নয়; তার ওপর মোড়ও ফিরেছে আবার বেশী ঘন ঘন। দার্জ্জিলিংএর কার্ট্ রোডে দু'দিক্ থেকেই গাড়ী হামেসা যাতায়াত কর্‌ছে, এখানে কিন্তু সেটি হবার জো নাই। দস্তুর মত সময় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, ওঠ্‌বার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন গাড়ী নাম্‌তে পাবে না, আবার নামার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে কোন গাড়ীরই ওঠা বারণ। এ নিয়ম বহাল না রাখ্‌লে এত বেশী মোড়-ফেরা সঙ্কীর্ণ রাস্তায় নিয়তই যে গাড়ীতে গাড়ীতে ঠোকাঠুকি লেগে যেত তা'তে কি আর সন্দেহ আছে? পথটি অত্যধিক আঁকাবাঁকা হওয়ায় অনেক সময় যাত্রীরা সারাক্ষণ তবিয়াৎ ঠিক রাখ্‌তে পারেন না, ফলে মাথা ঘোরা এমন কি বমিরও স্রোত বইতে থাকে। আমাদের সহযাত্রী এক দু' মণ চোদ্দ সেরী ভদ্রলোক (ওজনটি তাঁকে সবিনয় জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম) সারা পথ এই ভাবে দেহভার কমাতে কমাতে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশ্রাম তিনি এতটুকু পান নি, কেননা যেটুকু সময় সুস্থ (?) ছিলেন সেটুকুও কেটেছিল পাহাড়ে রাস্তার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধেরই কাজে।

রাস্তার দু' পাশে দেখ্‌তে পাবে অসংখ্য ছোট ছোট ঝর্ণা—আরও এগিয়ে অনন্ত পাইন-বন। এখানে চুপি চুপি তোমাদের কাছে আমার একটা বোকামীর কথা স্বীকার করে নিই—শিলংএর ফটকের কাছে এসে না পৌঁছা অবধি পাইন গাছ-গুলোকে আগাগোড়া আমি ভুল করে এসেছিলাম ঝাউ গাছ মনে করে, যদিও আমার বিলক্ষণই জানা ছিল যে খাসিয়া পাহাড় পাইন-প্রধান জায়গা।

পথের কথাতেই অনেকগুলি পৃষ্ঠা খরচ হয়ে গেল, এবারে খোদ্ শিলং সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। সহরটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট্ ওপরে। ১৮৬৪ সনে আসামের রাজধানী এখানে উঠিয়ে আনা হয়, তার আগে এ সহরের তেমন কিছুই হাঁক-ডাক শোনা যেত না। কিন্তু এ ক' বছরের লালন-পালনে এ শিশু সহরটি সৌন্দর্য্যে এক অনুপম রূপ ধারণ করেছে। তুমি হয় তো বল্‌বে সৌন্দর্য্যের কোন বাঁধা-ধরা মাপকাঠি নাই। অতিশয় খাঁটি কথা, তবে আমার চোখে কী রকম ঠেক্‌ছে তাই তোমাদের গোচর কর্‌ছি। দার্জ্জিলিংএর মত এ সহরটা জমাট নয়, অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়ানো। আকারে তাই দার্জ্জিলিংএর তিন-চার গুণ।

ফুলের বাগান ঘেরা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ীগুলি সুরুচির আদর্শ। দু'ধারে ঘনসন্নদ্ধ পাইনের সার, তার মাঝখান দিয়ে তকতকে ঝকঝকে দীর্ঘ রাস্তাগুলো পাহাড়ের গা ঘিরে চলে গেছে—কোথাও নীচু কোথাও উঁচু। রাস্তায় মানুষের হুড়োহুড়ি-ঠেলাঠেলির বালাই নেই, সব জায়গাতেই যেন একটা নীরব, প্রশান্ত সৌন্দর্য্য। বাস্তবিক শিলংএর এই 'walk' গুলোর তুলনা নাই। এই ধরণের walk যে কত আছে তা কি বল্‌ব! আর একটা জিনিষ যা সিম্‌লা বা দার্জ্জিলিংএ পাবে না তা হচ্ছে এই যে প্রায় প্রত্যেকটি রাস্তাতেই মোটর চলে। এতে অবশ্য আমার আনন্দের চাইতে বিরক্তির ভাবই হচ্ছে বেশী।

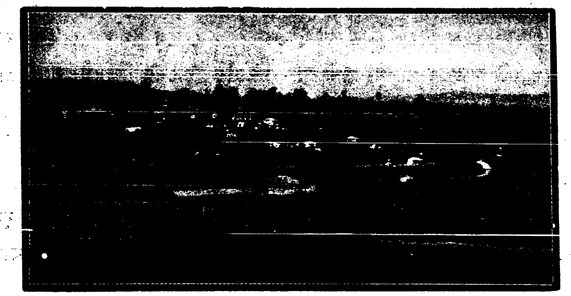

শিলং সহরের সাধারণ দৃশ্য
(ঘোষাল ব্রাদার্স কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র)

এখানকার সাধারণ লোকগুলো বেশ বিনয়ী, ভদ্র এবং সম্ভ্রমশীল; ফলে পথে-ঘাটে প্রচুর সেলাম লাভ হচ্ছে। সেলামের ভাগটা বেশী পড়্‌ছে আমাদের এক নবলব্ধ বন্ধুর বরাতেই। খুব সম্ভবতঃ এর কারণ তাঁর দু' মণ দশ সের ওজন এবং ছ' ফুট এক ইঞ্চি লম্বা দেহলতাটি (?)। গুটি দুই-তিন মেডেল-যুক্ত লাল চক্‌মকে বনাতের উর্দ্দিপরা, গর্ব্বিত উষ্ণীষধারী 'বড়া সাহেবের' আর্দ্দালীকে দেখে আমরাই তাকে সেলাম কর্‌ব কিনা ভাব্‌ছি, এমন সময় পুরোদস্তুর মিলিটারী কায়দায় দুই গোড়ালি ঠকাস্ করে একত্রে এনে সে-ই আমাদের এক সেলাম জানিয়ে দিলে—একেবারে বড় রাস্তার মাঝখানে। গম্ভীর ভাবে আমরাও মাথাটা একটু হেলালাম। রাস্তা দিয়ে টেলিগ্রামের পিয়ন যাচ্ছিল, আমাদের বন্ধুবর কি দরকারে তাকে আহ্বান করলেন—ব্যস্, প্রথম দৃশ্য য়্যাটেন্‌সন্, দ্বিতীয় দৃশ্য স্যালিউট্, তৃতীয় দৃশ্য

বঙ্গপুঙ্গবটির কথার জবাব। কল্‌কাতায় বসে এ সব কথা তোমরা ভাব্‌তে পার কি? অবশ্য এগুলি বন্ধুবরের নিখুঁৎ কাটের চেষ্টারফিল্ড্, ভড়ি পাড়ের ধুতি এবং বাটা কোম্পানীর হাল্ ফ্যাসানের জুতো জোড়ার প্রতি হৃদয়ের অকপট ভক্তি নিবেদন নাকি তাঁর দু' মণ দশ সেরী ধরবপুখানার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি সে সম্বন্ধে 'আমাদের ভেতর এখনও গবেষণা চল্‌ছে।

শিলংএর খাঁটি অধিবাসীদের বলা হয় খাসি বা খাসিয়া। পাহাড়ের যে এই থেকেই নামকরণ হয়েছে তা বোধ করি তোমাকে আর বুঝিয়ে বল্‌বার প্রয়োজন নাই। এদের ভাষা আলোচনা ক'রে অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন হাজার হাজার বছর আগে এঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা আসাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে এদেশে এসেছিল। রাঁচির ওদিকে মুণ্ডা নামে যে এক জাতের লোক আছে তাদের কথা নিশ্চয়ই তুমি জান। খাসি ভাষার সঙ্গে মুণ্ডাদের ভাষার বেশ একটু মিল দেখা যায়। শুধু ভাষায় নয়, আচার-ব্যবহারেও কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। কাজেই অনেকে মনে করেন মুণ্ডা জাত বহু পূর্ব্বে খাসিয়া পাহাড় থেকে নেমে গিয়েছিল। ভাষাটা বাস্তবিকই আমাদের কানে অপরূপ ঠেকে, একটি বর্ণও বুঝ্‌বার উপায় নাই। তোমাকে যদি বলা হয় 'ওয়াট্‌রুং' তুমি কি তার মাথামুণ্ডু কিছুই ঠাওর কর্‌তে পার? ভাব্‌তে পার ওটা কোন ভারতবাসীর ভাষা, জার্মানীদের নয়? কথাটার মানে হচ্ছে, ভিতরে এসো না; যদি তোমাকে বলা যায় 'ইম্‌বিট্ বান্ বিয়া' তুমি খানিকটা ঢোঁক গিল্‌বে তা আমি জানি, কিন্তু খবরদার, থুথু ফেল না যেন, কেননা ওকথাটা বলে তোমাকে থুথু ফেল্‌তেই বারণ করা হচ্ছে। বাজারে ফলওয়ালী (ফলওয়ালী বড় বেশী নাই) যদি কোন জিনিষের দাম 'ছাও আনা' হাঁকে, আর তুমি বল, 'নাহে, পাঁচ আনায় দাও', তবে ওরা হেসেই কুটিকুটি হবে, কেননা ছাও আনা মানে চার আনা; তেম্‌নি লাই আনা মানে নয় আনা নয়, তিন আনা। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় এদের ভাষায় যথাক্রমে ওয়ে (অথবা সি) আর, লাই, ছাও, ছন, হিঙ্গু ইত্যাদি।

খাসিয়াদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার মনে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। এদের একটা আদিম ধর্ম্ম আছে, সাপের পূজো, ভূত-পেত্নীর পূজো তার অঙ্গ। আগে

নাকি ওরা অনেক সময় মানুষ মেরে সাপের কাছে বলি দিত। পাদ্রী সাহেবদের প্রচারের ফলে আজকাল বহু খাসি খৃষ্টান হয়ে গেছে। পাহাড়ের সুদূর অভ্যন্তরে পর্য্যন্ত মিশনারি সাহেবেরা গীর্জ্জা তৈরী করে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করছেন। শিলং-এর রাস্তায় চলতে চলতে অনেক সময় হয়তো সাইনবোর্ড চোখে পড়বে মিষ্টার উড, চেয়ার-রিপেয়ারার ইত্যাদি। তাদের সাহেব ছুতোর মিস্ত্রি বলে ভুল করে বস না যেন, ওরা সব খৃষ্টান খাসিয়া। পাহাড়ের নীচের দিকে যাদের বাস তারা বহু দিন থেকেই হিন্দুভাবাপন্ন। আজকাল আবার হিন্দু মিশন এবং রামকৃষ্ণ মিশন ভেতরে গিয়েও ধর্ম্মপ্রচার করছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারেরও একটু ছোটখাট বন্দোবস্ত আছে। এঁদের কল্যাণে খাসিয়াদের মুখে বাংলা ভাষা, বাংলা গান শুনে কান যেন জুড়িয়ে যায়। বাংলা নামেরও খাসিয়ারা বেশ পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে। চারুচন্দ্র রায় বা চন্দ্রকান্ত রায় নাম শুনে স্বপ্নেও কি ভাবতে পারবে তারা জাতে খাসিয়া? এখানে তোমার একটা মস্ত ভুল ভাঙ্গা বিশেষ দরকার—খাসিয়াদের মধ্যে উচুদরের লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত নরনারীর অভাব নাই।

এখানে মেয়েদের প্রাধান্যটাই যেন বেশী লক্ষ্য করছি। পরিবারের অভিভাবক নাকি বাপ নয়, মা। ছেলে সম্পত্তি পায় না, পায় মেয়ে। দেবতার মধ্যে অধিকাংশই মেয়ে-দেবতা, হাট-বাজারে মেয়েদেরই রাজত্ব। তবে পুরুষেরাও একেবারেই অলস নয়, পরিশ্রমের মর্য্যাদা এরা সকলেই করে থাকে। শিলং সহরে খাসি ভিক্ষুক আজ পর্য্যন্ত একটিও আমার চোখে পড়ে নি। চুরি করার প্রবৃত্তি এ জাতের আদৌ নাই। আমাদের হিল্‌টপ্ হোটেলে বাইরে বেরুবার সময় কাউকেই দরজা বন্ধ করতে দেখি না, জিনিষপত্র, বাক্স-প্যাঁটরা সমেত ঘর চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা অবস্থাতে পড়ে থাকে। অনেক ঘরে তালা লাগাবার হুকটি পর্য্যন্ত নাই। ম্যানেজার বাবুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, 'আজ পর্য্যন্ত ওর কোন প্রয়োজন হয় নি, তাই কোন ব্যবস্থাও করা হয় নি।' এই বিংশ শতাব্দীতে কথাগুলি তোমার খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হবে। স্ত্রীরা স্বাধীনচেতা, বসে বসে স্বামীর অন্নধ্বংস করতে বড়ই গররাজী। কাজেই অনেক সময় দেখা যায় স্বামী হয়তো সরকারী আপিসে কাজ করছেন, স্ত্রী বসে গেছে জিনিষ

বেচতে বাজারে। জিনিষ বেচা শেষ হ'লে পুরোদস্তুর মেমসাহেবী ষ্টাইলে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে সে বাড়ী ফিরবে। ট্যাক্সি চড়াটা এদের বোধ হয় জীবনের মস্ত একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। গরীব লোককে বেপরোয়া ভাবে এমন ট্যাক্সি হাঁকাতে এই শিলং সহরেই প্রথম দেখলাম।

ভদ্র খাসিয়া পরিবারে সাহেবী অনুকরণটা যেন বেশী মাত্রায় লক্ষ্য করছি। মেয়েমহলে হিল উঁচু জুতো আর সান্ সেডের ছড়াছড়ি। গোটা জাতটাই বেশ স্ফূর্ত্তিবাজ। পুরুষেরা তীর ছুঁড়তে ভারী ভালবাসে; এই ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা আছে, তবে আজকাল সেখানে জুয়ো খেলাটাই বেশী চলে। খাসিদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানার জন্য যদি তোমার কৌতূহল থাকে তো গর্ডন সাহেবের 'The Khasis' নামে বইখানা পড়ে নিও।

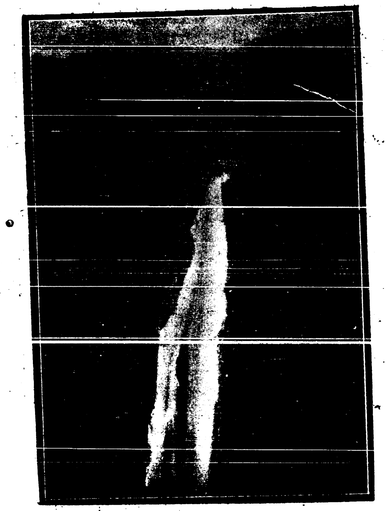

বিশপ্ ফল্‌স্—শিলং
(ঘোষাল ব্রাদার্স কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র)

খাসিয়াদের পরেই শিলংএ বাস শ্রীহট্ট জেলার বাঙ্গালীদের, তার পর আসামীয়, ইয়োরোপীয়ান্ ইত্যাদি। ঝাড়ুদারের কাজে এখানে কেন যে কেবল পাঞ্জাবী শিখদেরই দেখছি তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আজ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলাম না। গুর্খা পল্‌টনে সহর ভর্ত্তি।

শিলং সহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আভাস কিছু আগেই তোমাকে দিয়েছি; আজকালকার সাহিত্যিকরা হয়তো বলবেন সুপটু পটুয়ার আঁকা একখানা ছবি যেন। চারদিকে কেবল পাহাড় আর সেই পাহাড়ে অজস্র পাইন গাছ। পাইনের বাতাস ফুস্‌ফুসের পক্ষে খুব ভাল তা জান বোধ হয়।

পরিষ্কার দিনে আমাদের হিল্‌টপ্‌ হোটেলে দাঁড়িয়ে আমরা যে দৃশ্য দেখি তা তুমি কল্পনায়ও বোধ করি আন্‌তে পারবে না। সুদূর ভোটান সীমান্তে হিমালয়ের তুষারশুভ্র চূড়াগুলি সূর্য্যের আলোয় সোনার মত ঝক্‌মক্‌ কর্‌তে থাকে। সহরের প্রধান প্রধান পল্লীগুলোর নাম লাইউম্‌খী, লাবান, জেল রোড্‌, পুলিশ-বাজার, বড়বাজার, গাড়ীখানা এবং মপ্রেম। বাঙ্গালীরা বেশীর ভাগ থাকেন লাবান এবং জেল রোডে। সহরের ভেতর কতগুলি জলপ্রপাত আছে যেগুলোর খ্যাতি অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে—ক্রিনোলাইন্‌ ফল্‌স্‌, সতী বা স্প্রেড্‌ ঈগ্‌ল্‌ ফল্‌স্‌ (Spread Eagle Falls), গানার্স্‌ ফল্‌স্‌, বিশপ্‌ এবং বীড্‌ন্‌ ফল্‌স্‌গুলোর কথা বল্‌ছি। প্রত্যেকটারই এক-একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে। তোমার যখন একটু কবিতা লেখার ঝোঁক্‌ আছে তখন স্প্রেড্‌ ঈগ্‌ল্‌ তোমার চোখে বিশেষ রমণীয় লাগ্‌বার কথা। সহরের ধারে বিশপ্‌ ফল্‌স্‌টাই সব চাইতে উঁচু; প্রবল জলধারা পৃথিবী কাঁপিয়ে ৪০০ ফুট নীচে নেমে বীড্‌নের জলের সঙ্গে মিশে উমিয়াম্‌ নদীর উৎপত্তি কর্‌ছে। বীড্‌ন্‌ ফল্‌স্‌টিও বড় কম যায় না। এই বীড্‌ন্‌ ফল্‌সেরই তলায় অনেক নীচে বিজলী কোম্পানীর পাওয়ার হাউস্‌। এই বিজলী কোম্পানীও আমাদের আর এক গৌরবের সামগ্রী, কেননা এটা বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান অংশীদার কল্‌কাতার বিখ্যাত ডাক্তার বিধান রায় মশাই।

শিলং সহরে সাহেবদের গল্‌ফ্‌ খেলার মাঠটি এতই উঁচুদরের যে সারা দুনিয়ায় দু'-একটি ছাড়া এর আর জুড়ি নাই। গল্‌ফ্‌ খেলা না জান্‌লেও এটি প্রত্যেকেরই দেখা উচিত। সহরের ভিতরকার ওয়ার্ড্‌স্‌ লেক্‌ নামে কৃত্রিম হ্রদটিও সৌন্দর্য্যের আধার।

শিলংএ ভূমিকম্প হয় বড়ই ঘন ঘন। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে নগরটি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে পাহাড়ী কায়দায় বাড়ীগুলি এম্‌নি ভাবে তৈরী হচ্ছে যে রাত্তির বেলায় ভূমিকম্প হ'লেও লোকেরা আরামে লেপের তলায় শুয়ে থাকে, বাইরে আসার কষ্টটুকুও সহ্য কর্‌তে রাজী হয় না।

শিলংএর বাইরে আশ-পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। এগুলো না দেখে যদি কেউ ফিরে যায় তবে তার শিলং ভ্রমণ একেবারেই অসম্পূর্ণ হয়েছে

বল্‌তে হবে। এগুলোর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আজ আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, শুধু তাদের নামের তালিকা দিয়েই ক্ষান্ত হব;—শিলং পিক্‌ (৬৪৪১ ফুট) এলিফ্যাণ্ট্‌ ফল্‌স্‌, সুইট্‌ ফল্‌স্‌, চেরাপুঞ্জি, মসমাই ফল্‌স্‌।

ওয়ার্ড্‌স্‌ লেক্‌—শিলং
(ঘোষাল ব্রাদার্স্‌ কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র)

যদি মানচিত্র খোল দেখ্‌তে পাবে শিলং পাহাড়ের চার দিক্‌ হল্‌দে রঙে ছোপান। এর কারণ এই যে এ পাহাড়গুলো ছোট ছোট খাসিয়া রাজার অধীনে। এঁদের নাম সীম। শিলংএর লাবান পল্লীটিও এই ধরণের একজন সীমের অধীনে—অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের বাইরে। নংক্রেমের সীম্‌-রাজত্বে পূজা উপলক্ষে খাসিয়া মেয়েদের চমৎকার দেশী নাচ হয়। সে নাকি এমনি বিরাট্‌ ব্যাপার যে আসামের লাট সাহেব পর্য্যন্ত তা দেখ্‌তে যান। নাচ অবশ্য পূজারই অঙ্গ।

এখানে ক্রমেই শীতের উপদ্রব বেড়ে চলেছে; কল্‌কাতার খবর জানিও।

ইতি—মেজমামা

ধামাচাপা ঝামা ইট রামা রেখে রাতে,
রাশি রাশি বাসি ডিম শুকাইছে ছাতে;
ভিজে ডিম গলে যদি কি যে হবে ছাই,
রামা তাই মামাবাড়ী করে খাই খাই।

শ্রীবিকাশ দত্ত

থল-কমলের গান

(শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

থল-কমল, থল-কমল,
ভোর আলোয় রূপ অমল।
সাঁঝ-মেঘের রঙ্ উজল
মৌ-নদীর ঢেউ উছল।
বুলবুলির সুর মধুর
আজ মাতায় বন সুদূর;
মেঘ ভাসা নীল গগন
কার বাঁশীর সুর মগন।
কোন দেশের রূপকথায়
হিম হাওয়ায় আজ মাতায়!
শ্যাম মাঠে ধান দোলায়,
ফুল-বনে হাত বুলায়।

থল-কমল, কার হাসির
রঙ্টী ও, কার বাঁশীর—
সুর খানি ঢেউ তোলে
ভোর আলোর কল্লোলে?
ওর পুলক ঢেউ লাগায়,
আজ ধরার মন জাগায়।
হিম-ফোঁটা ঝলমলি'
দুল পরে— ফুল-কলি!
থল-কমল বন-মেয়ে—
কার পানে রয় চেয়ে!

নীল আকাশ মেঘ-হারা
শেষ বাদল, নেই ধারা;
রামধনুর দেশ থেকে
কোন্ পরী যায় ডেকে!
তাই ভোরে রূপ অমল
আজ ফোটে থল-কমল।

তাবিজ-মহিমা

(শ্রীকিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি)

ফেব্রুয়ারী মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল, হুহু করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষাও আসিয়া পড়িল। সপ্তাহ খানেক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিয়া উঠিয়া সোমেশকে আজ আবার বই খুলিয়া বসিতে হইবে। জ্বরের সময়ে শুইয়া শুইয়া মনের মধ্যে কত রকম আশাই না ঘুরিয়া বেড়াইত—আর কয়েকটা দিন এইভাবে কাটাইয়া দিতে পারিলেই এ বছরটার মত পরীক্ষার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। এ ক'টা দিন চোখ বুঁজিয়া সাগু খাইয়া কাটাইয়া দিতে তার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু হায়! সে করুণ আবেদন ভগবানের কাছে পৌঁছিবার আগেই ডাক্তার বাবু তাকে ভাত খাইবার অনুমতি দিয়া ফেলিলেন। ফলে সর্ব্বশরীরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার গ্লানি ও সম্মুখে অতি সামান্য কয়েকটা দিন এবং পর্ব্বতপ্রমাণ অপঠিত পুস্তক লইয়া সোমেশকে আবার পড়ার ঘরে ঢুকিতে হইল।

বহুক্ষণ জ্যামিতির নাইন্ পয়েণ্ট্স্ সার্কলের ভিতর ঢুকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবার পর সোমেশ, তখন অত্যন্ত বিরক্তমুখে ব্যাকরণকৌমুদী খুলিয়া সুর করিয়া আওড়াইতেছে—"গৃহ্লীয়াৎ—গৃহ্লীয়াতাম্—গৃহ্লীয়ুঃ,—গৃহ্লীয়াঃ—গৃহ্লীয়াতম্—", এমন

সময়ে সশব্দে দরজা খুলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে এক গাল পান চিবাইতে চিবাইতে তার পরম বন্ধু সিদ্ধেশ্বর আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সোমেশের মাথায় চাঁটি মারিতে মারিতে বলিয়া চলিল, "চাঁটীয়াৎ—চাঁটীয়াতাম্—চাঁটীয়ুঃ,—চাঁটীয়াঃ—"

"সব সময়ে ইয়ার্কি ভাল লাগে না। আজ কত্তায়িখ খেয়াল আছে?" বলিয়া সোমেশ হাতটা সরাইয়া দিল।

"আছে, আছে বন্ধু, আছে। কিন্তু সারা বচ্ছর ফক্কিকা দিয়ে এখন মরণকালে নাম জপ ক'রে আর কি হবে! তার চাইতে বরঞ্চ চল্ হরিপদ জ্যোতিষালঙ্কারের কাছে। পাশ হব কি ফেল হব জেনে আসা যাবে। গেল বছর বিষ্টু দা'রা গেছ্‌ল। জ্যোতিষালঙ্কার বল্লেন, 'নিশ্চয়ই পাশ হবে'—ব'লে হাতে এক মন্ত্রপূত তাবিজ বেঁধে দিলেন। ব্যস্, বিষ্টু দা' বাড়ী এসে আর বই ছুঁল না—অথচ আশ্চর্য্য, গেজেট খুলে দেখা গেল দিব্যি থার্ডডিভিশনে উৎরে গেছে।"

অতঃপর জ্যোতিষালঙ্কারের বাড়ী যাওয়াই ঠিক হইল।

হরিপদ জ্যোতিষালঙ্কারের আস্তানা শিবপুরে—অনেকখানি পথ। কিন্তু খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। বাড়ীর সামনে লম্বা লম্বা দুইখানি সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে—তা'তে ছোট-বড় নানা অক্ষরে অনেক কথাই লেখা, সবটা পড়িয়া উঠা যায় না। এক জায়গায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—

উমেদারগণের মহা সুসময়

চাকুরীর বাজারে নিষ্ফল ভাবে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া এইখানে আসুন, জ্যোতিষালঙ্কারের মন্ত্রপূত তাবিজে আপনার অবশ্য চাকুরী লাভ ঘটিবে।

ছাত্রগণের স্বর্ণ সুযোগ

পরীক্ষা পাশ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইতে হইলে এইখানে আসুন। জ্যোতিষালঙ্কারের অপূর্ব্ব গণনা-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হউন। গ্রহ প্রতিরূপ থাকিলে তাহার বিধান করিয়া লউন। দক্ষিণা মাত্র দুইটি রজত চক্র।

সোমেশ ও সিদ্ধেশ্বর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

ঘরখানা দেখিয়া মনে খুব যে বেশী সম্ভ্রম হয় তা' নয়। ঘরের এক কোণে কতকগুলি তামাকের সরঞ্জাম জড় করা—তামাক-টিকা-হুঁকায় মিলিয়া সেখানে এক অপূর্ব্ব সুরভির সঞ্চার করিয়াছে। একটা তক্তপোষের উপর একখানা ধূলিধূসরিত চাদর বিছান—সম্ভবতঃ গত তিন বছর যাবৎ সেটি ধোপাবাড়ী যায় নাই। দেয়ালে এক সময় বোধ হয় ডিস্‌টেম্পার এবং পেন্টিং করা ছিল, এখন সে সব চটিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, এবং তার জায়গায় কোথাও বা পানের পিচ লাগানো হইয়াছে, কোথাও বা তেল-সিঁদুর; দেয়ালের একদিকে পেন্সিল, ইটের টুক্‌রা এবং কাঠ-কয়লার সাহায্যে পরিচিত লোকেদের এবং দেবদেবীর নামধাম ও ছোট ছেলের হাতের বড় বড় অক্ষরে ক খ গ ঘ ইত্যাদি লেখা। হঠাৎ দেখিলে সম্রাট্ অশোকের অনুশাসনের কথা মনে পড়িয়া যায়। এক কথায় সাধারণ বাঙ্গালীর বাড়ীর বৈঠক-খানা যেমনটা হয় জ্যোতিষী মহাশয়ের বৈঠকখানাটিও ঠিক তেমনি সুরুচিপূর্ণ।

তক্তপোষের উপর একটি ৭।৮ বছরের মেয়ে বসিয়া বসিয়া সুর করিয়া নামতা পড়িতেছিল; আর কাহাকেও না দেখিয়া সিদ্ধেশ্বর তা'কেই জিজ্ঞাসা করিল, "খুকী, হরিপদ বাবু আছেন?" মেয়েটি চমকাইয়া মুখ ফিরাইল, তার পর আকর্ণবিস্তৃত হাঁ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ?"

"হরিপদ বাবু—হ-রি-প-দ জ্যোতিষালঙ্কার—যাঁর সাইনবোর্ড বাইরে ঝুলছে।"

খুকী এইবার বুঝিতে পারিল, এবং বুঝিয়া একবার স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিয়া আবার ধারাপাতের দিকে মনোযোগ দিল। সিদ্ধেশ্বর আবার বলিল, "বল না খুকী?" খুকী বিরক্তভাবে জবাব দিল, "কব ক্যাম্বায়?" সোমেশ হতবুদ্ধি হইয়া সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাইল, সিদ্ধেশ্বর ব্যাপার বেগতিক দেখিয়া ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, "জ্যোতিষী মশাই তোমার কে হন?" উত্তর আসিল —"মাউসা"। খুকী কি ভাষায় কথা কহিতেছে—ফরাসী না জার্ম্মান্ না হিব্রু না এস্‌পারেণ্ট্—বুঝিতে না পারিয়া সোমেশ কহিল, "ওহে, ব্যাপার বিশেষ সুবিধার বোধ হচ্ছে না, এবার ফেরা যাক্, বাড়ী গিয়ে ততক্ষণ ব্যাকরণকৌমুদী পড়লে কাজ দেবে।" সিদ্ধেশ্বর বিচলিত না হইয়া পকেট হইতে একটা পয়সা বাহির করিয়া মেয়েটীর সামনে ধরিয়া বলিল, "তোমার মেসোমশাইকে যদি একবার ডেকে

দাও ত' এই পয়সাটা—।" খুকী এবার টলিল—শুধু টলিল না, হঠাৎ উঠিয়া চিলের মত ছোঁ মারিয়া পয়সাটি তুলিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। মিনিট খানেক পরেই সে রেসের ঘোড়ার মত বেগে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "বাবুদের বস্‌ফার কইছে, তেনি এক্তিবেলায় আইবো"—বলিয়া আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া বোধ হয় সেই পয়সাটির সদ্ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ঠিক তেমনি বেগেই রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরেই খড়মের খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং এক ঝলক বিশুদ্ধ নস্যের গন্ধ বৈঠকখানা আমোদিত করিয়া তুলিল। গন্ধের পিছু পিছু জ্যোতিষালঙ্কার মহাশয়ও ঢুকিলেন।

মেয়েটি চমকাইয়া মুখ ফিরাইল।

জ্যোতিষী মহাশয় যে নেহাৎ 'হাতুড়ে' জ্যোতিষী নন্ তা' তাঁর প্রথম কথা হইতেই বুঝা গেল। "বাবুরা বুঝি এবার মেট্রিক দিবেন?" সোমেশ ও সিদ্ধেশ্বর মুগ্ধ হইয়া গেল। লোকটি পণ্ডিত, আবার কেমন ভদ্র! এখনও তো তারা কলেজে উঠে নাই তবু কেমন 'বাবু', 'আপনি' করিয়া কথা বলিতেছেন। বাঃ, বেশ তো! বলিল, "আজ্ঞে হাঁ"। জ্যোতিষালঙ্কার আসিবার কারণও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কহিলেন, "য়্যাগ্ জামিন্ ত আইসা পর্‌ল, দেখি আতটা।"—বলিয়া সোমেশের

হাতটা টানিয়া লইলেন। "হঃ, ভালই। মঙ্গল—বৃহস্পতি—হঃ, ঠিক আছে। উর্দ্ধ্ র‍্যাহাটা দেহি? এ-এইখানে একটু—তা একটা তাবিজ দিয়া দিমু অখন। আপনেরটা দেখি বাবু মশায়?" সিদ্ধেশ্বরের কর-রেখারও একই রকম ফল দেখা গেল। জ্যোতিষী মহাশয় উঠিয়া একটা কাঠের আলমারি হইতে দু'টি তাবিজ বাহির করিলেন এবং সে দু'টি কপালে ঠেকাইয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে দু'জনেই কনুইএর একটু উপরে বাঁধিয়া দিলেন। তার পর কহিলেন, "যে দিন পাশের সংবাদ বাইর হবে সি দিনই এই তাবিজ খুইলা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করবেন—ভুল হয় না যিনি।" সোমেশ ও সিদ্ধেশ্বর গদ্গদ ভাবে জ্যোতিষালঙ্কার মহাশয়ের পদধূলি লইল এবং দু'টি দু'টি চারটি টাকা প্রণামী রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। "বাইচা থাকেন, বাইচা থাকেন বাবুরা। আর তাবিজের দাম পাচ সিকা কইরা—মহা তেজস্কর তাবিজ কিনা!" সোমেশ ও সিদ্ধেশ্বর একটু বিব্রত হইয়া আরও আড়াইটি টাকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্যোতিষী মহাশয় দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া বিদায় দিলেন এবং পাশের সংবাদ পাইলেই তাবিজটি যাহাতে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিতে ভুল না হয় সে সম্বন্ধে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিলেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে বিষ্ণু দা'র সঙ্গে দেখা। সিদ্ধেশ্বরের মুখে সব কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ওঃ, আর ভাবতে হবে না, ও খুব জাগ্রত তাবিজ। আমার নিজের কথা তো জানিস্‌ই, আমার বন্ধুদের মধ্যে আরও অনেকে নিয়েছিল—স-ব পাশ ক'রে গেছে।"

পরদিন সিদ্ধেশ্বর ও সোমেশের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে রমেশ, হরেন, নিমাই, ভুঁদো, ঘেঁাতা প্রভৃতি আরও দশ-বারো জন গিয়া তাবিজ ধারণ করিয়া আসিল। সোমেশকে আর পায় কে? নাইন্-পয়েন্ট্স্ সার্কল্ হল্ য়্যাণ্ড্ ষ্টিভেন্স্-এর বইএর মধ্যেই সমাহিত রহিল, গ্রহ্ ধাতুর রূপ লইয়া মাথা ঘামাইবারও আর প্রয়োজন রহিল না।

পরীক্ষা হইয়া গেল এবং যথা সময়ে রেজাল্ট্ বাহির হইবার দিনও আসিয়া

পড়িল। পাড়ায় অবনী বাবুর বাড়ীতে একখানা গেজেট আসে, সকাল হইতে সেখানে ছেলের দল দারুণ ভিড় লাগাইয়া দিয়াছে। গেজেট আসিলে হরিশ দা' নাম পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।—'সিদ্ধেশ্বর দত্ত—ফার্ষ্ট ডিভিসন্, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ফার্ষ্ট ডিভিশন, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—সেকেণ্ড ডিভিশন্', ইত্যাদি। কিন্তু কই, সোমেশের নাম কোথায়! না, সোমেশের নাম গেজেটে নাই; ভুঁদোর নামও নাই, ঘোঁতার নামও নাই।

রাগে ফুলিতে ফুলিতে সোমেশ বলিল, "চল্ জ্যোতিষালঙ্কারের বাড়ী। জোচ্চুরি করবার আর জায়গা পায় নি! প্রত্যেকের কাছ থেকে নগদ স' তিন টাকা ক'রে নিয়েছে বেটা।" ভুঁদো আর ঘোঁতা তো ক্ষেপিয়া ছিলই, সিদ্ধেশ্বর, রমেশ, হরেন—এরাও বন্ধুদের প্রতি সহানুভূতিতে গলিয়া গেল। দল বাঁধিয়া তখনই সকলে জ্যোতিষীর বাড়ী রওনা হইল।

জ্যোতিষালঙ্কার মশাই আজ বৈঠকখানাতেই ছিলেন, তাঁর সামনে ছিল একটি অত্যন্ত গোবেচারা গোছের লোক। তারই হাতে তাবিজ বাঁধিতে বাঁধিতে তিনি বলিতেছিলেন, "এই তাবিজে আপনের চাকরী না হইয়া পারে না, কিন্তু চাকরী পাইয়াই কইলাম তাবিজ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করতে ভুলবেন না। বোচ্ছেন নি?" এমন সময় সোমেশদের দল গিয়া ঘরে ঢুকিল।

জ্যোতিষী মহাশয় কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া কহিলেন, "আসেন বাবুরা। কি চাই আপনেগো?"

কি চাই! রাগে সবাই তখন ফুঁসিতেছে, ন্যাকামী দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বরের মুখের ক্রুদ্ধ বিবরণ বেশ ধীরভাবে শুনিয়া জ্যোতিষালঙ্কার কহিলেন, "আমার তাবিজ ঠিকই আছে, কিন্তু মহামায়ার উপর ত আর মানুষের আত নাই, তেনি যদি পছন্দ করেন ফ্যালের আত হইতে কেডা বাচাইবে? তাবিজের ভিতর চুইকা তিনি হগ্‌গল বদ্‌লাইয়া দিয়া যাইবেন। কই, কেডা ফ্যাল হইছেন? আপনি? কই দেহি আপনের তাবিজ, খোলেন ত?"

কারও তাবিজই গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবার সময় হয় নাই। সোমেশের তাবিজ খুলিয়া গালা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ভিতর হইতে শুক্‌না ফুলের সঙ্গে

বাহির হইল পাকানো এক টুক্‌রা কাগজ। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল তার উপর লেখা—'তুমি ফ্যাল হইবা।'

জ্যোতিষালঙ্কার মহাশয় সগর্ব্বে কহিলেন, "আর কেডা কেডা ফ্যাল হইছেন, খোলেন তাবিজ।" ভুঁদো এবং ঘোঁতার তাবিজ খুলিয়া দেখা গেল তা'তেও লেখা আছে—'তুমি ফ্যাল হইবা', 'তুমি ফ্যাল হইবা।' সোমেশের দলের মুখ চুণ হইয়া গেল। জ্যোতিষালঙ্কার মহাশয় ঠোঁট চুঁচি শুয়োরের মত সরু করিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসি চাপিতে লাগিলেন; ভাবখানা,—এবার কেমন জব্দ!

সোমেশদের দল গিয়া ঘরে ঢুকিল।

হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরের মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে কহিল, "দেখি, আমারটায় কি লেখা, আমি তো পাশ হয়েছি।" জ্যোতিষালঙ্কার হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, "কন্ কি, পাশ করছেন তবু গঙ্গাজলে তাবিজ বিসর্জ্জন দ্যান নাই। মহাপাতক করছেন—এখনই ছুইটা যান্, মা গঙ্গার কাছে ক্ষমা চাইয়া তাবিজ ফেইলা দিয়া আসেন। ছি ছি ছি।" কিন্তু সিদ্ধেশ্বর ততক্ষণে তাবিজ খুলিয়া ফেলিয়াছে। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল তার ভিতরেও পাকানো কাগজ এবং তা'তেও গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—"তুমি ফ্যাল হইবা।"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বর বলিল, "দেখি তোদের

তাবিজ ?" রমেশ, হরেন প্রভৃতি যারা পাশ করিয়াছে একে একে তাদের সকলের তাবিজ খুলিয়া ফেলা হইল। প্রত্যেকটির মধ্যেই লেখা—'তুমি ফ্যাল হইবা, তুমি ফ্যাল হইবা, তুমি ফ্যাল হইবা।'

সোমেশ বলিল, "ওঃ, এই জন্যেই পাশের খবর পাওয়ামাত্র তাবিজ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করতে হবে, নইলে যে সব ফাঁক। দেখি মশাই, আপনার তাবিজটা ?" সেই গোবেচারা লোকটিকে কোনও কথা বলিবার ফুরসৎ না দিয়া টান মারিয়া তার তাবিজটাও খুলিয়া ফেলা হইল। দেখা গেল তার মধ্যে লেখা—'তোমার চাকরী কস্মিন্ কালেও হইবো না'। "ওঃ, এই জন্যে আপনাকেও চাকরী পাওয়ামাত্র গঙ্গাজলে তাবিজ নিক্ষেপের আদেশ দেওয়া হয়েছে !"

"তবে রে বেটা ভণ্ড, তবে রে বেটা জোচ্চোর" বলিয়া ভুঁদো, ঘোঁতা ও সিদ্ধেশ্বর আস্তিন গুটাইয়া জ্যোতিষালঙ্কারের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু কই, কোথায় গেলেন তিনি ? কোন্ ফাঁকে পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, কেউ টেরও পায় নাই।

তার পর ঝাড়া দু' ঘণ্টা ধরিয়া নানা রকম চীৎকার, হট্টগোল এবং জ্যোতিষী মহাশয়কে নানা ধরণের নিম্নশ্রেণীর জীবের সহিত তুলিত করার পর বোধ হয় বাড়ীর লোকেদের মায়া হইল। উপরের বারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া সেদিনকার সেই খুকী দেখা দিল, কহিল, "বাবুরা প্যাচাল পারবেন না। মাউসার প্যাটে ভস্কর ব্যাদনা হইছে, আইজ আর তেনি লামায় যাইবো না।"

লণ্ডন-মেল্‌বর্ণ্ এয়ার রেস্

(শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্-এ, বি-এল্)

তোমরা শিবরাম বাবুর 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' গল্পে দু'রকম রেসের কথা প'ড়েছ নিশ্চয়,—হিউম্যান্ রেস্ ও হর্স্ রেস্। আর এক রকম রেসের কথা এই

ক'দিন আগে খুব শোনা গেছে, সেটা হ'চ্ছে লণ্ডন-মেল্‌বর্ণ্ এয়ার রেস্,—অর্থাৎ প্রায় এক সঙ্গে রওনা হ'য়ে কে কত আগে ইংল্যাণ্ড্ থেকে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবর্ণ্ সহরে এরোপ্লেনে উড়ে যেতে পারে তারই চেষ্টা। এ চেষ্টা অবশ্য আজ নতুন নয়, যদিও এই ঘোড়দৌড়ের মত ক'রে অনেকগুলো এরোপ্লেন ইংল্যাণ্ডের একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গা থেকে অষ্ট্রেলিয়ার একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আগে পৌঁছবার রেষারেষি এই প্রথম। পথ বড় কম নয়, ইংল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়া মোটামুটী দশ হাজার মাইল ধরা যেতে পারে। ম্যাপ্ দেখলেই বুঝ্‌তে পারবে কত নদী, পাহাড়, সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে, কত বিপদ্ মাথায় ক'রে এই ওড়া। এমি জন্‌সন্, কিংস্‌ফোর্ড্-স্মিথ, এলান্ কব্‌হ্যাম এবং আরও অনেকে এই পথে উড়ে নাম ক'রেছেন। মেয়েদের মধ্যে নিউজীল্যাণ্ডের জীয়েন্ ব্যাটেন্ নতুন রেকর্ড্ ক'রেছেন, ১৫ দিন ২৫ ঘণ্টা ২৩ মিনিটে এই পথটী উড়ে গিয়ে। একা উড়ে যাবার রেকর্ড্ স্যার্ চার্ল্‌স্ কিংস্‌ফোর্ড-স্মিথের, — ৭ দিন ৪ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট্। কিন্তু সব চেয়ে কম সময়ে ইংল্যাণ্ড্ থেকে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছেছিলেন চার্ল্‌স্ উল্‌ম এবং তাঁর তিনটী সঙ্গী—গত বৎসর অক্টোবর মাসে, ৬ দিন ১৭ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে।

মিঃ ক্যাম্‌বেল্ ব্ল্যাক্ মিঃ সি, স্কট্
(এঁরাই এয়ার রেসে প্রথম হয়েছেন)

এবার দৌড়ের পাল্লা একটু লম্বা, প্রায় ১১৩০০ মাইল, লণ্ডন থেকে মেলবর্ণ্। ঠিক্ লণ্ডন থেকে নয়, লণ্ডনের প্রায় ষাট মাইল উত্তর-পূর্ব্বে সাফোক্ জেলার মিল্‌ডেন্‌হল্ গ্রাম থেকে রওনা হ'তে হ'য়েছিল। আর মেলবর্ণ্ যে অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের প্রধান সহর তা' আর নিশ্চয় তোমাদের ব'লে দিতে হ'বে না। এবার ভিক্টোরিয়ার শতবার্ষিকী উৎসবের খুব ধুমধাম। সেই উপলক্ষেই এই ওড়া-

দৌড় হ'ল। দৌড় একটা হ'লেও আসলে এর মধ্যে দু'টো ভাগ ছিল—চ্যাম্পিয়ন্-শিপ্ রেস্ আর হ্যাণ্ডিক্যাপ্ রেস্। দু'টোর পথ ছিল আলাদা আলাদা। প্রথমটায় যা'রা যোগ দেবে তা'দের পথে বাগ্দাদ্, এলাহাবাদ, সিঙ্গাপুর, পোর্ট ডারউইন্ এবং চার্লভিল্ হ'য়ে মেলবর্ণের ফ্লেমিংটন্ রেস্কোর্সে পৌঁছাতে হবে। দ্বিতীয়টায় মার্সেল্স্, রোম, এথেন্স্ প্রভৃতি হ'য়ে পথটা একটু বড়। প্রাইজ্ হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্-শিপ্ রেসে যে প্রথম হবে তার জন্য প্রায় সাত হাজার টাকা দামের একটী সোনার কাপ্ এবং এক লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা; আর যে দ্বিতীয় হবে সে পাবে বিশ হাজার টাকা। হ্যাণ্ডিক্যাপ্ রেসে চল্লিশ হাজার টাকার প্রাইজ্ দেবার কথা। সমস্তটাই দিয়েছেন মেলবর্ণের এক ব্যবসায়ী, স্যার্ ম্যাক্কার্সন্ ররার্টসন্।

এলাহাবাদ পড়েছিল ঠিক মধ্যপথে। এলাহাবাদের এরোপ্লেনের মাঠ হ'য়েছিল বাম্রৌলি গ্রামে। সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যে অফিস্, বাড়ী, রাস্তা, তাঁবু, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ্ অফিস্ তৈরী হ'য়ে গেল। নানা জায়গা থেকে নানা রকম লোক এসে পড়তে লাগ্ল এয়ার রেস্ দেখবার জন্য। যে সব এরোপ্লেন আস্বে তা'দের জন্য পেট্রোলের ব্যবস্থা, আলোর আয়োজন, আরোহী ও চালকদের খাবার, থাক্বার বন্দোবস্ত, কিছুরই ত্রুটী ছিল না। করাচী, যোধপুর, কল্কাতা (দমদম্), আকিয়াব এবং রেঙ্গুনেও হ্যাণ্ডিক্যাপ্ রেসের জন্য ঐ রকম আয়োজন হ'য়েছিল।

গোড়ার দিকে চৌষট্টিখানা এরোপ্লেনের নাম পাওয়া যায়। তার পর নানা কারণে, বিশেষতঃ খরচ অত্যন্ত বেশী হওয়ায়, ক্রমে একুশখানাতে এসে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের লোক গোড়ায় একজন নাম দিয়ে থাকলেও শেষটায় আর কেউ ছিলেন না। ইটালী আর ফ্রান্স্ শেষ পর্য্যন্ত যোগ দিল না। আর একটু দুঃখের বিষয় এই যে বিখ্যাত বৈমানিক কিংস্ফোর্ড-স্মিথ্ এবং পোষ্ট্ দু'জনেই নাম দিয়েও তুলে নেন। কিংস্ফোর্ড্-স্মিথের কথা আগেই বলেছি। পোষ্ট্ একজন আমেরিক্যান্, যিনি সব চেয়ে কম সময়ে এরোপ্লেনে পৃথিবী ঘুরে আসেন—৭ দিন ১৮ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটে। গ্রেট্ ব্রিটেন, আমেরিকা, আয়ার্ল্যাণ্ড্, হল্যাণ্ড্, ডেন্মার্ক, নিউজীল্যাণ্ড্ এবং অষ্ট্রেলিয়ার এরোপ্লেন যোগ দেবে ঠিক ছিল, কিন্তু ছাড়বার কিছু আগেই

আইরিশ্ প্লেনের চালক কর্ণেল কিট্জ্-মরিস্ একটু গোলমাল হওয়াতে নিজের নাম কেটে নেন। তবে রইল কুড়িখানা। কেবলমাত্র চ্যাম্পিয়ন্শিপ্ রেসে নাম দিয়েছিলেন চারজন, শেষ পর্য্যন্ত মোটে দু'খানা এরোপ্লেন রইল, একখানা আমেরিকান্—টার্ণার এবং প্যাংবর্ণ্ পরিচালিত, অন্যখানা হল্যাণ্ডের,—আষ্টেন্স্ এবং জাইমেন্ডর্ফার যার চালক ছিলেন। অপরগুলির হয় শুধু হ্যাণ্ডিক্যাপ্ রেসে নয় দু'টোতেই নাম দেওয়া ছিল।

২০শে অক্টোবর শনিবার ভোর সাড়ে ছ'টায় ওড়া সুরু হয়। বিলেতে ভোর সাড়ে ছ'টা মানে আমাদের ঠিক দুপুর বারটা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ টাইম্, অথবা কল্কাতার ১২টা বেজে চব্বিশ মিনিট্। পঞ্চাশ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। ষ্টার্ট্ দেন লণ্ডনের মেয়র। লটারী ক'রে ঠিক করা হয় কা'র আগে কে ছাড়বে। প্রথম ছাড়েন জেম্স্ ও এমি মলিসন্, স্বামীস্ত্রী। যে এমি জনসনের নাম আগেই বলেছি, তিনিই জেম্স্ মলিসন্কে বিবাহ ক'রে এখন এমি মলিসন্ হ'য়েছেন। এঁদের ওপরেই সবার আশা ছিল যে এঁরাই এই রেসে প্রথম হবেন। তাঁদের নিজেদেরও খুব দৃঢ় ধারণা ছিল তাই। তাঁদের প্লেন "ব্ল্যাক্ ম্যাজিক্" সবার আগেই এসে ভারতবর্ষে পৌঁছেছিল—রবিবার বেলা ১০-১৫ মিনিটে, অর্থাৎ বিলেতের সময় ধরে হিসেব কর্লে ২২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে করাচী থেকে রওনা হ'য়েই তাঁরা দেখেন যে তাঁদের প্লেনের একটু মেরামত দরকার; তাই আধার তাঁদের

উপরে—পারমেন্টিয়ার ও মলের এরোপ্লেন্ (২য় হয়েছে)।
নীচে—টার্ণার ও প্যাংবর্ণের এরোপ্লেন্ (৩য় হয়েছে)।

করাচীতেই মেরামতের জন্য ফিরে আস্‌তে হয়। এতে তাঁদের প্রায় বারো ঘণ্টা দেরী হ'য়ে যায়। এলাহাবাদে এসে দেখা যায় যে তাঁদের এরোপ্লেন যে ভাবে বিকল হ'য়েছে তা'তে আর এ রেসে যোগ দেবার আশা নেই। এতে সবাই দুঃখিত।

প্রথম হ'য়েছেন যাঁরা তাঁরা স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোক। তাঁদের নাম স্কট্ এবং ক্যাম্‌বেল্ ব্ল্যাক্। বাগ্‌দাদে এবং করাচীতে প্রথম পৌঁছান মলিসন্‌রা, দ্বিতীয় আসেন এঁরা। মলিসন্‌দের এই দুর্ঘটনা হ'বার পর এঁদের 'প্লেন "Grosvenor House" এলাহাবাদে (বাম্‌রৌলি) আসে সবার আগে, রবিবার দুপুরে, সাড়ে ছাব্বিশ ঘণ্টার একটু বেশী সময়ে। বেলা তখন দু'টো বেজে চল্লিশ মিনিট্। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করবার পরই তাঁদের এরোপ্লেন ঠিক তিনটে পঞ্চাশ মিনিটের সময় রওনা হ'য়ে যায়। এবার সোজা সিঙ্গাপুর, ২২০০ মাইল। বঙ্গোপসাগর ও ভারত-মহাসাগর কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে সিঙ্গাপুর পৌঁছতে তাঁদের সাড়ে বারো ঘণ্টা লাগে। সিঙ্গাপুর থেকে পোর্ট ডারউইন্ পৌঁছোন সোমবার ১১টা (বিলেতের সময়), ২১০০ মাইল পাড়ি দিয়ে। সেখান থেকে ১৪০০ মাইল চার্ল্‌ভিল্ যেতে লাগে আরও সাড়ে এগার ঘণ্টা। কলে একটু দোষ হওয়াতে সওয়া দু' ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে শেষ ৭৫০ মাইল প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টায় এসে মঙ্গলবার মেলবর্ণ্ পৌঁছান। তখন ভোর ৫টা ৩৪ মিনিট, বিলেতের হিসেবে। আর আমাদের কল্‌কাতার হিসেবে তখন বেলা ১১টা বেজে ২৮ মিনিট্। আগেই ব'লেছি যে মিল্‌ডেন্‌হল্ থেকে রওনা হওয়ার সময় সব এক সঙ্গে না হ'য়ে একে একে উঠ্‌তে থাকে। সাড়ে ছ'টায় ঠিক প্রথমখানা রওনা হয়। এঁরা ছাড়েন পাঁচ জনের পর। কাজেই সে হিসেব কর্‌লে দেখা যায় যে ৭০ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট্ ৫০ সেকেণ্ডে এই ১১৩০০ মাইল তাঁরা উড়ে আসেন। চার্ল্‌স্ উল্‌মের যে রেকর্ডের কথা বলেছি তা'র অর্দ্ধেকেরও কম সময়ে তাদের চেয়ে বেশী পথ স্কট্ ও ক্যাম্‌বেল্ ব্ল্যাক্ অতিক্রম করেন। এর পরে কি হ'ল তা' বুঝে নাও। কত লোক যে এসেছিল, কত যে হৈ-হৈ হ'ল এবং কি করে তাঁদের সম্মানিত করা হ'ল তা' বল্‌বার নয়। স্কট্ ও ব্ল্যাক্ যখন নামেন তখন নাকি কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা কানে কিছুই শুন্‌তে পান নি, কানে এমন তালা লেগে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় এসেছেন পার্‌মেন্টিয়ার এবং মল্। এঁরা ডাচ্‌ম্যান্, অর্থাৎ হল্যাণ্ড্ দেশের লোক। স্কট্ ও ব্ল্যাকের প্লেন এক দমে যতটা যেতে পারে এঁদের প্লেনে ততটা যাওয়ার বন্দোবস্ত না থাকায় এঁরা অনেকটা ঘুরে আস্‌তে বাধ্য হ'য়েছেন, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে মেল্‌বর্ণ্ থেকে ১৬০ মাইল মাত্র দূরে এসে পথ হারিয়ে ফেলেন। তবুও তাঁদের পক্ষে দ্বিতীয় হওয়া খুব কৃতিত্বের বিষয়। এঁরা হ্যাণ্ডিক্যাপের ১ম পুরস্কার নিয়েছেন। তৃতীয় এসেছেন আমেরিকান্‌রা,—টার্ণার ও প্যাংবর্ণ্।

দু'টো খুব শোচনীয় ব্যাপারও হ'য়ে গেছে। আষ্টেস্ ও জাইসেনডর্ফারের ডাচ্ প্লেনখানা এলাহাবাদ থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে একটা আলোতে চালকের চোখে ধাঁধা লাগে এবং তা'তে ধাক্কা লেগে প'ড়ে গিয়ে আগুন ধরে যায় ও অল্পক্ষণের ভেতর পুড়ে যায়। চালকেরা দু'জন বেঁচে গেছেন কিন্তু অন্যান্য লোক আহত হ'য়েছে। এর চেয়ে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে ইটালীর সান্ জার্‌ভাসিও নামক জায়গায়। সেখান দিয়ে উড়ে যাবার সময় গিল্‌ম্যান্ ও বেন্‌সের এরোপ্লেন-খানা প্রায় পৌনে এক মাইল উঁচু থেকে পড়ে যেতে থাকে এবং হঠাৎ আগুন ধরে যায়। কেউ রক্ষা করতে আসবার আগেই লোকজনশুদ্ধ সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।

বাকী যাঁদের কথা বলা হ'ল না তাঁরা কেউ কেউ নানা দুর্ঘটনায় পড়ে রেস্ ছেড়ে দেশে ফিরেছেন, কেউ কেউ বা আস্তে আস্তে অষ্ট্রেলিয়ার দিকেই গেছেন।

তিন দিনেরও কম সময়ে সাড়ে এগার হাজার মাইল যাবার কথা শুনে তোমাদের কি মনে হচ্ছে না যে অভিধান থেকে 'দূরত্ব' কথাটা আস্তে আস্তে উঠে যাবার যোগাড় হ'য়েছে? এখন ইচ্ছে কর্‌লেই হাজার হাজার মাইল দূরের কথা টেলিফোনে বা বেতারে শোনা যাচ্ছে, আর বহু দূরের দৃশ্যও টেলিস্কোপে বা টেলি-ভিশনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। এমন দিনও কি আস্‌ছে যখন ইচ্ছে হওয়া মাত্রই হাজার হাজার মাইল চলে যাওয়াও যাবে?

আগামী মাঘ মাস হইতে একখানি **নূতন ধারাবাহিক উপন্যাস** রামধনুতে বাহির হইবে।

পাথর-কুচির অভিযান

(শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী)

কল্‌কাতার সরু গলি, পাথরের খোয়া দিয়ে বাঁধান। অহরহঃ লোক চল্‌ছে তার বুকের উপর দিয়ে—কেউ চলেছে খালি পায়ে, কেউ যাচ্ছে জুতো মস্‌মসিয়ে; গাড়ী চলেছে হরেক রকমের—মানুষের টানা রিক্‌সা—মোষে টানা ভারী মালের গাড়ী—ট্যাক্সি—ঘোড়ার গাড়ী—দালান-কাঁপান মোটর বাস্—মোটর লরি।

সেদিন সকাল বেলা জোরে ছুটছিল একখানা ছ্যাকরা গাড়ী সেই গলির ভিতর দিয়ে। হঠাৎ চাকার ঠোক্কর লাগ্‌তেই একখানা পাথর-কুচি আল্‌গা হয়ে গেল। তখন সে মাথা উঁচু করে জেগে উঠে চারদিক্‌টা একবার দেখে নিলে। সব দিকে যেন ঐশ্বর্য্যের বান ছুটছে—কত বড় বড় বাড়ী আকাশে মাথা তুলে আছে—নীল আকাশটাকে শুধু ফাঁকে ফাঁকে আব্‌ছা দেখা যায়। ঐ জানালার ভিতর দিয়ে একটা ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে, কি পরিপাটী সাজান। ও নিশ্চয় রাজ-বাড়ীই হ'বে, নইলে ঘরের ভিতর যে খেল্‌ছে ঐ ছোট্ট মেয়েটী—তার গায়েও অত গয়না কেন? ওর গলার লকেটে যে হীরাটি ঝল্‌ছে—তা থেকে একটা দীপ্তি ঠিক্‌রে পড়ে চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছে। পাথর-কুচিটি ভাব্‌তে লাগ্‌ল—"পাহাড়ের তলায় যখন আমরা জড় হয়ে ছিলাম তখন ঐ হীরাটাই না আমার কোল ঘেঁষে বসে কত গল্প কর্‌ত—আমায় দাদা বলে ডাক্‌ত। আজ ও রাজকন্যার গলায়, আমিই বা এখানে থাকি কেন?" তার চারধারে একবার দৃষ্টি পড়্‌তেই তখন সে নাক সিঁট্‌কিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "মাগো! কি নোংরা এরা সব! ধুলো, কাদা-গোবরের মধ্যে সব ঘেঁষাঘেঁষি করে উপুড় হয়ে সুখে বসে আছে। কি ছোটলোকের মেলা এই সব রাস্তায়!" রাস্তায় আর যত সব পাথর-কুচি ছিল তারা তার কথা শুনে অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

পাথর-কুচিটি তখন আবার ভাব্‌লে, "থাক্‌ব না আমি এই ছোটলোকদের সঙ্গে এখানে ধুলোয় ভিড় করে। আমি সারা পৃথিবী ঘুরে রাজবাড়ীতে আমার ঠাঁই

করে নেব। আমিও বনিয়াদী বংশের ছেলে—হীরা, মরকতের চেয়ে কম কিসে?"

এমন সময়ে এক ভিখারীর ছেলে যাচ্ছিল সেই রাস্তা দিয়ে; সে আনমনে পাথর-কুচিটা কুড়িয়ে নিলে। পাথর-কুচি তখন ভাবলে, "আমি পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলাম—এইবার আমার ভ্রমণ সুরু হ'ল"।

ছেলেটা দু'-চার পা যেতেই তার কি খেয়াল হ'ল—সে পাথর-কুচিটা উপর দিকে ছুঁড়ে মার্‌লে। পাথর-কুচির গর্ব্বে বুক ভরে উঠ্‌ল, সে ভাব্‌ল, দেখা যাক্, স্বর্গের দেবতাদের মাথার মুকুটমণি হওয়া যায় কিনা।

স্বর্গে সে গেল না। বন্ বন্ করে ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পড়্‌ল সেই রাজ-বাড়ীর মত প্রকাণ্ড দালানের জান্‌লার শার্সির উপর। ঝন্ ঝন্ করে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল কাচের শার্সি, তার পর শত খণ্ড হয়ে নীচে মাটিতে পড়্‌তে পড়্‌তে গর্জ্জে উঠ্‌ল, "হতভাগা! কি কর্‌লি দেখ্ ত?" "পথ থেকে সরে দাঁড়ালেই ত পারতে বাপু। কেউ আমার পথ আটকে দাঁড়াবে এ আমার মোটেই সহ্য হয় না। তোমার এত হিংসা কেন বাপু, আমার উন্নতির পথ আট্‌কে দাঁড়াবে?" তারপর আর বাক্যব্যয় না করে পাথর-কুচি ধপ্ করে এসে পড়্‌ল ধবধবে নরম বিছানার উপর।

ঘরের ভিতর পাতা ছিল জমিদার বাবুর সাহেব-বাড়ী থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরী বিছানা। সে বিছানায় গড়াতে গড়াতে পাথর-কুচি ভাব্‌ল, "একটুখানি এলাম—তবু হেঁটে আসি নি, তাতে কত ক্লান্তই না হয়ে পড়্‌লাম। যাক্, বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক্। আঃ, কি আরাম!"

এমন সময়ে জমিদারের ছোট্ট মেয়েটী সেখানে ছুটে এল। জান্‌লার ফাঁক দিয়ে পাথর-কুচি একে দেখেই রাজকন্যা বলে মনে করেছিল। সে ছুটে এসে বিছা-নায় পাথর-কুচিটা দেখেই তাকে কুড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধর্‌ল। তার কী আনন্দ, সে বিছানায় বসে বসে তাকে নিয়ে খেল্‌তে লাগ্‌ল। পাথর-কুচি ভাব্‌ল, "এবার নিশ্চয়ই আমার রাজমুকুটে স্থান হ'বে।"

একটু পরে জমিদারের চাকর ঘরে ঢুক্‌ল। বিছানার উপর বসে রাস্তার পাথর-কুচি নিয়ে খুকী খেল্‌ছে দেখে তার মহা রাগ হয়ে গেল। সে চোখ রাঙ্গিয়ে

বল্‌লে, "তুমি বিছানা নোংরা কর্‌ছ খুকু—এটা ভারী অন্যায়, শীগ্‌গির ফেলে দাও বল্‌ছি, ফেলে দাও।" খুকু ভীত হ'য়ে পাথর-কুচিটা বুকের কাছে লুকিয়ে নিল। তখন চাকর এসে খুকুর হাত থেকে পাথর-কুচি ছিনিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে দিল দূরে ছুঁড়ে।

পাথর-কুচি ঠোঁট বেঁকিয়ে মনে মনে বিড়্ বিড়্ করতে লাগ্‌ল, "বেটা নেহাৎ চাকর—ও কি বুঝবে দামী পাথরের কদর!" তারপর খোয়া-বাঁধান রাস্তার উপর পাথর-কুচি আবার আছাড় খেয়ে পড়্‌ল—ঠং!

আশ-পাশের খোয়াগুলি চম্‌কে উঠে তার পানে তাকাতে লাগ্‌ল। পাথর-কুচি গিয়ে তাদের গা ঘেঁষে বসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কেমন আছ ভাই? তোমাদের সব খবর ভাল ত? এই একটা মস্ত বড় দালানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এ সব রাজা-রাজড়া বড়লোকদের কথা ছেড়েই দাও। ওদের অত সব ওমরী চাল আমার মোটেই পছন্দ হয় না। আমরা গরীব আছি, আমাদের গরীবী চালই ভাল। ওরা বড় মানুষ—আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ—ওরা থাক্‌লেও বা কি না থাক্‌লেও বা কি? আমরা, যারা মাটীতে বুক দিয়ে ছুনিয়া রেখেছি—আমাদের না হ'লে একটি দিনও কারও চল্‌বে না; তাই তো সব সময়ে সাধারণের জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। তোমাদের কথা মনে পড়্‌তেই মন কেমন করে উঠ্‌ল, তাই তোমাদের কাছে ছুটে এলাম।"

পাশের দু'-একটা খোয়া ব্যঙ্গের সুরে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল, "আহা গরীবের বাড়ীতে এসেছেন—কৃতার্থ করেছেন আমাদের। পাদ্য আন, অর্ঘ্য আন"। এমন সময়ে হুহু করে ছুটে এসে একখানা ট্যাক্সি তাদের সবার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। কারও আর বল্‌বার বা শুনবার অবসর রইল না; উপরে জাগা পাথর-কুচি চাকার চাপে আবার মাটীতে ঢুকে গিয়ে সকলের গা ঘেঁষে বসে সবার সমান হয়ে রইল। *

* একটি রাশিয়ান্ গল্পের ভাব অবলম্বনে।

নূতন খবর

রামধনুর পাঠক-পাঠিকারা আমাদের বিজয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। এবার বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা চিঠিতে তাঁদের প্রিয় রামধনুকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়াছেন, আমরা রামধনুর তরফ হইতে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

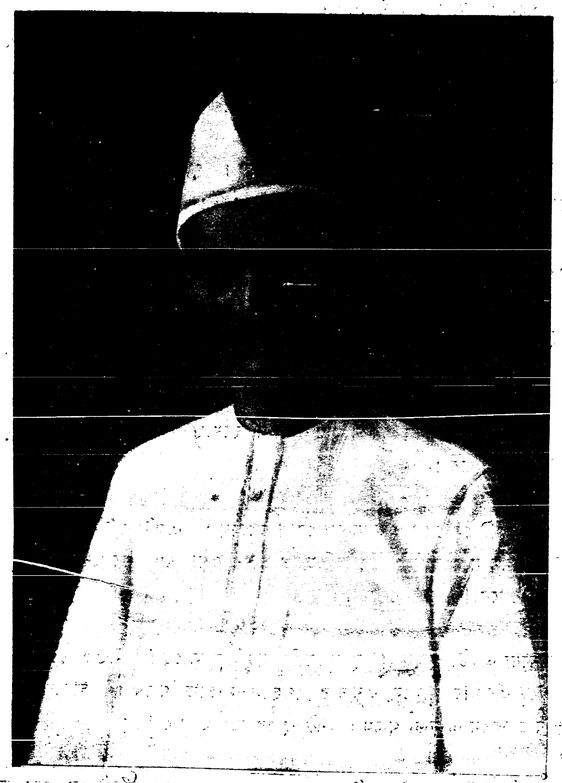

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

এবার বোম্বাই সহরে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন বিহারের সুবিখ্যাত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত নরীম্যান্। যেখানে সভা বসিয়াছিল সেই জায়গাটার নাম সীমান্ত-গান্ধী আব্দুল গফুর খাঁর নামানুসারে 'আব্দুল গফুর নগর' রাখা হইয়াছিল। আগামী বারের কংগ্রেস লক্ষ্ণৌতে হইবে।

রাঃ সঃ

* * *

তোমরা জান অস্ত্রোপচারের সময়ে

রোগীকে অজ্ঞান করতে হলে ক্লোরোফর্ম দিয়ে করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর বৈজ্ঞানিকেরা 'এভিপান' নামে এক রকম জিনিষ রোগীর গায়ে ইন্‌জেক্‌শান্ করছেন, তাতে রোগী আধ ঘণ্টার মধ্যেই অসাড় হয়ে পড়ে। আর সেই ফাঁকে—

* * *

প্রথম যখন ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে 'চা' যায় তখন এক-এক পাউণ্ড ওজনের চা দশ পাউণ্ডে বিক্রী হয়েছিল।

* * *

প্রত্যেক ইংরাজ নাকি গড়ে প্রত্যহ ছয় কাপ্ চা পান করে। পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় তারাই সব চেয়ে বেশী চা-খোর জাত। চীনদেশে প্রতি বছর প্রায় ১১২৫০০০০ মণ চা উৎপন্ন হচ্ছে।

* * *

বৃটীশ মিউজিয়ামে ২২০০ রকম ভাষায় লিখিত বাইবেল সংগ্রহ করা আছে।

* * *

বৃটেনে প্রতি বছর শুধু খাওয়ার জন্য সাতশ' কোটি ডিম খরচ হয়।

শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

* * *

বিলাতের ওয়েষ্ট্‌লীতে একটা পুকুরে এমন একটা যন্ত্র বসান হয়েছে যা'তে জল আপনা-আপনি চার ঘণ্টা অন্তর ফিল্‌টার হয়ে যাবে।

* * *

ডোনাল্ড্ ব্যাম্‌বেল্ নামে একটি লোকের এক অদ্ভুত রোগ হয়েছে। একটা দুর্ঘটনার পর থেকে তার দেহযন্ত্রে কি একটা গোলমাল হয়েছে যে সে অবিশ্রান্ত ভাবে কথা বলে চলেছে, চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না। ডাক্তারেরা ঘাবড়ে গেছেন।

* * *

নিউ গিনির লোকেদের মধ্যে একটা সুন্দর (?) নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত আছে। নর্ত্তক দু'জন পরস্পরের নাকে তালা-চাবি এঁটে একবার সামনে, একবার পেছনে নাচতে থাকে। অবশেষে দু'জনে যখন বেহুঁস হয়ে পড়ে যায় তখন এ নৃত্য থামে। কী সুন্দর নাচ তার দেখি!

* * *

সম্প্রতি মালয় উপদ্বীপে ৪৩টা অতিকায় গিরগিটি ধরা পড়েছে। এরা প্রায় ১০ ফিট্ লম্বা এবং মাংসভুক্। দু'জন সাহেব অনেক কষ্টে এদের ধরেন। এর মধ্যে কতকগুলোকে নিউইয়র্কে

পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে এখনও যে অতিকায় জীব বাস করে, এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

* * *

বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মস্তিষ্ক ওজনে কম। অবশ্য তাই বলে এটা মনে করবার কোনও দরকার নেই যে মেয়েরা কম বুদ্ধিমতী।

* * *

হলিউডে শিরলী টেম্পল নামে একজন আড়াই বছরের অভিনেত্রী আছে। এই আড়াই বছর বয়সেই সে অভিনয় করে অদ্ভুত!

শ্রীঅতুলানন্দ দাশগুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

বার্ষিক শিশুসাথী—নবম বর্ষ, ১৩৪১। সম্পাদক শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

সুবিনয় বাবু শিশু-সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁর নিপুণ সম্পাদনায় এবারকার বার্ষিক শিশুসাথী সত্যই শিশুদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে। বহু প্রসিদ্ধ লেখকের লেখা—শুধু গল্প-কবিতা নয়, নানা রকম জানিবার বিষয়ে পত্রিকাখানি ভরপূর। সেই সঙ্গে সুনিপুণ শিল্পী শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আঁকা ছবিগুলিও পত্রিকাখানির সৌষ্ঠব অনেকখানি বাড়াইয়াছে। লেখা, ছাপা, কাগজ, ছবি—সব দিক্ দিয়াই বইখানি ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার মত।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

প্রিয় রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ,

আমি একটি গল্প-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছি। প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে একটি স্বর্ণপদক। গল্পটি তিন থেকে সাত পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া চাই। কাগজের এক দিকে লিখে ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে।—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশ গুপ্ত, ১৫নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। (এই প্রতিযোগিতার জন্য রামধনু-সম্পাদক কোন রকম দায়ী নন।)

আশ্বিনমাসের ধাঁধার উত্তর

(১) বল (২) রায় (৩) চন্দ্র (৪) ভদ্র (৫) সোম (৬) পাঠক (৭) সিংহ

উত্তরদাতাদের নাম স্থানাভাব বশতঃ এবারেও দেওয়া সম্ভব হইল না। উহা আগামী সংখ্যায় অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। আশা করি গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

কার্ত্তিক মাসের প্রশ্নের উত্তর

(১) পেন্সিল (২) শঙ্খ (৩) কাগজ কিংবা গ্রামোফোন-রেকর্ড্।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

সুধীর কুণ্ডু, মেজমামা, শোভা প্রভৃতি (ফরিদপুর); সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাগলপুর); সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রীচি রোড্); গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য (রামপুরহাট)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

অধীররঞ্জন দে, ভোলা, ভানু প্রভৃতি (বর্দ্ধমান); নিখিল চৌধুরী (নওগাঁ); রামপ্রসাদ, কাটু, শিবশঙ্কর প্রভৃতি (বেহালা); মাখন চন্দ্র বাগচী, অজয় তারা প্রভৃতি (লক্ষ্মণপুর); নারায়ণ, সোম, শৈলেন (নডিহা—পুরুলিয়া); শশাঙ্কশেখর বসু (বেহালা); অশোকরঞ্জন দত্ত (সিংরেল); সভ্যবৃন্দ, পূর্ণচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার (পানিহাটি); কেরামউদ্দীন আহমদ (রাণীনগর); আজিজ, সন্তোষ, ভূপেন (নলহাটী); প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ); দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর); কিরণ, সুধাংশু, বিনয় গুপ্ত (শ্রীরামপুর); রহিম, নূর, মফিজ প্রভৃতি (তাহিরপুর); চিলমারী বি, এম্, ভি স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (চিলমারী); প্রাণদানন্দ, আরতি, অনিল প্রভৃতি (কলিকাতা); সন্তোষ বসু ও অরুণা দে (রাণাঘাট)।

নূতন প্রশ্ন

ভাই রামধনু,

সেদিন রাত্রে এক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখলাম। দেখলাম, আমার টেবিলের ওপর সাদা ধবধবে এক মূর্ত্তি,—তার মাথা থেকে, ঠিক পরীদের মাথায় যেমনি থাকে, তেমনি ছটা বেরুচ্ছে। মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রইল, আমি অবাক্ হয়ে দেখতে লাগ্লাম। ঘণ্টা কয়েক পরে দেখি, ওমা, কোথায় সে মূর্ত্তি! আস্তে আস্তে কখন মিলিয়ে গেছে! ভাই রামধনু, তোমার গ্রাহকদের কেউ কি আমায় বলতে পারে কার মূর্ত্তি সেটা?—ইতি তোমার বন্ধু।

রামধনু—

নির্ভর

৭ম বর্ষ | পৌষ, ১৩৪১ | ১২শ সংখ্যা

হেমন্ত-ভোরে

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

মাঠের সোনার হরষখানি
হেমন্তে আজ উঠ্‌ল ঝলি',
কার বাঁশীতে উঠ্‌ল ফুটে
শিশির ফুলের উজল কলি!
কৃষাণ ছেলে আল পথে যায়
সোনা ধানের আঁটি মাথায়—
হিম-ঢাকা দূর আব্‌ছা দেশে
মন আজি যায় কোথায় চলি!

মা মাছ কুট্‌তে কুট্‌তে চাকর মালিয়াকে ডেকে বল্লেন, "মালিয়া, ডাক্ তো মিনুকে, এ বালাই এসে পড়েছে, নিয়ে যাক্ মিনু।"

মালিয়াকে আর ডাকতে হ'ল না। কথাটা মিনুর কানে পৌঁছেছে, মিনু ছুটে নীচে চলে এল। মিনুর মা দু-তিন বার হাত দিয়ে আদুরীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আদুরী কিছুতেই মান্‌তে চায় না—সে যেন মাছের ওপর লাফিয়ে পড়বে এই ভাবটা। মিনুর মা পাঁশের হাতাটা তুলে দিলেন বেড়ালটার পিঠের ওপর সজোরে এক ঘা বসিয়ে।

এতক্ষণে মিনু নীচে এসে পড়েছে; আর তার চোখে পড়েছে যে আদুরী মার খেয়েছে। বেড়ালের লেগেছিল কতটা তা ঠিক জানা নেই কিন্তু মিনুর চোখ জলে ভ'রে উঠ্‌ল।

মা চেঁচিয়ে বল্লেন, "মিনু, তোর বেড়াল নিয়ে গিয়ে ওপরে ঐ বড় টুক্‌রি চাপা দিয়ে রাখ্‌গে। জ্বালাতন করে মার্‌লে, রোজ এই মাছ কোট্‌বার সময় কোথা থেকে পোড়ারমুখী এসে অধিষ্ঠান হবে তার ঠিক নেই।" বেড়ালটা মিনুকে দেখে জিভ চাট্‌তে চাট্‌তে ডেকে উঠ্‌ল, "ম্যাও—ম্যাও"। কথাটা বোধ হচ্ছে এই—"আমি মার খেয়েছি, দেখ্‌ছ কি?" মিনু বেড়ালকে কোলে তুলে নিয়ে বল্লে, "কোথায় গিয়েছিলি আদুরী?" আদুরী বল্লে, "ম্যায়াও—" মিনু বল্লে, "মা মেরেছে, বড্ড বুঝি লেগেছে, না? জানিস্ ত মার কাজের সময় গোলমাল করলে মা বড্ড রেগে যান। আমাকেও তোর সাম্‌নে কত মেরেছেন—সেই সেদিনকে—"

মিনু অনেকটা ওপরে উঠে পড়েছিল, এমন সময় শুন্‌তে পেল মা মালিয়াকে বল্‌ছেন, "দেখ্ মালিয়া, তুই যখন কাল বাজারে যাবি তখন বেড়ালটাকেও ঝুড়ির ভেতর করে নিয়ে গিয়ে বাজারের পথে ছেড়ে দিবি; বুঝ্‌লি ত?" কথাটা মিনুর কানে যাওয়া অবধি মিনু দিশেহারা হ'য়ে গেল। বেড়ালটাকে জোর করে এমন ভাবে বুকের কাছে আঁক্‌ড়ে ধর্‌লে যেন এক্ষুণি ওর কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে এসেছে। মিনু বল্লে, "শুনেছিস্ আদুরী, মা বল্‌ছে তোকে বাজারের পথে ফেলে দিয়ে আস্‌বে। কখনই তা' হ'তে দেব না, স্কুলে যাবার সময় তোকে আমার বাক্সে বন্ধ করে রাখ্‌ব, কেমন?"

বইগুলির সাম্‌নে বেড়ালটাকে বসিয়ে রেখে বল্লে, "চুরি করে খাস্ নি আদুরী, আর দুষ্টামী করিস্ নি, তা হ'লেই মা তোকে কিছু বল্‌বেন না। আচ্ছা আদুরী, তুই এখানে বস্, আমি মাকে আর মালিয়াকে বুঝিয়ে আসি, কেমন?"

মিনু অতি সন্তর্পণে পুতুলের পুঁতির মালার ছোট্ট একটা কৌটো খুলে তার ভেতর থেকে বহু দিনকার জমান চারটে পয়সা বার করে নিয়ে নীচে নেমে এল। ইচ্ছেটা মালিয়াকে ঘুষ দিয়ে যদি আদুরীকে রক্ষা কর্‌তে পারে, তবে মন্দ কি। আর এ রকম সে অনেক বার দিয়ে কাজ হাসিল করেছেও। মালিয়ার হাতে পয়সা ক'টা দিয়ে বল্লে, "মালিয়া, কেন দিলুম জানিস্ ত?" মালিয়াকে আর কিছু বলতে হ'ল না, বল্লে, "হ্যাঁ দিদিমণি, কক্ষণো তোমার আদুরীকে নিয়ে যাব না।"

তারপর মিনু চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে মার কাছে এসে বল্লে, "হ্যাঁ মা, তুমি নাকি আমার আদুরীকে বাজারে পাঠিয়ে দেবে?" মা বল্লেন, "দেবই তো, ওর জন্য মাছ, দুধ, খাবার, কিছু ঘরে রাখ্‌বার যোটি নেই।—আর দেখ্ মিনু, শীগ্‌গিরই কিন্তু তোর ডিপ্‌থিরিয়া হবে তা আমি বলে দিচ্ছি। ওটাকে হর্‌দম ঘাঁটছিস্, ওকে লেপের ভেতর না নিলে তোর শোয়া হয় না, ওকে এক দণ্ড কোল থেকে নামাবি না!"

সাত বছরের মেয়ে মিনু বল্লে, "হ্যাঁ মা, যাকে ভালবাসা যায় তাকে ঘাঁটলে কি অসুখ করে?"

মিনুর কথা শুনে মা মিনুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বল্লেন, "আচ্ছা, ওকে আমি তাড়াব না—কিন্তু তাই ব'লে তুই যেন ওকে দিন-রাত ঘাঁটিস্ নে।"

মিনু হাস্‌তে হাস্‌তে ওপরে এল। এসে দেখলে আদুরীকে যেখানে বস্‌তে বলে গিয়েছিল সেখান থেকে সে চলে গিয়েছে। "আদুরী! আদুরী!" আদুরীর দেখা নেই। খানিক পরেই নীচে থেকে মার গলার আওয়াজ এল, "হ্যাট্—হ্যাট্—দেখেছ কাণ্ডটা! রান্না-ঘরে গেছি ঢাক্‌নাটা আন্‌তে, এর ভেতরে কোথা থেকে লক্ষ্মীছাড়ী এসে এক বাটি সুজির পায়েস এঁটো ক'রে দিয়ে গেল!"

মিনু জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কি হ'ল মা?" "কি আর হবে ছাই? তোদের

আজ টিফিন বন্ধ; আমি বারে বারে আর পার্‌ব না কড়াই চড়াতে।" মিনু বল্লে, "আচ্ছা মা, আজ আমায় টিফিন দিতে হবে না।" কিন্তু ফিচু চেঁচিয়ে বল্লে, "আজ আমার টিফিন না হ'লেই চলবে না।" কাজেই সেদিন আবার মাকে ডবল্ ক'রে খাটতে হয়েছিল।

তেতালার ছাদে উঠবার সিঁড়িতে আহুরীর পাঁচটা বাচ্চা হয়েছে। তাই আজ কয়েক দিন হ'ল মিনুর কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে। স্কুল থেকে এসেই ছুটে যায়, পড়তে পড়তে উঠে যায়, মাষ্টার মশায়কে বসিয়ে রেখে এক-এক বার চুপ্ করে লুকিয়ে এসে দেখে যায়। মিনু একটা ঝুড়ির ভেতর তার একটা ছেঁড়া কাপড় বিছিয়ে বাচ্চাগুলোকে বেশ যত্ন ক'রে রেখেছে।

তার আহুরীর বাচ্চা হয়েছে সে কথা মিনু কা'কে যে না বলেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। স্কুলের মেয়েরা এ খবর অনেক দিন আগেই পেয়েছে; আবার তার ভেতরে দু-একজন বন্ধু আহুরীর বাচ্চাকে দাবী করেও বসেছে। বাড়ীতে যে চেনা লোক আসে মিনু তাকে তার শত কাজের ভেতরেও দৌড়ে এসে এ খবরটা দেয়। সেদিন সন্ধ্যে বেলা ওর এক দাদা এলেন বেড়াতে; মিনু তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার আগেই খবর দিয়েছে যে তার আহুরীর অনেকগুলি বাচ্চা হয়েছে। দাদা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "আচ্ছা মিনুমণি, তোমার তো অনেকগুলো নাতি-নাতনী হ'ল, এইবার খাওয়াটা কবে হচ্ছে বল তো?"

মিনু বল্লে, "আমার কাছে পয়সা নেই, দাদা। তুমি আমার নাতি-নাতনীর মুখ দেখে পয়সা দাও; তা হ'লে আমি তোমাকে খাওয়াব।"

দাদা কিচ্ছু বল্লেন না, শুধু ব্যাগ্‌টি খুলে একটি টাকা বার ক'রে মিনুর হাতে দিলেন। মিনু বল্লে, "কই দাদা, মুখ দেখ্‌লে না ত?" "এই নে, বেড়াল-বাচ্চার মুখ আবার কি দেখ্‌ব?" মিনু অভিমান ক'রে টাকাটা দাদাকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে যতক্ষণ না সে বাচ্চাগুলোর মুখ দেখবে ততক্ষণ সে টাকা নিতে কখনই রাজী নয়। অগত্যা দাদাকে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তেতালার ছাদে উঠে আহুরীর বাচ্চার মুখ দেখতে হয়েছিল। মিনু এক-এক করে বাচ্চাগুলোকে তুলে ধরে বল্লে, "জান দাদা,

এটার নাম 'এনাকী', এটার নাম 'মেনাকী' আর এটার নাম 'ছেনাকী'। আর দু'টো পরশু মরে গিয়েছে।"

সেবার পুজোর ছুটিতে ঠিক হ'ল মিনুরা সকলে জব্বলপুর যাবে,—তার এক মামা আছেন সেখানে। জব্বলপুরে নাকি অনেক কিছু দেখবার আছে—শ্বেত পাথরের পাহাড়, নর্ম্মদার ঝরণা—আরো কত কী! মিনুর যে কি মজাটাই হ'ল তা কি বল্‌ব! জব্বলপুর দু'দিনের পথ—এই দু'দিন সে ট্রেনে থাকবে, তারপর আরো কত রকমের জিনিষ দেখ্‌বে তার ঠিক নেই।

জিনিষপত্র কেনাকাটা হচ্ছে। দাদারা তাদের সব গুছোতে আরম্ভ করে দিয়েছে; মিনুও যে গুছোচ্ছে না এমন নয়। এই আমোদের মাঝে সহসা মিনু একটা মস্ত বড় আঘাত পেল—যখন সে তার মার কাছ থেকে শুন্‌তে পেল যে তার আহুরীকে নেওয়া হবে না—কারণ তা হ'লে অনেক খরচা পড়বে। মিনুর মন ভেঙ্গে গেল কিন্তু সে দম্‌বার মেয়ে নয়; সে মনে মনে ঠিক কর্‌ল, যে করে হোক্ তার আহুরীকে সে নেবেই।

সকাল বেলা গাড়ী বিলাসপুর ষ্টেশনে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। এইখানেই মিনুরা সকালের চা-এর পালা শেষ করলে। তারপর মিনু কি করলে জান, ওদের সঙ্গে যে সংসারের ছোট্ট ঝুড়িটা এসেছিল—সেটার মুখ খুল্‌ল। খুলতেই আহুরী ম্যাও ম্যাও করতে করতে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। মিনু চা-এর পর যে দুধটা বেঁচেছিল সেটা আহুরীর সাম্‌নে ধর্‌ল। মা, বাবা, ভাইরা,—সকলে দেখে অবাক্। গাড়ীশুদ্ধ সব লোক অবাক্ হয়ে মিনুর দিকে তাকিয়ে রইল। আরো মজা হ'ল, এর ভেতরে দরজা খুলে উঠে পড়েছে এক টিকিট-চেকার। সেবার মিনুর বাবাকে তাঁর আহুরে মেয়ের জন্য অনাবশ্যক কতকগুলো টাকা খরচ করতে হয়েছিল।

অনেকদিন পরের কথা, পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছে। ওরা সকলে অনেক দিন আগেই জব্বলপুর থেকে ফিরে এসেছে।

আহুরীর কি যে হয়েছে, কিচ্ছু খায় না, কেবল দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। আহুরী আজকাল এলিয়ে পড়ে থাকে, আগেকার মত উঠে আর খেলা করে না, লাফালাফি করে না, মাছের কাঁটা আর ভাল করে চিবোতে পারে না; আগেকার

মত মিষ্টি সুরে আর ম্যাওঁ ম্যাওঁ ক'রে ডাকেও না। মার কাছে এই কথাটা বলাতে মা বলেছিলেন, "ও বুড়ী হয়ে গেছে, এইবারে মরবে"—কথাগুলো মিনুর কাছে বিশেষ ভাল লাগে নি।

যত দিন যায় মিনুর ভাবনা তত বাড়ে; ভাবে আর একবার এ রকমটি হয়েছিল, সেবার সেরে উঠেছিল কিন্তু এবার আর বোধ হয় কিছুতেই বাঁচবে না। এনাকী, মেনাকী, ছেনাকীকে তার মা অনেক দিন আগেই বিদায় করে দিয়েছেন।

কয়েক দিন কেটে গেল, আদুরী আজ-কাল ভাল হয়ে উঠেছে। দুধ খায়, এবাড়ী-ওবাড়ী ঘুরে ফিরে বেড়ায়। মিনুর সন্দেহ দূর হয়েছে; ভাবনা ঘুচেছে।

শনিবার দিন মিনু স্কুল থেকে এসেছে; এমন সময়ে তার ছোট ভাই আধ-আধ স্বরে খবর দিলে, "দিদি, আ-দু-লী নেই!"

মিনু মনে ভাব্‌লে কোথায় চলে গিয়েছে, আবার আসবে; কতবার ত এ রকম ভাবে চলে যায়, আবার আসেও।

কিন্তু যখন সঠিক খবর পেল তার মার কাছ থেকে যে আদুরী সত্যিই নেই—সে রাস্তা পার হয়ে বাগীদের বাড়ী যাবার সময় কার যেন মোটরে চাপা পড়েছে তখন আমাদের মিনুর অবস্থাটা যে কি হয়েছিল তা তোমরা সহজেই অনুমান করতে পার। মিনুর মনে হ'ল যেন সেই মোটরটা মিনুরও বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল। মিনু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পার্‌ল না, কেঁদে ফেল্‌ল।

আদুরীর জন্য শুধু মিনু কাঁদে নি, বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই চোখের কোণা মুছ্‌তে হয়েছিল।

বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এস্‌-সি)

জালিয়াৎ, জুয়াচোর, বাটপাড় পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। সাধারণ জুয়াচোর নয়,—দস্তুরমত লেখাপড়া-জানা, শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক জুয়াচোর! তাদের অদ্ভুত দুষ্ট

বুদ্ধির কাহিনী তোমাদের কিছু দিন আগে বলিয়াছিলাম। সেই সঙ্গে বলিয়াছিলাম আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডিটেক্‌টিভ্‌দের অদ্ভুত বাহাদুরীর কথা। আজ আবার তোমাদের আর এক ধরণের পাপীর কাহিনী বলিব। এরা ঠিক জুয়াচোর নয়, বাটপাড় কিংবা ঠকও নয়, একেবারে অন্য ধরণের জীব—আরও ভয়ঙ্কর। এই বছর কয়েক হইল আমেরিকায় ইহাদের উপদ্রব ভয়ানক ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে; তবে অন্য দেশে বিশেষ শুনি নাই।

এই পাপীদের ইংরাজীতে বলা হয় 'কিড্‌ন্যাপার' (Kidnapper), আর তাদের সেই ঘৃণিত কাজকে বলা হয় 'কিড্‌ন্যাপিং'। আমরা এদের ডাকাতই বলিব—কারণ ডাকাতের সঙ্গে এদের তফাৎ খুব বেশী নাই। ইহারা করে কি জান? কোন ধনী লোককে কিংবা তার খুব প্রিয় কোন আত্মীয় (যেমন ছেলে, মেয়ে, ভাই)কে বন্দী করিয়া নানা গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখে। তার পর সেই ধনীর আত্মীয়দের কাছে অথবা আত্মীয়দের লুকাইলে সেই ধনীর কাছে উড়ো চিঠি পাঠায়—"অমুক সময়ে অমুক ভাবে এত হাজার কি এত লক্ষ টাকা রাখিয়া যাও নচেৎ—তোমার এই আত্মীয়টিকে আর জীবন্ত দেখিতে পাইবে না। অমুক দিন তা'কে হত্যা করা হইবে। আর একটা কথা, খবরদার, পুলিশে খবর দিতে যাইও না—তা' হইলেও তোমার আত্মীয়টির কপালে সেই এক গতি।"

প্রিয়জনের প্রাণের চাইতে তুচ্ছ টাকার মূল্য অনেক কম। তাই আত্মীয় বেচারারা এই নরপশুদের হাতের পুতুল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া টাকা দিয়া আসে। প্রিয়জনকে অবশ্য বেশীর ভাগই ফেরৎ পায়, তবে কখনও কখনও ফেরৎ পায়ও না। যারা সহজে টাকা দিতে চায় না এবং পুলিশের সাহায্য নেয় তাদের পক্ষে প্রায়ই আর সেই প্রিয়জনের মুখ দেখা সম্ভব হয় না। এই ত' কয়েক বছর আগে বিখ্যাত ধনী বৈমানিক লিণ্ড্‌বার্গের ছোট্ট মেয়েটিকে—তার বয়স বোধ হয় তখন বছর খানেক হইবে—এই ধরণের ডাকাতেরা ধরিয়া লইয়া গিয়া বাপের কাছে মেয়ের মুক্তির জন্য একটা বিরাট্ পরিমাণ টাকা চাহিয়া বসিল। লিণ্ড্‌বার্গ্ টাকা দিলেন, কিন্তু তা' ডাকাতদের হাতে না পৌঁছায় তারা অসহায় শিশুটিকে নিষ্ঠুর ভাবে হাতুড়ী পিটাইয়া হত্যা করিল। তখন এই ব্যাপার লইয়া খবরের

কাগজে সমস্ত পৃথিবীময় হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। শুধু ছোট ছেলে নয়, অনেক সময়ে ৬০।৭০ বছরের বুড়াদের শুদ্ধ এই ভাবে ধরিয়া লইয়া যায়। তার পর টাকা চাহিয়া পাইলে মুক্তি দেয়, না পাইলে অমানুষিক ভাবে হত্যা করে।

কিন্তু পাপকে আর কত কাল প্রশ্রয় দেওয়া যায়? পৃথিবীতে যেমন বুনো ওল আছে তেমনি বাঘা তেঁতুলও আছে। এই বাঘা তেঁতুল আর কেউ নয়, আমেরিকার বাঘা ডিটেক্‌টিভের দল। এই ধরণের পাপকে আমেরিকা হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য তাঁরা এবার নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়াছেন। সেখানকার বিচার-বিভাগের (Department of Justice) কর্ত্তা হুভার সাহেব এই ব্যাপারের সঙ্গে লড়িবার জন্য কী বিরাট্ আয়োজন করিয়াছেন তা' শুনিলে অবাক্ হইতে হয়।

আমেরিকার চোর-ডাকাতেরা স্কুলে সিন্ধুক ভাঙ্গা শিখিতেছে।

বলা বাহুল্য এই বিজ্ঞানের যুগে—বিশেষতঃ আমেরিকার মত বিজ্ঞানের দেশে সমস্ত আয়োজনই করিতে হয় বিজ্ঞানের সাহায্যে; কারণ চোর-ডাকাতেরাও সেখানে বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় সমান পটু। বিচার-বিভাগের যে নতুন প্রকাণ্ড অট্টালিকা তৈরী হইয়াছে সেখানে গেলে দেখিবে তার অনেকখানি—একটা সম্পূর্ণ তালা যুড়িয়া বসান হইয়াছে এক বিরাট্ ল্যাবরেটরী। কত রকম সেখানে

আয়োজন! আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা, বড় বড় দাগী অপরাধীর আঙ্গুলের ছাপের হিসাব রাখা—এই সবের জন্যই কত ঘরের পর ঘর রহিয়াছে। কম করিয়া পঞ্চাশ লক্ষ লোকের আঙ্গুলের ছাপ সেখানে সংগ্রহ করা আছে, এবং এর প্রত্যেকটি এমন অদ্ভুত ভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা আছে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজন মত ছাপ মিলাইয়া বাহির করা যায়।

ডাকাতেরাও কি সহজ লোক? বুদ্ধিতে তাদের সঙ্গে পারিয়া উঠা যার তার কাজ নয়। তারাও দস্তুরমত স্কুল করিয়া এই 'বড় বিদ্যা' আয়ত্ত করে। আঙ্গুলের ছাপ যাহাতে ধরা না পড়ে সে জন্য তারা কত না সতর্ক। একটা উদাহরণ দিই। একবার এক ধনীকে বন্দী করিয়া ডাকাতেরা তার স্ত্রীর কাছে একখানা চিঠি পাঠাইল। তাদেরই একজন গিয়া চিঠিখানি হাতে পৌঁছাইয়া দিল—অবশ্য অপর হাতে পিস্তল লইয়া। বন্দীর স্ত্রী দেখিল একটা বড় খামের মধ্যে আর একখানা খাম। ডাকাত তাকে ভিতরের খামটা বাহির করিয়া লইতে বলিল—তার নিজের হাত যাহাতে সে খামের গায়ে না লাগে দেখা গেল সে বিষয়ে সে ভয়ানক সতর্ক। খাম ভরিবার সময় তার গায়ে যা কিছু দাগ লাগা সম্ভব তা' সে আগেই নষ্ট করিয়া আনিয়াছিল। উপরের খামটা—যেটা ডাকাতের হাতে ছিল—সেটা সে আবার ফেরৎ লইয়া গেল।

কাজেই দেখ, শুধু আঙ্গুলের ছাপের হিসাব রাখিলেই ডিটেক্‌টিভ্‌দের চলে না—আরও বহু জিনিষের হিসাব তাঁদের রাখিতে হয়। বাজারে যত রকম কালি আছে, যত রকম কাগজ আছে, যত মেকারের টাইপ্-রাইটার আছে তাদের হিসাব, তাদের সাহায্যে লেখা হরফের নমুনা—সব তাঁদের কাছে সংগ্রহ করা থাকে। ডাকাতদের চিঠি দেখিয়া কি রকম কাগজে, কি কালিতে, কি রকম টাইপ্-রাইটারে সে চিঠি লেখা তা' তাঁরা বলিয়া দিতে পারেন। এই সব খুঁটিনাটী খবর অনেক সময়ে অপরাধীকে ধরিতে আশ্চর্য্য রকম সাহায্য করে।

শুধু লেখা বলিয়া নয়, আরও অনেক কিছুর নমুনা তাঁরা রাখেন। সবই তাঁদের সময়ে সময়ে বেশ কাজে লাগে। যেমন ধর—বাজারে যত রকম মোটর-টায়ার আছে তার ছাপ সংগ্রহ করা। এর সাহায্যে মাটীতে চাকার দাগ দেখিয়া

কি ধরণের মোটরে ডাকাতেরা আসিয়াছিল তার হদিস মিলিয়া যাইতে পারে। এই রকম আরও কত কি!

এই ব্যাপারের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রও তাঁরা আবিষ্কার করিয়াছেন বিস্তর। যেমন ধর, একটা যন্ত্র আছে—তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ কার্ড্ ভরা থাকে। সেই কার্ড্-গুলি এমন ভাবে তৈরী যে এক-এক জন দাগী আসামীর সম্পূর্ণ পরিচয় ঐ কার্ডের ভিতর সাঙ্কেতিক ভাবে পাওয়া যাইবে। ধর, টেলিফোনে খবর আসিল—অমুক জায়গায় একজন লোককে ডাকাতের দলের লোক বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। লোকটি প্রায় ছয় ফিট্ লম্বা, গায়ের রং একটু তামাটে, চিবুকটা একটু চওড়া, নাকটা একটু থ্যাবড়া। ব্যস্, অমনি এই যন্ত্র চালাইয়া দেওয়া হইল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ ধরণের আকৃতির যত লোক আছে তাদের সাঙ্কেতিক পরিচয়-পত্র (কার্ড্) লক্ষ লক্ষ কার্ডের ভিতর হইতে বাছিয়া বাহির হইয়া আসিল। এই কাজটা হাতে করিতে হইলে বোধ হয় ১৫।২০ জন লোককে সারাদিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইত।

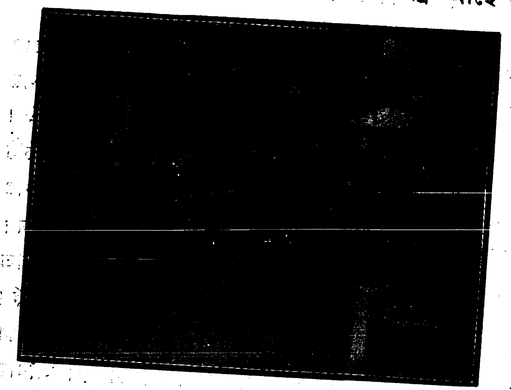

আমেরিকার পুলিশদের ক্লাস্ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

কোন একটা খবর পাইলে কিংবা ঘটনা ঘটিলে দশ মিনিটের মধ্যে যাহাতে তার সম্পূর্ণ বিবরণ ডিটেক্‌টিভ্-অফিসে পৌঁছায় দেশের সর্ব্বত্র টেলিফোনের সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, সন্দেহযুক্ত লোকেরা যখন পরস্পর কথা বলে কিংবা টেলিফোন-নম্বর চায় তখনও যাহাতে সেই কথার মধ্যে গুপ্ত ভাবে আড়ি পাতা যায় এমনধারা যন্ত্র তাঁরা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। এই ধরণের

আরও কত যন্ত্রপাতি যে তাঁদের অফিসে বসান আছে তার ফর্দ্দ দেওয়া কঠিন। কত বৈজ্ঞানিক শুধু এই লইয়া—নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন এবং তার উন্নতির জন্য দিনের পর দিন গবেষণা করিয়া চলিয়াছেন।

যে সব ডিটেক্‌টিভ্‌দের হাতে-নাতে গিয়া ডাকাত ধরিতে হয় তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাও একটা বড় ব্যাপার। তাঁদের সকলেই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত লোক—সব দিক্ দিয়া চৌকস। তার উপর তাঁদের আবার দস্তুরমত ক্লাস্ করিয়া নানা বিদ্যা শেখান হয়। নানা রকম ছদ্মবেশ, ছদ্ম চালচলন, অপরের অনুকরণ করা ইত্যাদি তো শিখিতে হয়ই, তা ছাড়া হঠাৎ যে সব বিপদ্ ঘটিতে পারে এবং সে সব স্থলে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার—ইত্যাদিও যতটা সম্ভব শিখিয়া রাখিতে হয়। ডিটেক্‌টিভ্‌দের হাত-ব্যাগের মধ্যে যে সব খুঁটি-নাটি যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক মাল-মশলা থাকে তাকে একটা ছোটখাট ল্যাবরেটরী বলা চলে।

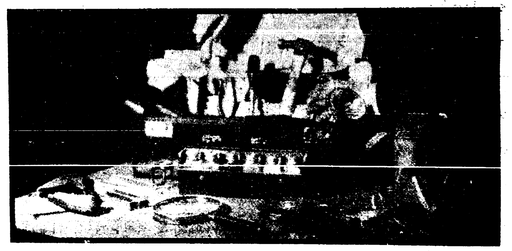

ডিটেক্‌টিভের সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বাক্স (একটা ছোটখাট ল্যাবরেটরী)

ডিটেক্‌টিভ্‌দের কার্য্যকরী ক্ষমতার এক-আধটা নমুনা দিই, শোন।—

কিছু দিন আগে ওকলাহোমা সহরে এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল। সহরের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীতে বসিয়া তাস খেলিতে-ছিলেন, হঠাৎ সেখানে পিস্তল ও মেশিন্-গান্ সমেত মুখোস-পরা কয়েকজন লোক ঢুকিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে পেটের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভদ্রলোকটিকে তাদের অনুসরণ করিতে বলিল। ঘরে আর যারা ছিল তাদের মুখও ঐ ভাবে বন্ধ করা হইল। তার পর ডাকাতেরা সেই ধনী লোকটিকে একটা সিডান্-গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বিদ্যুৎ-গতিতে বাহির হইয়া গেল। পর দিন সেই ভদ্রলোকের অন্তরঙ্গ এক

বন্ধুর কাছে এক চিঠি আসিল—"অমুক দিন দুই লক্ষ ডলারের নোট (এক ডলার প্রায় তিন টাকা) একটা চামড়ার ব্যাগে ভরিয়া অমুক ট্রেন ধরিয়া অমুক সহরে হাজির হও। সেখানে প্লাটফর্ম্মে কোনও আগুন জ্বলিতে দেখিলে তার পাশে ব্যাগ্‌টি রাখিয়া যাইও। আর কোন আগুন না দেখিলে সেখানে অমুক হোটেলে এই নামে পরিচয় দিয়া ওঠ। তার পর ব্যাগ্‌টি কোথায় জমা দিতে হইবে নিশানা করা হইবে। দেখিও অন্যথা না হয়, কারণ তোমার বন্ধুর জীবন ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। পুলিশের শরণ লইলে কি হইবে বোধ হয় জান—"

পুলিশের শরণ লইলে ডাকাতদের সন্ধান পাওয়া যাইত কি না বলা কঠিন তবে বন্ধুর সন্ধান যে আর পাওয়া যাইত না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কাজেই সকলে পরামর্শ করিয়া চিঠি অনুযায়ী কাজ করাই স্থির করিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সেই অপহৃত ধনী ব্যবসায়ীটির বন্ধু গিয়া টাকা সমেত সেই সহরে হাজির হইলেন এবং আগুনের সন্ধান না পাইয়া সেই হোটেলে সেই আদেশ অনুযায়ী নাম নিয়া উঠিলেন। একটু পরেই তাঁর কাছে টেলিফোন আসিল—'পশ্চিম দিকের বারান্দা ধরিয়া যাও।' পশ্চিম দিকে কয়েক পা যাইতেই পাশের ঘর হইতে একটি লোক ছোঁ মারিয়া ব্যাগ্‌টি লইয়া পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল,—বলিয়া গেল, 'বারো ঘণ্টা পরে এর রসিদ পাবে।' বারো ঘণ্টা পরে সেই অপহৃত ধনী ব্যবসায়ীটি বাড়ী ফিরিলেন।

মুক্তি লাভ করিবার পর এইবার সুরু হইল ডাকাতদের সন্ধান। ডিটেক্‌টিভ্‌-অফিসে সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল। অপহৃত লোকটির কাছে নিম্নলিখিত খবরগুলি পাওয়া গেল—

দস্যুরা তাঁকে মোটরে তুলিয়াই শক্ত আঠাল এক রকম ফিতা দিয়া তাঁর চোখ বাঁধিয়া দিয়াছিল, কাজেই চোখে তিনি কিছুই দেখিতে পান নাই। তবে তাঁর কান বন্ধ করা হয় নাই আর অনুভব-শক্তির সাহায্যে তিনি প্রাণপণে সময় সম্বন্ধে মনে মনে একটা আনুমানিক হিসাব রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডাকাতেরা তাঁকে কোথায় লইয়া রাখিয়াছিল তা তিনি কিছুই জানেন না, তবে যে বাড়ীতে ছিলেন সেখানে খুব হাঁস, মুরগী, শূয়োর ইত্যাদির চীৎকার শোনা যাইত। আর একটা শব্দ হইত—যেন কূয়া হইতে কপিকল দিয়া কঁ্যাচ্‌ কঁ্যাচ্‌ করিয়া জল তোলা

হইতেছে। তাঁকে যে সব খাবার দেওয়া হইত তা'তে বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু ছিল না—তবে জলটা ছিল একটু উগ্র রকম কষায় স্বাদের, আর তা' তাঁকে দেওয়া হইত একটা হাতল-ভাঙ্গা কাপে করিয়া। আর একটা বড় খবর এই—রোজই দু'বার করিয়া বাড়ীর উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন্‌ যাইবার আওয়াজ শোনা যাইত, শুধু এক দিন খুব ঝড় হওয়ায় সে আওয়াজ শোনা যায় নাই।

এই খবরটুকু পাইয়া ডিটেক্‌টিভের দল চট্‌পট্‌ কাগজ-পত্র ঘাঁটিতে সুরু করিলেন। ডাকাতেরা অনুমান যে সময়টুকু ভদ্রলোককে মোটরে করিয়া লইয়া গিয়াছিল তা'তে তাঁকে বড় জোর ৬০০ মাইল্‌ নেওয়া যাইতে পারে। তখনই ম্যাপ্‌ দেখিয়া আশ-পাশের ৫০০ হইতে ৬০০ মাইল্‌ জায়গার একটা হিসাব করিয়া ফেলা হইল। আরও জানা গেল ঐ সব জায়গার মধ্যে অমুক জায়গা দিয়া প্রত্যহ দু'বার একটা এরোপ্লেন্‌ সার্ভিস্‌ আছে এবং বাস্তবিক এক দিন ঝড় হওয়ায় এরোপ্লেন্‌ যাওয়া বন্ধ ছিল। দাগী আসামীদের পরিচয়-পত্র ঘাঁটিয়া জানা গেল যে একজন বিখ্যাত অপরাধী—"মেশিন্‌গান্‌ কেলি" বলিয়া সে বিখ্যাত—তার শাশুড়ীর ঐ অঞ্চলে একটা খামার-বাড়ী আছে। ব্যস্‌, অমনি ৬৪ জন ডিটেক্‌টিভ্‌ কাজে লাগিয়া গেলেন।

ডিটেক্‌টিভ্‌দের মধ্যে একজন মজুরের ছদ্মবেশে কাজ খালি আছে কি না জানিবার ছুতা করিয়া সেই বাড়ীতে হাজির হইলেন। কাজ অবশ্য তিনি পাইলেন না কিন্তু খবর পাইলেন অনেক। শূয়োর, হাঁস, মুরগীর সহিত মোলাকাৎ হইল, কূয়ার জল তোলার কঁ্যাচ্‌ কঁ্যাচ্‌ আওয়াজ পাওয়া গেল, তার পর বুদ্ধি করিয়া ভয়ানক পিপাসার্ত্ত হইয়া তিনি সেই হাতল-ভাঙ্গা কাপ্‌টির দেখা পাইলেন আর পাইলেন সেই কূয়ার উগ্র কষায় জলের স্বাদ। এই ভাবে ডাকাতদের একটা আড্ডার সন্ধান মিলিল।

তার পর একদিন শেষ রাত্রে কৌশলমত হানা দিয়া দলের একজনকে গ্রেফ্‌তার করা গেল এবং তাকে আত্মহত্যার সুযোগ না দেওয়ায় তার কাছ হইতে আরও পনের জনের নাম পাওয়া গেল। কেলি ছিল এই দলের একজন পাণ্ডা, দলে তার স্ত্রীও ছিল।

তার পর সুরু হইল সেই দস্যুদলের পিছু পিছু ধাওয়া। সে কী বুদ্ধির খেলা! এ যায় ডালে ডালে তো ও যায় পাতায় পাতায়। কিন্তু অবশেষে সকলেই ধরা পড়িল। কেলিকে ধরিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল সব চেয়ে বেশী। ধরা পড়িবার আগের দিনেও তাকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত পাঁচটি বিভিন্ন সহরে দেখা গিয়াছিল। এই বুদ্ধি সৎকাজে লাগাইলে কি কাণ্ড হইত ভাব তো! কেলির বিচার হইয়া গিয়াছে, বহু নিরপরাধ লোককে বন্দী করিয়া এখন সে নিজেই যাবজ্জীবন বন্দী।

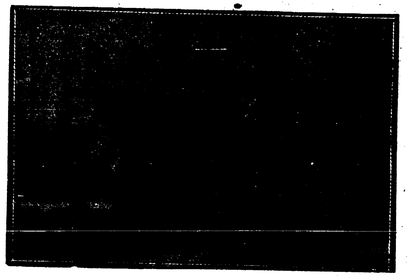

বিখ্যাত অপরাধী "মেশিন্‌গান্" কেলি ও তার স্ত্রীর বিচার হইতেছে।

এই কিড্‌ন্যাপারদের ধরিবার ব্যাপারে ডিটেক্‌টিভ্‌দের বাহাদুরীর আরও অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে—কিন্তু আজ থাক্।

ভালুকের মহাপ্রস্থান

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী)

গল্প কেমন লিখি জানি নে, কিন্তু শিকারী হিসাবে যে নেহাৎ কম যাই না ভাদ্রের রামধনুতে "আমার ভালুক শিকারেই" তোমরা তার পরিচয় পেয়েছ। আমার জ্যেঠ্‌তুত বড়দাদাও যে কত বড় শিকারী তাও তোমাদের আর অজানা নেই। এবার আমার মাথাত ছোট ভাইয়ের একটা শিকার-কাহিনী তোমাদের বল্‌ব। পড়লেই বুঝবে ইনিও নিতান্ত কম যান্ না। হবে না কেন, আমারই ছোট ভাই তো!

গল্পটা, যত দূর সম্ভব, তার নিজের ভাষাতেই বলবার চেষ্টা করা গেল :

ভালুকদের ওপর আমার বরাবর ঝোঁক্, ছোটবেলা থেকেই। রামধনুতে দাদার ভালুক শিকারের গল্পটা প'ড়ে অবধি ভালুকদের ওপর আমার ছোটবেলার টানটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল, সর্ব্বদাই মনে হয় কোন্ ফাঁকে একটা ভালুক শিকার করি। কিন্তু শিকারের জন্য এয়ার্-গান্ পাওয়া সোজা হতে পারে (আমাদের দেবুরই একটা আছে)—কিন্তু ভালুক যোগাড় করাই শক্ত। অবশ্য রাস্তায় প্রায়ই ভালুকওয়ালাদের দেখা পাওয়া যায়, সে সব নিঃসন্দিগ্ধ নৃত্যপটু ভালুকদের শিকার করাও অনেকটা সহজ, কিন্তু তাতে ভালুকদের আপত্তি না থাক্‌লেও তাদের গার্জ্জেন্‌দের রাজী করানো যাবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু চমৎকার সুযোগ মিলে গেল হঠাৎ। আমাদের পাহাড়ে দেশে সার্কাস্-টার্কাস্ বড় একটা আসে না। সার্কাস্ দেখ্‌তে হ'লে আমরা কলকাতায় যাই বড়দিনে দাদার ওখানে। যাই হোক্, এবার একটা সার্কাস্ এসে পড়েছে আমাদের অঞ্চলে। শুন্‌লাম অনেকগুলো ভালুকও এনেছে তারা। ভারী আনন্দ হ'ল।

দেবুকে গিয়ে বল্লাম, "এই, তোর বন্দুকটা দিবি দিন কত'র জন্য?"

"কি করবি?"

"ভালুক শিকারের চেষ্টা দেখ্‌ব।"

"আমার এটা তো এয়ার্-গান্, এতে কি ভালুক মরে? কেন, অমল, তোর তো সেজ কাকারই ভাল বন্দুক রয়েছে!"

"দূর্, সেটা বেজায় ভারী। তোলাই দায়, ছোঁড়া তো পরের কথা। তা ছাড়া আমি একটা গল্পে পড়েছি ভারী বন্দুক ভালুক শিকারের পক্ষে বড় সুবিধের ব্যাপার নয়।"

"ও, তোর সেই দাদার গল্পটা? কিন্তু আমি যে এটা দিয়ে কাক মারি।"

এটা হ'ল গিয়ে দেবুর স্রেফ্ চাল। বল্‌লে কাক মারি, কিন্তু আসলে ওই দিয়ে ও মাছি তাড়ায়। এয়ার্-গান্ থাকে ওর পড়ার টেবিলে, সেখানে কাক একটাও নেই, কিন্তু যত রাজ্যের মাছি।

"বেশ আমি তোকে একটা জিনিস দেব তাতে মারা না যাক্ কাক ধরা পড়বে।" দেবু উৎসুকচোখে তাকায়। "আমার ক্যামেরাটা দেব তোকে ওর বদলে। কাকের ছবি ধরা আর কাক ধরা একই ব্যাপার নয় কি?"

দেবু সে কথা মেনে নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠে। আমার 'জাইস্

আইকনে'র সঙ্গে ওর বন্দুকের বিনিময় ক'রে আমরা দু'জনেই বেরিয়ে পড়ি সার্কাসের তাঁবুর উদ্দেশে—ভালুক মারার মৎলব নিয়ে আমি, আর ভালুক ধরার উৎসাহ নিয়ে দেবু।

বাজারের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেবু এক গাদা কালো জাম কেনে। আমার দিকে, বোধ করি তার স্মরণশক্তির পরিচয় দেবার জন্যই, গর্ব্বভরে তাকায়—"পড়িস্ নি তোর দাদার গল্পে, ভালুকেরা জাম খেতে ভারী ভালোবাসে?"

হুঁ, পড়েছি এবং মনেও আছে; কিন্তু যাকে শিকার করতে যাচ্ছি তাকে জাম খাওয়ানো আমি পছন্দ করি না—সাবাড়ের আগে খাবারের ব্যবস্থা একটা নিষ্ঠুর ব্যবহার নয় কি? আমার মতে ওটা দস্তুরমত অত্যাচার—ভালুকের প্রতি এবং নিজের পকেটের প্রতি। দেবুকে জবাব দিই, "ভালুকের সঙ্গে ভাব করার তো মৎলব নেই আমার!"

সার্কাসের তাঁবুর পেছন দিক্‌টায় জানোয়ারের "মিনেজারী"—হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, ভালুক, জেব্রা—একটা উটও দেখলাম। খোঁটায় বাঁধা হাতী শুঁড় তুলে অপরিচিত লোককেও সেলাম ঠুক্‌ছে, জেব্রা এবং উটও কম দর্শক আকর্ষণ করে নি। কতকগুলো ছোঁড়া বাঘের খাঁচার দিকে গিয়ে ভিড়েছে, ওদের আফিং খাইয়ে রাখা হয় কিনা এই হ'ল ওদের আলোচ্য বিষয়। দেখা গেল বাঘেরা মনোযোগ দিয়ে সেই গবেষণা শুন্‌ছে এবং মাঝে মাঝে হাই তুলে ওদের কথা সমর্থন করছে।

মোটের উপর সমস্তটা জড়িয়ে বেশ উপভোগ্য ব্যাপার। কিন্তু এ সমস্ত থেকে কঠোর ভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে ভালুকের খাঁচার দিকে আমরা অগ্রসর হলাম। পথে-ঘাটে সর্ব্বদাই যাদের দেখা মেলে স্বভাবতঃই তাদের মর্য্যাদা কম; বেচারা ভালুকদের বরাতে তাই একটিও 'য়্যাড্‌মায়ারার্' জোটে নি।

একটি বড় খাঁচার একধারে দু'টো মোটাসোটা ভালুক—আর তার পাশেই পার্টিশান্-করা অন্য ধারে একটা বেঁটে ভালুক! পার্টিশানের মাঝখানের দরজাটা বাইরে থেকে লাগানো। এতক্ষণ অবধি কোন সমঝ্‌দার না পেয়ে মোটা ভালুক দু'টো যেন মুষড়ে পড়েছিল, আমাদের দু'জনকে যেতে দেখে নড়ে চড়ে বস্‌ল। কিন্তু বেঁটে ভালুকটার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই! বুঝলাম নিতান্ত উজ্‌বুক্ বলেই ওটাকে আলাদা করে রেখেছে।

দেবু পকেট থেকে এক মুঠো জাম বার কর্‌ল—তাই না দেখে বেঁটে ভালুকটার লম্ফ-ঝম্ফ দেখে কে? কিন্তু আমরা প্রথমে দিলাম মোটা ভালুকদের, তারা দু'-একটা চাখ্‌ল মাত্র, তার পর আর ছুঁলও না। এই ভালুক দু'টোর টেষ্ট উঁচুদরের বল্‌তে হবে, কেননা আমরাও রাস্তায় চেখে দেখেছি জামগুলো একেবারে অখাদ্য, এমন বিশ্রী জঘন্য জাম প্রায় দেখা যায় না!

কিন্তু বেঁটে ভালুকটা তাই অম্লানবদনে সবগুলো খেল; খেয়ে আবার হাত বাড়ায়!

দেবু দু' পকেট উল্‌টিয়ে জানায় যে 'হোপ্‌লেস্' তবু তার আগ্রহের নিবৃত্তি হয় না। বুঝলাম ব্যাটার বুদ্ধিশক্তি একটু কম।

দেবু আমার কাছে আবেদন করে,—"এই অমল, দে না তোর একটা চকোলেট একে।"

আমি অগত্যা বিরক্তিভরে একটা চকোলেট ছুঁড়ে দিই—"ভারী হ্যাংলা তো!"

দেবু মাথা নেড়ে জানায়, "ছেলেমানুষ কিনা! বড় হ'লে শুধ্‌রে যাবে।"

কিন্তু ভালুকটা চকোলেট্ স্পর্শও করে না, জামের জন্য দেবুর জামার নাগাল পাবার চেষ্টা করে। আমি এয়ার-গানের সাহায্যে চকোলেটটা সন্তর্পণে বাগিয়ে এনে বদন ব্যাদান করতেই দেবু বাধা দেয়, "খাস্ নে, সেপ্‌টিক্ হবে।"

বাধ্য হয়ে চকোলেটটা মোটা ভালুকদের দান করতে হয়। যথার্থই ওদের টেষ্ট উঁচুদরের। ওদের একজন ওটা সযত্নে কুড়িয়ে নেয়, নিয়ে সুকৌশলে রূপালী কাগজের মোড়ক খুলে ফেলে চকোলেটটা বার করে; তার পরে সমান দু' ভাগ ক'রে দু'জনে মুখে পুরে দেয়। ভালুকদের মধ্যে এরূপ সভ্যতা আর সাধুতা আমি কোনদিন আশা করি নি। একদম্ অবাক্ হয়ে যাই, এরকম ন্যায়পরায়ণ আদর্শ ভালুককে শায়েস্তা সঙ্গত হবে কিনা এয়ার-গান্ হাতে নিয়ে ভাব্‌তে থাকি।

দেবু চমৎকৃত হয়—"দেখ্‌ছিস্ কি রকম শিক্ষিত ভালুক!" তার পরে একটু থেমে যোগ করে—"শিক্ষিত প্রাণীদের শিকার করা কি উচিত?" অবশেষে আমার মতামত না পেয়েই আপন মনে ঘাড় নাড়তে থাকে—"একেই তো আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম!... এই ভালুকটি গেলে এর স্থান কি আর পূর্ণ হবে?"

ওর সহৃদয়তার প্রশ্রয় না দিয়ে গম্ভীর ভাবে জবাব দিই—"না, এখন আর শিকার কর্‌ব না। সার্কাস্ দেখ্‌বার আগে এদের খতম্ করা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না।"

আড়াইটার শো-র টিকেট কেটে আমি আর দেবু ঢুকে পড়ি—আমার হাতে দেবুর এয়ার-গান্, আর দেবুর হাতে আমার ক্যামেরা। স্থিরসংকল্প হয়েই ঢুকেছি, সার্কাসের পরেই অব্যর্থ শিকার; কেননা অনেক ভেবে দেখ্‌লাম সার্কাস্-এর সঙ্গে কারকাস্-ই হচ্ছে একমাত্র মিল এবং খুব ভালো মিল্। শিকারী-জগতে ভয়ানক পিছিয়ে রয়েছি অন্ততঃ আমার পিস্‌তুত দাদা এবং তাঁর জ্যেঠ্‌তুত বড়দা'র চেয়ে ত বটেই,—সেই অপবাদ আজ দূর করতে হবে।

প্রথমেই সেই মোটা ভালুক দু'টোকে এরীনায় এনে হাজির করেছে। বেঁটেটাকে ওদের সঙ্গে না দেখে দেবু একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল—"সেই বাচ্চাটাকে আন্‌বে না?"

"ওটা আস্ত জানোয়ারই আছে, এখনো মানুষ হয়ে ওঠে নি কিনা!"

দেবু চুপ্ করে থাকে, বোধ করি ওর প্রাণের ভালুককে অমানুষ বলাতে মনে মনে দুঃখিত হয়। খানিক বাদে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, "হতভাগার জন্যে জাম এনেছিলাম।"

আমি ওর দিকে আশ্চর্য্য হয়ে তাকাই—"য়্যাঁ? তোরও বুঝি ভালুক-শিকারের মৎলব? একরাশ ওই বিদ্‌ঘুটে জাম খেয়ে কেউ বাঁচে কখনও? পেটে গেছে কি নির্ঘাৎ ধনুষ্টঙ্কার! তুই বুঝি জাম খাইয়ে কাজ সারতে চাস্?" দেবু উত্তর দেয় না। আমি আশ্বাস দিই—"তা বেশ ত, এয়ার-গানে ঐ জাম পুরে ছুঁড়লে নেহাৎ মন্দ হবে না। জাম খাওয়ানোকে জাম খাওয়ানো, কাম ফতেকে কাম ফতে!"

দেবু সান্ত্বনা পায় কিনা ওই জানে। দেখি ওর দু' পকেট জামে ভর্ত্তি। ইতিমধ্যে সেই মোটা ভালুক দু'টো বাইসিকেলে চেপে এমন সব অদ্ভুত কসরৎ দেখাতে থাকে যা নিজের চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস করা যায় না। ভালুকের ভাষা আলাদা না হ'লে এবং আলাপের সুবিধা থাক্‌লে, ওদের কাছ থেকে দু-একটা সাইকেলের প্যাঁচ্ শিখে নিলে নেহাৎ মন্দ হ'ত না। সেটা সম্ভব কিনা মনে মনে চিন্তা করছি এমন সময়ে দেবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে—"আমার সেজ মামা কি বলে জানিস্ অমল?"

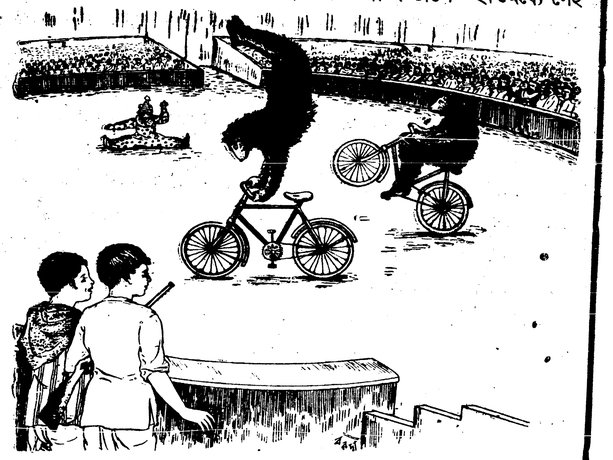

বাইসিকেলে চেপে এমন সব অদ্ভুত কসরৎ দেখাতে থাকে...

দেবুর সেজ মামা কি বলে জান্‌বার আগ্রহ না থাক্‌লেও জিজ্ঞাসা করি।—"বলে যে সার্কাসে মানুষে ভালুকের খোলস গায়ে দিয়ে সেজে থাকে। সাইকেলের খেলা দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে।"

আমি প্রতিবাদ করি—"পাগল! আমি কখনো কোনো মানুষকে এমন অদ্ভুত সাইকেল চালাতে দেখি নি, এ কেবল ভালুকের পক্ষেই সম্ভব।"

দেবু ঘাড় নাড়ে—"তা বটে।"

আমি জোর দিয়ে বলি—"নিশ্চয়ই তাই! শিক্ষালাভের ফলে কত কি হয় বইয়ে পড়িস্ নি? এ তো কিছুই না, আমি যদি ভালুকটাকে তারের ওপর সাইকেল্ চালাতে দেখি তা হ'লেও আশ্চর্য্য হব না। এমন কি এখুনি যদি ওরা স্পষ্ট বাংলায় কথা কইতে সুরু করে দেয় তা হ'লেও না।"

দেবু সায় দেয়—"হুঁ, তা বটে।"

কায়দা-কসরৎ দেখিয়ে ভালুকেরা চলে গেল। একটু পরে, যখন একটা হাতী চার পায়ে একটা পিপের পিঠে দাঁড়াবার দুশ্চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছে—আমি দেবুকে অপেক্ষা করতে ব'লে, অলক্ষ্যে ওদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম এখন হাতীর কসরতের ওপরেই সকলের যারপরনাই মনোযোগ, ভালুক-শিকারের এই হচ্ছে সুযোগ।

সার্কাসের পেছন দিক্ দিয়ে মিনেজারীর পাশ ঘেঁষে একেবারে তাঁবুর শেষ প্রান্তে ভালুকের আস্তানা! দূর থেকে মনে হ'ল ভালুক দু'টো যেন নিজেদের বাহাদুরির গল্প ফেঁদেছে। বেশ স্পষ্ট দেখ্‌লাম ধেড়ে-মোটাটা পিঠ চাপ্‌ড়ে ছোট ভাইকে সাবাস্ দিচ্ছে। ওরা কি ভাষায় কথোপকথন করে জান্‌বার কৌতূহল ছিল কিন্তু আমাকে দেখ্‌তে পাবা মাত্র যেন একদম্ বোবা মেরে গেল।

আমি বল্লাম, "কিহে ভায়ারা! বেশ ত আড্ডা চল্‌ছিল, থাম্‌লে কেন?"

আমার কথা শুনে এ ওর মুখের দিকে তাকাল, তার মানে—'এই ছেলেটা কি বল্‌ছে হ্যা?' নিশ্চয়ই আমাদের বুলি ওদের বোধগম্য নয়। উঁহু, স্বদেশী ভালুক না; তবে কি উত্তর মেরুর, যাকে 'পোলার বেয়ার' বলে, তাই নাকি এরা? পোলার বেয়ার মারতে পারলে বড়দা'র চেয়ে বড় কীর্ত্তি রাখ্‌তে পারব ভেবে মনে ভারী স্ফূর্ত্তি হ'ল। এয়ার্-গান্‌টা বাগিয়ে ধরলাম।

প্রথমে বাচ্চা থেকেই সুরু করা যাক্, কিন্তু খাঁচার পাখী শিকার ক'রে আরাম নেই। বেঁটে ভালুকটার খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। বিপদ্ এবং মুক্তি, এক কথায় বিপন্মুক্তির সম্মুখীন হয়ে ও যেন প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কেননা অনেক ইতস্ততঃ ক'রে তবে সে খাঁচার নীচে পা বাড়াল।

এমন সময়ে একটা অঘটন ঘট্‌ল। অকস্মাৎ দৈববাণী হ'ল—"পালাও পালাও, মারাত্মক ভালুক।"

চারি দিকে তাকালাম, কেউ কোথাও নেই, সার্কাসের লোকজন সার্কাস্ নিয়ে ব্যস্ত, তবে এ কার কণ্ঠধ্বনি? নিজের স্বগতোক্তি বলেও সন্দেহ করবার কারণ ছিল না। ভাল ক'রে চেয়ে দেখি, ওমা, সেই মোটা ভালুকদেরই একজন হাত নাড়ছে, আর ওই কথা বল্‌ছে!

আগেই আঁচ করা ছিল তাই আর আশ্চর্য্য হলাম না; বাংলা ভাষাও যে এরা আয়ত্ত করেছে এই ধরণের একটা সন্দেহ আমার গোড়া থেকেই ছিল। শিক্ষিত ভালুকের পক্ষে একটা

বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা এমন আর বেশী কথা কি? ইতিমধ্যে সেই বেঁটে ভালুকটা দেখি আমার বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছে।

মোটা ভালুকটা আবার আওয়াজ ছেড়েছে—"ওহে দেখ্‌ছ না! ভালুক যে!"

ভালুক যে, তা অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। ভালুক আমি খুব চিনি। চিনি এবং নিজেকেও চেনাতে জানি—আমি এবং আমার দাদা দু'জনেই। কিন্তু এই মোটা ভালুকটার আহাম্মুকি দেখ! একটু শিক্ষা পেটে পড়েছে কি আর অহঙ্কারের সীমা নেই, অম্‌নি নিজের জাত ভুল্‌তে সুরু করেছেন। কোন কোন বাঙালী যেমন দু' পাতা ইংরিজি পড়েই নিজেকে আর বাঙালী জ্ঞান করে না, একেবারে খাস্ ইংরেজ ভেবে বসে ওরও তাই দশা হয়েছে। নিজেও যে উনি একটি 'নাথিং বাট্ ভাল্লুক' তা আর ওঁর খেয়াল নেই।

ভারী রাগ হয়ে গেল আমার। চেঁচিয়ে বল্লাম—"ও তো ভাল্লুক, আর তুমি কি? তুমি যে আস্ত একটা জাম্বুবান!"

ওকে একটু লজ্জা দেবার চেষ্টা করলাম, এ রকম না দিলে চলে না। শিক্ষিত লোককেও অনেক সময়ে শিক্ষা দেবার দরকার হয়। আমার অত্যুক্তি শুনে বোধ করি ভালুকটার আত্মগ্লানি হ'ল, কেননা সে আর উচ্চবাচ্য করল না। বেঁটেটা আর এক পা এগুতেই আমি এয়ার-গান্ ছুঁড়লাম, ছর্‌রাটা ওর পেটে গিয়ে লাগ্‌ল। ও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পেটটা একবার চুল্‌কে নিল কিন্তু মোটেই দম্‌ল না, ধীরপদে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল—বন্দুকের মুখেই।

দুঃসাহসী বটে! বাধ্য হয়ে এবার আমাকেই পশ্চাদ্‌পদ হ'তে হ'ল। "আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।" কিন্তু ও একটু করে গা চুলকায় আর এগিয়ে আসে। গ্রাহ্যই করে না, যেন অনেক কালের গুলি খাবার অভ্যাস!

বুঝলাম খুব শক্ত শিকারের পাল্লায় পড়া গেছে, আমার বড়দা'র বরাতে যা জুটেছিল ইনি মোটেই তেমন সন্তোষজনক হবেন না। হঠাৎ উনি একটা অদ্ভুত গর্জ্জন করলেন; ওটা বাংলার কোনো অব্যয় শব্দ কিংবা কোনো অপভাষা কিনা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করছি এবং যখন প্রায় সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছি যে ওই গর্জ্জনের ভাষাটা বাংলা নয় বরং গ্রীক্ হ'লেও হ'তে পারে সেই সময়ে ভালুকটা অভদ্রের মত দৌড়ে এসে অকস্মাৎ আমাকে এক দারুণ চপেটাঘাত করল।

স-বন্দুক আমি বিশ হাত দূরে ছিট্‌কে পড়লাম। জানোয়ারদের খাবার জন্য কি শোবার জন্য জানি না বিচালির গাদা স্তূপাকার করা ছিল তার ওপরে গিয়ে পড়েছিলাম বলেই বাঁচোয়া। এক মুহূর্ত্তের চিন্তাতেই বুঝলাম যে গতিক সুবিধের নয়। যে পালায় সেই কীর্ত্তি রাখে এবং যে কীর্ত্তি রাখ্‌তে পারে কেবল সেই বেঁচে যায়, এমন কথা নাকি শাস্ত্রে বলে। আজ যদি শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করি তা হ'লে কাল ফিরে এসে শিকার আবার করলেও করতে পারি। অতএব—

চড়টা আমার পালানোর পক্ষে সাহায্যই করল, না হেঁটে না হটে এবং না লাফিয়ে বিশ হাত এগিয়ে পড়া কম কথা নয়! উঠেই উদার পৃথিবীর দিকে চোঁচা দৌড় দিলাম। ভালুক বাবাজীবনও অমনি পিছু নিলেন—যেমন ওদের দুঃস্বভাব। অনুকরণ আর অনুসরণ করতে যে ওরা ভারী মজবুত. দাদার গল্প পড়েই তা আমার জানা ছিল।

পাহাড়ের যে দিক্‌টায় আলেয়ার ভয়ে দিনেও লোকে পথ হাঁটে না প্রাণভয়ে সেইদিকেই ছুট্‌লাম। মাঝখানে একটা জায়গা এমন স্যাঁৎসেতে, সেখান দিয়ে যেতে কি রকম একটা গ্যাসে যেন দম আট্‌কে আসে; জায়গাটা পেরিয়ে উঁচু একটা পাথরের ঢিবিতে দাঁড়িয়ে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি।

দৌড়তে দৌড়তে ভালুকটা সেই স্যাঁৎসেতে জায়গাটায় এসে পিছ্‌লে পড়্‌ল। মিনিট্-খানেক পরে উঠ্‌তে গিয়ে আবার মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল। হঠাৎ কি হ'ল ভালুকটার? বার বার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই যেন আর দাঁড়াতে পারে না।

আমিও সেই উঁচু ঢিবিটার উপরে দাঁড়িয়ে—অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ দেখি ভালুকটা উঁচু হয়েছে, উঠেই দাঁড়িয়েছে কিন্তু মাথার দিকে নয় লেজের দিকে। অবাক্ কাণ্ড! মাথা নীচের দিকে, লেজ ওপরের দিকে—এ আবার কি রে! এটা কি এখানেই সার্কাস্ সুরু করল নাকি!

আরো খানিকক্ষণ কাট্‌ল। ভালুকটা আরো একটু উঁচু হ'ল। ভাল ক'রে চোখ রগ্‌ড়ে দেখি—ও দাদা, এ যে একেবারে মাটি ছেড়ে উঠে পড়েছে! দাঁড়িয়েই আছে বল্‌তে হবে, যদিও তার মাথাই নীচে আর পা উপরের দিকে। ভালুকটা দু' হাত দিয়ে মাটি আঁক্‌ড়াবার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে, কিন্তু তার আকাশে পদাঘাত করাই সার—কেননা পৃথিবী আর তার মধ্যে তখন দু' হাত ফারাক্! মাটির নাগাল্ পাওয়া মুস্কিল!

খানিক বাদে ভালুকটা উড়তে সুরু করল। ভালুক উড়ছে এ কখনও কল্পনা করতে পার? কিন্তু আমার স্বচক্ষে দেখা। আমার হাত থেকে এয়ার-গান্ খসে পড়্‌ল। উড়তে উড়তে ভালুকটা একবার আমার মাথার কাছাকাছি পর্য্যন্ত এল—আমি বসে পড়ে আত্মরক্ষা করলাম। ও যে রকম হাত বাড়িয়েছিল, ঠিক ডুবন্ত লোক যে ভাবে কুটো ধরতে যায়,—আর একটু হ'লেই আমায় ধরে ফেলেছিল আর কি! ওর চোখে এক অসহায় সপ্রশ্ন দৃষ্টি—ভাবটা যেন, 'হায়, আমার এ কি হ'ল?!' আমাকে ধরতে ওকে সাহায্য না করায় ও যে আমার ওপর খুব বিরক্ত আর মর্ম্মাহত হয়েছে তা ওর মুখভাব দেখ্‌লেই বোঝা যায়।

লক্ষ্য ক'রে দেখলাম ওর পেটটা ভয়ানক ফেঁপে উঠেছে—চারটে জয়ঢাক এক করলে যা হয়। ঠিক যেন একটা রক্ত-মাংসের বেলুন্! ভালুকটা ক্রমশঃই উপরের দিকে যেতে লাগ্‌ল—

লেজ সর্ব্বাগ্রে। দেখতে দেখতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে অবশেষে বিন্দুমাত্রে পরিণত হ'ল, তার পর চক্ষের পলকে অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অমল-ভ্রাতাজীবনের শিকার-কাহিনী পাঠে বিজ্ঞানবিদ্ পাঠক হয়ত এই ব্যাখ্যা দেবেন যে বেচারা ভালুক যে স্যাঁৎসেতে জায়গায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে সেখানটায় প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাদুর্ভাব ছিল; সেই গ্যাস্ উদরস্থ করার ফলেই বাবাজী বেলুনে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস ওই ভালুকটা ছিল অতিরিক্ত পুণ্যাত্মা—কেননা সশরীরে স্বর্গারোহণের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়! এ ভাবে মহাপ্রস্থানের পথে যাবার য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ এ পর্য্যন্ত চার জনের মোটে হয়েছে এই ভালুক-নন্দনকে ধ'রে; যার মধ্যে কেবল একজন মাত্র দুর্ব্বিপাক কাটিয়ে কোন গতিকে স্বস্থানে ফিরতে পেরেছেন। প্রথম গেছলেন স্বয়ং যুধিষ্ঠির, দ্বিতীয়—তাঁরই সমভিব্যাহারী জনৈক কুকুরশাবক, তৃতীয় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল, আর চতুর্থ—?

চতুর্থ এঁদের কারো চেয়েই কোন অংশে ন্যূন নয়।

প্রাচীন উড়িষ্যা

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্)

এখন উৎকল ও উড়িষ্যা এক বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু পূর্ব্বে তাহা ছিল না। উত্তরে ছিল উৎকল, দক্ষিণে ওড্র, উভয়ের পূর্ব্বে কলিঙ্গ। কলিঙ্গ খুব বিস্তীর্ণ ও প্রতাপশালী জনপদ ছিল। ওড্রকে তোসলও বলা হইত—তোসলের আবার দুইটী ভাগ ছিল—উত্তর তোসল ও দক্ষিণ তোসল। সবটাকে একত্র করিয়া বলা হইত ত্রিকলিঙ্গ। এই ত্রিকলিঙ্গের উত্তর সীমায় ছিল দামোদর নদ, দক্ষিণে গোদাবরী। বাংলার মেদিনীপুর ও হাবড়া জেলার কতকটা ইহার মধ্যে ছিল। কলিঙ্গের প্রতাপ এত ছিল যে ইহার সাম্রাজ্য ব্রহ্মদেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কলিঙ্গের সভ্যতার

চিহ্ন পূর্ব্বমহাসাগরের অনেক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিকলিঙ্গের খানিকটা এখনকার উড়িষ্যা।

আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র মতে কলিঙ্গ ছিল অনার্য্যের দেশ, ব্রাহ্মণেরা এখানে আসিলে পতিত হইতেন। কিন্তু বঙ্গদেশেরও তখন সেই অবস্থা, বরং আরও খারাপ। আর্য্যদিগের নিকট হেয় হইলেও কলিঙ্গ বর্ব্বরের দেশ ছিল না, এখানকার রাজারাও শৌর্য্যবীর্য্যহীন ছিলেন না। প্রাচীন বৃত্তান্ত অনুসারে মহাভারতের যুদ্ধের পর বত্রিশ জন রাজা পর পর কলিঙ্গে রাজত্ব করিলে পর মগধে মহাপদ্ম নন্দ মাথা তোলেন। এই শূদ্র রাজা দ্বিতীয় পরশুরামের মত দেশের পর দেশ নিঃক্ষত্রিয় করিতে থাকেন; কলিঙ্গ তাঁহার হস্তগত হয়। নন্দরাজ উড়িষ্যায় যে খাল কাটাইয়াছিলেন পুরী জেলার উদয়গিরি পাহাড়ের উপর হাতী গুম্ফায় তাহার উল্লেখ আছে।

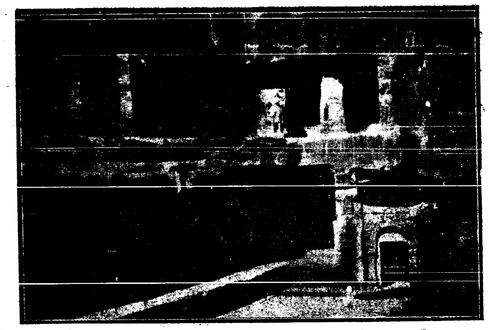

খণ্ডগিরিতে পাহাড় কাটিয়া তৈয়ারী একটি গুহার নমুনা—রাণী গুম্ফা

প্রাচীন কলিঙ্গ ও ওড্রের কথা বলিতে গেলে পুরী জেলায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী এই উদয়গিরি ও তাহারই যুড়িদার খণ্ডগিরির কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। যীশু খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে এই দুই পাহাড় বৌদ্ধ ও জৈন সাধুদের সাধনার ক্ষেত্র ছিল। পাহাড় কাটিয়া সেকালকার স্থপতিরা কত কারুকার্য্যযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কত দ্বিতল, ত্রিতল গুহা, কত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি এখনও দর্শকের মনে বিস্ময় আনয়ন করে। হিন্দুশিল্পেরও এখানে অভাব নাই। আবার কটক জেলায় উদয়গিরি, ললিতাগিরি ও রত্নগিরিতেও প্রাচীন কীর্ত্তি যথেষ্ট। বাংলা দেশে এত প্রাচীন যুগের এমন কীর্ত্তি কোথাও নাই।

পরবর্ত্তী সময়ে প্রচুর কীর্ত্তির স্থান ভুবনেশ্বর, পুরী, যাজপুর প্রভৃতি। এ সকল স্থানই প্রাচীন মন্দির ও দেবমূর্ত্তিতে পূর্ণ।

যে দেশে এত প্রাচীন কীর্ত্তি তাহা কখনই বর্ব্বরের দেশ ছিল না। ওড্র প্রথম অবস্থায় অসভ্য দেশ ছিল কিন্তু কলিঙ্গেরা অনার্য্য হইলেও সভ্যই ছিল। বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই কলিঙ্গদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশে প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রাচীন কীর্ত্তিপূর্ণ দেশের রাজা-রাজড়ারা কেমন ছিলেন জানিতে কিছু কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। খুব প্রাচীন কালের রাজাদের খাঁটি সংবাদ পাওয়া যায় না। মহাপদ্ম নন্দের পরে মগধের লোক দেশটাকে বেশী দিন বশে রাখিতে পারে নাই। আমরা দেখিতে পাই অশোকের প্রধান যুদ্ধ এই কলিঙ্গের সঙ্গে। সে যে-সে যুদ্ধ নয়; অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায়, "এই যুদ্ধে এক লক্ষ লোক হত হয়, দেড় লক্ষ বন্দী হয়—এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিতে তাহার বহুগুণ লোক যমালয়ে যায়। ফলে, অশোকের মনে প্রবল অনুতাপ জন্মে এবং তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়িয়া ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারে মন দেন। বর্ত্তমান ভুবনেশ্বরের নিকট ধৌলী পাহাড়ে অশোকের যে অনুশাসন খোদা আছে তাহাতে দেখা যায় তিনি প্রজাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সে বিষয়ে শাসনকর্ত্তাদিগকে কত উপদেশ ও আদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার মত কত উদার ছিল।

মৌর্য্যপ্রাধান্য ক্রমে লুপ্ত হইলে খরবেল নামক এক জৈন রাজা কলিঙ্গে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি যেমন বিক্রমে তেমনি ধর্ম্মের দিক্ দিয়াও বড় ছিলেন। উদয়গিরির গুহায় ইহার কীর্ত্তিকাহিনী লেখা আছে। গ্রীক্ রাজা ডেমিট্রিয়াস্ এই সময়ে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র আক্রমণ করিয়া লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। খরবেল সসৈন্যে পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলে ডেমিট্রিয়াস্‌কে লেজ গুটাইয়া মথুরার দিকে পালাইতে হয়। দেখা যাইতেছে, খরবেল জৈনধর্ম্মে আস্থাবান্ ও ধার্ম্মিক রাজা হইলেও মশা-মাছি মারিতে ভয় পাইতেন না। তিনি আর্য্য ছিলেন না কিন্তু শিক্ষিত ছিলেন। ধর্ম্মালোচনার জন্য তিনি জৈন সাধুদিগের সভা বসাইয়াছিলেন।

খরবেলের রাণীর নামেও উদয়গিরিতে গুহা আছে। এই পাহাড়ে অন্যান্য জৈন রাজারও নাম পাওয়া যায়।

ইহার কিছু কাল পরে সম্ভবতঃ উড়িষ্যা কুশান্‌বংশীয় রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করে। গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ছিল ঠিক করা কঠিন।

বাংলা দেশে রাঢ় অঞ্চলে শশাঙ্ক নামে এক প্রবল রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে)। তিনি আর্য্যাবর্ত্তের বিখ্যাত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত পাল্লা দিয়ে চলিতেন। উড়িষ্যার অনেকটা তাঁহার অধীনে করদ রাজ্য রূপে ছিল। উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব বংশের রাজারা প্রথমে ইহার অধীন ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা স্বাধীন হইয়া এত প্রবল হইয়া উঠেন যে মালয়দেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত হয়।

ইহার পর আমরা কর রাজাদিগের উল্লেখ পাই। ইঁহাদের একজন চীন সম্রাটের নিকট পর্য্যন্ত দূত পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পর বিখ্যাত সোমবংশীয় কোশল রাজগণ। ইঁহারা কত দূর পরাক্রান্ত ছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু উড়িষ্যার লোক ইঁহাদের নাম এখনও সম্মানের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে এবং দেশের অনেক কীর্ত্তিকলাপের সহিত সেই নাম সংযুক্ত। ইঁহাদের কাহারও কাহারও কেশরী উপাধি ছিল। উড়িষ্যাবাসীরা ললাটেন্দুকেশরী নামে এক রাজার উল্লেখ করে কিন্তু তিনি যে কে ছিলেন ঠিক করা যায় না। জন্মেজয় বা মহাভবগুপ্ত এই বংশের একজন গোড়াকার রাজা। তাঁহার পুত্র যযাতি বা মহাশিবগুপ্ত গুর্জ্জরাদি জাতির আক্রমণ নিবারণের জন্য রাঢ় ও গৌড় দেশের রাজার সাহায্যে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যযাতি হইতে ষষ্ঠ রাজার সময়ে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত কৃত্তিবাস-মন্দির নির্ম্মিত হয় (সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতক) কিন্তু কে যে ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা ঠিক করা কঠিন। অনেক বাংলা দেশীয় কায়স্থ এই বংশীয় রাজাদিগের কর্ম্মচারী ছিলেন। এই রাজাদিগের লিপিতে সমসাময়িক বাংলা অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয় উড়িষ্যাবাসীদিগের এই সকল অক্ষর বাঙ্গালীদিগের নিকট ধার করা। ত্রিকলিঙ্গের রাজা উদ্দ্যোতকেশরী এই বংশীয় রাজা—তাঁহার

কতকগুলি লিপি বাহির হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের বহু শিবমন্দির এই গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়।

ইহার পর আমরা কলিঙ্গের গঙ্গ রাজাদিগকে উড়িষ্যায় দেখিতে পাই। এই বংশের অনন্তবর্ম্মন্ রাজা বঙ্গেশ্বর বিজয়সেনের বন্ধু ছিলেন। পুরীর জগন্নাথ-মন্দির এই অনন্তবর্ম্মন্ বা চোলগঙ্গ রাজার কীর্ত্তি। দেবতা পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন কিন্তু এই ১২৭ ফুট উচ্চ মন্দিরটী ইনি নির্ম্মাণ করেন। গোদাবরী হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত এই রাজার অধীন ছিল।

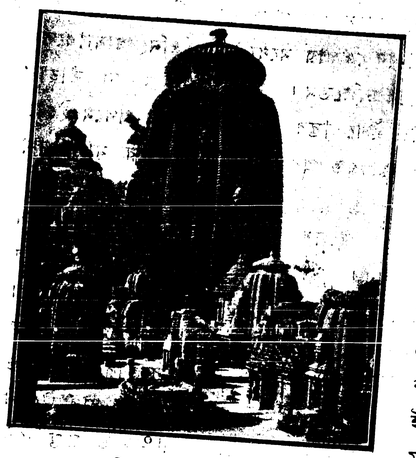

লিঙ্গরাজ মন্দির—ভুবনেশ্বর

গঙ্গবংশীয় রাজা তৃতীয় রাজ-রাজের সময়ে মুসলমানেরা প্রথম উড়িষ্যা আক্রমণ করে কিন্তু সেবার বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার পুত্র তৃতীয় অনঙ্গভীম মুসলমানদিগকে তাড়া করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র প্রথম নরসিংহ বাংলার মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইজ্জুদ্দিনকে পরাজিত করিয়া মুসলমানের অধিকৃত দেশ লুটপাট করিয়া ফিরিয়াছিলেন। ইহা পরবর্ত্তী সময়ের বর্গীর হাঙ্গামার পূর্ব্বাভাস। বর্ত্তমান মেদিনীপুর, হুগলী ও হাবড়া জেলার অনেকটা ইহার শাসন মানিয়া চলিত। কণারকের বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির ইহারই কীর্ত্তি।

ইহার পর আমরা সুবিখ্যাত কপিলেশ্বর রাজার নাম শুনিতে পাই। ইনি পূর্ব্বে মহাপাত্র ছিলেন, প্রবল হইয়া ভুবনেশ্বরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহারই নামে ভুবনেশ্বরের কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ইনি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন এবং গজপতি ও গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। দক্ষিণে আর্কট পর্য্যন্ত—কৃষ্ণানদীর দক্ষিণেও—ইহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এক মতে ইহার পূর্ব্বপুরুষ

গৌড়বঙ্গ হইতে আগত। গঙ্গবংশীয় রাজারা ছিলেন অন্ধ্রদেশের, উড়িষ্যা ছিল তাঁহাদের বিজিত দেশ কিন্তু সূর্য্যবংশীয় রাজা কপিলেশ্বরের সময়ে অন্ধ্রই উড়িষ্যার অধীন হয়।

রাজা প্রতাপরুদ্র খুব ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন—চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তের মধ্যে তিনি ও তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা রায় রামানন্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হরিনামে বিভোর হওয়া এক কথা, রাজ্যশাসন অন্য কথা। প্রতাপরুদ্র যুদ্ধে পূর্ব্বপুরুষের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি পুরী লুণ্ঠনের পর মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীকে গড় মান্দারণে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিলেন বটে কিন্তু শেষে এক কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকায় তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। রায় রামানন্দ ধর্ম্মে মাতোয়ারা হইয়া শাসনকর্ত্তার পদই ছাড়িয়া দেন।

মুসলমানদিগের লুটপাট চলিতে থাকে এবং প্রতাপরুদ্রের পর উড়িষ্যার নানা প্রকার দুর্দ্দশা ঘটে। কিন্তু আজ আর সে কথায় কাজ নাই।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে উড়িষ্যায় প্রাচীন কীর্ত্তি বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশী এবং উড়িষ্যা বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশী দিন স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতে বাংলার সহিত উড়িষ্যার বেশ সংযোগ চলিয়াছে, উত্তর বঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ গিয়া উড়িষ্যায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার সেনবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী হরিবর্ম্মা নামক এক রাজার মন্ত্রী পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট শেষ বয়সে ভুবনেশ্বরে বাস করিয়া সেখানে মন্দির নির্ম্মাণ ও জলাশয় খনন করেন। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে তাঁহার কীর্ত্তি খোদাই করা আছে। ভুবনেশ্বরে কোন বাঙ্গালী হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া যদি তাহা দেখিয়া না আসেন তবে (গৌরীকুণ্ডের জল যতই উদরস্থ হউক না কেন) তাঁহার ভুবনেশ্বর ভ্রমণ বৃথা।

এক পেয়ালা চা

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

সেবার গিরিডি গেছলাম এক বন্ধুর বিয়েতে। তখন শীত—আর কী শীত! ঠিক সন্ধ্যেবেলা গিয়ে পৌঁছলাম—ষ্টেশনে পা দিয়েই মনে হ'ল যেন এক গলা ঠাণ্ডা জলে নামলাম। অতি কষ্টে যথাস্থানে এসে পৌঁছলাম—গায়ে তিনটে গরম জামা, তার উপর প্রাণপণে আলোয়ান জড়িয়ে জবুথবু হ'য়ে বসলাম। তবু কি শীত মানে! ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ, তবু মনে হয় যেন কোনখানে একটা দেয়াল নেই, খোলা মাঠের মধ্যে ব'সে আছি। দেয়াল ভেদ ক'রে ঢুকছে শীতের স্রোত, ঢুকছে আমাদের হাড় ফুটো ক'রে।

সে-রাতটা লেপ-কম্বল চাপা দিয়ে এক রকম কাটলো। যখন ঘুমোলাম, কলকাতায় তখন সন্ধ্যা, তাই ঘুম ভেঙে গেলো খুব ভোরেই। কিন্তু তখন লেপের তলা থেকে ওঠবার চাইতে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ। শুয়ে-শুয়েই প্রথম কিস্তি চা খেলাম; তার পর যখন বেশ ভাল রকম রোদ উঠেছে, উঠে এক ছুটে গেলাম বাইরে রোদ্দুরে।

বাইরে এসেই মনটা খুসিতে ভ'রে গেলো। কী নীল আকাশ, আর কী অজস্র রোদ! দূরে আঁকাবাঁকা পাহাড় কুয়াসায় ঝাপসা; আর কন্‌কনে হাওয়াটা যেন শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে তুলতে চায়। দুপুর বেলা হী-হী ক'রে হাওয়া দেয়, গাছগুলো তাদের শুকনো পাতাগুলো ঝরিয়ে দিয়ে হাল্‌কা হয়—আর সেই শুকনো পাতা পায়ের নীচে মড়মড়িয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে কী ভালো আমার লেগেছিলো এখনো বেশ মনে পড়ে।

শীতের প্রথম ধাক্কাটা যখন স'য়ে গেলো, বাকী ক'টা দিন বেশ ভালই কাটলো। খাওয়া, বেড়ানো, গল্প করা—এ ছাড়া কিছু করবার নেই; কয়েক দিন প্রাণ ভ'রে বেড়িয়ে নিলাম।

এখন, গিরিডি যে কেন বিখ্যাত তা তোমরা ভূগোলের বইতে নিশ্চয়ই

পড়ো নি, কিন্তু লোকের মুখে বোধ হয় শুনেছো। ধিক্ তাকে—উশ্রী ফল্‌স্-এর নাম যে শোনে নি—যা হচ্ছে গিরিডির একমাত্র বৈশিষ্ট্য, গৌরব, সম্পদ্ এবং অলঙ্কার। সেখানকার ছেলে-বুড়ো সকলের মুখে কেবল উশ্রী আর উশ্রী। তুমি ষ্টেশনে নামলে; গোল টাক-পড়া ষ্টেশন-মাষ্টার তোমার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে বল্‌লে, 'উশ্রী ফল্‌স্ না দেখে যাবেন না কিন্তু।' যে কুলি তোমার মোট বইলো, সে তোমাকে গায়ে প'ড়ে জানিয়ে দিলে যে উশ্রীতে যেতে হ'লে অনেকখানি হাঁটতে হয়। যে ট্যাক্সিতে তুমি উঠলে, তার ড্রাইভার বল্‌লে, 'উশ্রীতে কবে যাবেন—আমাকে ব'লে দিন, ঠিক আসবো।' সহরের যে ভদ্রসন্তানের সঙ্গে তোমার প্রথম আলাপ হ'ল, সে বল্‌লে, 'উশ্রীতে পৌঁছবার রাস্তাটা একটু গোলমেলে—যদি বলেন, আমি যেতে পারি সঙ্গে।' গেলে হয় তো এক জায়গায় চায়ের নিমন্ত্রণে, গিয়ে শুনলে কে কতবার উশ্রী গেছে তারই আলোচনা চলছে। কেউ সাঁইত্রিশ বার, কেউ পঁচাত্তর বার, কেউ বিরানব্বই বার। কী ক'রে যে ঠিক সংখ্যাটা মনে রাখতে পেরেছে, সেটাই আশ্চর্য্য। সমস্ত সহরটা উশ্রী দিয়ে ভরা। এখানকার শিশুরা প্রথম যে কথা শেখে তা হচ্ছে উশ্রী; আর বড় হ'য়ে উশ্রীর সঙ্গে সুশ্রী মিলিয়ে তারা কত যে পদ্য লেখে তার অন্ত নেই।

যা-ই হোক্, গিরিডি এসে অবশ্য উশ্রী দেখতেই হয়—ইচ্ছে করলেও না দেখে যাবার উপায় নেই। আমরাও দেখতে গেলাম—আমি, আর ভোম্বল—আমার বন্ধু। দুপুরে খাওয়ার পরে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। সবশুদ্ধ মাইল চারেক রাস্তা, তার অর্দ্ধেকটা ধরো, বনের ভিতর দিয়ে। বনের ধার পর্য্যন্ত সবাই মোটরে আসে, তার পর হেঁটে যায়। কিন্তু আমরা ঠিক করলাম আগাগোড়াই হেঁটে যাবো।

এখন, ভোম্বল যে কেমনতরো মানুষ তা তার নাম শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। বেজায় মোটা, কেবলি তার থেকে-থেকে ক্ষিদে পায়। সব চেয়ে সে ভালোবাসে পেট-ভরা খাওয়ার পর লম্বা হ'য়ে শুঁয়ে থাকতে। প্রথমটায় তো সে আসতেই চায় নি, অনেক ব'লে-ক'য়ে তাকে রাজী করলাম। বল্‌লাম 'ওরে মূর্খ, কলকাতার ইটে-কাঠে আটক হ'য়েই তো জীবনটা কাটালি—

এইবার একটু বাইরে তাকা, একটু দেখতে শেখ—' ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ভাল-ভাল কথা।

কিন্তু এত বক্তৃতা কার কাছে করলাম! সহর ছাড়িয়ে সবে বনের মধ্যে ঢুকছি, ভোম্বল বললে, 'একটা কথা।'

আমি হেসে বললাম, 'ভয় নেই রে, ভয় নেই। এ-বনে বাঘও নেই, ভাল্লুকও নেই, পরিষ্কার রাস্তা চ'লে গেছে বরাবর।'

ভোম্বল একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'সে-কথা নয়; ক্ষিদে পাচ্ছে।'

'ক্ষিদে! এই তো ভাত খেয়ে উঠলি।'

'একবার খেলেই যদি আর কখনো খেতে না হ'তো তা হ'লে তো কোনো ভাবনাই ছিলো না।'

ভোম্বলকে আমি অবশ্য কোনো আমলেই আনলাম না। সেই বন, বনের ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা রাস্তা, সত্যি বলতে, আমার বেশ ভালই লাগছিলো। চুপচাপ খানিক দূর গেছি, ভোম্বল হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'বুদ্ধি ক'রে কয়েকটা কমলা-লেবু নিয়ে এলেও হ'তো।'

আমি বললাম, 'এত বুদ্ধিই যদি তোর থাকবে তা হ'লে তুই এত মোটা হ'বি কেন? ক্ষিদে আর তেষ্টা ছাড়া আর কোনো জিনিস কি তোর মধ্যে নেই? চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখ্ না, কী সুন্দর!'

ভোম্বল চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। তার পর বললে, 'ফ্লাস্ক্-এ ক'রে চা আনলেও হ'তো।'

এইবার আমি সত্যি-সত্যি চটে গিয়ে বললাম, 'থাম্ তুই।'

ধমক খেয়ে ভোম্বল চুপ করলে। বাকীটা রাস্তা কোনো কথা বললে না। মাঝে-মাঝে আমি ওকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করাবার চেষ্টা করলুম, তা ও একবার বলে হুঁ, একবার বলে হাঁ।

উশ্রী দেখলাম। নীচে থেকে, উপর থেকে, এ-পাশ থেকে, ও-পাশ থেকে—যত রকম ক'রে দেখবার নিয়ম, কিছু বাকী রাখলাম না। তার পর পাথরের উপর ব'সে জিরোতে লাগলাম—আমার মনে অন্ততঃ খুব একটা আত্ম-প্রসন্ন ভাব।

একটু পরে ভোম্বল বললে, 'এই, যাবি নে?'

'এত অস্থির হ'য়ে পড়েছিস্ কেন? কেমন লাগছে তোর বল্ তো?'

'কেন, বেশ—বেশ ভালোই তো।'

'কী সুন্দর দেখ্। এ-রকম দেখেছিস্ কখনও?'

'না তো।'

ভোম্বলের সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা ক'য়ে সুখ নেই। একটু ক্লান্তিই লাগছিলো, তা ছাড়া।

খানিক পরে আমি বললাম, 'চল্, তা হ'লে যাওয়া যাক্।'

ভোম্বল উঠতে-উঠতে করুণস্বরে বললে, 'বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে ভাই।'

সত্যি বলতে, আমারও তেষ্টা পাচ্ছিলো, কিন্তু খুব প্রফুল্লমুখে বললাম, 'তোর প্যান্‌প্যানানির আর শেষ নেই? চল্, নামতে-নামতে ঝরণার জল খেয়ে নে তো এক ঢোঁক।'

উশ্রীর জল নাকি একটু খেয়েও দেখতে হয়, শুনেছিলাম। কিন্তু খেয়েই বুঝলাম, সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলের চাইতে সে-সময়ে আমাদের অন্য কিছু প্রয়োজন। পেটের ভিতরটা মুচড়িয়ে উঠলো যেন। হঠাৎ ব'লে ফেললাম, 'গরম এক পেয়ালা চা পেলে কী ফাইন্ হ'তো ভাই।'

ভোম্বল গম্ভীরমুখে বললে, 'কী সুন্দর দৃশ্য!'

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'কাছাকাছি কোথাও যে একটা ভাঙা পেয়ালাও জুটবে এমন আশা তো দেখি নে।'

ভোম্বল বললে, 'কী আকাশ! কী জল! কী বন!'

আমি চটে গিয়ে বললাম, 'ফাজলেমি রাখ্। তোর কি চা খেতে ইচ্ছে করছে না?'

'ক্ষিদে আর তেষ্টাই তো ভোম্বলের সম্বল।'

ততক্ষণে আমরা বনের পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমার চা খাওয়া অভ্যাস, তার উপর রোদে এতখানি হেঁটে আর নানাদিক্ থেকে উশ্রী দেখে এমন হয়েছিলো যে সমস্ত শরীর আর মন কেবল চা-চা করছিলো। সত্যি, ফ্লাস্ক্ একটা নিয়ে এলেই হ'তো।

চুপচাপ চলেছি, হঠাৎ বনের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা। একটু দূরে দেখতে পেলাম, সুন্দর একটি বাংলো-প্যাটার্ণের বাড়ী ছবির মত ঝলমল করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম।

'কি হ'লো?' ভোম্বল আমার মুখের দিকে তাকালো।

'ঐ বাড়ীটা দেখছিস্?'

ভোম্বল তাকিয়ে বললে, 'দেখছি তো।'

নাঃ, ভোম্বলটা একেবারে নীরেট। আমি বুঝিয়ে বললাম, 'চল্ না উঠি গে—চাইলে পরে এক পেয়ালা চা কি আর দেবে না?'

ভোম্বল একটু দ্বিধার সুরে বললে, 'যাবি?'

'যাবো না কেন? এই ঈশ্বর-পরিত্যক্ত জায়গায় হঠাৎ একটা বাড়ী কেন থাকবে বল্—আমাদের চা খাওয়াবার জন্য নিশ্চয়ই।'

যুক্তিটা ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে ভোম্বল বললে, 'হুঁ।'

'দেখ্ছিস না কী ঝক্‌ঝকে বাড়ী—নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর। আমাদের দেখে কত খুসি হবে দেখবি—খালি চা? আরো কত কিছু খাওয়াবে।'

ভোম্বল ক্ষীণস্বরে বললে, 'চল্ তা হ'লে।'

বাড়ীটা যত কাছে ভেবেছিলাম, হাঁটতে গিয়ে দেখলাম ততটা নয়। আধ মাইলের কিছু উপরেই হবে। রোদে টুকটুকে লাল হ'য়ে এসে পৌঁছলাম দু'জন।

বাড়ীটা একেবারে চুপচাপ, সামনের দরজা বন্ধ, ভিতরে লোক আছে মনে হয় না। বারান্দায় উঠে দু'-একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, 'কে আছেন বাড়ীতে?'

কেউ সাড়া দিলে না। আরো কয়েকবার ডাকাডাকি করলাম, উত্তর নেই। তার পর দরজায় ধাক্কা।

ভিতর থেকে অত্যন্ত মোটা গলায় কে বললে, 'কে?'

'একটু শুনবেন?'

দরজা খুলে গেল একটু পরেই, আর ভীষণ রোগা, 'ডিস্‌পেপ্‌টিক' চেহারার এক ভদ্রলোক ভীষণ পুরু কাচের চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিটে চোখে আমাদের দু'জনকে দেখতে লাগলেন।

চেহারা দেখে সন্দেহ ছিলো না, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বাঙ্গালী?'

'কি চাই আপনাদের?' ঐ বঁড়শির মত শরীর থেকে অমন পিলে-চমকানো আওয়াজ কি ক'রে বেরুতে পারে, এখনো আমার মাঝে মাঝে তা ভেবে অবাক্ লাগে।

'আজ্ঞে—আজ্ঞে—এই আমরা কলকাতা থেকে এসেছি।'

'ও। তা কি মনে ক'রে?'

ভিতরটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছিলো, জোর ক'রে একগাল হেসে বললাম, 'আমরা এসেছিলাম শ্রী দেখতে—'

'ও।'

'সমস্তটা পথ হেঁটে এসেছি—বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।'

ভদ্রলোক আমাদের মুখের দিকে বললেন, 'তা-ই দেখছি।' নিজেও তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন দরজা আগলে, আমাদেরও একবার বসতে বললেন না।

এইবার ভোম্বল বললে, 'সুন্দর বাড়ীটি আপনার।'

'হ্যাঁ, অনেকের চোখে সুন্দর লাগে।'

ভোম্বল আবার বললে, 'আপনার দেশ কোথায় জানতে পারি?'

'বরিশাল।'

ভোম্বল মৃদু হাস্য ক'রে বললে, 'আজ্ঞে আমার দেশও বরিশাল।'

'ও, তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা দেখুন, আমরা বড্ড ক্লান্ত হয়েছি কিনা—এখানে একটু বিশ্রাম—' ভোম্বলের মুখ-চোখ বাকী কথা প্রকাশ করলে।

'আচ্ছা, দাঁড়ান একটু।'

আর কিছু না ব'লে ভদ্রলোক ভিতরে চ'লে গেলেন। আমাদের উভয়ের হৃৎপিণ্ড আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠলো। আমি চুপি চুপি বললুম, 'তা হ'লে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত চা-টা হ'ল।'

'উঃ!' ভোম্বল এর বেশী কিছু বলতে পারলে না।

ভদ্রলোকের ফিরতে দেরী হ'তে লাগ্‌ল। আমি আরো বেশী চুপি-চুপি

বললুম, 'কিছু খাবার-টাবার তৈরী করছে বোধ হয়। ভাল ক'রে আলাপ ক'রে দেখিস্—হয় তো কোন আত্মীয়তা বেরিয়ে পড়বে।'

প্রায় পনেরো মিনিট পর ভদ্রলোক ফিরলেন—তাঁর দু' হাতে দু' গেলাস জল।

—'এই নিন্।'

কী আর করি, গেলাস নিয়ে সেই দাঁতে-দাঁত-লাগানো জল খানিকটা খেলাম। পশ্চিমের জল—পেটে পড়তেই ক্ষিদে যেন আরো দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল।

মরিয়া হ'য়ে গেছলাম ততক্ষণে। ঢোঁক গিলে ব'লে ফেললাম, 'আপনাদের তো এতক্ষণে চা খাওয়ার সময় হয়েছে।'

'তা এক সময় খেলেই হয়।'

'আচ্ছা, আমরা তা হ'লে একটু—এই একটু ঘুরে বেড়াই এদিক্-ওদিক্।'

'এখানে কোথায় আর বেড়াবার জায়গা?'

দাঁত বা'র ক'রে বললাম, 'বারান্দায় পাইচারী করি একটু—তার পর আপনারা যখন চা খাবেন—'

'তা আপনাদের ইচ্ছা।'

ভদ্রলোক (যদি এখনো ভদ্রলোক বলা যায়) আবার ভিতরে চ'লে গেলেন। ভোম্বল ব'লে উঠলো, 'আস্ত ভূতুম। ভাবখানা কি তা-ই বোঝা গেল না।'

'দেখি আর একটু ধৈর্য্য ধ'রে। নেহাৎ জীবে দয়া ব'লেও তো একটা জিনিস আছে।'

ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট গেলো, ভদ্রলোকের আর দেখা নেই। হয় তো ঘরে চিনি নেই, কোন্ দূরে বাজার, আনতে পাঠিয়েছে। বললেই হ'ত, চিনি ছাড়াই খেতুম। এদিকে বিকেল হ'য়ে আসছে, রোদের জোর ক'মে আসছে। শীত আরম্ভ হবে একটু পরেই। আবার সেই চার মাইলের পাড়ি—এক পেয়ালা চা না খেয়ে কি ক'রে পা বাড়াই?

আবার হাঁক-ডাক সুরু করবো ভাবছি, এমন সময় ভদ্রলোক আবার দেখা দিলেন—হাতে তাঁর একটা চায়ের পেয়ালা। মোটে এক পেয়ালা—তবু মন লাফিয়ে

উঠলো। যাক্, ঐ ভাগ ক'রে খাবো দু'জনে। সেটা নেবার জন্যে হাত বাড়াতে যাচ্ছি, ভদ্রলোক পেয়ালায় এক লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'এ কি! আপনারা যান নি এখনও?' ব'লে আর এক চুমুকে পেয়ালা শেষ ক'রে সেটা নামিয়ে রাখলেন। 'আমাদের তো চা খাওয়া হ'য়ে গেলো, আপনাদের না তখনই যাবার কথা ছিলো?'

সাগর-প্রসঙ্গ

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

এটা নিশ্চয়ই অতিশয় সত্যি কথা যে বাংলাদেশে এমন ছেলেমেয়ে একজনও নাই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ের ছবিখানা যে না দেখিয়াছে। এবং এ কথাও বোধ করি মিথ্যা নয় যে ছবিখানা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সংস্কৃত শ্লোকও তার মনে পড়িয়া গেছে—"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" অথবা ওরই আর একটু মোলায়েম সংস্করণ, "নীরস-তরুবরঃ পুরতো ভাতি।" ওই জ্ঞান-গম্ভীর, কর্ত্তব্যকঠোর মূর্ত্তিটির সামনে রসিকতা বা রঙ্গ-রস জীবনে বুঝি একবার উঁকি মারিতেও ভরসা পায় নাই, সাত হাত দূর হইতেই নমস্কার সারিয়া বিদায় নিয়াছে।

বিদ্যাসাগর মশায়কে জীবনে যারা দেখিয়াছে তারা কিন্তু জোর গলায় বলে ও ধরণের একটা বিভীষিকা তিনি আদবেই ছিলেন না। উচ্চাঙ্গের রসিকতা নিজেও করিতে পারিতেন, আবার হাসি তামাসার ব্যাপার ঘটিলে উপভোগও করিতেন প্রচুর। দু' একটা গল্প বলি, শোন।

অনেক সময়েই দেখা যায় পাড়ার দিল্‌খুস্ মেজাজের ছোক্‌রারা চাঁদা করিয়া মাঝে মাঝে 'খ্যাটের' বন্দোবস্ত করে, আর তার নাম রাখে গ্যাস্ট্রোনমিক ক্লাব (Gastronomic Club)। গাম্ভীর্য্যের অবতার বিদ্যাসাগর মশায়ও এই ধরণের একটা

গ্যাষ্ট্রোনমিক ক্লাব তৈরী করিয়াছিলেন। সে ক্লাবের মেম্বার ছিলেন বাংলার সব মহা মহা রথীরা, যেমন হাইকোর্টের নামজাদা জজ্ দ্বারকা মিত্র প্রভৃতি। এক দিন ভবানীপুরে ক্লাবের বৈঠক বসিয়াছে, এক বঙ্গ-বিখ্যাত উকীলের বাড়ীতে, ভূরিভোজনের আয়োজন। পর দিনই একজন সভ্য—বোধ করি দ্বারিক বাবুই—

বিদ্যাসাগর (শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত কর্ত্তৃক অঙ্কিত রেখাচিত্র)

পড়িলেন রাম পেটের অসুখে। খবর পাইয়াই সকলে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন, চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার চমৎকার ব্যবস্থা হইল। তার পর দ্বারিক বাবু একটু সুস্থ হইতেই একজন সভ্য ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ওর পেটের ব্যামো আছে, দাও ওর থেকে ওর নাম কেটে।" অমনি বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, "সে কি হে

ও হোলো ভোজনব্রতের একনিষ্ঠ সাধক, তার জন্যে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত (martyr to the cause) ওর নাম কাট্‌লে চলে কখনো?"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আর একটা গল্প, এটা আমার এক প্রাচীন লোকের মুখে শোনা। তোমরা জান, বিদ্যাসাগর মশায় চটিজুতা ছাড়া অন্য কিছু কখনোই পায়ে দিতেন না। তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ চটিজুতার ডগা একটু বেশী দিন ব্যবহারের পরেই বাঁকিয়া যায়, যেন একটু উপর দিকে ওঠার ইচ্ছা। এই ধরণেরই এক জোড়া চটি পায়ে একদিন বিদ্যাসাগর বসিয়া আছেন, আর তাঁরই সাম্‌নে বসিয়া সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কথা বলিতে বলিতে বঙ্কিম বাবুর নজর পড়িল বিদ্যাসাগরের চটির দিকে। একটু রঙ্গ করার লোভ হইল, বলিলেন, "আপনার চটি দেখি ক্রমশঃ স্বর্গপানে ওঠ্‌বার উদ্‌যুগ কর্‌ছে!" বিদ্যাসাগর আড়চোখে একবার নিজের চটির দিকে তাকাইয়া নিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হে, জানই তো চট্টোপাধ্যায় পুরোনো হলেই বঙ্কিম হয়ে যায়।"

কোনও হাসির ব্যাপার ঘটিলে বিদ্যাসাগর উপভোগও করিতে পারিতেন খুব। ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুল্‌স্ অবস্থায় একবার তিনি গিয়াছিলেন মফঃস্বলের এক ইস্কুল দেখিতে। আগে হইতেই খবর রটিয়াছিল, গাঁয়ের লোকেরা রাস্তার দু' পাশে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে বিদ্যাসাগর-দর্শন আশায়। ক্রমে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজও ভয়ানক বাড়িয়া চলিল, তখনও লোকগুলি সেই অবস্থাতেই সেইখানে ঠায় দাঁড়াইয়া। খানিক বাদে একখানা পাল্‌কি আসিয়া উপস্থিত, বিদ্যাসাগর মশায় নামিলেন। জনতার মধ্যে ছিল এক বুড়ী, বিদ্যাসাগর দেখিবার জন্য সেও আসিয়া জুটিয়াছে। ব্যাপার কিছু না বুঝিতে পারিয়া সে আগাইয়া গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, কল্‌কেতা থেকে বিদ্যেসাগর আস্‌বে শুনেছিলাম, কই তিনি এলেন না গা?" লোকটি ইঙ্গিতে বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখাইয়া বলিল, "এই তো বিদ্যাসাগর!" বুড়ী যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একটুক্ষণ তাকাইয়া শেষে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "ও মা, না আছে জুড়ীগাড়ী, না আছে চেন-ঘড়ি, এই উড়ে বেহারা দেখ্‌বার জন্যে এতক্ষণ রোদে ভাজা ভাজা হলাম্?"

ঘটনা-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে এ কথা কেউ উত্থাপন করিলেই তিনি হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া পড়িতেন।

দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ

(জসীম উদ্‌দীন্, এম্-এ)

পশ্চিম মুল্লুকের এক সহরে মুসলমান নবাবের অধীনে অনেকগুলি বাঙ্গালী কেরাণী কাজ করিত। সেবার পূজার সময়ে তাহারা স্থির করিল, সকলে চাঁদা তুলিয়া দুর্গাপূজা করিবে। তোমরা হয় ত জান না, বাঙ্গালার বাহিরে কোথাও বড় একটা দুর্গাপূজা হয় না। তাই সহরে দুর্গাপূজা হইবে শুনিয়া সকলেই যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাঙ্গালা দেশ হইতে এক কুমারকে ডাকাইয়া দুর্গা প্রতিমা গড়া হইল। কেরাণীদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্থির হইল তিনিই পুরোহিতের কাজ করিবেন।

দেখিতে দেখিতে পূজার দিন আসিয়া পড়িল। পূজার আগের দিন সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, "আমরা ত নবাব সাহেবের অধীনে কাজ করি, তাঁহাকে আমাদের পূজায় নিমন্ত্রণ করিলে হয় না?" শেষে পরামর্শ শেষ করিয়া সত্য সত্যই কয়েক জন কর্ম্মচারী নবাব সাহেবের বাংলোয় গিয়া উপস্থিত।

"নবাব সাহেব, আমাদের ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ।"

নবাব সাহেব হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিহে, তোমাদের ওখানে ব্যাপার কি?"

তাহারা বলিল, "বৎসর পরে আমাদের মা আসিবেন, আমরা সেই মায়ের পূজা করিব।"

নবাব সাহেব খুসী হইয়া বলিলেন, "আমি আলবৎ যাইব। তোমাদের মা আসিবেন আর তোমরা তাঁহার পূজা করিবে—এ ত খুব ভাল কথা।"

সকলে খুসী মনে নবাব সাহেবকে সালাম করিয়া বিদায় লইল।

সন্ধ্যাবেলায় পূজা দেখিতে নবাব সাহেব আসিলেন। নবাব সাহেবের আগমনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। চেয়ার আন রে, গড়গড়া আন রে, পান আন রে, সরবৎ আন রে। আদরে-অপ্যায়নে নবাব সাহেব বড়ই খুসী হইলেন। খানিক বসিয়া এ কথা সে কথার পর তিনি বলিলেন, "এবার তোমাদের মাকে দেখাও।"

সকলে নবাব সাহেবকে দুর্গা প্রতিমা দেখাইতে লইয়া গেল। নবাব সাহেবের হাতে একখানা লাঠি। দুর্গা প্রতিমাকে দেখাইয়া নবাব সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

সকলে উত্তর দিল, "ইনি আমাদের মা। দশ হাতে দশ রকম অস্ত্র ধারণ করিয়া দশদিক্ রক্ষা করিতেছেন।"

নবাব সাহেব বলিলেন, "বড়া খুবসুরৎ মা হ্যায়। হাম্ বহুৎ খুস্ হুয়া।" তার পর নবাব সাহেব লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, "এঁরা দু'জন কে কে?"

সকলে বলিল, "এঁরা লক্ষ্মী আর সরস্বতী, মায়ের দুই মেয়ে।"

নবাব সাহেব কহিলেন, "এভি বহুৎ আচ্ছা হ্যায়। বড়া খুসীকা বাত হ্যায়।"

ইহার পর নবাব সাহেব কার্ত্তিক-গণেশের মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, "এঁরা কাহারা?" সকলে বিনীত ভাবে উত্তর দিল, "ইহারা কার্ত্তিক-গণেশ—মায়ের দুই ছেলে।" নবাব খুব খুসী। "এও ভি খুবসুরৎ হ্যায়; বাবা কার্ত্তিক-গণেশ, বেঁচে থাক।"

প্রতিমা দেখা শেষ হইয়াছে, এইবার নবাব সাহেব বিদায় লইবেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি দুর্গা প্রতিমার অসুরের উপর পতিত হইল। নবাব সাহেবের চোখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। লাঠি দিয়া অসুরকে দেখাইয়া নবাব সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "এ কেন্ হ্যায়—এ লোকটা কে?"

সকলে বলিল, "এটা অসুর। মায়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।" নবাব সাহেবের সুর এবার পঞ্চমে উঠিল, "কেয়া? জানানাকা সাথ লড়তা হ্যায়?—

স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেয়। হামারা এলাকামে এয়ছা দুষমণি কাম নেহি হোনে দেগা।" বলিতে বলিতে নবাব সাহেব হাতের লাঠি লইয়া অসুরের গায়ে মারিতে লাগিলেন। মাটীর প্রতিমা, লাঠির দুই-এক আঘাতেই অসুর-মূর্ত্তি নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এ কোন্ হ্যায়?

ব্যাপার দেখিয়া সকলেই হতভম্ব। নবাব সাহেবকে ত কেহই কিছু বলিতে পারে না! কালই সকালে পূজা হইবে, ভাঙ্গা প্রতিমা দিয়া ত পূজা করা যায় না! সকলের মুখই মলিন হইয়া উঠিল।

নবাব সাহেব ভাবিয়াছিলেন, অসুরকে প্রহার করিয়াছেন দেখিয়া কর্ম্মচারীরা খুব খুসী হইবে। কিন্তু তাহা না দেখিয়া তিনি বড়ই আশ্চর্য্য এবং লজ্জিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুম্‌লোক বেজার হুয়া কাহে? দুষমণ্ অসুরকো ত হাম্ মারা!"

সকলে যোড় হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, আমাদের প্রতিমা ভাঙ্গিয়া গেল। কি করিয়া পূজা হইবে?"

তখন নবাব সাহেব বলিলেন, "নতুন করিয়া প্রতিমা বানাও। আমি এখনই পাঁচ শ' টাকা পাঠাইয়া দিতেছি। আরও যদি টাকা লাগে, হামি দিব; কিন্তু ঐ দুষমণ্ অসুরকো নেহি বানাও।"

টাকা পাইয়া সকল কেরাণীই খুসী। তৎক্ষণাৎ দুই-তিন জন কুমোর ডাকাইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হইল। অসুরের মূর্ত্তি না হইলে ত দুর্গাপূজা হয় না, খুব ছোট করিয়া একটা অসুরের মূর্ত্তি গড়ান হইল। তাহা নবাব সাহেবের চোখেও পড়িল না। মহা সমারোহে পূজা হইয়া গেল।

"আ"কার ও "উ"কার

(শ্রীকালিদাস রায়)

ছুটির সকাল, উঠি উঠি করি'
লেপটা টানিয়া সবে
নিমেষের লাগি বুঝি বা কখন
চোখটা বুঁজেছি, হবে—
হঠাৎ দেখিনু অবাক্ হইয়া
পড়ার টেবিলে মোর
'আ'কারে 'উ'কারে মহা কলরবে
বেধেছে দ্বন্দ্ব ঘোর।
'উ'কার কহিছে 'আ'কারে ডাকিয়া
"ধিক্ তোরে শতবার,
যে তোরে আদরে দেয় আশ্রয়
মাথা নত সদা তার।
কাক ও কোকিল ছিল এক পাখী,
এক বুলি ছিল আগে,
তোরে পেয়ে কাক 'কা'-'কা' রব করে
কানে যেন বিষ লাগে।
কোকিল আমার সোনার পরশে
'কুহু-কুহু-কুহু তানে
আদরে মাখিয়া নিত্য নূতন
মধু ঢেলে দেয় কানে।
'বীণু, রাণু, খুকু,' বলিতে কেমন
আদর উথলি' উঠে—
'বোকা, হাবা, গাধা,' শুনিতে তেমন
কানে যেন সূচ ফোটে।"
'আ'কার তখন ক্ষণিক রহিয়া
লাজে যুড়ি দুই পাণি,
হেঁট করি মাথা ধীরে ধীরে কয়,
"এ কথা তোমার মানি।
কিন্তু জানিও সকল হাবারে
আমিই আগে শিখাই
শিশুর প্রথম আধ আধ বুলি
মধুর "মা" ডাক, ভাই।"
সহসা শুনিনু কে যেন বলিছে,
"থাম্, ওরে তোরা থাম্,
'দুর্গা' 'কালী'তে কোন ভেদ নাই,
একই জননীর নাম।"

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

ঘরের স্মৃতি

(শ্রীভারতী দেবী)

গ্রামটি আমার বন-বাদাড়ে অজয় নদীর বাঁকে,
গাঙশালিকে ঘর বেঁধেছে আম গাছেরই ফাঁকে ;
রাঙা মাটীর উপর দিয়ে পথটি আঁকা-বাঁকা—
পথিক যেথায় মাঝ দুপুরে চলতে থাকে একা।
সেথায় গেলে দেখতে পাবে আমার ছোট ঘর,
পাঁচীল বেয়ে শাকের রাশি উঠছে মাচার পর।
ছোট একটি ফালি উঠান, তারই একটি পাশে
এক ফালি রোদ সোনার মতন ঝিলিক্ মেরে হাসে।
দড়ির 'পরে শুকোচ্ছে এক ছোট্ট রঙীন কাঁথা,
এক ধারেতে গোয়াল ঘরে কাজ্‌লী গরু বাঁধা।
ঘরের স্মৃতি থেকে থেকে আমায় পাগল করে,
মনটা আমার ঘুরে বেড়ায় অজয় নদীর ধারে।

হুবহু

(শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

অনিন্দ্য—"তোকে দেখলেই আমার একজন মস্ত আবিষ্কারকের কথা মনে পড়ে।"

দীপক—(উৎসুকনেত্রে) "তাই নাকি? কে সেই আবিষ্কারকটি?"

অনিন্দ্য—"ডারউইন্।"

ছোটদের চিত্রশালা

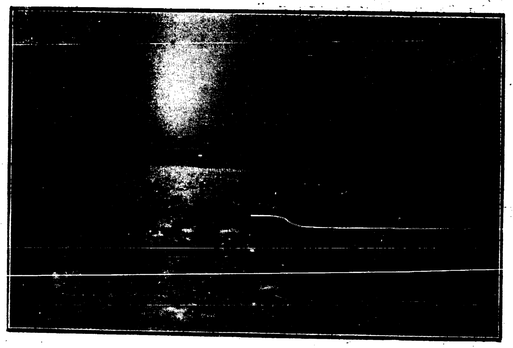

গঙ্গায় আলোর খেলা

আলোক-চিত্রগ্রহীতা—
শ্রীরামপ্রসাদ সিং
গ্রাঃ নং ১৩৬৯

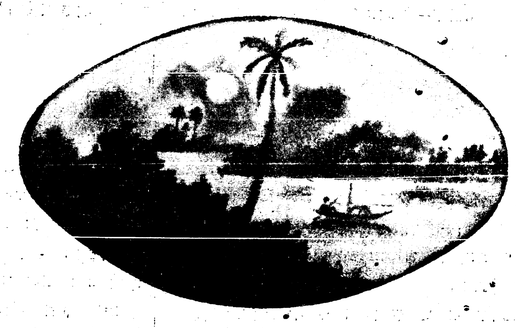

শীতের দিনে

চিত্রশিল্পী—
শ্রীগৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য
গ্রাঃ নং ১৩৮০

[illegible]

(শ্রীনবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)

স্থান-নির্দ্দেশ

একজন শিক্ষক খেলিবার মাঠে একটি আনি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। স্কুল বসিলে তিনি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেউ কি একটা আনি হারিয়েছ ?"

একটি ছোট ছেলে বলিয়া উঠিল, "স্যার, আমি হারিয়েছি।"

"কে, নেপাল, তুমি হারিয়েছ ? কোথায় হারিয়েছিলে বল তো ?"

"আজ্ঞে, যেখানে আপনি পেয়েছেন।"

চোষ্য

তোমরা বোধ হয় জান অনেক জায়গায় জ্বর দেখবার থার্ম্মোমিটার বগলে না দিয়ে জিভে দেওয়া হয়।

এক হাসপাতালে রোগীদের খুবই কম খেতে দেওয়া হ'ত। এক দিন একজন পরিদর্শক সেই হাসপাতালটি পরিদর্শন ক'রতে গিয়ে এক রোগীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তোমার কি ব্যারাম ?"

রোগী—"ম্যালেরিয়া।"

পরিদর্শক—"কি খেতে পাও ?"

রোগী—"দিনে দু'বার ক'রে জ্বর দেখ্‌বার কাঠি চু'ষতে পাই।"

চিঠি-পত্র

"আশ্বিনের ধাঁধার প্রতিযোগিতায় শ্রীঅনিল দে, এন্, ব্যানার্জ্জি ও এম্, বসু পুরস্কার পাইয়াছেন। নিম্নলিখিত বইগুলি তাঁহাদের ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—সমস্যাসংগ্রহ (৩ খানা), ঝলমল, ছোটদের গল্পসঞ্চয়ন, ছোটদের চয়নিকা, রাজা সোলেমানের রত্নাগার, অজ্ঞাত জগৎ, সুদখোর ও সওদাগর, পদ্মরাগ, ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি, বিজ্ঞান-বুড়ো।"

—শ্রীঅধীররঞ্জন দে

"অগ্রহায়ণ মাসের গল্প-প্রতিযোগিতায় অনেক গল্প এসেছে, কিন্তু অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা বাৎসরিক পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকায় সময় একটু বাড়িয়ে দিতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। তাঁদের কথামত গল্প-প্রতিযোগিতার সময় আর এক মাস বাড়িয়ে ১৫ই পৌষ শেষ তারিখ করা গেল। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও গ্রাঃ নং পাঠাতে হবে।"

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

"আশ্বিনের রামধনুতে শ্রীরবীন্দ্র পালিত ষ্ট্যাম্প্ কোম্পানীর নাম জানতে চেয়েছিলেন। কতকগুলির নাম দিলাম—

(১) সি, এস্, আয়ার ব্রাদার্স্, Attugi, Travancore. (২) মিশন্ ষ্ট্যাম্প্ কোং, ৮, রবার্ট্‌স্ রোড্, নিউ দিল্লী, ও জামালপুর (৩) ক্যালকাটা ষ্ট্যাম্প্ কোং, 2, Sudder Street, Calcutta. (৪) ইণ্টারন্যাশানাল্ ফিলাটেলিক্ কোং, ১০, হিল্ ষ্ট্রীট্, কলম্বো; (৫) সিটি ষ্ট্যাম্প্ এণ্ড্ কয়েন্ কোং, ২০, চৌরঙ্গী, কলিকাতা।"

—শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

"যিনি 'রবট্' বা কলের মানুষ আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার নাম কি ?"

—শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য্য

(সর্ব্বপ্রথম যিনি রবট্ আবিষ্কার করেন তাঁর নাম আর, জে, ওয়েন্সলি। ইনি ওয়েষ্টিং হাউস্ ইলেক্ট্রিক্ এণ্ড্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ার। —রাঃ সঃ)

"লাল-নীল মাছ ঘুমোয় কিনা, তারা কি খেয়ে বাঁচে আর তাদের ভাষা আছে কি না ?"

—শ্রীশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

(গভীরতম বিশ্রামকেই ঘুম বলে। প্রাণী-মাত্রেই ঘুমায়, কারণ বিশ্রাম ছাড়া বাঁচা যায় না। তবে মাছেরা চোখ বুজতে পারে না কারণ আমাদের মত তাদের চোখে পাতা নাই—এবং চোখের পাতা না থাকলে চোখ খুলে ঘুমান কঠিন নয়। সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদ্‌ই এই সব মাছের খাদ্য। এরা শব্দ করতে পারে কিনা সন্দেহ, তবে অন্য উপায়ে পরস্পরের মধ্যে মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে বলেই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—যদিও মাছেরা স্বভাবতঃ খুব অল্পবুদ্ধি। —রাঃ সঃ)

সন্দেশ

এ বছর সাহিত্যের জন্য নোবেল্ পুরস্কার পাইয়াছেন ইটালীয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত পিরান্‌ডেলো। রসায়ন-শাস্ত্রে পাইয়াছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরল্ড্ ক্লেটন্; আর শান্তির জন্য পাইয়াছেন অস্ত্র-নিয়াকরণ সমিতির (Disarmament Conference) সভাপতি শ্রীযুক্ত আর্থার হেণ্ডারসন্। গত বছরের শান্তির পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে সুপ্রসিদ্ধ লেখক স্যার নরম্যাল্ এঞ্জেলকে। হেণ্ডারসন্ সাহেব গত বছরের কার্ণেগী-শান্তি-পুরস্কারও পাইয়াছেন।

* * *

এ বছরকার বেঙ্গল টেনিস্ চ্যাম্পিয়ন্‌শিপের খেলা শেষ হইয়াছে। পুরুষদের মধ্যে "সিঙ্গ্‌ল্‌স্" খেলায় চ্যাম্পিয়ন্ হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ডি, হজেস্। ইনি ফাইনালে শ্রীযুক্ত মিচেল-মোরকে হারাইয়াছেন। মেয়েদের মধ্যে "সিঙ্গ্‌ল্‌স্" খেলায় চ্যাম্পিয়ন্ হইয়াছেন শ্রীমতী জেনি স্যাণ্ডিসন্—ফাইনালে শ্রীমতী লীলা রাওকে হারাইয়া। পুরুষদের "ডাব্‌ল্‌স্" খেলায় জয়ী হইয়াছেন ক্যাপ্‌টেন হিলি ও ব্রিগেডিয়ার কোচ্‌ম্যান্—শ্রীযুক্ত কার্চ্চ্ ও শ্রীযুক্ত লেসিকে হারাইয়া। পুরুষ ও মেয়েদের একত্র "মিক্স্‌ড্ ডাব্‌ল্‌স্" খেলায় জয়ী হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ডি,

হজেস্ ও শ্রীযুক্তা ম্যাকেনা বেকার। ইহারা ফাইনালে—শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌ইনিস্ ও শ্রীমতী হোম্যান্‌কে পরাজিত করিয়াছেন।

* * *

গত বছর এগারটি নতুন ভাষায় বাইবেল্ অনূদিত হইয়াছে। সমস্ত ভাষায় মিলিয়া এই বছর প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ বাইবেল্ বিতরণ করা হইয়াছে।

* * *

ডেন্‌মার্কের অধীন জীল্যাণ্ড ও ফুনান্ নামক দু'টি দ্বীপকে শীঘ্রই একটা পোল দিয়া সংযুক্ত করা হইবে। পোল্‌টি হইবে ১১ মাইল্ লম্বা। পৃথিবীর মধ্যে আপাততঃ এইটিই হইবে সব চেয়ে বড় পোল।

* * *

মেক্সিকোর সাণ্টামেরিয়া ডেল টিউল গ্রামে একটা খুব প্রাচীন সাইপ্রেস জাতের গাছ আছে। অনেকে মনে করেন এটাই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন গাছ—এটির বয়স ৫০০০ বছরের কম নয়। গাছটি প্রায় ২০০ ফিট্ উঁচু এবং এখনও নাকি একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে!

* * *

জাতিকে বড় করিতে হইলে কি কি নিয়ম পালন করা দরকার চীনের সেনাপতি চ্যাং কাই সেক তার একটা তালিকা দিয়াছেন। নিয়মগুলির কয়েকটা এই—

(১) মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করিবে এবং ভাইবোন্‌দের ভালবাসিবে (২) রাত্রে সকাল সকাল শুইবে এবং খুব ভোরে উঠিবে। (৩) রোজ স্নান করিবে ও ভদ্রভাবে পোষাক পরিবে। (৪) সব সময়ে সোজা হইয়া সম্মুখে তাকাইয়া চলিবে। (৫) কাহাকেও কথা দিলে যে করিয়াই হউক্ সে কথা রাখিবে। (৬) পরিমিত খাইবে, নিয়মিত ব্যায়াম করিবে এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে; কিন্তু বিলাসিতা করিবে না। (৭) জুয়া খেলা এবং আফিম খাওয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবে। ইত্যাদি।

* * *

ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ জন লোক চাষবাস করিয়া খায়। ব্যবসা করিয়া শতকরা অর্জ্জন করে শতকরা ৬ জন এবং সরকারী চাকরী করে শতকরা ২ জন।

* * *

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক লোক গড়ে বছরে উপার্জ্জন করে ১০৮০ টাকা, গ্রেট্ ব্রিটেনে ৭৫০ টাকা, ফ্রান্সে ৫৭০ টাকা, জার্ম্মেনীতে ৪৫০ টাকা, আর আমাদের ভারতবর্ষে মাত্র ৪৫ টাকা। ভাবিয়া দেখ আমরা কি ভয়ানক রকম গরীব!

* * *

বিলাতের সুবিখ্যাত লেখক এডগার ওয়ালেস্ বই লিখিয়া এ পর্য্যন্ত যত টাকা পাইয়াছেন তার হিসাব নিয়া দেখা গিয়াছে তাঁর লেখা প্রত্যেকটি শব্দের জন্য গড়ে ১০ শিলিং পাওয়া গিয়াছে।

আশ্বিন মাসের ধাঁধাঁর উত্তরদাতাদের নাম

যাহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রিচি রোড্), সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর), অধীরঞ্জন দে, ভোলা, ভানু, প্রভৃতি (বর্দ্ধমান), অজয়কুমার ও অরুণা দাস, গীতা হাজরা (বালিগঞ্জ); সুধীরচন্দ্র দাস (ভবানীপুর); টুটু, মিনু, টিনু ঘোষাল প্রভৃতি (লেকপল্লী); রামপ্রসাদ সিং, বলাই, সতু প্রভৃতি (বেহালা); বটকী, স্বরাজ, বানোয়ারী প্রভৃতি (দেওঘর); অমল, খোকন, প্রতুল গুপ্ত (মালদহ); অদীম, দীপিকা, অশোক প্রভৃতি (গিরিধি); প্রতিমা, অনিমা, নীলিমা প্রভৃতি (কলিকাতা); সৌরীন্দ্র, হীরালাল, শশাঙ্কশেখর বসু (বেহালা); হাসি, দিলু, দীপা প্রভৃতি (কাত্রাশগড়); কৃষ্ণ, অমর, প্রতিভা প্রভৃতি (মুড়াগাছা); শিবেন, পুন, স্বরাজ প্রভৃতি (দেওঘর); গোবিন্দ, বাদল, বাবল প্রভৃতি (নসীপুর); রবীন্দ্র, বটকৃষ্ণ, জগবন্ধু প্রভৃতি (দেওঘর); শচীন্দ্র চন্দ্র সেন (ভবানীপুর); বিদ্যুৎ, অম্বু ও উমা (ছাপরা); নিমাই, মঞ্জু, বান্টি প্রভৃতি (কটক); সুরমা, প্রতিমা, বেলা মজুমদার প্রভৃতি (পাতিহাল); নাদু, ভক্তি কার্ত্তিক প্রভৃতি (আন্দুলিয়া); সমীর চক্রবর্ত্তী-চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর); কিরণ, সুধাংশু, বিনয় গুপ্ত (শ্রীরামপুর); রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বাণী, শান্ত প্রভৃতি (মির্জ্জাপুর); রণজিৎ, বেলা, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি (সুপোল); নিরুপম লাহিড়ী (মাহিগঞ্জ); চিরু, কানু, দীপু (ভবানীপুর); প্রাণদানন্দ, অতুল, আরতি প্রভৃতি (কলিকাতা); ডলি, তুলতুল, ঠাকুমা প্রভৃতি (ভবানীপুর); সন্তোষ বসু, অরুণা দে (রাণাঘাট); অমল, বিমল, উমা মুস্তাফি প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা—কুচবিহার); কুমার দিবাকর সেন রায় (ঢাকা); মেজদি, হেলেনা দি, বুড়ীদি প্রভৃতি (ঢাকা); বাবু, চুলু, খুদু প্রভৃতি (বসিরহাট); সত্যেন, অমরেন, নৃপেন প্রভৃতি (সাগর); সূর্য্য, অজিত, চুণী প্রভৃতি (গোপালগঞ্জ); শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, ঝন্টু প্রভৃতি (ভবানীপুর); সেক্রেটারী, বাণী লাইব্রেরী (কালিম্পং); কুষ্টোফার রোডস্থ কর্পোরেশন্ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (কলিকাতা); রেণু, রাঙ্গাদি, বড়দা প্রভৃতি (কলিকাতা); শান্তি, দেবু, শৈল প্রভৃতি (কলিকাতা); রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দাদু, দিদিমা প্রভৃতি (মাধিপুরা—ভাগলপুর); কুমারী বীণা (কলিকাতা); শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিন্দু, হাসি প্রভৃতি (রমনা); অনিল, নিতাই, রেণুদি প্রভৃতি (কলিকাতা); সোনু, মনু, মোহন প্রভৃতি (কলিকাতা); চন্দ্রশেখর, বীণা, রথী প্রভৃতি (জামালপুর); জীবন, সমরেন, প্রকৃতি প্রভৃতি (শিবপুর); কিশোর লাইব্রেরীর পরিচালকবৃন্দ, রমা ও মায়া ভট্টাচার্য্য (শ্রীরামপুর); মা, দিদিমণি, সনৎ মিত্র প্রভৃতি (কালিঘাট) আমিয়া নন্দী (ঝিনাইদহ); জিতেন্দ্রনাথ দাস (জলপাইগুড়ী); সুকুমার, ভবানীপ্রসাদ ও সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়; নীহার, সৌদামিনী, নমিতা প্রভৃতি (মাথাভাঙ্গা—কুচবিহার)।

যাঁহাদের ১টি ভুল হইয়াছে—

সুজাতা, শেফালী, সবিতা প্রভৃতি (কলিকাতা); কেরামউদ্দীন আহমদ (রাণীনগর); অমল, অরুণ, শোভন প্রভৃতি (ভাগলপুর); মুকুল, সন্তোষ, উমা প্রভৃতি (কালিঘাট); নিখিল চৌধুরী (নওগাঁ); অনিল কুমার সেন (নাগপুর); অরুণা, গোরা, বেবী চৌধুরী (কলিকাতা); অন্নপূর্ণা, আলোক, অশোক (কালিঘাট); মণ্টু, ফড়িং ছিজু, চড়িং প্রভৃতি (কালিগ্রাম); লতিকা ও সান্ত্বনা (রাজসাহী); কামাখ্যাচরণ গুপ্ত, ভানু, রবি প্রভৃতি (ময়নাগুড়ি); সত্যেন্দ্র কুমার ও কনক কুমার সিংহ (বর্দ্ধমান); প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ); নবকুমার, সুধীর, অবনী প্রভৃতি (কালনা); শক্তিপ্রসাদ গর্গ (কলিকাতা); দুলাল চন্দ্র দত্ত (শিবপুর); জুনীপ ও নীতিপ দাশগুপ্ত, মাষ্টার মশাই (কলিকাতা); শোভারাণী ও সত্যপ্রসাদ (জামসেদপুর); তিলক, আব্দুল গফুর, সুশীল প্রভৃতি (চিলমারী); দেবেন, দাদা, দিদি (রংপুর); সুমুখনাথ মিত্র, বাণী, হরি প্রভৃতি (দিনাজপুর); কমল, গিরিজা, সভ্যবৃন্দ—যতীন্দ্রপাঠাগার (শ্রীরামপুর); পুণ্যব্রত ঘোষ (ধুবড়ী); নারাণ, সোম, মাণিক প্রভৃতি (নহিড়া); যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (পাটনা); শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি (ভাস্তারা); দাদা, সরোজ, অতুল প্রভৃতি (ভাট্টা—পূর্ণিয়া); মাখন চন্দ্র বাগচী, অজয়, অরুণা প্রভৃতি (লক্ষ্মণপুর); শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ী); নিরুপমা, প্রভাবতী ও বিভাবতী দেবী (জলপাইগুড়ী); শিবানী, ভবানী, কল্যাণী, সীতারাণী সরকার (ডিব্রুগড); মণি দাস (লখিমপুর); বাপ্পি, সেজমামা, মণ্টুকাকা প্রভৃতি (চাইবাসা); ঊষা, গীতা ; ভারতচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি (বারাকপুর), গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য (রামপুরহাট); ব্যোমকেশ রাহা (চট্টগ্রাম); প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য্য (বাগেরহাট), বখ্‌তিয়ার হোসেন (বর্দ্ধমান); নির্ম্মলেন্দু, অমলেন্দু, অরবিন্দ প্রভৃতি (বর্দ্ধমান)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

সুধীর কুণ্ডু, দাদাবাবু, দিদিমা প্রভৃতি (বসিরহাট); রাধাশ্যাম, রঙ্কু, দাদারা প্রভৃতি (আদরা); জন, রেম, পিন প্রভৃতি (মালদহ); রথীন্দ্রনাথ মিত্র (ভবানীপুর); কল্যাণকিশোর মুখোপাধ্যায় (টুথবাটী—গয়া); সন্তোষ, নিতাই, নীলু (দেওঘর); চুণীরঞ্জন সেন, অরুণ, উমা, প্রভৃতি (খুলনা); জলু, নবু, বরু (মণিহরা); রহিম, নূর, নরেশ প্রভৃতি (তাহিরপুর); তুষারকণা পাল (কলিকাতা); সুধীর, পরিমল, অধীরচন্দ্র রায় প্রভৃতি (জলপাইগুড়ী) কামাখ্যা, ব্রজেন, লাট্টু প্রভৃতি (দমদম); জ্যোৎস্না, বিজয়াদি, রমাদি প্রভৃতি (রাজাপুর—চট্টগ্রাম); অজিত কুমার সান্যাল (পাবনা); অশোকরঞ্জন দত্ত (সিংরেল); অজিতদা', মাষ্টার মহাশয়, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি (বড়া—হুগলী); শ্যামাপ্রসাদ বসু, বুলু, সুনীল প্রভৃতি (আকিয়াব); মেমিও বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (মেমিও)।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মোমবাতি

উত্তরদাতাদের নাম

বিদ্যুৎ, অন্ন ও উমা (ছাপরা); তুষারকণা পাল (কলিকাতা); ব্যোমকেশ রাহা (চট্টগ্রাম); কল্যাণকিশোর, রাণী, ছোটদাদা (গয়া); শোভারাণী ও সত্যপ্রসাদ (জামসেদপুর); বিনয় গুপ্ত, মণি, হরিশ, সুধাংশু, বিলাস (শ্রীরামপুর); সন্তোষ বসু ও অরুণা দে (রাণাঘাট); সুকা, নীলিমা, ছায়া, সুজাতা, মঞ্জরী, বিনয়, অনন্ত ওহ্‌দেদার (কাশী); অনিল, স্বরাজ, মণি, সুকুমার, শান্তি, সত্যব্রত, হরিপ্রসাদ (দেওঘর); কৃষ্ণবরণ, অমর, প্রতিভা (মুড়াগাছা); জ্যোৎস্না, কীয়াদি, খেদিদি, পাখীদি, দীপেন, বরেন, ফেলু প্রভৃতি (রাজাপুর—চট্টগ্রাম), অমল, খোকা, কালি, সান্ত্বনা, উমা, প্রতুল (মালদহ); গোপাল, কমলা, ববি, সন্তোষ (দেওঘর); দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর); পুষ্প, বিজন, খেলা, সুনীতি, মঙ্গলময়ী, কল্যাণী, প্রসাদ ; প্রতিমা ভট্টাচার্য্য (কিশোরগঞ্জ); ঠাকুরদা', নিরঞ্জন, নীহার, শান্তি, কালু পরিমল, অরুণা প্রভৃতি (মধ্যপাড়া); আরতি, অরুণ, অনিল, অন্নদা, প্রাণদা, অতুল (কলিকাতা); অরুণ, অনিল, অন্নদা, প্রাণদা, অতুল (কলিকাতা); অরুণ, মজুমদার, বেবী, নটু, শিশির, রবি, নন্দা ভবানীপুর); মহম্মদ, আজিজ ও বেতাল সিংহ (নলহাটী); সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাগলপুর)।

নূতন ধাঁধা

(প্রাচীন সাহিত্য হইতে সংগৃহীত)

একটি ছোট মেয়ে তার সইকে একটা ছোট বাক্সে ভ'রে কতকগুলি ফুল পাঠাচ্ছে। ফুলগুলি পাছে পথে নষ্ট হয় এই ভয়ে সে বাক্সের গায়ে একটা সাপের ছবি, হনুমানের ছবি এবং মহাদেবের ছবি এঁকে দিল। বল তো কেন ?

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যার সহিত রামধনুর ৭ম বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ হইতে ৮ম বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া আগামী বছরের বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০ (ষাণ্মাসিক গ্রাহকেরা ১৷৵০) আগামী **২০শে পৌষের** মধ্যে আমাদের মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইবেন; (কলিকাতার গ্রাহকেরা হাতে টাকা জমা দিতে পারেন।) কারণ ভি, পি, তে পত্রিকা লইলে তাঁহাদের অনর্থক অতিরিক্ত ।/০ ভি, পি মাশুল দিতে হইবে এবং পত্রিকা পাইতেও কিছু দেরী হইবে। আশা করি সকল পুরাতন গ্রাহকই আগামী বছরও গ্রাহক থাকিবেন। যদি বিশেষ কারণে কেহ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকেন তবে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আগামী **২০শে পৌষের** মধ্যে আমাদের জানান। ঐ তারিখের মধ্যে চাঁদা কিংবা কোনও চিঠি না পাইলে আমরা তাঁহাদের নামের রামধনু ভি, পি, তে পাঠাইব। আশা করি গ্রাহকেরা ভি, পি, ফেরৎ দিয়া আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

আগামী মাঘ হইতে রামধনুতে একখানি নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস আরম্ভ হইবে।

নিঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, **রামধনু**
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

বাটী ভাড়া

ভবানীপুর—৫১।বি, ল্যান্সডাউন্ রোড্; উপরে ৪ খানা ঘর ও বাথরুম, নীচেও ৪ খানা ঘর ও বাথরুম আছে। রান্নাঘর প্রভৃতি স্বতন্ত্র। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম খোলা। ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা আছে। ভাড়া ৬০৲ ও occupier's tax ৭৷৷০। উক্ত ঠিকানায় দারোয়ানের নিকট গিয়া বাটী দেখা যাইতে পারে।